মৈথিলী সাহিত্যের ইতিহাস

মৈথিলী সাহিত্যের ইতিহাস

জয়কান্ত মিশ্র



সাহিত্য অকাদেমি

Maithili Sahityer Itihas: Bengali translation by Udaya Narayana Singh of Jayakanta Mishra's *History of Maithili Litearature* in English. Sahitya Akademi, 2000.

সাহিত্য অকাদেমি
রবীন্দ্রভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি ১১০ ০০১
বিক্রয় কেন্দ্র : স্বাতী, মন্দির মার্গ, নতুন দিল্লি ১১০ ০০১
জীবনতারা, ২৩ এ/৪৪ এক্স, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা ৭০০ ০৫৩
সি. আই. টি. ক্যাম্পাস, টি. টি. টি. আই. পোস্ট, তারামণি, চেন্নাই ৬০০ ১১৩
১৭২ মুম্বাই মরাঠি গ্রন্থ সংগ্রহালয় মার্গ, দাদার, মুম্বাই ৪০০ ০১৪
সেন্ট্রাল কলেজ ক্যাম্পাস, ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি বিল্ডিং, ড. বি. আর. আম্বেদকর ভীথি, বাঙ্গালোর ৫৬০ ০০১

অক্ষরবিন্যাস : সাইবার কম্পিউটারর্স, ৫৫ এম. জি. রোড, বজবজ, ২৪ পরগণা (দক্ষিণ)

মুদ্রক : ফ্রেন্ডস গ্রাফিকস, ১১ বি বিডন রো, কলকাতা ৭০০০০৬

মুখবন্ধ

বর্তমান গ্রন্থটি আমার মৈথিলী সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক পূর্বে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর থেকে একাধিক কারণে পৃথক। এতে এমন অনেক অংশ বর্ণিত ও সংক্ষেপিত হয়েছে যা বিশেষজ্ঞদের জন্য মূল্যবান কিন্তু সাহিত্য বিকাশের অনুধাবনের জন্য অতটা প্রয়োজনীয় নয়। আবার এই বইয়ে বহু নতুন বিষয়ও স্থান পেয়েছে। মধ্যযুগের সাহিত্য বিষয়ক অধ্যায়ে বহু অপ্রকাশিত কৃতির বর্ণনা রয়েছে যা আমি নেপালের ঐশ্বর্যময় গ্রন্থাগারগুলিতে ১৯৫৭ সালে দ্বিতীয়বার ভ্রমণের সময় আবিষ্কার করি। আধুনিক কালের বর্ণনা ১৯৭২ সাল পর্যন্ত করা হয়েছে। নবীন আলোকে উদ্ভাসিত একাধিক বিষয় যা ইতিপূর্বে প্রকাশিত বা আলোচিত, তা আমাকে মত পরিবর্তনের সুযোগ দিয়েছে। অবশ্য একটি বিষয়ে আমার পক্ষে এমন একটি মত গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি যা আপাতদৃষ্টিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কারের মতো প্রতীত হয়। আমি বিশেষ করে মহান কীর্তনিয়া নাট্যকার উমাপতি উপাধ্যায়ের সময়- কালের কথা উল্লেখ করছি। এই বইটি যখন প্রকাশের পথে তখন আমাকে এ বিষয়ে অবগত করা হয় যে উমাপতির পৃষ্ঠপোষক হিন্দুপতি দক্ষিণ নেপালের মেকামনি নামক স্থানের সেন বংশেব রাজা ছিলেন। কিন্তু এই তথ্যের প্রমাণাদি যেহেতু আমার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা সম্ভব হয়নি, তাই আমি আমার পুরনো মতের পক্ষেই ঝুঁকেছি, উমাপতি যে হিন্দুপতির পৃষ্ঠপোষকতায় বিকশিত হন তিনি বুন্দেলখণ্ডের ছত্রশালের বিখ্যাত রাজবংশের উত্তরাধিকারী ছিলেন।

জয়কান্ত মিশ্র

বিষয়-সূচি

প্রথম অধ্যায়

মৈথিলী সাহিত্যের ভূমিকা

১. *মিথিলা ও তার সংস্কৃতি*

মিথিলা

বিহার ও নেপালের জন - অধ্যুষিত এক বিশাল অংশের অধিবাসীদের মাতৃভাষা মৈথিলী। বিভিন্ন সময়ে এই প্রান্তের সঠিক আকার ও পরিমাপ বদলেছে। তবে মৈথিলী ভাষাভাষীদের কাছে এই ভূ-ভাগ এমন একটি পৃথক "দেশ যার নিজস্ব ঐতিহ্য আছে, আছেন নিজস্ব কবিগণ, আর আছে সমস্ত নিজস্বতার প্রতি স্বকীয় গর্ব।"[১]

বর্তমানে যা 'তিরহুত' বা 'মিথিলা' বলে পরিচিত কিন্তু প্রাচীন ইতিহাসের পাতায় এর নাম ছিল 'বিদেহ' যার অধীনে ছিল বহু রাজ্য, যেগুলির আর তার মধ্যে মিথিলা ও বৈশালী ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।[২] খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে এই অঞ্চলটি 'মিথিলা'[৩] বা 'তীরভুক্তি' প্রদেশ নামে পরিচিত হলো। মোগল সাম্রাজ্যের কালে এর উত্তরভাগের একাংশ নেপালের রাজাদের অধীনে পাকাপাকিভাবে চলে যায় এবং ভারতীয় শাসককুলের শাসনাধীনে যে অংশটি রইল তাব নাম 'তিরহুত'।[৪] এই তিরহুত বিহার প্রদেশের একটি 'সুবা'-র একটি সরকার বা অঙ্গরূপে অন্তর্ভুক্ত হলো। উত্তরে হাজিপুর, মুঙ্গের ও পূর্ণিয়ার সরকারগুলির[৫] দ্বারা নির্দিষ্ট একটি বিশাল ভূমি ছিল মিথিলার অধীনে। ইংরেজ শাসনকালে সরকারীভাবে 'তিরহুত' বিহরের একটি অর্থকরী তহদিলরূপেই নির্দিষ্ট ছিল যার অধীনে ছিল মুজফ্‌ফরপুর, দ্বারভাঙা, চম্পারন ও সহর্ষা জেলা) কিন্তু জনপ্রিয়ভাবে তা গঙ্গার উত্তরের সম্পূর্ণ বিহার বলে জ্ঞাত ছিল এবং আজও পর্যন্ত যা আধুনিক মৈথিলী ভাষী অঞ্চলের একটা অস্পষ্ট সীমারেখা বলে গণ্য হয়। স্যার জর্জ এ. গ্রিয়ারসন মৈথিলী-ভাষী অঞ্চলের বর্তমান সীমানার সঠিক সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে নিম্নোক্ত উক্তি করেন :

"প্রাচীন মিথিলার ভাষার ওপরে পশ্চিম প্রান্তে হিন্দী (ভোজপুরী) নিকট অতীতে

১। স্যার জর্জ এ. গ্রিয়ারসন, মৈথিলী ব্যকরণ, প০ ২

২। শতপথ ব্রাহ্মণ (খ্রি. পূ. ১০০০-৬০০) বিদেহ প্রদেশের সীমা উল্লেখ করে এবং বলে যে কোশল প্রদেশের থেকে এই দেশকে পৃথক করে 'সদানীরা' (গণ্ডক বা রাপ্তি বা করতোয়া নামেও জ্ঞাত) নদী।

৩। বৃহদ্-বিষ্ণু-পুরাণ-এ (খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতক) মিথিলাব সীমানাকে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে : "পূর্বে কৌশিকী নদী, পশ্চিমে গণ্ডকী নদী, দক্ষিণে গঙ্গা ও উত্তরে হিমালয় দ্বারা পরিবৃত।"

৪। বৈশালীর কাছে বসাঢ়েব মুদ্রায় (খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতক) 'তীরভুক্তি' নামটি সর্বপ্রথম পাওয়া যায় এবং আজও তা 'তীরভুক্তি'বা 'তিরহুত' নামে পরিচিত।

৫। জলা গেজেটিয়ার (মুজফ্‌ফরপুর)।

অনধিকার প্রবেশ করে এবং যেন প্রতিশোধ রূপে তা গঙ্গা পেরিয়ে উত্তর পাটনা এবং মুঙ্গের ও ভাগলপুর জেলায় নদীর দক্ষিণ প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। তা ছাড়া কোশী নদী পেরিয়ে তা পূর্ণিয়াও অধিকার করে।"[১]

উপরোক্ত সীমানা-নির্দেশ অনুসারে অঙ্কিত মৈথিলী-ভাষী অঞ্চলের মানচিত্রে আধুনিক মিথিলা রূপে প্রায় ৩০,০০০ বর্গমাইল[২] এলাকা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে এতে ভারতীয় অংশের অধীনে মোটামুটিভাবে মজফ্ফরপুর, সীতামঢ়ী, বৈশালী, দ্বারভাঙা, মধুবনী, সমস্তিপুর, সহর্ষা, উত্তর মুঙ্গের, উত্তর ভাগলপুর ও পূর্ণিয়ার অংশবিশেষ এবং নেপাল রাজ্যের অধীনে রৌতাহাট, সরলাহী, সপ্তারী, মোতাহারী ও মোরাং জেলাগুলি পড়ছে।

দেশ

প্রাচীনকাল থেকেই মিথিলাদেশ গভীর জঙ্গল ও ঘন উদ্ভিদ-সম্পদের জন্য এবং নিচু জলাভূমি রূপে বিখ্যাত। এ দেশ নদীনালায় পরিপূর্ণ এবং বছরের অধিকাংশ সময়ে দেখে মনে হয় এটা "মূলত অস্থায়ী হ্রদসমূহের একটা বিশাল শৃঙ্খল যা একত্রে গাঁথা রয়েছে অসংখ্য পাহাড়ী নদীর সুতোয় যা প্রবাহিত হয়... নেপাল থেকে গঙ্গায়। প্রচণ্ড শীতের সময়েও এই অঞ্চলের বিশাল ভূখণ্ডের অনেকটাই শুকোয় না এবং অনেক জায়গাতেই যাতায়াত ও সংযোগরক্ষা সম্ভব বছরের মাত্র তিন কি চার মাস।" এ দেশের ভূখণ্ডের এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই ১৯৩৪ সালের বিহারের বিশাল ভূমিকম্প মিথিলার পক্ষে হয়েছিল সবচেয়ে ক্ষতিকর। চাষবাসের উন্নতি ও যাতায়াতের ব্যবস্থার অগ্রগতির ফলে এখন গভীর জঙ্গল এবং বিশাল 'চত্তরস'গুলি (জমি ও জমা জলের জলাভূমি) ধীরে ধীরে কম হয়ে এসেছে এবং বর্তমানে যথেষ্ট দীর্ঘ ও গভীর জঙ্গল নেই বললেই চলে যেখানে বৃহদাকার বন্য প্রাণীরা আশ্রয় নিতে পারে।

মিথিলার আবহাওয়া বছরের অধিকাংশ সময়ে থাকে শীতল ও মনোরম। ইদানীংকালে, নানান কারণে বিশেষ করে অত্যধিক মাত্রায় ও দীর্ঘ সময় ব্যাপী বন্যা ও আকস্মিক চরম খরার ক্রমাবর্তন আগমনে, বিশেষত ১৯৩৪ সনের বিধ্বংসী ভূমিকম্পের পরে আবহাওয়া অনেকাংশে অস্বাস্থ্যকর, অলস ও মন্থরতাপ্রদ হয়ে উঠেছে।

১। গ্রিয়ারসন, এ গ্রামার অব্ সেভেন বিহারী ডায়ালেক্টস্ (প্রথম খণ্ড) ভূমিকাসহিত, পৃ. ১৬। আমি কিছুদিন পূর্বে গয়া ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলে ভ্রমণ করি এবং সেখানে প্রচলিত ভাষা হিসেবে মৈথিলীকেই পাই। অতএব একটি নিরপেক্ষ ভাষা জরিপের প্রয়োজন বোধ হয় এখনও আছে।

২। এর মধ্যে প্রায় ১০,০০০ বর্গমাইল নেপাল রাজ্যের (তরাই) অধীনে আছে এবং ২০,০০০ বর্গমাইল আছে ভারতে (এখানে উল্লেখ্য, বৃহদ্-বিষ্ণু-পুরাণে (খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতক) বর্ণিত মিথিলার সীমা অনুসারে তা হবে ৪০,০০০ বর্গমাইল — পুব থেকে পশ্চিমে ৯৬ ক্রোশ এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে ৬৪ ক্রোশ।

এর ফলে জনসাধারণের পক্ষে তা হয়েছে অত্যন্ত কষ্টকর। কারণ বর্তমানের চরম দুর্ভাগ্যময় দুঃখকষ্টের জন্য অনেকাংশেই এখানকার মানুষের পরিবেশজাত অলস জীবন ও অভ্যাসই দায়ী, কিন্তু এর আগে এই দেশের মানুষজনই ভীষণ সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন যাপন করেছে, সহজ ও স্বতঃপ্রবাহী দিন কাটিয়েছে, যার জন্য দৃষ্টিময় শিল্প ও সাহিত্যে আত্ম-নিয়োজন হয়েছে সম্ভব। যথেষ্ট খাদ্য এবং দৈনন্দিন প্রয়োজনের জন্য যে কঠিন পরিশ্রমের দরকার তা নগণ্য হওয়ায় এই ভাষাভাষীদের হাতে ছিল অফুরন্ত সময় এবং এরপর শান্তিপ্রিয় শাসন-ব্যবস্থার কারণে ইতিহাসের ঊষাকাল থেকেই এখানকার মানুষজন নানাবিধ শিল্পকলার চর্চা এবং দর্শন ও জ্ঞানের নানান শাখার অধ্যয়নে আত্মনিবেদন করতে পেরেছিল। এই দিক দিয়ে প্রাচীনতম কাল থেকে এই প্রান্তের এক ধরনের একাকিত্বময় অবস্থান হওয়ায় এ বিষয়ে নিশ্চিত ও নিশ্চিন্তরূপে অগ্রগতি করা সম্ভব হয়েছে একাধিকবার বহিঃশত্রু রা আক্রমণ সত্ত্বেও। শ্রী ও'ম্যালী এ বিষয়ে একটা নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে:[১]

> (মিথিলা) একটা এমন প্রান্ত ছিল যা অন্য কোনো জাতির সঙ্গে সমমর্যাদার সঙ্গে অন্তর্মিশ্রণের পক্ষপাতী ছিল না, ছিল অধিকতর গরবিনী, এবং উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে যুগে যুগে বারংবার আক্রমণ সত্ত্বেও নিজের ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে ছিল সঞ্জীবিত ... মুসলমান আক্রমণের সময়ে গণ্ডক নদী একটা অদ্ভুত বাধা হিসেবে ছিল। যে সময়ে গণ্ডকের পশ্চিম দিকের ও গঙ্গার দক্ষিণের রাজ্যগুলিকে মোগল সাম্রাজ্যের অধীনে নানান ঝড়ঝাপটা সহ্য করতে হচ্ছিল, সে সময়ে মিথিলা রাজ্য . . . হিন্দু রাজাদের অধীনে মোটামুটি শান্তিতেই ছিল। এই পৃথকাবস্থানের ফলাফল আজও দেখা যায়।

মিথিলা — ঐতিহ্যময় বিদ্যাশিক্ষার পীঠস্থান

এটা দেখা যায় যে "মিথিলার ইতিহাস বীরত্ব ও অস্ত্রপ্রয়োগের বীরগাথাকে কেন্দ্র করে নয়, জ্ঞান ও সাহিত্যের বিলাসী সম্ভোগকে কেন্দ্র করে রচিত হতে পারে। যদিও মিথিলার খ্যাতি বীরত্বপূর্ণ কাজের ওপর নির্ভরশীল ছিল না, একথা মেনে নিতেই হবে যে প্রতিভাবান ও জ্ঞানীরা এই রাজ্যে উদার পৃষ্ঠপোষক, শান্তি ও সুরক্ষা পেয়েছিলেন। এই দেশের মুখ্য নগরগুলি ছিল আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে মুক্ত। রাজসভা ছিল জ্ঞান ও সংস্কৃতিচর্চায় নিয়োজিত যেখানে কবি ও দার্শনিকেরা অধিষ্ঠিত ছিলেন ও প্রাচুর্যের মধ্যে। তাই এখানে ঐতিহাসিক প্রথমেই খোঁজেন সম্মান এখানকার অধিবাসীদের মনের উৎকৃষ্ট বৌদ্ধিক বিকাশের চিহ্নগুলিকে যেখানে অন্তত এখানকার মহামানবদের জ্ঞানের পেয়ালা থেকে উপছে পড়া প্রজ্ঞার পরিচয় থাকে"[২]।

১। লিংগুইস্টিক সার্ভে অব্ ইন্ডিয়া, পঞ্চম খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ৪ এবং দ্বারভাঙা জেলা গেজেটিয়ার, পৃ. ১১৭-১১৮।

২। দ্বারভাঙা জেলা গেজেটিয়ার, পৃ. ২২।

সত্যিই মিথিলা ও তার অধিবাসীদের খ্যাতি কখনো অন্য কোনো কারণেই হয়নি। মিথিলার শাসকেরা সবাই বিদগ্ধ ছিলেন এবং তাঁরা সবসময় তাঁদের রাজ্যে ও রাজসভায়, যাঁরা ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। খাণ্ডব বংশের দ্বারভাঙা রাজাদের পূর্বপুরুষেরা শুধু এই জ্ঞানের ভিত্তিতেই রাজত্ব লাভ করেন। "দার্শনিক রাজা" হিসেবে মৈথিলী রাজাদের জুড়ি মেলা ভার। বৈদিক "জীবন-মুক্ত" বিখ্যাত বিদেহরাজ জনকের কথা কে না জানে? অথবা পরবর্তীকালের নব্য ন্যায়ের জ্ঞাতা মহারাজা মহেশ ঠাকুরের বিষয়েও কে না জানে ?

প্রাচীনতম প্রমাণ থেকে জানা যায় যে দীর্ঘদিন থেকেই মিথিলা বৈদিক ও ঔপনিষদিক গীতিচর্চার কেন্দ্র ছিল। রাজসভাতেই শুধু জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলতো না, সমাজের নিম্নতর শ্রেণীর মানুষের (উদাহরণস্বরূপ, মহাভারতের বন-পর্বের ধর্ম-ব্যাধের কাহিনীই রয়েছে) মনেও ছিল এই আলোর প্রকাশ।

ভারতীয় দর্শনের ছটি মূল শাখার মধ্যে চারটিরই ভিত্তি স্থাপন হয়েছিল মিথিলায় খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ থেকে ৬০০ সালে। গৌতম, কণাদ, জৈমিনি এবং কপিল যথাক্রমে ন্যায়, বৈশেষিক মীমাংসা এবং সাংখ্য দর্শন প্রচার করেন। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ থেকে তৃতীয় শতকে বৈশালী নগরী ও তার পরিপার্শ্ব বৌদ্ধ দর্শনের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল কিন্তু কুমারিল ও উদয়নের নেতৃত্বে এখানে আবার ব্রাহ্মণ্য চিন্তাধারার অধিকতর প্রসার সম্ভব হলো।

পরবর্তীকালে যখন দেশে মুসলমান আক্রমণ হলো, প্রত্যেক প্রাজ্ঞজনই নানান চিন্তাভাবনা ভাবনা করে সামাজিক ও নৈতিক ব্যবহারের নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করতে থাকলেন। এই কারণেই মধ্যযুগে এখানে নব্য-ন্যায়, পূর্ব-মীমাংসা এবং স্মৃতি-নিবন্ধ চর্চার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র গড়ে উঠলো।

নিজস্ব ঐতিহ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করে মিথিলার পণ্ডিতেরা ঈর্ষাবশত তাঁদের জ্ঞানের দুয়ারে পাহারা বসালেন। অতএব এখানে গড়ে উঠলো শরযন্ত্র[১] বা শলাকা পরীক্ষা[২] এবং উপাধ্যায়-মহোপাধ্যায় ও মহামহোপাধ্যায়ের[৩] মতো কঠিন পরীক্ষা ব্যবস্থা।

প্রাচীন ঐতিহ্যময় বিদ্যাশিক্ষার প্রতি এই ভক্তি ও শ্রদ্ধার চিহ্ন মিথিলার মানুষ-জনের

১। দ্র. গঙ্গানাথ ঝা, কবিরহস্য, পৃ. ৭৪; কে পি জয়সওয়াল, ইন্ট্রোডাকশন টু মিথিলা ম্যানুসক্রিপ্ট ক্যাটালগ, দ্বিতীয় খণ্ড ; এবং আর. ঝা-র প্রোসিডিংস অব দি অল ইন্ডিয়া ওরিয়েন্টাল কনফারেন্স-এ (খণ্ড ১২.২, পৃ. ৩১০-৩২৫) প্রকাশিত 'ডিক্লারেশান অব এ শর-যন্ত্রী'।)

২। দ্র. সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, 'হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়ান লজিক'. পৃ. ২৩, পাদটীকা ১ এবং সরস্বতী ভবন স্টাডিজ-এ (খণ্ড ৪, পৃ. ৬৯) ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজের নিবন্ধ।

৩। গোবর্ধনের 'আর্যসপ্তশতী' বিষয়ক ম. ম. সচল মিশ্রের টীকার কেশী মিশ্র সম্পাদিত সংস্করণে ড. গঙ্গানাথ ঝার ভূমিকা ।

জীবনে এখনো পাওয়া যায়। এখানকার স্থান-নামে [১] এখনো সংস্কৃত চর্চার পরিচয় পাওয়া যায় এবং এখানকার ক্রীড়া ও অবসর যাপনের [২] মধ্যেও বৈদিক ঐতিহ্যর ছাপ রয়েছে।

সব মিলিয়ে, প্রাচীন ঐতিহ্যের বিদ্যার প্রতি এই অসাধারণ আনুগত্যের মিলিত ফল হয়েছিল খুবই ভালো। এর ফলে যুগে যুগে এখানে সংস্কৃতি ও জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্বলিত রাখা সম্ভব হয়েছিল। অবশ্য একথাও স্বীকার্য যে এজন্যেই মিথিলায় গোঁড়ামি ও প্রাচীন পন্থা আজও পাওয়া যায়। প্রাত্যহিক জীবনে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুদিনা, মৌরি ও জিরা-র বাঁধনে বাঁধা বয়েই গেছেন মৈথিলেরা[৩]। যা কিছু এই নিয়মের বিরুদ্ধে চলে তারই প্রতি তাঁরা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেছেন। তার ফল এই হয়েছে যে যখন অধিকাংশ ভারতীয় রাজ্যে পশ্চিমা ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠনের মধ্যে দিয়ে এইসব স্থানের ভাষা ও সাহিত্যে নবীন প্রভাব নব প্রাণ-সঞ্চারের চেষ্টা হচ্ছিল, মিথিলা তখন দীর্ঘকাল ধরে সেই তুলনায় অনড়ভাবে ছিল দাঁড়িয়ে। এইজন্যেই আধুনিক মৈথিলী সাহিত্যে সাংবাদিকতা এবং অন্যান্য নানান পশ্চিমা বিধায় সাহিত্যচর্চা এসেছে অনেক দেরিতে। এই কারণেই আজ শিক্ষা ও শাসন-ক্ষেত্রে মাতৃভাষার অবমাননা সম্ভব।

অতিরিক্ত এবং একাত্মিক সংস্কৃত-চর্চাও মিথিলা-বাসীদের মাতৃভাষার প্রাচীন, জটিল ও মিশ্র রূপের জন্য দায়ী। মৈথিলী ভাষার ক্রিয়া-রূপতত্ত্ব অত্যন্ত জটিল, বিশেষ্য পদে এখনো রূপভেদ আছে, এবং সর্বনাম ও আরো কিছু সংরচনায় এমন সব বৈশিষ্ট্য রক্ষিত আছে যা আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার ইতিহাসের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ।

সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে একথা নির্বিবোধের সঙ্গে বলা যায় যে অন্য কোনো আধুনিক ভারতীয় ভাষার সাহিত্য এভাবে সংস্কৃত সাহিত্যের চরণচিহ্নে পা রেখে রেখে চলেনি। সংস্কৃত থেকে যে কেবলমাত্র কথা-সূত্র ও বিষয় ধার নেওয়া হয়েছে তাই নয়, কিছুদিন আগে পর্যন্তও প্রতীক, ছন্দ ও কল্পনাও সংস্কৃত ও প্রাকৃত-নির্ভর ছিল এবং এ বিষয়ে রচনা-কৌশলও সংস্কৃত নন্দনতত্ত্ব ও অলঙ্কারশাস্ত্র অনুযায়ী ছিল। এছাড়া সংস্কৃত সাহিত্যের রচনা-শৈলীগুলিরও অনুসরণ একাধিকভাবে হয়েছে মৈথিলীতে। উদাহরণস্বরূপ, মৈথিলী ভাষায় লেখা শ্রেষ্ঠ ব্যাকরণ মাহাবৈয়াকরণ দীনবন্ধু ঝা-র গ্রন্থটি 'সূত্র'-শৈলীতে লেখা এবং পানিনির ব্যাকরণের অনুসরণে এখানেও একটি দীর্ঘ ধাতুপাঠ সংযোজিত রয়েছে; 'প্রচলিত' মৈথিলী নাটকে তিনটি ভাষার ব্যবহার পাওয়া যায় সংস্কৃত নাটকের অনুসরণে — সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং মৈথিলী; এছাড়া মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য এবং চম্পূ প্রভৃতির রচনায় আজও মৈথিলী কবিরা গৌরব বোধ করেন। লোককথাগুলিও (বিশেষ করে ব্রতকথাগুলি) পুরাণ ও মহাকাব্যগুলি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে।

এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে মৈথিলী সাহিত্যের বেশ ক্ষতি হয়েছে সংস্কৃত ভাষা ও

১। দ্র. জে. মিশ্র, 'সাম্ আস্পেক্টস্ অব মৈথিলী কালচার', জর্নল অব বিহার রিসার্চ সোসাইটি, খণ্ড ৩৩, ভাগ ১ ও ২, পৃ. ৪৫-৬৪।

২। উপরোক্ত নির্দেশ দ্রষ্টব্য।

৩। লিংগুইস্টিক সার্ভে অব্ ইন্ডিয়া, খণ্ড ৫.২, পৃ.৩ ৪।

সাহিত্যকে অতিরিক্ত উচ্চাসনে স্থাপিত করায়। সংস্কৃতজ্ঞেরা মৈথিলীকে সর্বদাই 'অপভ্রংশ' (পতিত, অবনীত) ভাষা বলে মনে করেছেন এবং তাই, ওঁদের মতে, এই ভাষা শুধুমাত্র চটুল সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষেই যোগ্য। এইজন্যেই অতীতে আমরা মৈথিলীতে কোনো পাণ্ডিত্যপূর্ণ বা শাস্ত্রীয় সাহিত্যসৃষ্টির প্রমাণ পাই না। শুধুমাত্র এই শতকে এসেই দেখা যাচ্ছে যে এই ভাষাভাষীদের মধ্যে মৈথিলীতে সিরিয়াস সাহিত্য রচনায় উৎসাহ জেগেছে। অবশ্য, এর মানে এও হয়েছে যে নিম্নতর মানের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা, কায়স্থরা এবং অন্যজাতীয় মানুষ অতীতকালে মৈথিলী সাহিত্যের রচনায় বেশি উৎসাহ দেখিয়েছেন। আর এভাবে সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শ ও ধারণার ভারে মৈথিলী সাহিত্য ভারগ্রস্ত হয়ে যাওয়ার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিল। এঁরা সেকালের মৈথিলী সাহিত্যকে এভাবে ধীরে ধীরে জনসাধারণের কাছাকাছি নামিয়ে আনতে পেরেছিলেন যা অন্যথায় রাজকীয় এবং শাসকীয় পৃষ্ঠপোষকতার সাহায্যে হওয়া অসম্ভব ছিল।

মিথিলার ধর্মীয় জীবন

মিথিলায় কোনোদিনও ধর্মীয় সংকীর্ণতা দেখা দেয়নি। মিথিলায় কোনো কালেই কোনো নতুন ধর্মের প্রচার ও প্রসার হয়নি। হিন্দু মৈথিলেরা সাধারণত বর্ণাশ্রমধর্মেই বিশ্বাসী এবং সামান্যত সমস্ত হিন্দু দেবী-দেবতার সাধক।

যে তিনটি প্রধান দেবচরিত্র যুগে যুগে মৈথিলদের অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করেছেন তাঁরা হলেন শিব, শক্তি ও বিষ্ণু। মৈথিলেরা এই তিনজনকেই সমমানের মনে করেছেন এবং তিনজনকেই বরদানের ক্ষমতাসম্পন্ন বলে মনে করেছেন। মৈথিল ব্রাহ্মণদের কপালে একসঙ্গে যে ত্রিবিধ তিলক দেখা যায় এ থেকে এই বৈশিষ্ট্যই প্রমাণিত হয়। পবিত্র ভস্মের তিনটি আনুভূমিক রেখা তাঁদের শিবনিষ্ঠার প্রমাণ দেয়, তদুপরি আনুলম্বিক চন্দনের চিহ্ন প্রমাণ করে দেয় তাঁদের বিষ্ণুতে বিশ্বাস এবং রক্তচন্দনের বা সিঁদুরের ফোঁটা থেকে তাঁদের শক্তিতে ভক্তিকে বোঝায়।

শিবসাধনাই অবশ্য মিথিলাবাসীদের মধ্যে সব থেকে জনপ্রিয়। একাদশীর চেয়ে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতেই পূর্ণ উপবাসের অধিকতর জনপ্রিয়তা, বিশেষ বিশেষ শুভ-অবসরে মাটির তৈরি হাজার হাজার শিবলিঙ্গের পূজা, এই বিশ্বাস যে মাত্র শিবই পরম মুক্তির বর দিতে পারেন। এমন আরো নানান ব্যাপার একথাই প্রমাণ করে যে সাধারণ মানুষের হৃদয়ে শিবের স্থান কেমন গুরুত্বপূর্ণ। এইজন্যেই শিবসঙ্গীত মিথিলার একটি বৈশিষ্ট্য। এই সঙ্গীত দু'ধরনের— 'নচারী' ও 'মহেশবাণী'। 'নচারী' হলো সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় মন্ত্রগীতি এবং অন্যটি হলো সাধারণভাবে হরগৌরীর বৈবাহিক জীবন-বিষয়ক গান। বিদ্যাপতি থেকে চন্দা ঝা-র যুগ পর্যন্ত, কবিরা অপূর্ব নচারী ও মহেশবাণীর রচনা করেছেন। এইজন্যই 'আইন-ই-আকবরী' (১৫৯৮ খ্রি.) তিবহুতের একটা বৈশিষ্ট্যরূপে 'নচারী'-র উল্লেখ করেছে [১]। এবং এইজন্যেই শতসহস্র মৈথিল তীর্থযাত্রী কপিলেশ্বর বা পশুপতিনাথের

১। ব্লকম্যান-কৃত অনুবাদ, খণ্ড ৩, পৃ ২৫২। উদা: বাংলা ছন্দ 'লাচাড়ি'।

দর্শনে যান অথবা ভারী 'কামরু' নিয়ে পায়ে হেঁটে বৈদ্যনাথের মন্দিরে যান এবং 'কখন হ্রব মোর দুখ হে ভোলানাথ'— এই গান গাইতে গাইতে অজস্র ভক্তি-অশ্রু বইয়ে দেন। মিথিলায় প্রায় প্রত্যেকটি গ্রামেই অন্তত একটা মহাদেব-মঠ থাকে এবং প্রত্যেক গ্রামেই মাঝে মাঝে বড়ো করে শিবপূজার আয়োজন করা হয়।

শক্তির আরাধনাও একইরকম জনপ্রিয়। অবশ্য শিবপূজা ও শক্তি-আরাধনার মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য আছে। শিবের পূজা করে 'সিদ্ধি' লাভ করা গেছে এমন সব গল্পের যেমনই অভাব আছে, কিন্তু সেই তুলনায় যাঁদের শক্তির পূজারী বলা হয় তাঁরা নানান অলৌকিক ক্ষমতা পেয়েছেন বলে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। এটা সম্ভবত এই জন্যই যে শক্তি-কে সিদ্ধি-দাত্রী বলে ধরা হলেও যে দেবতা 'মুক্তি' বা মোক্ষ দান করতে পারেন— যা সিদ্ধির থেকেও উচ্চতর প্রাপ্তি, তিনি একমাত্র মহাদেবই। মিথিলার বেশ কিছু মহান ভক্ত ও সন্ন্যাসীর সঙ্গে শক্তির নাম জড়িয়ে আছে; যেমন, দেবাদিত্য, বর্ধমান, মদন উপাধ্যায়, ধীরেন্দ্র উপাধ্যায়, গোকুলনাথ উপাধ্যায় এবং মিথিলেশ রামেশ্বর সিংহ; প্রত্যেক বাড়িতেও রয়েছেন একজন 'গোসাউনি' (কুলদেবী), এবং রয়েছে বিখ্যাত সব সিদ্ধপীঠ, যেমন উচ্চৈঠ, জনকপুর, চামুণ্ডাস্থান, উগ্রতারাস্থান প্রভৃতি; শিশুকে যে প্রথম ছড়া শেখানো হয় তা শক্তির প্রশংসাই; এছাড়া অইপন (বা আল্পনা কিংবা মাটিতে আঁকা 'যন্ত্র') অথবা মৈথিলদের নাম— তন্ত্রধারী, তন্ত্রনাথ, শক্তিনাথ, খড়্‌গধারী, তারাচরণ, আদ্যাচরণ প্রভৃতি ; মৈথিল নারীর 'শবর' পূজা; সাধারণ মানুষের ভোগাভিলাষী (রাগী-ভোগী) চরিত্র; নিরামিষ খাওয়া-দাওয়া; তান্ত্রিক উষ্ণীষ (যাকে 'পাগ' বলে); চালের পায়েস পুজোয় চড়ানো এবং যে কোনো শুভ কাজেই 'কুমারী' ভোজন (যাকে 'পাতড়ি' পরব বলে); দশেরাব সময় সর্বত্র মাটির তৈরি দুর্গার আরাধনা, মাতৃকা-পূজা এবং (ইষ্ট-মন্ত্র রূপে) শক্তি-দীক্ষার প্রভূত প্রচলন— এই সব কিছু মিলিয়ে বোঝা যায় মৌথিল ধর্মীয় বিশ্বাসে শক্তির গুরুত্ব কতো বেশি। অবশ্য, অন্যান্য অনেক ব্যাপারের মতো এই ক্ষেত্রে মিথিলার অনেক মিল রয়েছে বাংলা আর অসমের সঙ্গে ।

শক্তি আরাধনার প্রগাঢ় ভক্তির ছায়াপাত লক্ষ করা যায় মৈথিলী লিপি ও সাহিত্যে। মিথিলাতে সংস্কৃতে লেখা প্রচুর তন্ত্র-বিষয়ক কাজ যে শুধুমাত্র পাওয়া গেছে তাই নয়— প্রায় প্রত্যেক রচনাকারই শক্তিকে মূল শক্তি-স্রোত রূপে বর্ণনা করেছেন এবং মৈথিলী লিপি যাকে মিথিলাক্ষর বা তিরহুতা বলা হয় তার গঠনই হয়েছে 'তান্ত্রিক যন্ত্র'-র আকারকে মেনে। 'কামধেনু-তন্ত্র' এবং 'বর্ণদ্ধার- তন্ত্রে' এর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। উদাহরণরূপে এখানে দেখানো যেতে পারে কিভাবে তান্ত্রিক 'যন্ত্রে'-র ছাঁচে 'র'— এই বর্ণটির গঠন হয়েছিল। মধ্যযুগীন শিলালিপিতে যে 'বিন্দু'-র উল্লেখ পাওয়া যায়, তারই আধুনিক সংস্করণ হলো এই বর্ণটি যেখানে তিনটে সরলরেখার দ্বারা গঠিত হচ্ছে একটি 'ত্রিকোণ'(ত্রিভুজাকার) যার মধ্যে রয়েছে একটি আড়াআড়িভাবে আঁকা রেখা। একইভাবে 'আঁজি'— একটা শুভ চিহ্ন, যা দিয়ে মিথিলাক্ষর শুরু হয়— তা আসলে কুণ্ডলিনীর একটা তান্ত্রিক চিহ্ন বিশেষ।

মৈথিলী সাহিত্যের প্রভাবের সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো 'গোসাউনি-ক গীত' যা না গাইলে মিথিলায় কোনো শুভকর্মই শুরু হতে পারে না। এছাড়া রয়েছে আরো অনেক গান— যার নাম 'যোগ' এবং যেগুলি নানান ভূয়োতান্ত্রিক বিশ্বাস ও কুসংস্কারের উপর ভিত্তি করে লেখা। এছাড়া রয়েছে প্রচুর তান্ত্রিক পাঠ (বিশেষ করে মৈথিলী মন্ত্রাদি) যা জাদুমন্ত্রের মতো ব্যবহৃত হয় এবং যা মন্ত্র-শাস্ত্রের পণ্ডিতেরাও ঠিকমতো বুঝতে পারেন না— যদিও সেগুলি সফলভাবে নিজেদের উদ্দেশ্যপূরণ করে বলে ধরা হয়।

এই দুই দেবতার তুলনায় বিষ্ণুপূজার তেমন কোনো প্রভাব এদেশের ভাষা সাহিত্যের উপর পড়েনি। বিষ্ণুর শালগ্রাম শিলা যেখান থেকে পাওয়া যায় সেই শালগ্রামী নদীর নৈকট্য, সমস্ত মুখ্য বৈষ্ণব উৎসব ও উপবাসাদির পালন এবং শ্রীমদ্‌ভাগবত, হরবংশ এবং ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের অসাধারণ জনপ্রিয়তা থেকে প্রমাণ হয় যে বৈষ্ণবধর্মও এখানে লোকপ্রিয় ছিল। তবে মৈথিলী প্রেমগীতির মূল্যবান ঐতিহ্যের সঙ্গে ভগবান কৃষ্ণের সম্বন্ধ বিষয়ে বিদ্বজ্জনের মতামত যাই হোক এটা বলে নেওয়া দরকার যে, মৈথিলী ভাষা যে সব মহান বৈষ্ণব সাহিত্যের জন্ম দিয়েছিল তার সৃষ্টির স্থানগুলি ছিল মিথিলার পরিধির বাইরে। এখানে লক্ষ করার মতো ব্যাপার হলো, যে বৈষ্ণবগীতির নাম 'ভজন' তা শুদ্ধ মৈথিলীতে প্রায় অনুপস্থিত এবং যখনই মিথিলার মানুষজন এই ধরনের গান গাইতে চায় তখনি তাদের অন্যভাষার 'ভজন'ই গাইতে হয়।

এই সবের মূল কারণ হলো মৈথিলদের এই বিশ্বাস যে বৈষ্ণব হলো একজন 'বিরক্ত' (অবসরপ্রাপ্ত) মানুষ যার সঙ্গে প্রাত্যহিক বর্ণহীন জীবনের কোনো সম্বন্ধ নেই। সত্যি কথা বলতে গেলে, মৈথিলী বাগ্‌ধারায় বৈষ্ণব বলতে বোঝাবে "এমন একজন যে শাক্ত হয়েও মাছ এবং ভগবতীর প্রসাদ (শক্তি-পূজায় চড়ানো মাংসের প্রসাদ) খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে (এবং যার গলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে তুলসির মালা)"। সাধারণত, একজন মৈথিল—যে নিরুদ্বিগ্নমনা হওয়ার থেকে বিলাসপ্রিয় হওয়াই বেশি পছন্দ করে— ঠিক এই অর্থে বৈষ্ণব হতে চায় না। মৈথিল বৈষ্ণব সাধারণত নিজেকে মনে করে সমস্ত বাঁধা-বাঁধনের ঊর্ধ্বে, আর সেইজন্যেই সে অন্য ভাষায় লেখা 'ভজন'-এর মতো প্রকাশ-মাধ্যমের আশ্রয় নেয়। সাধারণত, অযোধ্যাধিপতি রাম এবং মথুরার কৃষ্ণ (ব্রজভাষা)— বৈষ্ণব ধর্মের এই দুইজন মহত্তম অবতারের জন্মস্থানের ভাষাতেই মৈথিল বৈষ্ণবেরা ভজন কীর্তন করে থাকেন।

অতএব সবশেষে এই সিদ্ধান্তে আসাই স্বাভাবিক যে মৈথিল মানসের ভক্তিভাবনার মূল উৎসমুখে আছেন শিব এবং শক্তি এবং এই ভাষাভাষীদের প্রধান ধর্মীয় চরিত্র হলো স্মার্ত ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মে বিশ্বাস।

মিথিলার হিন্দু ও মুসলমানেরা

এখানে একথা উল্লেখযোগ্য যে এই মূলত ব্রাহ্মণশাসিত দেশের মধ্যেও বেশ কিছু এমন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যেখানে হিন্দু ও মুসলমানের সমন্বয়ের প্রমাণ পাওয়া যায় । এর প্রমাণ

যে শুধু হিন্দুদের দ্বারা ব্যবহৃত অনেকগুলি আরবী ও পারসিক শব্দেই পাওয়া যায় তা নয়— যে শব্দগুলি হিন্দুদের একান্ত ঘনিষ্ঠ ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে পাওয়া যায়, যেমন কবুলা, রিকবী, জাজরা, তাজ, ফরক, দলান, মহফা, হবেলী প্রভৃতি (যথাক্রমে 'ভগবানকে বিশেষ কোনো প্রসাদ বা বলি চড়ানো', 'খাদ্যবিশেষ', 'মূত্রালয়', 'রাজকীয় কিংবা বাবুয়ানী টুপি', 'বিয়েতে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক মর্যাদা-সম্পন্ন দুটি সম্বন্ধী দলকে দেওয়া টাকাপয়সা', 'পুরুষ অতিথিদের বসার জন্য বাহিরদুয়ারের কক্ষবিশেষ', 'পালকি' এবং 'মাননীয় ব্যক্তির উঠোন বা অন্দরমহল' অর্থে)— (যেক্ষেত্রে অবশ্য আমরা শাসন ও সরকারী কাজকর্মে ব্যবহৃত এমন শতসহস্র শব্দকে বাদই দিচ্ছি, যদিও এও সত্য যে অষ্টাদশ শতকের সময় পর্যন্ত মিথিলা ছিল ভারতের সামান্য কয়েকটি প্রদেশের একটি যেখানে আইনগত বিচারাদি প্রাচীন হিন্দু রীতিনীতি অনুসারেই করা হতো— দ্র. কে. পি. জয়সওয়ালের ১৯২০ সালে প্রকাশিত "জার্নাল অব বিহার অ্যান্ড ওড়িশা রিসার্চ সোসাইটি-র জাজমেন্ট অব সচল মিশ্র"-তে এর প্রমাণ রয়েছে, এমন কি ব্রাহ্মণদের উপাধি বা পদবীও ছিল, যেমন খান, বক্শী এবং চৌধুরী। এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এখানে তাজিয়া (অথবা, মৈথিলেরা যাকে বলেন 'দাহা') আহৃত, সম্মানিত এবং পূজিতও হয় ও সবাই এতে অংশগ্রহণও করে।

এছাড়া দেখা যাচ্ছে মুসলমানেরা রাম ও কৃষ্ণের হিন্দু ভক্তিগীতি গাইছেন প্রাণ খুলে এবং হিন্দুরা পুজো দিচ্ছেন মুসলমান পীরদের দরগায় (যেমন, 'পঞ্চ-পিরিয়া' অর্থাৎ এমন একজন হিন্দু যিনি গাজী মিএগ্রা ও অন্যান্য চারজন পীরের পূজো করেন; দ্র. 'বিহার পেজেন্ট লাইফ', পৃ. ৪০৭ [১])। একই রকমভাবে পাচ্ছি হিন্দুদের আর একজন আরাধ্য দেবতাকে যাঁর নাম 'বালাপীর', যিনি ততক্ষণ তুষ্ট হন না যতক্ষণ না ওঁকে একটি মুরগি বলি দেওয়া হয় (যা মূলত মুসলমানদেরই বৈশিষ্ট্য)।

মিথিলার জাতীয় অব্দ হলো ফসল-নির্ভর। ভারতের অন্যান্য স্থানে যেমন দেখা যায়, এখানেও তেমনি সঙ্গীতে হিন্দু-মুসলমানদের সমন্বয় দেখা যায় সহজেই : মৈথিল সঙ্গীতজ্ঞ লোচন হলেন প্রথম হিন্দু সঙ্গীতকার ও বিশেষজ্ঞ লেখক যিনি বিখ্যাত মুসলিম গায়ক আমীর খুসরুর [২] দ্বারা আবিষ্কৃত দুটি রাগ—ইমন ও ফিরদৌসীকে গ্রহণ করেছিলেন।

এ থেকেই বোঝা যায় মিথিলার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কতটা পারস্পরিক সমঝোতা ও সম্মান রয়েছে। অর্থনৈতিক, কৃষিকার্য এবং অন্যান্য সাধারণ ব্যাপারে অবশ্য এই সদ্ভাবের কোনো শেষ নেই, যদিও ইদানীং এই দুই ধর্মের মানুষজনের মধ্যে সম্প্রীতিজনক সম্বন্ধে কিছুটা ঘাটতি দেখা যাচ্ছে।

মৈথিলীতে বেশ কিছু মরসৈয়া এবং গীতও পাওয়া যায় যা মুসলমান লোক-কবিদের রচনা।

১। একইভাবে মুসলিম কুঞ্জরারা রাম ঠাকুর নামক একটি হিন্দু দেবতার পূজা করেন (দ্র. গ্রিয়ারসন, 'বিহার পেজেন্ট লাইফ', পৃ.৪০৪)।

২। দ্র. আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের নিবন্ধ 'বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিক'-এর ১৯৪৪ সনের তৃতীয় ভাগ।

পঞ্জী ও মিথিলার কুলীনতাবাদ

মৈথিলেরা সামাজিক জীবনে বংশলতিকার হদিশ রাখার জন্য 'পঞ্জী' নামক একটি বিস্তারিত পদ্ধতি গ্রহণ করেন। যদিও এখন তা শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের জন্যেই লেখা হয়, মনে হয় আগে তা অন্যান্য জাতির লোকেদের জন্যেও লেখা হতো[১]। এই বংশানুক্রমণিকা ১১০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত পাওয়া যায়; তবে সর্বপ্রথম ১৩১০ খ্রিষ্টাব্দে মহারাজা হরিসিংহদেবই এই বংশপরিচয়গুলিকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে পঞ্জীতে বা (রেজিস্টারে) লিখে রাখতে আদেশ দেন যাতে এমন দুটি পরিবারে বৈবাহিক সম্বন্ধ না হয় যেখানে এমন সম্পর্ক হওয়ার নিষেধ রয়েছে। উনিই এই নিয়মের প্রচলন করেন যে বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হতে ইচ্ছুক দুটি দলকেই পঞ্জীকারদের থেকে সম্পর্কহীনতার প্রমাণপত্র ('অ-স্বজন-পত্র') নিতে হবে।

কালে এই বংশলতিকার দলিল এমন বিশাল আকার ধারণ করলো যে সমস্ত মিথিলাঞ্চলে কিছু নির্দিষ্ট স্থানে যাতে সরকারী পঞ্জীকারকে পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হয়ে পড়লো। এইজন্য যে-কোনো মৈথিলী গল্পে-উপন্যাসেই যখনই বিয়ের সম্বন্ধের কথা ওঠে তখনি পঞ্জীকারের প্রসঙ্গও এসে পড়ে। ঘটক প্রথার (ঘটক হলেন এমন একজন যিনি বেসরকারীভাবে বংশানুক্রমিকতার খবর রাখেন এবং বিধিবহির্ভূতভাবে নিয়মসম্মত বিয়ের সম্বন্ধ-নিরুপণে সাধারণ মানুষকে সাহায্য করেন।) জন্ম মৈথিলী সমাজের এই বৈশিষ্ট্য থেকেই হয়েছিল। সাহিত্যে অবশ্য চেনা ঘটক হলেন 'নারদ', তবে জীবন ঝা-র নাটক ও যাত্রীর কবিতায় আমরা ঘটকের বেশ মজার জীবনচিত্রণ দেখতে পাই।

পঞ্জীর আরেকটি অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে আমরা পাই একটি কুরীতি যার নাম 'বিকুয়া' (অথবা, কুলীনতাবাদ)। মনে হয় পঞ্জীর ব্যবস্থা আরম্ভ হওয়ার কিছুদিন পর কোনো কোনো পরিবারের কিংবা কোনো কোনো গ্রামবিশেষের— যেখানে এমন সব পরিবার বাস করে— সুগুণ বা দুর্গুণগুলির সঙ্গে সেই সব পারিবার বা গ্রামের প্রধানের নাম জড়িয়ে গেছিল, এবং এমন পরিবারের পঞ্জী বা 'লৌকিক' রূপে এই নামটিই প্রচলিত ছিল। এখানে এটা নিরুপণ করা কঠিন যে ব্রাহ্মণদের মধ্যে কবে নতুন করে উপশ্রেণীবিভাগ হয়ে গেছিল শ্রোত্রীয় ('সোতি'), যোগ্য (যোগা), পঞ্জীবদ্ধ ও জয়বার— এই চার ভাগে। মনে হয় সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হিসেবে ধরা হতো শ্রোত্রীয়দের; তার পরের ধাপে শ্রেষ্ঠ ধরা হতো যোগ্য-দের (বা যোগ্যতাসম্পন্নদের) এবং এছাড়া বাকি যাদের নাম পঞ্জীতে আসার যোগ্য ছিল তাদেরকে বলা হতো পঞ্জীবদ্ধ। জয়বাররা হলেন নিশ্চিন্তভাবে তাঁরা যাঁদের এই তিনটি ভাগের কোনোটিতেই অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। প্রথম তিনটি দলকে সাধারণত 'ভলমানুস' (বা কুলীন) বলা হতো। একসময়ে অবশ্য এই ভলমানুস যে-কোনো মৈথিল ব্রাহ্মণ হতে পারতো যে তার কর্মের দ্বারা এই মান পাওয়ার যোগ্য হতে পারতো।

১। দ্র. ঘনানন্দ ঝা-র 'ঘটকরাজা', পৃ. ১৩; ড. জনার্দন ঝা দ্বারা প্রকাশিত, পো. রানীতল, জেলা দ্বারভাঙা।

পরবর্তীকালে সংজ্ঞার এই নমনীয়তা গেল চলে এবং ভলমানুস এবং অভলমানুস—এই দুটি দলের সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্র ও প্রবণতা দেখা দিল। পঞ্জী অনুসারে উচ্চতর মানের একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করার ওপর প্রয়োজনের অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার ফল হিসেবেই বিকুয়া-প্রথার (বা কুলীনতাবাদ) মতো বহু নিশিত কুরীতির জন্ম হয়েছিল। ভলমানুসেরা টাকার বিনিময়ে নিম্নতর পরিবারগুলি থেকে একাধিক বিবাহের প্রস্তাব স্বীকার করতে আরম্ভ করলো। ঐ সময়েই মৈথিল সমাজের এই প্রথা সর্বনিকৃষ্ট স্তরে পৌঁছলো যখন তা বঙ্গদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। আজ অবশ্য বাংলা ও মিথিলা উভয় অঞ্চলেই এই প্রথা একেবারেই অচল হয়ে গেছে। সোতি ও ব্রাহ্মণ কিংবা ভলমানুস-অভলমানুসদের মধ্যে ঝগড়া এখনো কোনো না কোনোভাবে রয়েই গেছে।

পঞ্জী-প্রবন্ধ মিথিলার সামাজিক জীবনের একটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। এর দ্বারা ধর্মীয় ও বিদ্যাধ্যয়নের জীবনে এসেছে উৎসাহ, এভাবে রক্তের পবিত্রতা সংরক্ষিত হতে পেরেছে, এবং একই সময়ে এর দ্বারা সবচেয়ে বিস্তারে এবং বিশ্বাসযোগ্যভাবে মৈথিল পরিবারগুলির উৎস ও ইতিহাসের প্রামাণ্য দলিল তৈরি হয়ে গেছে। মৈথিলী গল্প উপন্যাসে এর ভালো ও খারাপ—দুটি দিক নিয়েই অনেক লেখা হয়েছে। এই প্রাচীন প্রথার প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টি থাকলে অবশ্য আমরা অন্ধভাবে এই প্রথাকে নিন্দামন্দ করতে পারবো না, কারণ অতীতে এই প্রথাই সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করেছে এবং স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নৈতিকতাসম্পন্ন ও অভিজাত জীবনের দিকে নিয়ে গেছে।

সঙ্গীত ও নাটকের প্রতি প্রেম

মৈথিলী জীবনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সঙ্গীত ও নৃত্যশিল্পের প্রতি অনুরাগ। দুর্ভাগ্যবশত এখনও পর্যন্ত মিথিলার সঙ্গীতচর্চার ধারা নিয়ে কোনো ইতিহাস লেখা হয়নি, যদিও সমস্ত পূর্বভারতের দেশীয় ভাষার সাহিত্যের প্রারম্ভ ও প্রগতির বিষয়ে কিছু জানতে গেলে এই ধারাকে জানা প্রয়োজনীয়।

দেশীয় (বা জনপ্রিয়—শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিরোধার্থসূচক শব্দ রূপে) রাগ-রাগিণীর সর্বাধিক প্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায় 'চর্যাপদ'-এ। তবে মনে হয় মহারাজা নান্যদেব (১০৯৭-১১৩৩ খ্রি.) সর্বপ্রথম জনপ্রিয় রাগগুলির সংরক্ষণ-সম্বর্ধনের ব্যবস্থা করেছিলেন। নিজেকে মিথিলার রাজা রূপে প্রতিষ্ঠিত করার পরই উনি 'সরস্বতী-হৃদয়ালঙ্কারহার' লিখেছিলেন। ওঁর পর গীতগোবিন্দের রচয়িতা জয়দেবই (জন্ম ১১২০ খ্রি.) মিথিলার সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যের উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। জয়দেবের সঙ্গীতকে (চতুর্দশ শতকের) কুম্ভের মতানুসারে নিকৃষ্ট ধরা হোক বা না হোক, একথা অনস্বীকার্য যে ওঁর মধুর সুর মৈথিলদের নানাভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল, বিশেষ করে এক নতুন ধরনের গীতিকবিতার রচনায়। ওঁর সুরলহরীর অসংখ্য টীকাকার ও অনুসারক ছিলেন যাঁদের মধ্যে সর্বপ্রাচীন ও মহানতম ছিলেন বিদ্যাপতি।

মহারাজা হরিসিংহদেবের (১২৯৫-১৩২৩/১৩২৪ খ্রি.) সময়ে আমরা সঙ্গীতচর্চার প্রচুর প্রমাণ পাই। উনি নিজেই একজন সংগীতবিশারদ ছিলেন এবং বিদ্যাপতির 'পুরুষপরীক্ষা'র 'নৃত্যবিদ্যা কথা'-য় দেখা যাচ্ছে, একজন মৈথিল সঙ্গীতজ্ঞ বলছেন যে "হর বা হরসিংহ দেবই একমাত্র তাঁর যোগ্যতার পরীক্ষা নিতে পারতেন"। ওঁর রাজসভায় জ্যোতিরীশ্বরের মতন দক্ষ সঙ্গীত বিশারদ ছিলেন যিনি চতুর্দশ শতকের মিথিলায় যেসব সাঙ্গীতিক গতিবিধি চলতো তার বিস্তারিত বর্ণনা করে গেছেন।

১৩২৪ খ্রিষ্টাব্দে হরসিংহদেবের নেপালে পলায়নের পর সঙ্গীতচর্চার কেন্দ্রবিন্দুও গেলো সরে। পরবর্তী শতকে আমরা নেপালের মৈথিলদের মধ্যে সঙ্গীতচর্চায় অসাধারণ প্রগতির পরিচয় পাই। সেই সময়কার সর্বপ্রথম গীতিকারের নাম নেয়া যায় তিনি হলেন সিংহ-ভূপাল। তাঁর পর এলেন জগদ্ধর (১৪৭৪ খ্রি.) যিনি লিখে গেছেন 'সঙ্গীতসর্বস্ব', যার প্রভূত উল্লেখ পাই তাঁর নিজেরই লেখা 'বেণীসংহার'-এর টীকায় এবং পাই রুচিপতি উপাধ্যায় ও রাঘবভট্টের রচনায়, এবং যা এখনও নেপালের জাতীয় পাঠাগারে (রাষ্ট্রীয় অভিলেখাগারে) সংরক্ষিত আছে।

সঙ্গীতবিষয়ক অন্যান্য মৈথিল কৃতির মধ্যে উল্লেখ করা যায় জগজ্জ্যোতির্মল্লের (১৫৭৭-১৬৩৩ খ্রি.) 'সঙ্গীতসারসংগ্রহ'-এর যা ঐ কালের সঙ্গীত, নৃত্য ও অভিনয়-বিষয়ক সমস্ত কৃতির সারসংক্ষেপ এবং অভিলাষ-কৃত 'সঙ্গীতচন্দ্র'-এর ওপর টীকাও বটে। এসবই রচিত হয়েছিল বংশমণি ঝা-র 'স্বরোদয়দীপিকা' ও 'গীতপঞ্চাশিকা' প্রভৃতির সঙ্গেই। ঐ সময়ে নিজের মেয়ের ঘরের নাতি অনন্তর আব্দারে জনৈক ঘনশ্যাম লিখলেন 'শ্রীহস্তমুক্তাবলী'র ওপর একটি টীকা যা মিথিলার সঙ্গীতচর্চার ধারার বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাকর্মের মধ্যে একটি। 'শ্রীহস্তমুক্তাবলী'র রচয়িতা ছিলেন সম্ভবত মহারাজা মহেশ ঠাকুরের (১৫৫৭-১৫৭০) ছেলে শুভঙ্কর ঠাকুর। ভুল করে ওকে কোনো অসমিয়া লেখকের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলা হয়। শুভঙ্কর ছিলেন একজন গুরুত্বপূর্ণ লেখক কেননা তিনি লিখে গেছেন সম্ভবত 'সঙ্গীতদামোদর' এবং অন্য একটি নৃত্য বিষয়ক পুস্তক যা নেপালের রাষ্ট্রীয় পাঠাগারে সযত্নে রক্ষিত রয়েছে। রামদাস উপাধ্যায় এবং লোচনের (১৬৮১ খ্রি.) মতো সঙ্গীত বিশারদরাও ওঁর প্রসংশা করেন। লোচন তাঁর 'সঙ্গীতদামোদর'-কে প্রায় অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করেন।

এটিই ছিল মৈথিল সঙ্গীতের স্বর্ণযুগ। নেপালে ও মিথিলায় এবং বিদেশেও মৈথিল গীতিকারেরা ছিলেন খুবই জনপ্রিয়। তাঁদের ডাক পড়তো ত্রিপুরার মহারাজার রাজসভায়, এবং বিদ্যাপতির বর্ণনায় যেমন দেখছি একজন মৈথিল সঙ্গীতবিদ্ গেছেন গোরক্ষপুরে, জনৈক বুঢ়ন মিশ্র সত্যি করে বাংলাদেশে গেছিলেন সঙ্গীত বিশারদরূপে।

লোচনের (১৬৮১ খ্রি.) 'রাজতরঙ্গিনী' -তে তাই আমরা এসব বিষয়ে প্রামাণ্য বর্ণনা পাই। উনি বেশ কিছু এমন রাগ ও বাগিণীর উল্লেখ করেন যা মৈথিল সঙ্গীত-ধারার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। মহারাজা মহীনাথ ঠাকুর (১৬৭০-৭১ থেকে ১৬৯২-৯৩ খ্রি) এবং মহারাজকুমার নরপতি ঠাকুর — যাঁকে লোচন বলেছেন

'ধুনিগানসিন্ধু' (ধুনি—ধ্বনি বা সঙ্গীতের সাগর), এঁদের সময়েই যে এই সঙ্গীত-ধারা চরমে উঠেছিল তা উনি জানতেন।

লোচনের পর আমরা সঙ্গীত বিষয়ক আর কোনো রচনা মৈথিলীতে পাই না, কিন্তু এর পরে মৈথিলীতে লেখা গীতিকবিতাই পরবর্তী ইতিহাস বলে দেয়। উদারণস্বরূপ অষ্টাদশ শতকের স্বনামধন্য সঙ্গীতকার ছিলেন উমাপতি এবং গোবিন্দদাস। উনিশ শতকে হর্যনাথ ঝা, ভানা ঝা ও চন্দা ঝা মৈথিলী সুরলহরীর ঐতিহ্যকে আবার ফিরিয়ে এনেছিলেন। মৈথিল রাজা ও জমিদারদের রাজসভার তরফে সঙ্গীতকে চিরকালই উৎসাহ দান করা হয়েছিল। মহারাজা ছত্রসিংহ (১৮০৮-১৮৩৯), মহারাজকুমার কীর্তিসিংহ (যিনি ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে স্বর্গত হয়েছিলেন), গোপীশ্বরসিংহ (১৮৮৬-তে পরলোকগত), মহারাজকুমার তন্দ্রধারীসিংহ (১৯১৫-তে স্বর্গত), আনন্দপুরের ললিতেশ্বর সিংহ প্রমুখ ছিলেন অত্যন্ত সঙ্গীতানুরাগী।

মিথিলার নারী খুবই সঙ্গীতপ্রিয়—চিরকালই। আমরা মধ্যযুগে মহাদেবী লখিমা এবং (বিদ্যাপতির পুত্রবধূ) চন্দ্রলেখার কথা তো জানিই। মৈথিল নারীদের গায়নশৈলী—বিশেষ করে খড়কাবসন্ত, শশিপুরা, পিলখবাড়, তরৌনি, পোখরৌনি, ককরৌড়া, সৌরাঠ, সুগৌনা এবং চকৌতির নারী আজও মিথিলার গর্ব বিশেষ।

সিদ্ধান্ত

মিথিলার সাংস্কৃতিক জীবনের কিছু কিছু দিকের এই বর্ণনা থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে মৈথিল মানস সক্ষম ছিল মহান শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টিতে; এই সমাজের রয়েছে বিদ্যাচর্চার একটা ঐতিহ্য; ধর্মীয় বিশ্বাস এখানে গভীর এবং অবিচলিত; এখানকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে রয়েছে কবিতা-সৃজন ও সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক রচনার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্দীপনা; এবং এর অতীতকালের (যদি না বর্তমানের বেলাতেও একথা প্রযোজ্য হয়) সঙ্গীতচর্চা যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্তরে উন্নীত হয়েছিল তার ফলেই সৃষ্টি হয়েছিল বহু সর্বোত্তম সঙ্গীত ও সুরলহরী।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মৈথিলী ভাষা

মৈথিলীর বিভিন্ন নাম

প্রাচীনকালে মিথিলার ভাষা যে নামে পরিচিত ছিল, সম্ভবত তা হলো, প্রাচীনকালে 'অবহট্‌ঠ' অথবা 'মিথিলা-অপভ্রংশ'। আমরা এখন একথা জানি যে 'অপভ্রংশ' শব্দটির অর্থ মিথিলায় ছিল 'দেশ ভাষা' (অথবা সাধারণের ভাষা বা 'দেসিল বঅনা') যা ছিল শাস্ত্রীয় সংস্কৃত ও প্রাকৃত থেকে পৃথক। মধ্যযুগে এই ভাষাটির স্পষ্ট উল্লেখ নেই, এক যদি না আমরা বঙ্গদেশীয় ভাষার থেকে গৌড়ের ভাষা ভিন্ন— আমীর খুসরুর (১২৫৩ খ্রি.) এই উক্তিকে ধরি। 'আলফা-বেটাম ব্রাহ্মাণিকাম্'-এ (১৭৭১ খ্রি.) আমরা 'তিরহুতিয়া' (মূল বানানে 'তুরুশিয়ানা') এই নামের উল্লেখ পাই। মনে হয় এই বিভ্রান্তির কারণ এই যে, মিথিলার অধিবাসীদের অনেক সময় বলা হয় 'তিরহুতিয়া' এবং মিথিলার লিপিকে বলা হয় 'তিরহুতা'। ১৮০১ সালের এশিয়াটিক রিসার্চেস্'-এ এইচ. টি. কোলব্রুক সর্বপ্রথম এই ভাষাটিকে 'মৈথিলী' নাম দেন (যার বানান ছিল 'Mithele' বা 'Mythili')। এঁকে মেনে নিয়ে উইলিয়ম কেরী এই ভাষাকে বললেন 'Mythilee' কিন্তু পরে স্যর আর্সনিক পেরী এটাকে বললেন 'তিরহুতি' (১৮৫৩ খ্রি.) এবং ভাষাপরিবারগত শ্রেণী বিভাগের নিরিখে এটিকে ফেললেন বাংলার অধীনে— ঠিক যেভাবে স্যর জন বীম্‌স এটিকে বললেন 'মৈথিল' এবং ফেলে দিলেন হিন্দির অধীনে। জর্জ ক্যাম্পবেলই প্রথম ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে 'দ্য ল্যাংগুয়েজেস অব্ বিহার' বলে মৈথিলীকে স্বাধীন ভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তবে মৈথিলী নামটিই ব্যবহৃত হতে থাকল। সর্বশেষে স্যর জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসনই ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে চূড়ান্তভাবে এই ভাষাটির নামকরণ করলেন মৈথিলী।

মৈথিলীর বিভিন্ন উপভাষার পৃথক পৃথক নাম রয়েছে, যেমন 'চিকি-চিকী', 'জোলাহী', 'খোট্টা' এবং 'গোয়ালরী' এই প্রদেশের [১] বিভিন্ন অংশে কথিত হয় এবং গ্রিয়ারসন এর বর্ণনা করেছেন এভাবে:

> উত্তর দ্বারভাঙা ও ভাগলপুর জেলার— পশ্চিম পূর্ণিয়ার ব্রাহ্মণগণ মৈথিলী ভাষা সবচেয়ে শুদ্ধরূপে (আদর্শ বা মানক মৈথিলী) বলে থাকেন। এঁরা এমন

১। এই প্রসঙ্গে একথা জানানো দরকার যে ১৯৬১ সালের 'সেন্‌সাস অব ইন্ডিয়া'য় মৈথিলীর আরো কয়েকটি নামের প্রচলনের কথা জানা যায়; যেমন, অঙ্গ, অঙ্গিকা; ভাগলপুরিয়া, ধরমপুরিয়া, মুঙ্গেরিয়া, মুজফ্‌ফরপুরিয়া, সুরজপুরী এবং 'পূর্বী'-ও। তদুপরি, অনেকেই মৈথিলীকে 'তিরহুতিয়া' বা কখনো ভুল করে 'বিহারী' এভাবেও বর্ণনা করেন। স্বাভাবিকভাবেই এই নামগুলো ইদানীং 'স্থান' বা 'জ্ঞাতি'র নাম থেকে নেওয়া; উপভাষা হিসেবেও মনে হয় না এগুলির কোনো ভাষাতাত্ত্বিক অস্তিত্ব আছে।

ঐতিহ্য ও সাহিত্যের পরম্পরার অধিকারী যা এই উপভাষা বিশেষকে অবক্ষয়িত হতে দেয়নি। দ্বারভাঙার দক্ষিণ প্রান্তে এবং গঙ্গানদীর উত্তরতীরের দিকে মুঙ্গের ও ভাগলপুর জেলার যেসব অঞ্চল রয়েছে সেইসব স্থানেও মৈথিলী মোটামুটি বিশুদ্ধরূপেই কথিত উপভাষার দ্বারা এটি প্রতিস্থাপিত হয়, যে উপভাষা একটি প্রান্তীয় বাক্-সংগঠন মাত্র। পূর্ণিয়ায় কথিত হয়, তবে এখানে বিভক্তির চিহ্নগুলির অবক্ষয়ের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এটিকে 'দক্ষিণী আদর্শ মৈথিলী' বলা যেতে পারে। পূর্বে, পূর্ণিয়ায় গিয়ে এটি ক্রমান্বয়ে বাংলার অধিকতর প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে যদিও এই জেলার পূর্বপ্রান্তে গিয়ে বাংলার সিরিপুরিয়া উপভাষার দ্বারা এটি প্রতিস্থাপিত হয়, যে উপভাষা একটি প্রান্তীয় বাক্- সংগঠন মাত্র। পূর্ণিয়ায় কথিত এই মৈথিলীকে বলবো 'পূর্বী মৈথিলী' যা মূলত বাংলা থেকে (আদর্শ) মৈথিলী থেকেও নানান কথা ধার নিয়েছে এবং যা বাংলা লিপিতে না লেখা হয়ে লেখা হয় বিহারের মৈথিলী।

গঙ্গার দক্ষিণের মৈথিলী মোটামুটিভাবে মগহীর দ্বারা প্রভাবিত যা কিছুটা পশ্চিমেও, কিয়দংশে বাংলার দ্বারাও প্রভাবিত হয়। তার ফলে আমরা পাচ্ছি একটি সুনির্দিষ্ট উপভাষা যার নাম হলো 'চিকা-চিকী বোলী', যা এসেছে এই উপভাষায় বারংবার 'চিক' এই শব্দের ব্যবহার। এই 'চিক' শব্দই হচ্ছে সেই ধাতুমূল যার থেকে আছ্-ধাতুর নিরিখে ধাতুরূপের বর্ণনা সম্ভব।

মুজফ্ফরপুর জেলায় যে মৈথিলী কথিত হয় এবং দ্বারভাঙার পূর্বদিকে যে এক-ফালি জায়গা রয়েছে তাতে প্রতিবেশী ভোজপুরীর প্রভাব দেখা গেছে যদিও পার্শ্ববর্তী সারন জেলা ও চম্পারন জেলার অধিকাংশ ক্ষেত্রে নানান ভঙ্গিতে কথিত হয়। প্রভাবটা এমন স্তরে যে কোনো কোনো লোকের ব্যক্তিভাষায় বলা মুশকিল যে তা মৈথিলীর উপভাষা না ভোজপুরীর। এটিকে 'পশ্চিমা মৈথিলী' বলা যেতে পারে।

মিথিলার মুসলমানেরা মৈথিলীতে কথা বলেন না। মুজফ্ফপুর ও চম্পারনে তাঁরা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি উপভাষায় কথা বলেন যার সঙ্গে ঔধের (অবধী) ভাষার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তার স্থানীয় নাম হলো 'শেখাই' এবং 'মুসলমানী' এবং কখনো কখনো এটিকে 'জোলহা বোলী'-ও বলা হয়। এই নামটি মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয় অভিমতে সবচেয়ে অধিকসংখ্যকের ভাষা যা মৈথিলীরই একটি রূপ তবে পার্সী ও আরবী শব্দ এর মধ্যে মেশায় এটির একটু ক্ষতি হয়েছে।[১]

১. দ্র. ভারতের ভাষাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ (গ্রিয়ারসন), খণ্ড ৫.২, পৃ. ১৩-১৪।

ভাষাভাষীর সংখ্যা

ভারতীয় ভাষা সর্বেক্ষণে (বা লিংগুইস্টিক সার্ভে অব্ ইন্ডিয়া, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৪) ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে দেখানো হয়েছে মৈথিলীভাষীদের সংখ্যা এমন :

আদর্শ মৈথিলী	.....	১, ৯৪৬, ৮০০
দক্ষিণী আদর্শ মৈথিলী	.....	২, ৩০০, ০০০
পূর্ব মৈথিলী	.....	১, ৩০২, ৩০০
চিকা-চিকী মৈথিলী	.....	১, ৭১৯, ৭১৮
পশ্চিমা মৈথিলী	.....	১. ৭৮৩, ৪৯৫
জোলাহা মৈথিলী	.....	৩৩৭, ০০০
	মোট	৯, ৩৮৯, ৩২৬

এইসব সংখ্যার মধ্যে কোথাও নেপালে কথিত মৈথিলী বক্তাদের সংখ্যা ধরা নেই। নেপাল ও মিথিলার মধ্যে প্রাচীন সাংস্কৃতিক ও ভাষিক যোগাযোগের নিরিখে এবং মিথিলার কিছু অংশ পরবর্তীকালে নেপাল রাজ্যের অঙ্গ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় গ্রিয়ারসন খুবই যুক্তিসংগতভাবে অন্ততপক্ষে ৬১০,৬২৪ সংখ্যক মৈথিলী ভাষী নেপালে আছেন এটা ধরে নিয়েছিলেন। এভাবে ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে অন্তত ১ কোটি মানুষ মৈথিলীতে কথা বলতেন যাদের মাতৃভাষা হলো মৈথিলী। মিথিলাঞ্চলের বাইরে মৈথিলীভাষীদের সংখ্যা গ্রিয়ারসনের মতে বাংলাদেশে ১, ৯৬, ৭৮২ এবং ৬৬, ৫৭৫ জন অসমে। এভাবে, তাঁর মতে ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে সর্বসমেত মোট ১, ০২, ৬৩, ৩৫৭ জন মানুষের মাতৃভাষা ছিল মৈথিলী।

১৯৩১ সালে ড. সুভদ্র ঝা এই সংখ্যাটির কথায় জানালেন ১, ৩৩, ৭৪, ১৪৭ জন। মহামোহপাধ্যায় ড. উমেশ মিশ্র দেখালেন যে ৬৫, ০৪, ৮১৭ জন মগহীভাষী ও ৫, ০০, ০০০ জন প্রবাসী মৈথিলীকেও গ্রিয়ারসনের সংখ্যার সঙ্গে যোগ দেওয়া উচিত। তাই, এই বছরগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের কথা চিন্তা করলে বলতে হয় মোট মৈথিলীভাষীর সংখ্যা এখন হবে ২ কোটি।[১]

১। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতের আদমসুমারীতে কখনোই মৈথিলী ভাষীদের সঠিক সংখ্যা দেখানো হয়নি। ১৯৬১ সালের আদমসুমারীতে দেখা যাচ্ছে সর্বপ্রথম এ বিষয়ে উৎসাহ দেখানো হয়েছে, যদিও এতে যে সংখ্যা দেওয়া আছে তা আদৌ সঠিক নয় এবং এখনও মৈথিলীকে একটি অস্তিত্বহীন ভুয়ো ভাষা 'বিহারী'র অঙ্গ হিসেবে দেখানো হয়েছে। বিভিন্ন জনগণনার বর্ণনায় মৈথিলী ভাষীদের সংখ্যা এভাবে দেখানো হয়েছে : ১৯১১ : সংখ্যা নেই; ১৯২১ : ১,৬৪১; ১৯৩১ : সংখ্যা নেই, ১৯৫১: ৮৭,৭৪৬; ১৯৬১ : ৪৯.৮৪,৮১১।

অন্যান্য আধুনিক ভারতীয় ভাষায় মৈথিলীর স্থান

আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমুহের মধ্যে মৈথিলীর স্থান কী তা নিয়ে যথেষ্ট ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা আছে। অতীতে এই ভুল বোঝার মূল কারণ ছিল পশ্চিমা গবেষকদের অজ্ঞানতা ও বিভ্রান্তি। তাই কোলব্রুক (১৮০১) এবং কেরী (১৮৫৩) এটিকে বাংলার অধীনে শ্রেণীবদ্ধ করলেন; স্যর জন বীম্‌স (১৮৬৭) এটিকে হিন্দির অধীন বলে গণ্য করলেন; (ইনিই গুজরাতীকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন 'হিন্দির একটি উপভাষার-চেয়ে কিছু বেশি' এবং পাঞ্জাবীকে বলেছিলেন 'একটি প্রাচীন হিন্দি উপভাষার চেয়ে কিছু অধিক'; জর্জ ক্যাম্পবেল (১৮৭৪) মৈথিলীকে একটি নতুন ভাষারূপে বর্ণনা করে এটিকে 'বিহারের ভাষা' নামে অভিহিত করলেন; এস. এইচ. কেলগ্ (১৮৭৬) মৈথিলীকে (অবধীর মতোই) 'পূর্বী অথবা প্রাচ্য হিন্দি'র এক বংশোদ্ভুত উপভাষা হিসেবে দেখেছিলেন এবং রুডল্‌ফ হোয়ের্নলে (১৮৮০) এর নাম দিলেন পূর্বের হিন্দি কিন্তু একথা জোরের সঙ্গে বললেন যে যেমন পাঞ্জাবী, হিন্দি ও বাংলা পৃথক ভাষা, তেমনি এটিও পশ্চিমা হিন্দির থেকে খুবই আলাদা; জে. গেরসন দ্য ক্যুন্‌হা কোঙ্কনী মৈথিলীর খুবই নিকট সম্পর্কের ভাষা এমন যুক্তি দিলেন; এবং শেষত স্যর জর্জ গ্রিয়ারসন (১৮৮১-৮২) এটিকে একটি ছদ্মভাষিক নাম 'বিহারী'-র অঙ্গ রূপে বর্ণনা করলেন যদিও ওঁর 'মৈথিলী গ্রামার' (১৯৮১-৯১৮২) বইয়ে উনি বেশ জোরগলায় একথা বলেছিলেন :

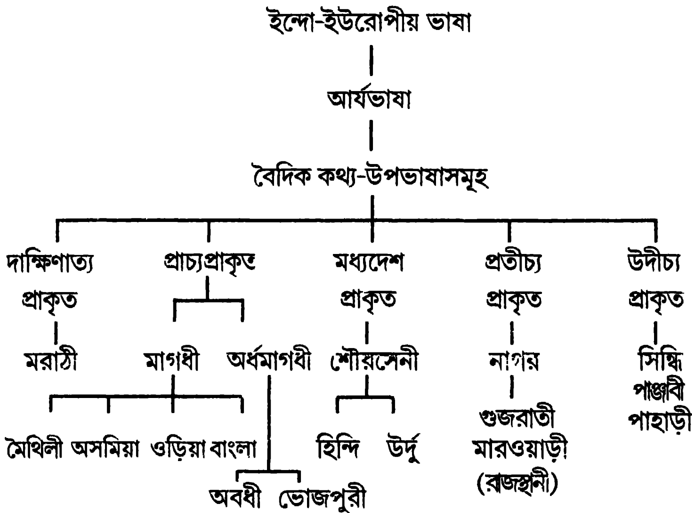
> মৈথিলী একটি স্বতন্ত্র ভাষা, কোনো , উপভাষা নয়। এটি এমন লক্ষ লক্ষ লোকের ...মাতৃভাষা যারা কষ্ট না করে হিন্দি বা উর্দুভাষা বলতে বা বুঝতে পারে না। এর সঙ্গে বাংলা ও হিন্দির তুলনায় অনেক পার্থক্য রয়েছে— শব্দভাণ্ডারেও, ব্যাকরণেও— ঠিক যেমন মরাঠী ও উড়িয়া যেমন সম্পূর্ণ ভাষা হিন্দির তুলনায়, তেমনই। এই দেশের নিজস্ব পরম্পরা আছে, আছে নিজস্ব কবিরা এবং যা কিছু মিথিলার সে-বিষয় গর্ব।

কিন্তু এই ধরনের পরিষ্কার সোচ্চার ঘোষণা সত্ত্বেও পণ্ডিতেরা আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমুহের মধ্যে মৈথিলীর স্থান বিষয়ে অসত্যবর্ণন করে থাকেন। আজও যে এই বিভ্রান্তিকর ধারণা রয়েছে তার কারণ অজ্ঞানতা নয়, বরং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, সাংস্কৃতিক পক্ষপাত এবং কায়েম স্বার্থই এর জন্য দায়ী। তাই কখনো মৈথিলীকে বাংলার অঙ্গ বলে ধরে নেওয়া হয়। বাংলার উৎসাহীজন বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস ও লোচন প্রভৃতি মৈথিলী লেখক-কবিদের বাংলা সাহিত্যের দিক্‌পাল বলে মেনে নিয়ে থাকেন। একইভাবে অত্যুৎসাহী হিন্দিভাষী (অনেক সময়েই জাতীয় সংহতির মিথ্যে দোহাই দিয়ে) বিদ্যাপতি ও অন্যান্য মৈথিলী সীহিত্যিকদের হিন্দির সাহিত্যিক বলেই মেনে নিয়ে এই যুক্তি দেন যে মহান মৈথিলী স্যাহিত্যিক — বিদ্যাপতি, হরিমোহন ঝা বা যাত্রীর প্রতি যেন ওঁদের দয়া করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে দেওয়া হয়। স্যর জর্জ গ্রিয়ারসনের যুগ থেকেই অবশ্য ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে এই চেতনা এসেছে যে মৈথিলী বাংলার উপভাষাও নয়, হিন্দির

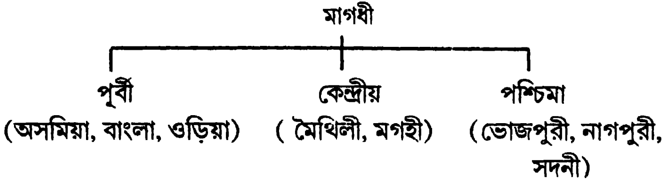
কোনো রূপভেদও নয়, বরং একটি স্বাধীন ভাষা, যদিও এখনও এ বিষয়ে কিছু কিছু মতভেদ আছে।

আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা-রূপে মৈথিলীর উদ্ভব বিষয়ক বর্তমান ভাষাতাত্ত্বিক অভিমত, যেখানে ভুয়ো তত্ত্ব ও পক্ষপাতগ্রস্ত মতামতের কোনো স্থান নেই, মোটামুটিভাবে পরবর্তী অনুচ্ছেদে মুদ্রিত নক্‌শায় দেখানো হয়েছে।

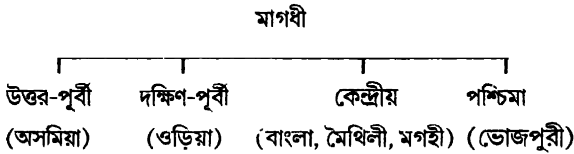
মৈথিলীর উদ্ভবের স্রোতের সর্বপ্রথম শৃঙ্খল হলো মাগধী প্রাকৃত। মাগধী প্রাকৃত বহু পূর্বেই নানান ভাগে বিভক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছিল। ব্যাকরণবিদেরা মাগধীর নানান রূপভেদ হিসেবে গৌরী, ঢক্কী এবং উৎকলী বা ওড়রীর উল্লেখ করেছেন। মৈথিলী হলো মাগধীর প্রত্যক্ষ উত্তরসূরী যা মাগধীর মূল দেশে কতিত হয়। গৌড়ী ছিল বর্তমান উত্তরবঙ্গীয় উপভাষা বা অসমিয়ার মূলস্রোত। ঢক্কী (অথবা ঢাকার মাগধী) আধুনিককালের পূর্ববঙ্গীয় উপভাষায় পরিণত হলো এবং ওড়িয়া হলো প্রাচীন উৎকলীর প্রতিনিধি।



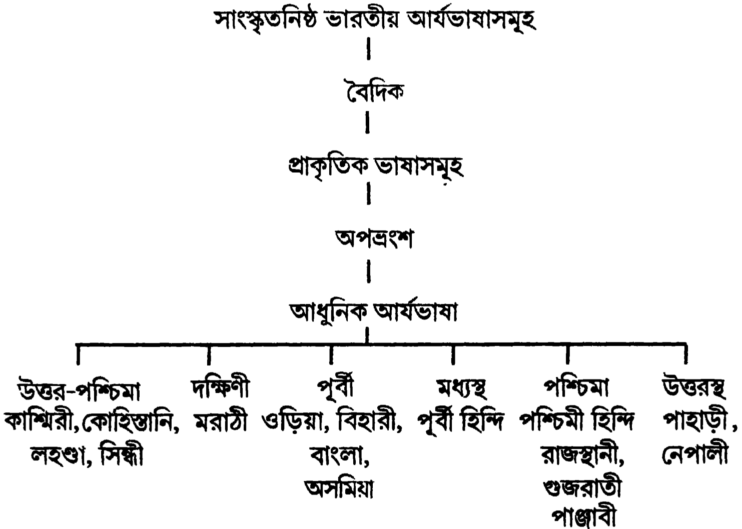
ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মাগধীর রূপবিভাগ এভাবে করেছেন :



মহামহোপাধ্যায় ড. উমেশ মিশ্র উপরোক্ত রূপবিভাগের একটা উন্নততর সংস্করণের কথা বলেছেন যা এইরকম :



স্যর জর্জ গ্রিয়ারসন অবশ্য মৈথিলীর স্থান নিরূপণ করতে গিয়ে যে শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন তাতে ভুল ছিল যদিও যেসব গ্রন্থাদিতে বৈজ্ঞানিকতা কম সেসব স্থলে এই বিশেষ শ্রেণীবিভাগটিই অনুসৃত হয়:



এখানে লক্ষণীয় এই যে গ্রিয়ারসন মৈথিলীকে উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগে কোনো স্বতন্ত্র

স্থান দেননি। এই বহির্ভুক্তির কারণ ছিল তাঁর মনগড়া তত্ত্ব যাতে 'বিহারী' নামক একটি ভাষার অস্তিত্ব ছিল কারণ বিহার বলে একটি প্রদেশ ছিল। এখানে একটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি হয়ে ছিল এবং এ থেকেই এমন ধারণার জন্ম হয় যে মৈথিলী বাংলার সঙ্গে সম্বন্ধিত একটি স্বতন্ত্র ভাষা নয়, বরং হিন্দিরই একটি উপভাষা মাত্র। কারণ, সাধারণ ভাষায় 'বিহারী' বলতে বোঝাতো হিন্দির একটি রূপভেদ মাত্র। এই বিশ্বাসের মূলে ছিল এই কারণ যে বিহারীর মধ্যেই ছিল ভোজপুরীর অস্তিত্ব এবং এ বিষয়ে গ্রিয়ারসন যতই প্রতিবাদ করুন, ভোজপুরী হিন্দির একটি উপভাষাই।

উপসংহারে একথা বলা যায় যে মৈথিলী অন্যান্য অর্ধমাগধী এবং শৌরসেনী উপভাষা-যেমন অবধী ও ভোজপুরী প্রভৃতির থেকে পৃথক একটি মাগধী ভাষা। হিন্দি বা বাংলার উপভাষা তো হওয়া দূরের কথা, প্রত্যেক দিক থেকেই এটি একটি স্বাধীন ভাষা। যদিও এ ভাষায় বাংলা ও হিন্দি দুটির সঙ্গেই মেলে এমন বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে তবু এতে এমন অনেক ব্যাকরণগত লক্ষণ আছে যা এ দুটিতেই নয়, যা অনেক ভারতীয় আর্যভাষাতেই দেখা যায়। এক্ষেত্রে মৈথিলী সমস্ত ভারতীয় ভাষার থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয় কারণ এই ভাষায় মানসূচক মানহীনতাদ্যোতক খুবই জটিল সূত্রাবলী আছে, আর আছে এমন পুরুষদ্যোতক সব বিভক্তি চিহ্ন যার দ্বারা উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের কর্মপদ —একই সঙ্গে দুটিকেই বোঝায়। অতএব শুধুমাত্র (শব্দাবলী কিংবা) সহজবোধ্যতার ভিত্তিতে এটিকে হিন্দি বা বাংলার উপভাযা বলা যাবে না, কারণ এটি একটি স্বাধীন ভাষা। যেহেতু এই সবকটি ভাষা সংস্কৃত থেকে এসেছে, তাই সবকটিতেই সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য থাকাই স্বাভাবিক। সাধারণত শব্দগুলি সবকটি ভাষাতেই পাওয়া যায়, তবে, একথা বলাই বাহুল্য যে কিছু শব্দ আছে যা এক ভাষায় এক আর অন্য ভাষায় অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়।

যদি মৈথিলীক কোনো অন্য ভাষার সঙ্গে শ্রেণীবদ্ধ করতেই হয় তো হিন্দির পরিবর্তে বাংলাকে বেছে নেওয়াই হবে স্বাভাবিক। গ্রিয়ারসন বলেছেন, "এই ভাষা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের (বর্তমানে উত্তরপ্রদেশ) হিন্দি ভাষা (-গোষ্ঠীর) তুলনায় বাংলা ভাষা (-গোষ্ঠীর) সঙ্গেই অধিকতর আত্মসম্বন্ধে আবদ্ধ।" "বাংলা, ওড়িয়া ও অসমিয়ার মতোই এটি হলো প্রত্যক্ষ উত্তরসূরী, সম্ভবত উত্তরসূরীদের মধ্যে মুখ্যস্থানের অধিকারী, সেই প্রাচীন ভাষার যার নাম মাগধী প্রাকৃত, এবং বিভক্তি চিহ্নের নিরিখে এই ভাষাগুলির সঙ্গে তার এতো মিল রয়েছে যে প্রায় এই চারটি ভাষার জন্য একটি ব্যাকরণ লেখা সম্ভব।"

তৃতীয় অধ্যায়

মৈথিলী লিপি (তিরহুতা)

মৈথিলী ভাষার লিপি, যাকে 'মৈথিলী লিপি', 'মিথিলাক্ষর' বা 'মৈথিলাক্ষর' প্রভৃতি নামে ডাকা হয় এবং যার সঠিক নাম হলো 'তিরহুতা', কিছু অভিজ্ঞ লোকের কলমে এভাবে বর্ণিত হয়েছে— 'বাংলারই অবক্ষয়ী রূপ' অথবা 'বিহারের মূলত ওঝা ব্রাহ্মণদের দ্বারা ব্যবহৃত ওঝা লিপি।' 'তিরহুতা' লিপিটি থেকেই বোঝা যায় যে লিপিটি পূর্ণরূপে উন্নত অবস্থায় ছিল কেননা তখন 'তীরভুক্তি' এই দেশের জনপ্রিয় নাম হিসেবে প্রচলিত হয়ে গেছিল ।এর পূর্ববর্তী পর্যায়ে সম্ভবত এটি পরিচিত ছিল 'মাগধী লিপি' নামে অথবা যেমন 'ললিত বিস্তার' নামক বৌদ্ধগ্রন্থে বলা হয়েছে, 'বৈদেহী লিপি' নামে।

তিরহুতার উদ্ভব ও বিকাশ নিয়ে বিস্তারিতভাবে কোথাও কথা বলা হয়নি। যে সময় থেকে প্রাচ্য লিপি সুস্পষ্টভাবে দেখা দিতে থাকে, তখন থেকেই "ড. ব্যুহলরের বর্ণনার বিস্তার আসে কমে এবং তখন থেকেই উত্তরী লিপির পূর্বদিকের রূপের বিষয়ে পৃথকভাবে আলোচনা বন্ধ হয়ে যায়..."। "শুধু শাবদা লিপির বেলাতেই ব্যতিক্রম করা হয় যা অষ্টম শতাব্দী থেকেই একটি স্বতন্ত্র ধারা রূপে স্বীকৃত, এবং তা করা হয়েছে প্রাক্-বাংলা লিপির ক্ষেত্রেও।"

মৈথিলী লিপির "উদ্ভব হয় একটি পূর্বী লিপি থেকে যা ষষ্ঠ শতাব্দী থেকেই বর্তমানের পূর্বপ্রান্তীয় সংযুক্ত প্রদেশ, পূর্বপ্রান্তীয় কেন্দ্রীয় প্রদেশ, বিহার, ওড়িশা এবং বাংলা ও অসমে প্রচলিত ছিল" এবং যা আবার "ভারতের সমস্ত লিপির মাতৃলিপি—প্রাচীন ও প্রখ্যাত ব্রাহ্মী লিপির থেকে মধ্যবর্তী পর্যায়ে কুষাণ লিপির মধ্যে দিয়ে যে এক ধরনের বঙ্কিম লিপির জন্ম হয়েছিল, যাকে বলা যায় গুপ্ত লিপি (৪০০-৫৫০ খ্রি.), তারই একটি রূপভেদ ছিল"। "সপ্তম শতকের সময় থেকে এই পূর্ব দেশীয় লিপিতে বঙ্কিম হরফে লেখা পুঁথিপত্র, যা জাপানের হোরিউজি মন্দিরে সংরক্ষিত আছে, তা পাওয়া গেছে।" "এই বাঁকা হরফের পূর্বদেশীয় লিপিই (১) বাংলা-অসমিয়া, (২) মৈথিলী এবং (৩) ওড়িয়া লিপির প্রত্যক্ষ উৎস। এর মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয়টি প্রায় একই; দ্বিতীয়টিতে পাওয়া সবকটি এককই প্রথমটিতে লেখা প্রাচীন পুঁথিতে কোথাও না কোথাও পাওয়া যায়। সত্যি কথা বলতে গেলে, মিথিলাক্ষরে লেখা প্রাচীন পুঁথি বাঙালি পণ্ডিতেরা খুব সহজেই পড়তে পারতেন— এঁরা এই লিপিকে জানতেন 'তিরুত' নামে . . .। প্রাক্-মুসলিমকালে মগধের নালন্দা ও বিক্রমশিলায় এই একই লিপির ব্যবহার পাওয়া যায় যা নেপালেও সংরক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে বাঁকা হরফে বা সংক্ষেপে লেখার দেবনাগরী-ভিত্তিক ভারতীয় লিপি, যা উত্তরস্থ ও পূর্বস্থ সমস্ত প্রান্তে সপ্তম শতাব্দী থেকেই ব্যবহৃত হতো, সেই 'কৈথী' লিপি ভোজপুরীয়া প্রান্ত দিয়ে মগধে এলো এবং

এখনও এই কৈথী লিপির ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। সরলতার কারণে কৈথী মিথিলাতেও প্রচলিত হয়েছিল এবং এখন শুধু ব্রাহ্মণ ও উচ্চতর জাতির মানুষেরাই প্রাচীন মৈথিলী লিপিকে বাঁচিয়ে রেখেছে, আর কখনোই এই লিপিতে কোনো ছাপার অক্ষর পাওয়া যায় না; বরং দেবনাগরী লিপি, হিন্দির প্রসারের থেকে জোর পেয়ে এবং বর্তমানে সংস্কৃতের সঙ্গে সম্বন্ধিত হওয়ায়, বর্তমানে ছাপার অক্ষরে মৈথিলীর জন্য ব্যবহৃত হয়। ওড়িয়ার বেলায় ১৫ শতকে এসে পূর্বদেশের প্রাচীন বঙ্কিম লিপি এমনভাবে পরিবর্তিত হয়ে ওড়িয়া লিপিতে পরিণত হয়েছিল যা আজও প্রচলিত আছে...যা বাংলা-মৈথিলীর লিপিরূপ থেকে অনেকটাই পৃথক্।"[১]

১. দ্র. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'ওরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অব্ বেঙ্গলি ল্যাংগুয়েজ', প্রথম খণ্ড।

চতুর্থ অধ্যায়

মৈথিলী সাহিত্যের ক্রমবিভাগ

মিথিলার রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে মৈথিলী সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশের কাহিনী রয়েছে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বিদেহন রাজবংশের মহিমাময় রাজা জনকদের শাসনকালে প্রাচীন মিথিলা ছিল জ্ঞানচর্চা এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির কেন্দ্রবিশেষ। তাঁদের পতনের পর শাসনভার গ্রহণ করলেন গণরাজ লিচ্ছবিরা এবং তারপর তা হস্তান্তরিত হলো প্রথমে গুপ্তবংশে ও পরে কনৌজের সম্রাট হর্ষের হাতে। সর্বশেষে, পালরাজারা এদেশের শাসন অধিকৃত করলেন।

প্রাক্-মৈথিলী যুগ (৮ম - ১২শ শতাব্দী)

পালরাজাদের শাসনকালেই (৭৫০-১১৩০ খ্রিষ্টাব্দ) মিথিলায় বৌদ্ধধর্ম এবং তন্ত্রের চর্চার প্রভাব দেখতে পাওয়া গেল। পালরাজারা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্রধান সংরক্ষক ছিলেন এবং এই তথ্য প্রাচীন প্রমাণে পুষ্ট যে শেষ মুখ্য পালরাজার আমলেই বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই ৮৪ জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী (সিদ্ধা) সংরক্ষণ এবং প্রোৎসাহন পেয়েছিলেন যাঁরা মৈথিলীতে সুবিখ্যাত চর্যাপদের রচনা করেন। এইসব পদের রচয়িতারা যে গুপ্ত গূঢ় জ্ঞানচর্চার একটি ঐতিহ্য রেখে যান, পরবর্তীকালে সেবিষয়ে সবিশেষ অধ্যয়নের ধারা আর দেখা যায় নি। তার কারণ বোঝা কঠিন না। বৌদ্ধমত ও ধর্মচর্চার প্রগতির প্রধান অন্তরায় হলো মিথিলায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অতিরিক্ত প্রভাব। এই জন্যেই অনেকেই মৈথিলী সাহিত্যের ইতিহাস শুরু করেন এই যুগ থেকে। আবার অন্যেরা মনে করেন এই যুগকে অন্যভাবে দেখা দরকার, খুব বেশি হলে এই কালকে বলা যায় প্রাক্-মৈথিলী যুগ, বিশেষ করে ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে। এই অভিমতও অনেকটাই সত্যি যে আজকে আমরা মৈথিলী ভাষা বলতে যা বুঝি, ঐ সময়ে তার পূর্ণ বিকাশ হয়নি এবং এমনিতেও দুর্বোধ্য ও দুর্জ্ঞেয় প্রাচীনতার অন্ধকারে ঢাকা আছে সে যুগের মৈথিলী ভাষার চরিত্র বিষয়ক আমাদের জ্ঞান।

প্রাচীন যুগ (১৩০০-১৬০০)

পৃথক রাজ্যরূপে মিথিলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১০৯৭ খ্রিষ্টাব্দে কর্ণাট রাজাদের আমলে। পাল সাম্রাজ্যের পতনের পর দক্ষিণ ভারত থেকে, বিশেষ করে কর্ণাটেরা, উত্তর ভারতে দেখা দিলেন উৎসাহী রোমাঞ্চকর অভিযানের অঙ্গ হিসাবে— যাঁরা রাজ্যস্থাপন করতে চাইলেন এখানে। মগধ সাম্রাজ্যের রাজ্যাধিকারের ক্রম অবক্ষয় নিশ্চয়ই এদের সামনে একটা অনুকূল সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছিল। এঁদের মধ্যে উল্লেখনীয় হলেন কনৌজ

(বা কাশীর) গহ্‌দবল, বঙ্গদেশের সেনেরা এবং মিথিলার রাজা নান্যদেব। যদিও বাংলার সেনেরা মিথিলাকে শাসনে আনার চেষ্টা করেন বহুবার— মিথিলায় আজও লক্ষ্মণ সেনের যুগকে ধরার মধ্যে দিয়ে যার প্রমাণ রয়েছে— মোটামুটিভাবে কর্ণাট রাজবংশের নান্যদেবই মিথিলা রাজ্যের স্বাধীন ও সার্বভৌম অধিকার রক্ষায় সক্ষম হয়েছিলেন।

নান্যদেবের কর্ণাট রাজবংশের শাসনকাল (১০৯৭-১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দ) প্রায়, প্রাচীন মিথিলার গৌরব ফিরিয়ে এনেছিল। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই উদ্দীপনার জোয়ারা দেখা দিল। নান্যদেব (১০৯৭-১১৩৩) নিজেই ছিলেন একজন যোদ্ধা, রাজনীতিবিদ্ এবং সঙ্গীত বিষয় ভগবদ্দত্ত প্রতিভার অধিকারী। তাঁর পুত্র গঙ্গাদেব (১১৩৩-১১৭৪) এবং পৌত্র নরসিংহদেব (১১৭৪-১২২৬) দেশের শাসনব্যবস্থাকে দৃঢ়তর করার কাজে আত্মনিয়োজন করলেন। নরসিংহদেবের শাসনকালে জ্ঞান ও সংস্কৃতির চর্চাকেও অনেক উৎসাহ দেয়া হয়েছিল। এই সময়েই বেশ কটি টীকা রচিত হয়েছিল বেদের উপর, হিন্দুদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় নানান নির্দেশিকাও রচিত হয়েছিল এবং আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় বেশ কিছু সংস্কারের কৃতিত্বও এঁরই প্রাপ্য। তাঁর পৌত্র হরসিংহদেবই (১২৯৬-১৩২৪) এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। এঁর শাসনকালেই সম্ভবত মিথিলা প্রগতির ও খ্যাতির শিখরে উঠেছিল। ইনি একটি নতুন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যুগের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ইনি নিজে ছিলেন একজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ এবং জ্ঞানের নানান শাখার সংরক্ষক। ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে ইনি দিল্লির সম্রাট গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের হাতে পরাজিত হন এবং নেপালে পালিয়ে যান। এইভাবে কর্ণাট বংশের স্বর্ণময় যুগের অবসান হলো।

মিথিলার ইতিহাসে এইভাবে কর্ণাট রাজবংশের একটি মুখ্য ভূমিকা ছিল। বঙ্গদেশের রাজাদের হাত থেকে এবং পশ্চিমের মুসলমান শাসকদের থেকেও এঁরা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমতা রক্ষা করতে পেরেছিলেন। এই রাজারা শাসনব্যবস্থায় এনেছিলেন পরিবর্তন, পাল্টে দিয়েছিলেন সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি, নতুন জীবন-পদ্ধতি ও নবীন ভাবনায় করেছিলেন মানব জীবনকে সমৃদ্ধ এবং নানান শিল্প ও কলার চর্চা ও অধ্যয়নকে জুগিয়েছিলেন প্রচণ্ড উৎসাহ। সবচেয়ে বড়ো কথা, এঁরা সংস্কৃতচর্চার এবং দেশীয় ভাষায় সাহিত্যচর্চার সমর্থক ছিলেন। মহান ব্যিদাপতি যুগের বীজ এই কর্ণাট রাজাদের আমলেই সঠিক ও সদৃঢ়ভাবে বপন করা হয়েছিল।

কর্ণাট রাজাদের পতনের পর, ওইনিবার রাজবংশের এক নতুন ধারার সূত্রপাত হলো মিথিলার ওপর যার রাজত্বকাল চললো ১৩৫৩ থেকে ১৫২৭ খ্রিষ্টাব্দ. অবধি। এই রাজবংশে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাজা জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু কেউই মহাকবি বিদ্যাপতির পৃষ্ঠপোষক মহারাজা শিব সিংহের (১৪১২-১৪২৯ খ্রি.) মতো প্রতাপশালী ও প্রোজ্জ্বল ছিলেন না। মনে হয় উনি দেশের সম্পূর্ণ সার্বভৌমতা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন এবং সত্যি কথা বলতে কি, এমন প্রমাণও রয়েছে যা থেকে বোঝা যায় যে, উনি নিজের নামে

মুদ্রাও প্রচলিত করেছিলেন এবং গৌড় ও 'গহনপুরের'(= ? গাজীপুর) রাজাদেরও পরাজিত করেছিলেন বলে দাবি করেছিলেন। এই বংশের শেষ রাজা লক্ষ্মীনাথদেবও শিল্প ও সাহিত্যের একই রকম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। উনি নিজেও ছিলেন একজন খ্যাতনামা কবি এবং তাঁর রাজসভায় সভাসদ রূপে ছিলেন এক বিখ্যাত শিল্পী, কবি ও জ্ঞানীগণ। তাঁরই রাজত্বকালে সিকন্দর লোদী মিথিলা আক্রমণ করেন এবং ওঁকে পরাজিত করেন, কিন্তু একটা মোটা খেসারতের বিনিময়ে ওঁকে রাজত্ব কায়েম রাখতে দেন। কিন্তু এর ঠিক পরেই বাংলার নসরত শাহ (১৫১৮-১৫৩২) সন্ধিভঙ্গ করে মিথিলাকে আক্রমণ করেন এবং দেশটিকে নিজের অধীনে নিয়ে আসেন। এইভাবে ওইনিবার রাজবংশের শেষ হলো।

সৌভাগ্যবশত ওইনিবার রাজাদের অধীনে যে সাহিত্যসৃষ্টি হয়েছিল তার প্রভূত সাহিত্যকৃতি আমরা পাই। এই বংশের শেষ রাজার আমলে প্রখ্যাত পণ্ডিত চণ্ডেশ্বরের নির্দেশনায় যে স্মৃতিচর্চা হয়েছিল তা তো গুরুত্বপূর্ণ ছিলই, কিন্তু এই রাজত্বকালেই মীমাংসা ও ন্যায়শাস্ত্রচর্চারও প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। প্রত্যেকটি রাজার আমলেই বিখ্যাত সব আচার্যের জন্ম হয়েছিল, যেমন বাচস্পতি, শঙ্কর মিশ্র, বর্ধমান, মস্রৌ মিশ্র প্রমুখ। এদের মধ্যে মহারাজ ভৈরব সিংহের আমলেই ১,৫০০ মীমাংসকদের সেই বিখ্যাত সম্মেলন হয়েছিল যাকে 'জরহটিয়া' বলে। এঁদের মধ্যে প্রত্যেক শাসকই বিরাট বড়ো বড়ো পুষ্করিণী খনন করেছিলেন এবং নিজেদের নামে গুরুত্বপূর্ণ শহর নগরের শিলান্যাস করেছিলেন। এঁরা বিদ্বানদের গ্রাহ্য কিংবা তেমনি বিশাল সম্পত্তি উপহার স্বরূপও দিয়েছিলেন। দেশীয় ভাষার সাহিত্য এই বংশের অনেকেরই পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল— শিবসিংহ, লখিমা, লক্ষ্মীনাথ প্রভৃতি। যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো এই যে রাজ পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্যরা এবং রানীরাও সঙ্গীত ও শিল্পচর্চায় বিশেষ রুচি দেখিয়েছিলেন।

এই রাজবংশের পতনের পর বেশ কবছরের জন্য দেখা দিলো ভেদবিভাগ ও গোলমাল। ১৫২৭ থেকে ১৫৬৬ খ্রিষ্টাব্দের শাসকদের বিষয়ে তিনটি বর্ণনা পাওয়া যায়। কিছুদিনের জন্য ওইনিবার বংশের সদস্যরা আবার নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন; কিন্তু মনে হয় তখন তাঁরা বিহারের রাজপুতদের হাতে পরাজিত হন। আরেকটি বর্ণনায় মনে হয় জিত হয়েছিল জনৈক কায়স্থ মজুমদারের। অন্য একটি ইতিকথায় দেখা যাচ্ছে জনৈক মজলিস খানের অধীনস্থ হয় এদেশের রাজ্যপাট। তবে এটা স্পষ্ট যে এই দেশের এই বিশেষ কালের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তা এবং অশান্তি।

অতএব, এ যুগের অবসান হয়েছিল দেশীয় রাজসভাগুলির বিলোপের পর থেকেই। মৈথিলী সাহিত্যচর্চার কেন্দ্র তাই সরে গেলো পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে। বিশেষ করে নেপালে মৈথিলী পেলো উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা কেননা ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে হরসিংহদেবের সঙ্গে মুসলিম আক্রমকদের যুদ্ধে যে একই রকম স্থানচ্যুতি ঘটেছিল তখন থেকেই মৈথিলী

নেপালে নিজের স্থান করে নিয়েছিল। এইবার (অর্থাৎ, ১৫২৭ খ্রিষ্টাব্দে) এই প্রভাব আরো গভীরভাবে প্রোথিত হলো। মিথিলার শিল্প ও সাহিত্য নেপাল, বাংলা, অসম, ত্রিপুরা ও ওড়িশায় স্থান পেলো— কবি বিদ্যাপতির মহান যশ ততদিনে ছড়িয়ে পড়তে আসছে এর সমস্ত প্রান্তে। সমস্ত উত্তর-পূর্ব ভারতে কাব্য ও নাটকে মৈথিলী ভাষার সফলতা ছিল স্বাগত সার্থকতা এবং এই যুগেই ঐ সমস্ত প্রান্তে মৈথিলী সাহিত্যের ভাষা রূপে স্বীকৃতি পেয়ে গেছিল, এবং মৈথিলী তার প্রতিবেশী ভাষাসমূহ — বাংলা, ওড়িয়া এবং অসমিয়ার ওপর প্রভাব বিস্তার করে, এইসব ভাষার সাহিত্যচর্চায় জুগিয়েছিল সময়োচিত উৎসাহ।

এই যুগের মুখ্য সাহিত্যকৃতি ছিল গীতিকবিতা।

মধ্যযুগীয় মৈথিলী সাহিত্য (১৬০০-১৬০)

বহুদিন পর্যন্ত মিথিলায় অশান্তি এবং অনিশ্চয়তার স্থিতি রইলো এবং শিল্প- সাহিত্যের প্রগতির পক্ষে জরুরি আঞ্চলিক শান্তি ও পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই কাটলো বহুযুগ। শেষে ১৫৫৭ খ্রিষ্টাব্দে মিথিলায় নতুন রাজবংশ খাণ্ডয়ার গোড়াপত্তন হলো যখন মোগল সম্রাট আকবর মিথিলার রাজ্যভার দিয়ে দিলেন মহারাজা মহেশ ঠাকুরের ওপর। আবার এদেশে জ্ঞানচর্চা, শিল্প সাহিত্য পেলো পৃষ্ঠপোষকতা এবং অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে শুরু হলো মৈথিলী সাহিত্যচর্চা। দিল্লির মোগল সম্রাটেরা নিজেদের সিংহাসন এবং শাসন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে এতো ব্যস্ত ছিলেন যে মিথিলার মতো সাধারণ রাজ্যের দিকে দৃষ্টি দেবার সময় তাদের ছিল না। অতএব, এই রাজ্য তুলনামূলক রূপে রয়ে গেলো অন্তরালে যেখানে সমস্ত সময় ব্যয়িত হতো বিদ্যাভ্যাস ও শিল্পচর্চায়। তাই সঙ্গীত ও নাটকের কলার উন্নয়নের পক্ষে এ ছিল খুবই সৌভাগ্যের ব্যাপার। এই সময় মিথিলা, নেপাল ও অসমেই মৈথিলী নাটক পেলো আশ্রয় ও প্রোৎসাহন, কেননা এই সময় উত্তর ভারতে সর্বত্র মুসলিম শাসকেরা নাট্যকলাকে 'ঈশ্বরনিন্দাপূর্ণ' মনে করে নাটকের বিরোধী হয়ে উঠেছিলেন।

অষ্টাদশ শতকের শেষ কটি বছরে খাণ্ডয়া রাজবংশ স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা এই প্রয়াসে অসফল হলেন কারণ এদেশে শাসকেরা একটি সুষ্ঠু শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করতে যেমন অক্ষম ছিলেন, তেমনি শক্তিশালী সেনাদল গঠনের পরিকল্পনাও করতে পারেন নি। এখানকার বিদ্বান ও কবিরা নিজেরা ছিলেন শিল্প ও সাহিত্যচর্চার মহান পৃষ্ঠপোষক, হতে পারেন নি রাজনীতি ও যুদ্ধবিদ্যার পণ্ডিত :

সর্বশেষে মিথিলার শাসকদের হাত থেকে ব্রিটিশেরা এদেশের রাজ্যভার ছিনিয়ে নিলো এবং মিথিলার রাজাদের সামান্য জমিদারে পরিণত করলো।

আধুনিক মৈথিলী সাহিত্য (১৮৬০-১৯৭০)

আধুনিক যুগের সূত্রপাত অবশ্য উনিশ শতকের ষাটের দশকের আগে শুরু হয়নি। নতুন যুগের সূত্রপাত হলো তখনই যখন ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের পর সমস্ত দেশের শাসনভার চলে গেলো ব্রিটিশরাজের হাতে। নতুন শাসনব্যবস্থার পক্ষে মিথিলার আধুনিকীকরণ করা হলো সহজ কেননা মিথিলা (বা তিরহুত) রাজ্যের দ্বারভাঙা রাজ্যের ভূতপূর্ব রাজাদের বংশধরদের হাত থেকে শাসনক্ষমতা ১৮৬০ সালে হস্তান্তরিত হলো 'কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসে'র কাছে এবং এভাবে প্রাচীন রাজত্বের শেষ চিহ্নগুলিও মুছে গেলো। স্থানীয় ভাষা (মৈথিলী) এবং এ দেশের নিজস্ব লিপির (তিরহুতা) ব্যবহার বন্ধ হলো সাধারণ্যে ও সরকারি কাজকর্মে; পুরাতন কর-প্রণালী হলো অবলুপ্ত; অনেক নতুন প্রতিষ্ঠান এবং প্রগতিশীল নিয়মনীতি চালু হলো এবং শাসনের দক্ষতা বাড়ানো হলো পুরনো জেলাগুলির সীমারেখা ও গঠনে অদলবদল করে এবং কয়েকটি নতুন জেলার গঠন করে। এইসবের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে লাভজনকও ছিল না, সর্বব্যাপীও হয় নি এমন কিছু, তবে এদের প্রভাব স্বরূপ এই 'আধুনিকীকরণে'র গতি গেলো বেড়ে। সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসেব-নিকেশ তৈরি হলো, টেলিগ্রাফ ও রেলের মতো আধুনিক উদ্ভাবনের সাহায্যে সংযোগ এবং যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি ঘটলো, প্রাকৃতিক দুর্যোগকে বেঁধে ফেলা হলো, স্থানীয় স্বায়ত্ব-শাসন শুরু হলো, এবং সর্বোপরি 'ইংরেজি' শিক্ষার সূচনা হলো।

এই যুগে আমরা তাই দেখতে পাচ্ছি একটা ক্রম-অবক্ষয়। ১৮৮০ সনে খাণ্ডয়া বংশের শাসকদের হাতে দ্বারভাঙা রাজ আবার তুলে দেওয়ার পরই আবার মৈথিলী সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা হতে দেখা গেল। একটা নতুন যুগের যেন জন্ম হলো মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর সিংহের (১৮৮০-১৯৯৮) রাজত্বে। এই শতাব্দীর প্রারম্ভেই মৈথিলী সাহিত্যের বিভিন্ন বিধা, বিশেষ করে গদ্যরচনা, পুনরাবিষ্কৃত ও প্রতিষ্ঠিত হলো। এর উন্নতির পক্ষে প্রধান অন্তরায় ছিলো এই প্রদেশের শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা এই ভাষা ও সাহিত্যের প্রায় পূর্ণাঙ্গ অবহেলা। অবশ্য 'ইংরাজি শিক্ষাধারা'র অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের সব বিধাই সবার ধ্যান আকৃষ্ট করেছিল। নাটক, কবিতা, ও গদ্য প্রচুর উন্নতি করলো, যদিও এমনিতে আধুনিক সাহিত্যের প্রতিনিধি এবং মূল স্বর বলতে গদ্যই।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে মৈথিলী সাহিত্যের ইতিহাসকে যে কটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে তা ঠিকই হয়েছে— প্রারম্ভিক (৮৯০-১৩০০)—, প্রাচীন (১৩০০-১৬০০), মধ্য (১৬০০-১৮৬০) এবং নবীন (১৮৬০-১৯৭০), যার মধ্যে শেষের তিন পর্যায়ে যথাক্রমে গীতিকবিতা, নাটক ও গদ্য ছিল সাহিত্যচর্চার প্রতিনিধি ও প্রভাবশালী অঙ্গ। ড. সুভদ্র ঝা-ও নিজের মহান নিরীক্ষা 'দ্য ফরমেশান অব্ দ্য মৈথিলী ল্যাংগুয়েজ'-এ মৈথিলী ভাষার পর্যায় ভাগ করতে গিয়ে এমনই তিনটি যুগের কথা বলেছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

মৈথিলীতে সাহিত্যের বৈচিত্র্য

প্রাচীন ভারতীয় কবিতার সব কটি ধারাই মৈথিলীতে পাওয়া যায়। তেমনই, সংস্কৃতের মতনই অঙ্কবিলাস, ছন্দোলঙ্কার-মঞ্জুষা, অলঙ্কৃতবোধ (কাব্যতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থ) বূটীপ্রকাশ (চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ক), প্রভৃতি বেশ কিছু রচনা আছে যেগুলি সাধারণত পদ্যে না লিখে গদ্যে লেখা উচিত ছিল।

বিশুদ্ধ কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে এলে আমরা পাবো সর্বপ্রথম কয়েকটি মহাকাব্য, যার মধ্যে বেশ কটি অন্য যে-কোনো ভাষার মহাকাব্যের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে। মৈথিলী মহাকাব্যেরও আবাব তিনটি শ্রেণী রয়েছে। প্রথমে আছে সেগুলি যেগুলি সংস্কৃত মহাকাব্যের সরাসরি অনুবাদ বা রূপান্তর, যেমন অচ্যুতানন্দ দত্তের 'মহাভারত' ও 'রঘুবংশ'। দ্বিতীয়ত রয়েছে বেশ কিছু মূল মহাকাব্য যেগুলি সংস্কৃত মহাকাব্য-রচনার শৈলী অনুসারে রচিত। এই শ্রেণীতে পড়ছে বদ্রীনাথ ঝা-র 'একাবলী-পরিণয়', রঘুনন্দন দাসেব 'সুভদ্রাহরণ' এবং তন্ত্রনাথ ঝা-র 'কীচক-বধ'। এই শ্রেণীতেই পড়বে গৌরীশঙ্কর ঝা-র করা মইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ-বধ'-এর রূপান্তর। তৃতীয় শ্রেণীর মুখ্য রচনাগুলি হলো মনবোধের 'কৃষ্ণজন্ম' ও চন্দা ঝা-র 'রামায়ণ'। এই দুটি কাব্যই, সত্যি কথা বলতে কি, মহাকাব্য-রচনার নিয়ম মেনে রচিত নয়। তবে দুটি ক্ষেত্রেই মহাকাব্যের মূল বৈশিষ্ট্য আছে উপস্থিত। এগুলি সাধারণত রচিত হয় সাতটি খণ্ড বা অধ্যায়ের ভিত্তিতে; এগুলি আরম্ভ হয় আশীর্বচন দিয়ে এবং তারপর সরাসরি গল্প বলায় চলে আসে তাদের বিষয়-বস্তুর বিষয়ে দুকথা বলে নিয়েই। এগুলি সাধারণত ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক কাহিনীর নানান মুখপাত্রের কৃতকর্ম বিষয়ক কাহিনী; শেষত এগুলি সাধারণত বিস্তারিত ও বর্ণনামূলক কথাকাব্য হিসেবে লেখা।

মৈথিলীতে খণ্ডকাব্য তুলনামূলকভাবে আরো জনপ্রিয়। খণ্ডকাব্য ও মহাকাব্যের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো বর্ণনার অধিকতর বিস্তার এবং অধিকতর সংখ্যায় ঘটনাবলী ও খণ্ড সংযোজন। মৈথিলীতে অন্তত ছয় ধরনের খণ্ডকাব্য আছে। প্রথমটি হলো 'মেঘদূত', 'ঋতুসংহার', 'ভর্তৃহরি-নির্বোদ-কাব্য' এবং 'বিরহিনী-ব্রজাঙ্গনা' প্রভৃতির অনুবাদ ও রূপান্তর। দ্বিতীয় শ্রেণীতে রয়েছে লালদাসের 'গঙ্গালহরী' ও 'গণেশ খণ্ড' গুণবন্তলালদাসের 'গজগ্রাহোদ্ধার' এবং অন্যান্য দীর্ঘ কবিতা, রঘুনন্দনদাসের 'বীরবালক', ঋদ্ধিনাথ ঝা-র 'সতীবিভূতি', অনুপ মিশ্রের 'নারদবিবাদ' প্রভৃতি। এই সবগুলিই হলো পৌরাণিক বা রূপকথার নায়কদের বিষয়ে দীর্ঘ কথাকাব্য।

তৃতীয় শ্রেণীর কাব্য হলো যাকে বলে 'বাতাহ্বান কাব্য'। মিথিলায় এটি একটি সংস্কৃত ধরনের কাব্য যার মাধ্যমে অসম্ভব গ্রীষ্মের মুহূর্তে বায়ুকে বইতে প্রবৃত্ত করা হয়। মৈথিলীতে

চন্দা ঝা ও ভানা ঝা এই ধরনের কাব্য লিখেছেন। চতুর্থ শ্রেণীতে রয়েছে বিরুদাবলী— বিশেষ করে লালদাস ও ঋদ্ধিনাথ ঝা-এর এবং পঞ্চম শ্রেণীতে আছে কাশিনাথ মিশ্র-র 'কোবরগীত'-এর মতো দীর্ঘ কবিতা। শেষের তিন ধরনের দীর্ঘ কবিতা বিষয়-বস্তুর নিরিখে প্রথম দুটি থেকে পৃথক।

'সম্মর'(= সংস্কৃত 'স্বয়ম্বর') হলো আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধরনের খণ্ডকাব্য যাতে রাম, জগন্নাথ, কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারের বিবাহ ও তার আগের ঘটনাবলীর একটা বর্ণনা আছে। ১৯ শতকের অনেক গৌণ কবিরাই এই ধরনের খণ্ডকাব্যের রচনা করেছিলেন।

মৈথিলী লোক সাহিত্যে বিশেষ করে বেশ কিছু আকর্ষণীয় প্রেম কথার উপর ভিত্তি করে দীর্ঘ রচনা ছন্দের বাঁধনে পাওয়া যায় যেগুলিকে বলা যায় 'গীতিকথা' (জনপ্রিয় গাথাসঙ্গীত) — যেমন, 'বিহুলা গীত', 'দীনা-ভদ্রিক গীত' এবং 'সুটুঠি কুমারিক গীত' যা এই ধরনের সূক্ষ্ম সৃষ্টিকর্মের ভালো উদাহরণ।

সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় অবশ্য হয়েছে 'গীতিকাব্য' যার ইংরেজি নাম হলো 'lyric poetry'। বিশেষ করে প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই গীতিকবিতাগুলি মূলত গায়নের জন্যই লেখা হয়েছিল। এই জন্যেই এর মধ্যে ব্যবহৃত নানান ধরনের মৈথিলী ঠিক বোঝা যায় না যতক্ষণ না এগুলি গীত হয়! বেশ কিছু প্রকারের গীতিকাব্য নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সেগুলিকে নিখুঁত রূপ দেওয়া হয়েছে এবং আজও কোনো মৈথিল কবিকে সম্পূর্ণ কবি বলে মনে করা হয় না যতক্ষণ না তিনি প্রাচীন মৈথিলীর গীতিকবিতার এই নানান ধাঁচে কবিতা রচনা করেন। 'চর্যাগীতি'তেই গীতিকবিতার প্রাচীনতম রূপ দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু আসলে জয়দেবের অমরগ্রন্থ 'গীতগোবিন্দ'এর অসংখ্য দেশীয় রূপান্তর ও অনুসরণ দিয়েই এর জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল। বিদ্যাপতিই প্রথম মহান কবি ছিলেন যিনি প্রায় সমস্ত ধরনের প্রাচীন গীতিকবিতার রীতিতেই কাব্যসৃষ্টি করেছিলেন।

মৈথিলী গীতিকবিতার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হলো— এগুলি অসাধারণভাবে গীতধর্মী; এগুলির প্রত্যক্ষতা ও স্বতঃস্ফূর্ততায় কোনো সন্দেহ নেই; এগুলির দৈর্ঘ্য এমন যে কোনো একটি গুরুত্বপূর্ণ মনোবৃত্তি বা হৃদয়াবেগের প্রকাশ এর দ্বারা সম্ভব; এর অর্থ বিস্তার বিশাল ও প্রায় অসীম; এই গীতগুলির অনুসরণের প্রধান উৎসমুখে রয়েছে প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনাবলী ও অভিজ্ঞতা; এবং সবশেষে এই গীতিকবিতাগুলির বর্ণময়তা ও কল্পনাশৈলীর শাশ্বত পটভূমি হিসেবে রয়েছে সংস্কৃত গল্পকাহিনী ও রূপকথা এবং সংস্কৃত কাব্যতাত্ত্বিক ও প্রেমবিষয়ক পরম্পরা। প্রাচীন মৈথিলী গীতিকবিতার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো 'ভনিতা' যার ব্যাখ্যা ড. সুকুমার সেন তাঁর 'হিস্ট্রি অব ব্রজবুলি লিটারেচর' গ্রন্থে এভাবে করেছেন:

> কবির নাম (বা তাঁর যে-কোনো উপনাম) তা সে তাঁর নিজের নামালঙ্কারই হোক বা গুরুর নামই হোক— এই রীতি মনে হয় উত্তর ভারতের সর্বত্র প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে প্রচলিত ছিল। মনে হয় এর উদ্ভবের মূলে ছিল আগেকার

সংস্কৃত কবিদের দ্বিবাচন রূপে যে ছন্দে কবিতাটি বা স্তবকটি লেখা হতো তার নাম কবিতার কোনো পংক্তিতে ঢুকিয়ে দেওয়ার রীতি।

কোনো কোনো ভণিতায় রাজা বা সংরক্ষক কিংবা অন্য কোনো পুরুষের (তার সঙ্গে তারই সহগামিনীর) নামও পাওয়া যায়— যাকে কবি নিজের মিত্র বা সহায়ক রূপে খুশি করতে চান বা সম্মান করতে চান।

মৈথিলীর মুখ্য গীতিশৈলীর শ্রেণীবিভাগ নিয়ে কিছু বলার পক্ষে সবচেয়ে বাধক ব্যাপার হলো লোকশৈলীর সঙ্গে পরম্পরাগত সাহিত্যিক শৈলীকে মিশিয়ে ফেলার প্রবণতা। অনেক সময় একথা নিশ্চিত করে বলা কঠিন হয়ে পড়ে যে বিশেষ গঠনশৈলী একই সঙ্গে কোনো বিশেষ ধরনের লোককবিতার জন্যেও দায়ী নয়। এখানে যে তালিকা দেওয়া হচ্ছে তাতে যতদূর সম্ভব সেইসব ধরনের গীতিকবিতার কথাই বলা হয়েছে যা বিখ্যাত কবিদের রচনা এবং যার অনুপ্রেরণায় মহৎ কবিতার সৃষ্টি হয়েছে। লোককবিতার সংরচনা নিয়ে পূর্ণ আলোচনা অন্যত্র করা হবে। গীতিকবিতার শ্রেণীবিভাগ করা হয় সাধারণত এগুলির সুরতানের উপর নির্ভর করে । এমন কিছু ধরনও আছে যেগুলির প্রতিরূপে পাওয়া যায়'ছন্দ পরক' কবিতা (অর্থাৎ, ছন্দোবদ্ধ কবিতা যা পাঠ্য, গেয় নয়)। অবশ্য বিষয়-বস্তুর নিরিখেও এই গীতিকবিতাগুলির শ্রেণীবিভাগ করা যায়।

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও সহজপ্রাপ্য শ্রেণী হলো 'তিরহুতি' (অথবা তিরহুতা) যার এমন নামকরণ হয়েছিল যে এই ত্রিহুত অঞ্চলের নিজস্ব গীতিকবিতার সুর প্রকাশের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সার্থক শৈলী ছিল এটাই। মৈথিলী গীতাবলীর সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে তিরহুতিই সবচেয়ে ধনী। এতে আছে মূলত প্রেমগীতি— বিরহের গান, মিলনেরও। নায়িকা, অলস অঙ্গভঙ্গিমা, প্রেমিকের সঙ্গে তার মিলন, এবং বিচ্ছেদের বিরহ এইসব নিয়ে এই গীতগুলিতে পাওয়া যায় অপরূপ বর্ণনা; মোটামুটিভাবে নায়িকা-মনের সমস্ত দিগন্ত হয় উন্মোচিত। 'না', 'হো', 'রে', অথবা 'সজনী-গে'- - এইসব শব্দ বারবার ঘুরে-ফিরে আসে এই গীতগুলিতে।

'সজনী-গে' কথাটি ধুয়োর মতো বারবার পাওয়া যায় সাধারণত যে ধরনের তিরহুতিতে তার নাম হলো 'বটগমনী'। বটগমনীগুলিতে সাধারণ অভিসারে চলেছে এমন নায়িকার বর্ণনাই পাওয়া যায়। সাধারণ তিরহুতির থেকে বটগমনীর পার্থক্য হলো এই যে বটগমনী সাধারণত এক অদ্ভুত সুরে গাওয়া হয়। এই ধরনের গীতিকবিতার মধ্যে সর্বাধিক সফল পুরুষ হলেন বিদ্যাপতি।

'গোয়ালরী' হলো আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধরনের তিরহুতি। সাধারণত এর কথাবস্তু হলো গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের ক্রীড়াও যৌবনোচিত দুষ্টুমি। এই ধরনের গীতরচয়িতাদের মধ্যে নন্দীপতি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ।

'রাস' হলো গোপীসমভিব্যাহরে কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক গীতের আর একটি প্রকাশ রূপ মাত্র। বিশেষ করে কৃষ্ণের রাস-লীলাই এর মুখ্য উপজীব্য। এর রচয়িতারা ব্রজভাষার

কবিতার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। সাহেব রামদাস ছিলেন রাস-রচয়িতাদের মধ্যে সবচেয়ে সফল।

'মান' হলো নাট্যধর্মী গীতিকবিতার একটি রূপ। যেখানে প্রেমিকদ্বয়ের একজনকে, অর্থাৎ প্রেমিকাকে অভিমান (স্ত্রী-মান) করতে দেখা যায়, সেখানে প্রেমিক তাঁর মান ভাঙার চেষ্টা করছে, অথবা এর ঠিক উল্টোটাও ঘটছে (তখন তাকে বলে 'পুরুষ-মান')। উমাপতি এই ধরনের সবচেয়ে সফল কবি। 'সমদাউনী' (= সংস্কৃত, 'সংবাদবাণী') হলো বিদায়-গীতি যা কন্যা যখন বিবাহের পরে পতিগৃহ যাত্রা করছে তখন গাওয়া হয়। নবরাত্র উৎসবের শেষে বিজয়ার দিন মা দুর্গার মূর্তিকে যখন ভাসানের মাধ্যমে বিদায় দেওয়া হয়, সে সময়ে গীত এমন বেশ কিছু চমৎকার 'সমদাউনি' পাওয়া গেছে। এমনকি আমের মরশুম চলে যাওয়ার সময়েও গাইবার জন্য এই ধরনের গান পাওয়া যায়। মৈথিলী শ্রোতাপাঠকেরা এই ধরনের গীতিতে যে সকরুণ সুর শুনতে পাওয়া যায় তা খুবই পছন্দ করেন। গণনাথ ঝা এবং বিন্ধ্যনাথ ঝা-র এই ধরনের গীতিকবিতায় বিশেষ অবদান রয়েছে।

'লগনী' দুধরনের হয়: একটি হলো চার থেকে পাঁচ স্তবকের অপূর্ব কবিত্বময় বিষাদ মাখানো কবিতা যাতে 'রে-কী'— এই শব্দগুচ্ছ ঘুরে-ফিরে আসে। অন্যটি একটি দীর্ঘ লোকগীতি যার মধ্যে পাই সাধারণত কাব্যে গাঁথা এমন সব কাহিনী যা গ্রামের মেয়েরা ভোর সকালে চাল-গম পেষার সময়ে গেয়ে থাকেন। নিধি এবং গণনাথ ঝা সার্থক কবিতার প্রকাশ-মাধ্যম হিসাবে এর মধ্যে প্রথমটি ব্যবহার করেছেন।

'চৈত' বা 'চৈতাবর' চৈত্র মাসে (মার্চ-এপ্রিল) প্রেমের অনুভূতিকে প্রকাশ করার জন্য গাওয়া হয়। 'চৈত' গীতির ধুয়ো হিসেবে 'হা-রামা', 'হো-রামা' কথাটি বারবার ঘুরে-ফিরে আসে এবং গানের সুরের সঙ্গে লোকগীতির অন্তর্গত 'ফাগু'র গানের মিল রয়েছে যা ফাল্গুন মাসে (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) গাওয়া হয়। এই শ্রেণীর বেশির ভাগ গানই লোককবিতার অন্তর্ভুক্ত।

'মলার' হলো আরেকটি ঋতুনির্ভর গীতিগুচ্ছ। 'মলার' আবার দুধরনের হয়: 'পাবস মলার' (যা বর্ষা ঋতুতে গাওয়া হয়) এবং 'ধুরিয়া মলার' (যা অন্যান্য ঋতুতে গাওয়া হয়)। মলারের 'রাগ' (বা ছন্দ) অন্য সব ধরনের গীতের থেকে পৃথক ধরনের এবং সবচেয়ে সহজলভ্য সুরের মধ্যে একটি।

'যোগ' ও 'উচিতীয়' হলো দুটি অদ্ভুত ধরনের মৈথিলী গীতি। যোগ গাওয়া হয় বধূকে বরের সঙ্গে ও প্রেমিকাকে প্রেমিকের সঙ্গে মন্ত্রোচ্চারণের বাঁধনে বেঁধে ফেলার জন্য। এই শ্রেণীর প্রাচীনতম গানগুলির বয়স বিদ্যাপতির কালে রচিত বলে ধরা হয়। উচিতী হলো সম্মানীয় কোনো অতিথির প্রতি গৃহকর্তার উচিত অভ্যর্থনার পরিচায়ক গীতিমাত্র। এই দুই শ্রেণীতে সাহিত্যিক এবং লোকতাত্ত্বিক — এই দুই ধরনের গীতিই পাওয়া যায়।

অন্যান্য পরিচিত শ্রেণীর দেশীয় কবিতার প্রকাশভঙ্গির মধ্যে পড়ে 'সোহর' (জন্মগীতি, বিশেষ করে রাম ও কৃষ্ণের বিষয়ে), 'বারহমাসা' (বারোমাসে প্রেমিক-প্রেমিকার বিচ্ছেদের থেকে জাত বিরহ-সংগীত) বা 'ছত্তমাসা' (শুধু ছমাসের বিচ্ছেদ — জ্যৈষ্ঠ থেকে কার্তিক) বা 'চৌমাসা' (শুধুমাত্র বর্ষা বা চতুর্মাসের জন্য)। এই গানগুলির সাহিত্যিক ও লৌকিক — দু ধরনেরই রূপই আছে।

ভক্তিগীতিগুলির মধ্যে উল্লেখ করা যায় (১)'নচারী', (২) 'মহেশবাণী' (৩) 'গোসউনিকগীত', (৪) 'বিষ্ণুপদ' বা 'ভজন-কীর্তন' — এই কটিকে। 'নচারী' গুলি হলো শিবের প্রতি প্রত্যক্ষ পূজনের গীতি। এগুলি বিশুদ্ধ ঋক মন্ত্রের মতন। 'নচারী' এই নামটি মনে হয় শিবের মদমত্ত নৃত্য থেকে এসেছে এবং এর সঙ্গে ভক্তের এমনই এক মানসিক স্থিতির প্রতিই ইঙ্গিত করা হয় যখন ঈশ্বরের চিন্তায় ভক্তের আত্মবিস্মরণ ঘটে। সাধারণ মানুষের কথায় 'নচারী'র সঙ্গে 'মহেশবাণী'কে মিশিয়ে ফেলা হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুটির মধ্যে আছে অনেক প্রভেদ। নচারী হলো সরাসরিভাবে ভক্তিমূলক ; কিন্তু মহেশবাণী হলো শুধুমাত্র শিব-বিষয়ক গীত। 'মহেশবাণী' নামে একটা বিরোধাভাস রয়েছে— এটি মহেশের (বা শিবের) 'বাণী', (কথা) নয় বরং শিবের সম্মানে 'বাণী', (কথা বা গান অর্থে)। মহেশবাণী সাধারণত মেনকা (মৈথিলীতে বললে মানইনি') বা গৌরীর মাকে উদ্দেশ্য করে গাওয়া হয় এবং হরগৌরীর বিবাহ বা তাদের পারিবারিক জীবনের বিষয়ে গাওয়া হয়। বিদ্যাপতির কাল থেকেই এই দুধরনের শিবগীতিরই সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যায়। প্রধান নচারী গীতিকারেরা হলেন বিদ্যাপতি, লাল কবি, কাহ্নারামদাস এবং চন্দা ঝা। নেপালের নচারী কবিরা বিষ্ণু, গণেশ এবং অন্যান্য দেবদেবীর বিষয়েও নচারী লিখেছেন।

'গোসাউনিক গীত' (অথবা, 'দেবীপদ' বা 'ভগবতীক গীত') হলো শক্তির নানান রূপের ভক্তিমূলক গীত বা স্ত্রোত্র। এই ধরনের গানে প্রধান অবদান ছিল বিদ্যাপতি, নেপালের মল্লেদের, রত্নপাণি ও গণনাথ ঝা-এর— যদিও প্রায় প্রত্যেক কবিই সেযুগে এই ধরনের গান লিখেছেন।

'ইংরেজি'-শিক্ষানীতির প্রচলনের পর থেকেই মৈথিলীতে কিছু কিছু ইংরেজি ধাঁচের গীতিকবিতাও রচিত হয়েছে। এর মধ্যে মুখ্য হলো সাধারণ গীতিকবিতা ছাড়া 'চতুর্দশপদী'(sonnet), 'পল্লী-গাথা' (ballad), 'দীর্ঘ গীতিকাব্য'(ode)।

এছাড়া রয়েছে যাকে বলে 'মুক্তক কাব্য'। এর অর্থ হলো এগুলি এমন কবিতা বা স্তবক যাতে অন্য কোনো পংক্তিস্তবক বা কাব্যাংশের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই। এর মধ্যে আছে 'সমস্যাপূর্তি' (হিন্দি বা উর্দু কবিতার ধাঁচে), ধাঁধা ('প্রহেলিকা' বা 'অহিয়ারী' বা 'কূট') এবং 'অপহ্নুতি' (বা 'মুকারী')। এই শেষোক্তটি একটি অপূর্ব ধরনের কবি-ক্রীড়া। এতে কোনো বস্তুবিশেষের পরিচয়কে ছদ্ম-অস্বীকার করা হয় এবং তার পরিবর্তে প্রেমিকা বা প্রেমিকের পরিচয়কে করা হয় প্রতিষ্ঠিত সেই স্থানে। সীতারাম ঝা,

উপেন্দ্র ঠাকুর 'মোহন', জীবনাথ ঝা হলেন এই ধরনের মুক্তক কবিতার জনপ্রিয় কবি।

গদ্যের প্রকারভেদ

প্রায় সব ধরনের গদ্যই মৈথিলীতে পাওয়া যায়। 'বর্ণনা' হলো প্রাচীনতম গদ্যশৈলী যা আমরা পেয়ে থাকি। এতে সাধারণত থাকে একগুচ্ছ বিবরণ। জ্যোতিরীশ্বরের 'বর্ণরত্নাকর' হলো এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জৈন প্রাকৃত থেকেই সম্ভবত এই বর্ণনা সাহিত্যের জন্ম হয়। এর তুলনা পাওয়া যায় বাংলা এবং গুজরাতি সাহিত্যেও। মনে হয় মধ্যযুগে মৈথিলী সাহিত্যে বর্ণনা খুবই জনপ্রিয় ছিল। কারণ দেখা যাচ্ছে কীর্তনিয়া নাটক এবং নেপালের অন্যান্য নাটকেও এর প্রয়োগ পাওয়া যাচ্ছে।

মধ্যযুগে দেখা যাচ্ছে দুধরনের গদ্য— নাটকের গদ্য ও দলিল-দস্তাবেজের গদ্য। নাটকের গদ্য ছিল আবেগপ্রবণ এবং বিবরণমূলক, শৈলীগতভাবে। আধুনিক নাটকের গদ্যশৈলী অবশ্য একেবারে আলাদা ধরনের । আজকাল নাটকের গদ্য প্রাণবন্ত এবং প্রাত্যহিক জীবনের সমস্ত গুণ তাতে রয়েছে। দলিলের গদ্য শুধু মধ্যযুগেই পাওয়া যেত এবং নান্দনিকতার দিক দিয়ে তা খুব একটা উচ্চদরের নয়।

আধুনিক গদ্যের বেশ কিছু নতুন শ্রেণীবিভেদ রয়েছে :

১. উপভোগ্য গদ্য —
- (ক) সাংবাদিকতার গদ্য
- (খ) নিবন্ধ
- (গ) কাহিনী ও ভ্রমণকথা

২. জ্ঞানের গদ্য —
- (ক) আলোচনা ও জ্ঞানগর্ভ গদ্য
- (খ) দর্শন ও ধর্ম
- (গ) ইতিহাস ও চরিত্রচিত্রণ
- (ঘ) বিবিধ

যথাস্থানে এই সবকটিরই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৩. চম্পূ (কবিতা ও গদ্যের সংমিশ্রণ), উদাহরণ ঋদ্ধিনাথ ঝা-র 'বিশ্বেশ্বর-চম্পূ'।

নাটকের প্রকারভেদ

তিনটি মুখ্য শ্রেণীর মৈথিলী নাটক আমরা দেখতে পাই :

১. প্রথাবদ্ধ মৈথিলী নাটক— প্রথাবদ্ধ মৈথিলী নাটকগুলির সঙ্গে মিল পাওয়া যায় সংস্কৃত নাটকের কারণ এখানেও সমস্ত নাটকের বাচন-ভাষণ থেকে সংস্কৃত ও প্রাকৃতে এবং সমস্ত নাটকে ছড়িয়ে থাকে কবিতা, কিন্তু তদুপরি থাকে মৈথিলী গীত। বহুক্ষেত্রেই এই মৈথিল গীতগুলি পূর্বের বা পরের সংস্কৃত কবিতার ভাবার্থের অনুবাদ করে দেয়;

যেমনটি দেখছি উমাপতির 'পারিজাতহরণ'-এ।

২. 'প্রথাবহির্ভূত' মৈথিলী নাটক— দ্বিতীয় ধরনের মৈথিলী নাটক হলো সেগুলি যাতে শুধু মৈথিলী গীত ও কবিতা পাওয়া যাচ্ছে নাটকের শরীরে। সংস্কৃত ও প্রাকৃতের ব্যবহার খুব কম পাওয়া যায়। উদাহরণ রূপে নেওয়া যেতে পারে রত্নপাণির 'উষাহরণ' ও জগজ্জ্যোতির্মল্লের 'মহাভারত'। আমরা অরেক ধরনের প্রথাবহির্ভূত মৈথিলী নাটক পাই যার অসমে খুব প্রচলন হয়েছিল। এখানে গদ্যের ব্যবহার খুব বেশি হয় এবং সংস্কৃতের মতো রূপকের ব্যবহার দেখা যায় না।

৩. আধুনিক মৈথিলী নাটক — এখানে সংস্কৃত ও ইংরেজির ছাঁচের ব্যবহার পাওয়া যায় তবে কোথাও মৈথিলী ভিন্ন অন্য ভাষা ব্যবহৃত হয় না এবং গীতিকবিতারও এতে কোনো স্থান নেই বললেই চলে। এমনকি বিশুদ্ধ কবিতাও নয়।

মৈথিলী নাটকের আর একটি শ্রেণী বিভাগ এই ভাবে করা যায় :

১. নেপালের মৈথিলী নাটক : এর আরম্ভ হয়েছিল সংস্কৃত নাটকে মৈথিলী গীতের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের থেকে। শেষমেষ এগুলি ছিল অপেরার মতো যাতে প্রচুর মৈথিলী গান থাকতো— সংস্কৃত ও প্রাকৃতকে খুঁজেই পাওয়া যেত না, এবং গঠনও সংস্কৃত ও প্রাকৃত নাটকের থেকে ছিল পৃথক ধাঁচের।

২. কীর্তনিয়া মৈথিলী নাটক : এরও শুরুতে দেখছি সংস্কৃত নাটকে ক্রমে বেশি করে মৈথিলী গানের অনুপ্রবেশ, কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যাচ্ছে মূলত মৈথিলীতে লেখা সম্পূর্ণ গীতিনাট্য হয়ে গেছে যাতে মূল ভাব হচ্ছে ভগবদ্‌ভক্তি। নেপালের মৈথিলী নাটকগুলি এবং অসমের 'অঙ্কিয়া নাট' এইসব কীর্তনিয়া নাটকের প্রভাবেরই ফল।

৩. আধুনিক মৈথিলী নাটক : পূর্বোক্ত প্রকারভেদের সঙ্গে এই অংশে কোনো পার্থক্য নেই।

মৈথিলীতে কাব্যচর্চা

গঙ্গানাথ ঝা-র বক্তব্য ছিল দেশীয় কবিদের পক্ষে ছন্দশাস্ত্রের সম্যক জ্ঞান একান্তই আবশ্যক।[১] মিথিলায় ছন্দশাস্ত্রের চর্চা প্রাচীনকাল থেকেই খুবই জনপ্রিয় ছিল। 'প্রাকৃত-পৈঙ্গল'-এর নানান টীকা রচিত হয়েছিল, যেমন উচৈধের মিথিলী কালিদাস (১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে), রমাপতি (১৭০৪ খ্রিষ্টাব্দে), দুর্গাদত্ত , দামোদর মিশ্র, ভীষ্ম মিশ্র, জানকীনন্দন ও তরৌনীর রাঘব ঝা— এঁরা সবাই এই টীকার রচনা করেছিলেন। এও দাবি করা হয়েছে 'প্রাকৃতপৈঙ্গল' মৈথিলীতে লেখা গ্রন্থ। কে. পি. জয়সওয়াল বলেছেন :

> ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী মধ্যে প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রের অধ্যয়ন ছিল মিথিলায় খুবই জনপ্রিয়। নাগের 'প্রাকৃতপিঙ্গল'-এর একাধিক পুঁথি ও টীকা থেকেই

১. স্যার গঙ্গানাথ ঝা, সম্পাদিত : 'গণনাথ-বিন্ধ্যনাথ-পদাবলী', সমর্পণ খণ্ড, পৃ. ১।

> একথা প্রমাণিত হয় . . . মৈথিলী ও উত্তর ভারতের অন্যান্য দেশীয় ভাষার . . . কবিতার উপর এর প্রভাব ছিল সর্বাধিক। এতে দোহা, টোটকা, ছপ্পয়, কুণ্ডলিয়া, মালিনী প্রভৃতি . . . ছন্দের ব্যবহার দেখা যায় . . . এতে এমন সব প্রচুর ধরনের দেশীয় ছন্দ পাওয়া যায় যা আঁর আজ ব্যবহৃত হয় না। . . . মৈথিলী পণ্ডিতেরা দেশীয় 'কুণ্ডলিয়া' ছন্দের ব্যবহার করেন সংস্কৃতে কাব্য রচনা করতে গিয়ে। সপ্ত দশ শতাব্দী থেকেই দেশীয় ভাষার ছন্দ বৈশিষ্ট্যের দিকে বেশি আকৃষ্ট হয়েছে মানুষ, যদিও বিদ্যাপতি ও উমাপতির (?) মতো কবিরা দেশীয় ভাষায় কাব্যরচনা করেছেন এর চেয়ে দুই শতক পূর্বেই।[১]

প্রাচীন ও মধ্য মৈথিলী কবিতার ছন্দের গঠন নির্ভর করেছে প্রাকৃত ও অপভ্রংশ সাহিত্যে ব্যবহৃত ছন্দের ওপর যেখানে মাত্রা অথবা ছান্দিক কালভাগ হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ— যা সংস্কৃত ছন্দের একেবারে বিপরীত, কারণ সংস্কৃত ছন্দে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো বর্ণ অথবা অক্ষর। 'গীত ছন্দ' হলো সবথেকে জরুরি ছন্দ যা তখন ব্যবহৃত হতো, যেখানে কবিরা রাগ ও রাগিণী অনুসারে রচনা করতেন— তাল ও স্বরের বিভাজন মেনে। এটা স্পষ্ট নয় যে এগুলি ড. এইচ. ডি. ভেলঙ্কর যাকে বলেছেন 'মাত্রাবৃত্ত ও তালবৃত্ত'[২] ছন্দ সেই পর্যায়ে ফেলা যায় কিনা। লোচন হলেন একমাত্র মৈথিল লেখক যিনি (তাঁর 'রাগতবঙ্গিনী'-তে) এইসব গেয় ছন্দের আলোচনা করেন এবং বলেন : "গীতগুলি 'তাল', 'মান', 'রাস', 'ছন্দ' 'গমক', 'নাদ', ও 'পদ' -এর নিয়মাবলীর বাঁধনে বাঁধা থাকে। এই গীতগুলিকে 'নিবন্ধ' বলা যায় যার বিপরীতে রয়েছে 'অনিবন্ধ'। এই 'নিবন্ধ'- গীতগুলি হতে পারে 'মার্গ' (শাস্ত্রীয়) অথবা 'দেশী' (জনপ্রিয় বা স্থানীয়) সুর - শৈলী (রাগ-রাগিণীর)। লোচন মনে করেন বিদ্যাপতি প্রভৃতিরা যে মৈথিলীতে দেশীয় গীতি-রচনা করেছেন তা মিথিলার জনপ্রিয় বা দেশী শৈলীতে সুরারোপিত। ছন্দ তাই দেশীয় গীতি অনুধাবনের একটা সহায় মাত্র হবে।

লোচনই প্রথম 'দীর্ঘ ও হ্রস্ব মাত্রা' (কাল-নির্ভর) গণনার প্রচলন করেন। এগুলির সঙ্গে প্রাকৃত ও অপভ্রংশের ছন্দশাস্ত্রের মোটামুটিভাবে মিল পাওয়া যায়। 'হ্রস্ব' স্বরে একমাত্রা ও 'দীর্ঘ' স্বরে দুই মাত্রার গণনা সংস্কৃতের মতনই— কিন্তু কিছু অক্ষর, যেমন 'এ' এবং 'ও'- কে মাত্র এক মাত্রাই ধরা হয়। এইভাবে সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের সঙ্গে (যেখানে

১. দ্র. মিথিলা ম্যানুসক্রিপ্ট ক্যাটালগ, পাটনা, খণ্ড ২, মুখবন্ধ। একইভাবে আমরা পাচ্ছি অলঙ্কার ও কাব্যশাস্ত্র বিষয়ক কাজ "ত্রয়োদশ-চতুর্দশ" শতক থেকে ষোড়ক শতকের মৈথিলী লেখকদের যা ভারতের অন্যত্র উদ্ভূত এবিষয়ক পাঠগ্রন্থের বদলে মিথিলায় মানক গ্রন্থ হিসাবে সমাদৃত হয়েছে। অতএব এভাবে একটি বিশেষ মৈথিলী কাব্যশাস্ত্রের ধারা গড়ে উঠেছিল" (ঐ)। "দেশীয় ভাষার রচনার স্পষ্ট প্রভাব যেখানে দেখা যায়"(ঐ) চতুর্দশ থেকে সপ্তদশ শতকে। এতে মৈথিলী কবিদের রচনা চাতুর্যের পরিচয়ও পাওয়া যায়।

২. দ্র. ভরত কৌমুদী (রাধাকুমুদ স্মরণ গ্রন্থ), পৃ. ১০৬৫, পাদটীকা।

অক্ষরবৃত্ত-ই মুখ্য) দেশীয় ছন্দশাস্ত্রের (যেখানে মাত্রাবৃত্ত-ই মুখ্য) প্রভেদ টানা হয়। মাত্রাবৃত্তে পাওয়া যায় বেশি স্বাধীনতা, এবং গানের পক্ষে এটি বেশি উপযোগী। যেমন :

> গায়নের সময়ে কালভাগ (তাল) মেনে চলা খুবই জরুরি, এবং এই কালভাগ মানা তখনি সম্ভব হয় যখন অক্ষরের থেকে মাত্রা বেশি জরুরি হয়ে পড়ে, কেননা অক্ষর কখনোই একটি সমসঙ্গত একক হতে পারে না।"[১]

লোচনের গানগুলি তাই 'দ্বিকল', 'চতুষ্কল' বা 'ষট্‌কল' এভাবে পরিমাপিত হয়। অবশ্য, উনি সংস্কৃতের আটটি গণকেও মেনেছেন কিন্তু সেগুলির ব্যবহার কমই করেছেন।

'দীর্ঘ' মাত্রাগুলি হলো : (১) আ, ঈ, ঊ, ঐ এবং ঔ প্রভৃতি দীর্ঘস্বর — হয় এককভাবে নয় যুগ্মরূপে; (২) অনুস্বার-যুক্ত কোনো বর্ণ; (৩) বিসর্গ-যুক্ত বর্ণ; ও (৪) সংযুক্ত বর্ণের আগের বর্ণটি। 'হ্রস্ব' মাত্রাগুলি হলো : (১) 'এ' এবং 'ও'— এককভাবে বা অন্য কোনো বর্ণের সঙ্গে যুগ্মভাবে; (২) অক্ষরমালার প্রথমে যেখানে 'র' বা 'হ' রয়েছে কোনো যুক্তাক্ষরে; তার আগের বর্ণটি এবং ঐচ্ছিকরূপে কোনো ছন্দোবদ্ধ পংক্তির শেষস্থানে।

এই সব গীত ছন্দের একটি বিশিষ্টতা হলো যাকে লোচন বলেছেন 'ধ্রুব' যা গানের বিষয়বস্তুকে পরিচয় করাবে, সংক্ষেপিত করবে এবং তাকে জোরালোভাবে প্রকাশিত করবে। সাধারণত এটি গানের শুরুতেই আসে এবং কোনো পদের গানের শেষে গাওয়া হয়। গীতিকবিতায় কতগুলি পদ থাকবে তার কোনো স্পষ্ট নিয়ম নেই : চার, ছয় বা আট- যেকোনো সংখ্যক পংক্তি তাতে থাকতে পারে।

মৈথিলী ছন্দশাস্ত্রের বর্তমান আলোচকেরা মৈথিলী ছন্দকে দুভাগে ভাগ করেন : (১) মাত্রিক ছন্দ, এবং (২) বর্ণবৃত্তক ছন্দ।

(১) মাত্রিক ছন্দ

(১) চৌপাই, (২) দোহা, (৩) সোরধা, (৪) বরবা, (৫) রোলা, (৬) উল্লাল, (৭) ছপ্পয় বা জয়করী, (৮) কুণ্ডলিয়া, (৯) গীতিকা, (১০) হরি-গীতিকা, (১১) বিজয়া, (১২) তোমর, (১৩) পদ্ধরি বা বসন্ত, (১৪) নানান ধরনের সঁধৈয়া, (১৫) ত্রিভঙ্গি, (১৬) ঘনাক্ষরী, (১৭) সুমেরু, (১৮) রূপমালা, (১৯) লবণী, (২০) সরসী, (২১) সর, (২২) আল্হাউ, প্রভৃতি।

এই কৃষ্ণজন্ম বর্ণনাত্মক কবিতায় চৌপাই সম্ভবত সবচেয়ে জনপ্রিয় ছন্দ। গ্রিয়ারসন মৈথিলীর একজন সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ণনাত্মক কবি, মনবোধের এই ছন্দের ব্যবহার বিষয়ে একথা বলেছিলেন :

> এই কৃষ্ণজন্ম কবিতাটির ছন্দ সর্বত্র সমান। এটি চৌপাই ছন্দের একটি রূপ

---

১. দ্র. ড. এইচ. ডি. ভেলঙ্কর, 'অপভ্রংশ ছন্দ'; জার্নাল অব দ্য বম্বে ইউনিভার্সিটি, ২.৩ (নভেম্বর ১৯৩৩), পৃ. ৩৩।

যাতে প্রতিটি অর্ধ-পংক্তিতে রয়েছে পনেরোটি করে মাত্রা— ষষ্ঠের পর একটা যতি দিয়ে। প্রতিটি ভাগের শেষের তিনটি মাত্রায় পরস্পরের সঙ্গে অন্ত্যমিল থাকে, এবং তা সাধারণত একটা দীর্ঘ অক্ষরমালা ও একটা হ্রস্ব— এমন আকার ধারণ করে; এমনটা: — ⌣ । কখনো কখনো অবশ্যতা তিনটি সংক্ষিপ্ত অক্ষরমালার আকার নেয়, যেমন: ⌣ ⌣ ⌣; কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শেষের অক্ষরটি হবে হ্রস্ব। সাধারণত, তবে সর্বত্র নয়, একাদশ এবং দ্বাদশ মাত্রাতেও দুটি হ্রস্ব অক্ষর ব্যবহৃত হয়। (জার্নাল অব রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৮৮২ খ্রি., পৃ.১৩০)।

কীর্তনিয়া নাট্যকারেরা এই ছন্দ 'দোহা' ও 'ছপ্পয়'-এর সঙ্গে প্রভূতভাবে ব্যবহার করেছেন।

(২) বর্ণবৃত্তক ছন্দ

(১) শিখরিণী, (২) মালিনী, (৩) বসন্ততিলক, (৪) ভুজঙ্গপ্রয়াত, (৫) দ্রুতবিলম্বিত, (৬) শার্দূলবিক্রীড়িত, (৭) মন্দাক্রান্তা, (৮) তোটক, (৯) বংশস্থ, প্রভৃতি।

এইগুলি হলো উত্তর ভারতীয় জনভাষায় ব্যবহৃত পরিচিত ছন্দের তালিকা। তবে হালের আমলে অন্যান্য ভারতীয় ভাষাসমূহ থেকে যে ছন্দগুলি এসেছে, যেমন 'পয়ার', কিংবা ইংরেজি থেকে যেগুলি গৃহীত হয়েছে যেমন মুক্তকছন্দ কিংবা অমিত্রাক্ষর ছন্দ— এগুলির প্রয়োগেও মৈথিলী কবিতার কাব্যগুণের বৃদ্ধিই ঘটেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রাচীন মৈথিলী সাহিত্য

১. প্রাচীনতম নিদর্শন (৮০০-১৩০০ খ্রি.)

একথা জানা যায় যে, কিভাবে এবং কোন সময়ে মৈথিলী সাহিত্যের জন্ম প্রকৃতপক্ষে হয়েছিল। ৯০০ খ্রিষ্টাব্দে এসে মৈথিলী মাগধী প্রাকৃত থেকে পৃথক হয়ে একটি স্বতন্ত্র ভাষারূপে দেখা দিল। আমরা মৈথিলী সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ দর্শন পাচ্ছি ১৩২৪ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে। মিথিলায় কর্ণাট রাজাদের উৎপত্তির ফলে, নান্যদেব (১০৯৭ খ্রি.) থেকে হরিসিংহদেবের (১৩২৪ খ্রি.) শাসনকালের মধ্যে, সমস্ত দেশ জুড়ে সঙ্গীত চর্চার ঢেউ উঠেছিল । সম্ভবত এই সময়েই মৈথিলী ভাষা সঙ্গীতের সহচরী হিসেবে স্থান করে নিয়েছিল। ৯০০ খ্রি. থেকে ১৩০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে মৈথিলীর উদাহরণ খুব বেশি পাওয়া যায় না; তবু যা কিছু পাওয়া যায় সেগুলিকে বিশেষভাবে খুঁটিয়ে দেখা দরকার।

এইসব উদাহরণগুলির মধ্যে যা প্রাচীনতম তা হলো স্থান ও মানুষজনের নাম, যা প্রাচীন পঞ্জিকা নথি বা বিবরণীতে পাওয়া যায়; কিন্তু আজও পর্যন্ত এগুলি নিয়ে গবেষণা হয়নি। তাছাড়া দেখা গেছে সংস্কৃত রচনাকারেরা অসাধারণ সব শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেশীয় ভাষার প্রয়োগ করেছেন। যেমন, বাচস্পতি মিশ্র ১ম (নবম শতক ?) তাঁর 'ভামতী'তে[১] প্রয়োগ করেছেন একটি শব্দ: 'হড়ি' এবং বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দ (১১ শতক) প্রায় চারশো মৈথিলী শব্দ ব্যবহার করেছেন তাঁর 'অমরকোষ'এ[২]। এই ঐতিহ্য চালু হয়ে গেছিল ও চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকের লেখকদের মধ্যেও— যেমন চণ্ডেশ্বর ঠাকুর[৩], রুচিপতি[৪], জগদ্ধর[৫], বাচস্পতি-২[৬] ও বিদ্যাপতি ঠাকুর[৭]।

---

১. নির্ণয়সাগর সম্পা., পৃ. ২৭০; ১.৩.১।

২. দ্র. ড. সুভদ্র ঝা : 'মৈথিলী ওয়ার্ড্স ইন সর্বানন্দ'জ অমরকোষ' অ্যানালস্ অব ভান্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, সং ২১, পৃ. ১০৬ পা. টী., সুকুমার সেন, 'নিউ ইন্দো-এরিয়ান ভোকাবল্স ইন সর্বানন্দ'জ টীকাসর্বস্ব', ইন্ডিয়ান লিংগুইস্টিক্স ৮, পৃ. ১২৬ (১৯৪০)।

৩. দ্র. ম. ম. ড. উমেশ মিশ্র-র 'চণ্ডেশ্বর ঠাকুর অ্যান্ড মৈথিলী', এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, পৃ. ৩৪৯-৩৫৭।

৪. দ্র. 'মৈথিলী ওয়ার্ডস অব দি ফিফ্টিনথ্ সেঞ্চুরি', জার্নাল অব বিহার অ্যান্ড ওড়িশা সোসাইটি, ১৯২৮, পৃ. ২৬।

৫. দ্র. পাদটীকা ৪।

৬. বাচস্পতি মিশ্রের 'তত্ত্বচিন্তামণি'র ড. উমেশ মিশ্র-কৃত (বরোদা, পৃ. ২২) ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৭. ড. উমেশ মিশ্র 'বিদ্যাপতি ঠাকুর' গ্রন্থে (পৃ. ১৭৯) যেমনটি উল্লেখ করেছেন 'দানবাক্যাবলী'তে উল্লেখ আছে।

সাহিত্যরূপে যে রচনাসমগ্রের কথা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তা হলো 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'[১]। প্রাচীন মৈথিলীর উদাহরণরূপে এই 'গান'গুলির দাবি সর্বাগ্রে, যদিও কেউ তার ভাষাকে বলেছেন প্রাচীন বাংলা[২], কেউ বা বলেছেন প্রাচীন অসমীয়া[৩] বা প্রাচীন ওড়িশা[৪] মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯১৬ সালে নেপালে এই পুঁথির আবিষ্কার করেন এবং এগুলিকে প্রাচীন বাংলাভাষার উদাহরণরূপে বর্ণিত করেন। এগুলিতে তিন ধরনের পাঠ পাওয়া যায়: (ক) চর্য্যাচর্য্য বিনশ্চয়, (খ) দোহাকোষ এবং (গ) ডাকার্ণব। দোহাগুলি মূলত অপভ্রংশে লেখা তবে 'চর্যাগীতি' ও 'ডাকার্ণব' মূলত দেশীয় ভাষায় (মৈথিলী) রচিত।

মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রীর পাঠ অনেক ক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণ এবং অসঙ্গতিপূর্ণ ছিল। তা ছিল মূলত ভ্রান্তিময়। ইদানীং ড. পি. সি বাগচি এবং ড. শহীদুল্লাহ্ বেশ কিছুটা হারানো পাঠের পুনর্নির্মাণ ও পুনরুদ্ধার করতে পেরেছেন 'তঞ্জুর'-এর তিব্বতী অনুবাদের সাহায্যে।

'চর্যাগীতি (= আচার্য অথবা অধ্যাপকের গীতি) যে প্রাচীন মৈথিলীরই উদাহরণ, সে বিষয়ে বেশ জোরের সঙ্গে বলেছেন রাহুল সাংকৃত্যায়ন[৫], ড. পি. কে. জয়সওয়াল[৬], মহামহোপাধ্যায় ড. উমেশ মিশ্র[৭], শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাস[৮], ড. সুভদ্র ঝা[৯], এবং শ্রীশিবনন্দন ঠাকুর[১০]। এগুলিকে মৈথিলী বলে মেনে নেওয়ার পিছনে যে যুক্তিগুলি দেখানো হয়েছে তা সংক্ষেপে এভাবে আর একবার বলা যায় :

(১) এই পদগুলিকে প্রাচীন মৌথিলীর উদাহরণ হিসাবে মেনে নেওয়ার সপক্ষে প্রথম যুক্তি হলো[১১] এই যে, যে সিদ্ধারা এই পদগুলির রচনা করেন তাঁদের অধিকাংশই বিহারে

১. দ্র. ড. জয়ধারী সিংহের 'বৌদ্ধ গান মে তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত' যা এই বিষয়ে মৈথিলীতে প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ গবেষণাকর্ম।

২. দ্র. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'হিস্ট্রি অব্ বেঙ্গল ১' (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) এবং 'অরিজিন অ্যান্ড ডেভলপ্‌মেন্ট অব দি বেঙ্গলি ল্যাংগুয়েজ'।

৩. যেমন বাণীকান্ত কাকতির 'ফর্মেশন অব্ অ্যাসামীজ ল্যাংগুয়েজ' (পৃ. ৮-৯) এবং বরুয়া : 'আর্লি হিস্ট্রি অব্ কামরূপ' (পৃ. ৩১৮)।

৪. দ্র. প্রাহরাজ, 'প্রসিডিংস অব্ অল ইন্ডিয়া ওরিয়েন্টাল কনফারেন্স ৬ (পৃ. ৩৭২-৩৮১) এবং প্রিয়রঞ্জন সেন, (বি. সি.) 'ল কোমেমরেশান ভল্যুম' ২, পৃ. ১৯৭ পা. টী.।

৫. 'গঙ্গা', ৩.১, পৃ. ৫৪৫ এবং 'পুরাতত্ত্বনিবন্ধাবলী' (ইন্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ), পৃ. ১৬৭।

৬. 'প্রসিডিংস অব অল ইন্ডিয়া ওরিয়েন্টাল কনফারেন্স ৭, সভাপতির অভিভাষণ।

৭. মৈথিলী সাহিত্য পরিষদ, যোঁঘরডিহাতে দেওয়া সভাপতির ভাষণ দ্রষ্টব্য।

৮. দ্র. 'মিথিলা-মিত্র', ১৯৩০-১।

৯. দ্র. ফর্মেশন অব দি মৈথিলী ল্যাংগুয়েজ'।

১০. দ্র: 'বিদ্যাপতি কী ভাষা' পৃ. ২০৮ পা. টী.

১১. পৃ. ৫৭ (৬৬ খ)।

বাস করতেন। গ্রুনওয়েডেল, কার্ডিয়াল, মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী এবং রাহুল সাংকৃত্যায়ন প্রমুখ সব বিশেষজ্ঞরাই মেনে নিয়েছেন যে এঁরা মগধদেশেই উদ্ভূত হয়েছেন এবং এঁরা হয় বিক্রমশীলা নয় নালন্দার বিহারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রাচীনতম গদ্যগ্রন্থ 'বর্ণ- রত্নাকর'-এ যেমনভাবে প্রত্যেকের পূর্ণনাম কথিত হয়েছে যে তাতে বোঝা যায় যে এই সিদ্ধারা মিথিলায় সুপরিচিত ছিলেন।

(২) সিদ্ধাদের রচনা 'দোহাকোশ'[১]-এব ভাষা অপভ্রংশেরই একটি রূপবিশেষ, কিন্তু তার সঙ্গে 'কীর্তিলতা' 'কীর্তিপতাকা', 'বর্ণরত্নাকর' এবং 'বিশুদ্ধ-বিদ্যাপতি-পদাবলী'র ভাষার সাদৃশ্য দেখা যাচ্ছে প্রচুর। কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসাবে উল্লেখ করা যায় দন্ত্য 'স'-ধ্বনির প্রমুখস্থান, করণের এক বচনে এঁ-র ব্যবহার, চন্দ্রবিন্দুর একটি পরিসর্গরূপে ব্যবহার; সম্বন্ধ সূচক শব্দ রূপে '- ক' এর ব্যবহার; অধিকরণে '- হি', '- এঁ' এবং 'এ'-রও প্রযোগ; 'ময়ী' (কাহ্ন ৩১), 'জে', 'এহু', 'তসু', 'অপ্পন' (সরহ ৪.৬) প্রভৃতি সর্বনামের ব্যবহার; অনুজ্ঞাসূচক শব্দ রূপে '-হ্', '-হি', কিংবা '- উ' এর ব্যবহার; বর্তমান কালের প্রথমপুরুষের একবচন রূপে '-ই' এর ব্যবহার; 'জহি', 'তেহি', 'তেহি-খনে', 'তা' প্রভৃতি অব্যয়ের ব্যবহার; এবং অবশ্যই — খাঁটি মৈথিলী প্রবাদবাক্য বা শব্দের ব্যবহার।

(৩) 'চর্যাপদ-এর রূপতাত্ত্বিক দিকটির কথা যদি বাদও দেওয়া যায়, শুধুমাত্র ধ্বনিবিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও মৈথিলীর সঙ্গে তার অদ্ভুত সাম্য দেখা যায়। দুই ক্ষেত্রেই শব্দের শেষের আগের স্বরে (সিলেবলে) বলাঘাত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে অথবা বলাঘাত আসছে শেষ দীর্ঘ স্বরের ওপর, এমন স্বরধ্বনি যা শেষের থেকে তৃতীয়ের চেয়ে বাঁদিকে আসতে পারবে না।

> বাংলাতে অবশ্য এই দ্বিতীয় ধরনের বলাঘাত দেখতে পাওযা যায শুধুমাত্র শিলালেখর বেলাতেই (দ্র. চ্যাটার্জী, ২৮০ পৃ., পা. টী.) যদিও মৈথিলীতে এই দুই ধরনের বলাঘাতই দেখতে পাওয়া যায় ব. র-তেই (= বর্ণ-রত্নাকরেই) ও বিদ্যাপতির পদাবলীতেও। যাই হোক, শুধু বলাঘাতের ওপর নির্ভর ক'রে খুব কম কথাই বলা যায় যে চর্যাগুলি বাংলাতে লেখা না মৈথিলীতে[২]।

(৪) শব্দতত্ত্বের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে :

(ক) বিশেষ্যপদের শব্দরূপ

(এক) মৈথিলীতে তিনটি কর্তৃপদেরই উপস্থিতি রয়েছে— হ্রস্ব, দীর্ঘ ও অতিরিক্ত - - যা বাংলার[৩] পক্ষে বিজাতীয় রূপভেদ।

১. মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও পি. সি. বাগচী মহাশয় দ্বারা সম্পাদিত (প্রথম খণ্ড মাত্র); কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত।

২. ড. সুভদ্র ঝা, 'দ্য ফর্মেশন অব দ্য মৈথিলী ল্যাংগুযেজ'।

৩. ঐ; কিন্তু ড. চ্যাটার্জী বলেছেন— "না; উদা: রম, রমুয়া, রমিয়া।"

(দুই) করণে — এঁর ব্যবহারও অদ্ভুতভাবে মৈথিলীরই বৈশিষ্ট্য।

(তিন) কখনো কখনো যে সম্বন্ধসূচক-ক্ পাওয়া যাচ্ছে তা বাংলাতে নেই বললেই চলে, অথচ মৈথিলীতে এটিই স্বাভাবিক রূপ। অন্য সম্বন্ধ-সূচক রূপগুলি, যেমন -এর, -অর, -কের, -এরই[১] প্রভৃতি প্রাচীন মৈথিলীতে[১] ছিল খুবই সহজপ্রাপ্য এবং আধুনিক মৈথিলীতেও - কর এবং -কের রূপগুলি টিঁকে আছে। প্রকৃতপক্ষে - এর এবং - এরই সর্বনামের সম্বন্ধসূচক রূপ হিসেবে বাংলা ও মৈথিলী (যেমন ভোজপুরী, অসমীয়া প্রভৃতি) ছাড়াও আরো বহু ভাষাতেও পাওয়া যায়[২]।

(চার) কারক-বিভক্তির চিহ্ন রূপে চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার বিশেষ করে মৈথিলীরই বিশিষ্টতা[৩]।

(পাঁচ) "চর্যাগুলিতে অধিকরণের নির্দেশক রূপে - ত-এর ব্যবহারে প্রথমে মনে হয় বাংলার সঙ্গেই এর যোগকে প্রমাণ করছে। কিন্তু প্রাচীন মৈথিলীতে এই - ত-এর দীর্ঘতম রূপটি পাওয়া যাচ্ছে, যেমন পূর্বী মৈথিলীতে আজও তা পাই সহজেই ব্যবহার হতে। বাংলাতেও সাহিত্যিক ভাষায় রূপটি হলো - তে এবং - ত-এর প্রয়োগ মাত্র কয়েকটি উপভাষাতেই সীমিত রয়েছে আসলে এটি সম্পূর্ণ উত্তরস্থ, কেন্দ্রীয় ও পূর্বী মাগধ অঞ্চলের অধিকরণ-এর নির্দেশক মাত্র—যা অসমিয়াতেও পাওয়া যায় (চ্যাটার্জি,পৃ. ৭৫০)।"[৪]

(ছয়) করণে - তেঁ-র ব্যবহারে বর্ণরত্নাকরের সঙ্গে মিল পাওয়া যাচ্ছে।

(খ) সর্বনামের শব্দ-রূপ

প্রাচীন মৈথিলীর প্রথম পুরুষ একবচন, মধ্যম পুরুষ একবচন, ও উত্তম পুরুষে ব্যবহৃত রূপগুলি চর্যাপদে বহুবার পাওয়া যায় — অধিকাংশ ক্ষেত্রেই।

(গ) ক্রিয়া-রূপ ও তৎসম্পর্কিত অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

(এক) চর্যাতে প্রাপ্ত ক্রিয়ামূল থাক ও আছ প্রাচীন মৈথিলীতে সহজেই পাওয়া যায়; যদিও আধুনিক মৈথিলীতে দ্বিতীয়টির ব্যবহারই বেশি সহজলভ্য; এই পর্বে প্রথমটির বদলে প্রয়োগ করা হচ্ছে থিক।

(দুই) " -উ দিয়ে যে ক্রিয়াগুলি পাওয়া যায় চর্যায় ব্যবহৃত ক্রিয়ার অতীত কালে, তা বাংলাতে এবং প্রাচীন মৈথিলীতে — দুই ভাষাতেই আছে। ড. সুনীতিকুমার চ্যাটার্জী

১. 'বিদ্যাপতি কী ভাষা', পৃ। ৩০-এ দেওয়া উদাহরণ দ্রষ্টব্য — এবং বিদ্যাপতি পদাবলীর সব পাণ্ডুলিপিই।

২. ড. সুভদ্র ঝা, দ্র. পৃ. নি.।

৩. 'বিদ্যাপতি কী ভাষা', পৃ. ৯।

৪. ড. সুভদ্র ঝা, দ্র. পৃ. নি.।

চর্যাতে এগুলির উপস্থিতির জন্য দায়ী করছেন পশ্চিমা ভাষাগুলির প্রভাবকে, কিন্তু প্রাচীন মৈথিলীতে এইসব বৈশিষ্ট্যগুলি খুবই সাধারণ। র র-তে এটি একটি অকৃত্রিম প্রাচীন মৈথিলীর রূপ।''

(তিন)'' উত্তম পুরুষ একবচনের -ত্তি রূপটি চর্যাতে এবং বিদ্যাপতিতেও খুব সহজলভ্য ছিল, কিন্তু বাংলাতে এটি পাওয়া যায় না; অথচ চর্যাতে ব্যবহৃত উত্তম পুরুষের নির্দেশিকা -থি বাংলার পক্ষে বিভাষীয় বৈশিষ্ট্য বিশেষ। যদিও মৈথিলীর পক্ষে সহজাত।''

(চার) নিমিত্তবাচক ক্রিয়া-রূপ হিসাবে -অব-এর ব্যবহার ছিল মৈথিলীতে সাধারণ ব্যাপার।

(পাঁচ) কর্মবাচ্যে ব্যবহৃত ইয়-রূপটির বিদ্যাপতিতে সহজেই দেখা যায় (অবশ্য তাতে অ-এর সঙ্গে -ইয়- রূপটির একটা রূপভেদ দেখা যাচ্ছে, যা ধ্বনি বৈজ্ঞানিক পরিবর্তনের জন্যই হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে এটি - এ হয়ে যাচ্ছে)।

(ছয়) -ইল এবং ইব রূপগুলি যথাক্রমে অতীত ও বর্তমান কালের ক্ষেত্রে আপাত দৃষ্টিতে অ-মৈথিলী বৈশিষ্ট্য বলে মনে হয়, কিন্তু প্রাচীন মৈথিলীতে তা খুবই বেশি পাওয়া যায়, যেমন পাওয়া যাচ্ছে 'বর্ণরত্নাকর' এবং 'কীর্তিলতা'-তেও এবং ''(আধুনিক মৈথিলীর) চিকা চিকী উপভাষাতেও— সেই স্থানে যেখানে প্রাচীন বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল একদা, যার অধ্যাপকেরাই এইসব গীতগুলি রচনা করেছিলেন।'' (ড. সুভদ্র ঝা)

(সাত) ''এছাড়া, প্রাচীন সকর্মক ক্রিয়া থেকে যে কৃদন্ত অতীতের নতুন ক্রিয়ারূপ জন্ম নেয় তা কর্তৃকারকের লিঙ্গ পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বদলে যায়। প্রাচীন থেকে আধুনিক মৈথিলী অবধি মৈথিলীর এই বৈশিষ্ট্যটিই বজায় আছে। বাংলার ক্ষেত্রে কখনোই তা হয়নি।'' এছাড়াও ''প্রাচীন সকর্মক ক্রিয়ার কৃদন্ত অতীত থেকে পাওয়া ক্রিয়া-রূপগুলি কর্মকারকের সঙ্গে লিঙ্গে সমরূপতা আনে চর্যায় বহু স্থানেই। প্রাচীন মৈথিলীতেও এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।''

(আট) অনুজ্ঞা সূচক মধ্যম পুরুষে ব্যবহৃত হু স্পষ্টতই মৈথিলীতে আজও ব্যবহৃত একটি ক্রিয়া রূপ।

(নয়) ''মৈথিলীতে এবং চর্যাতেও সংযোজক ক্রিয়ার নির্দেশক - ই রূপ পাওয়া যায়-- বাংলার মতো নয় যেখানে হেনাক -এর নে বরং ক্রিয়ার পরে পাওয়া যায়।''

(ঘ) লিঙ্গ

(এক) স্ত্রী লিঙ্গের বিশেষ্য পদের সঙ্গে ক্রিয়ার এবং বিশেষণের স্ত্রীলিঙ্গ - রূপ ব্যবহৃত হয় চর্যাতেও এবং প্রাচীন মৈথিলীতেও।

(দুই) 'আগ' (= আগুন) চর্যা ৪৭-এ এবং প্রাচীন মৈথিলীতে স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

(ঙ) ক্রিয়াবিশেষণ বা অব্যয়-রূপ

'বর্ণরত্নাকরএ' 'কইসন', 'জইসন' প্রভৃতির ব্যবহার প্রচুর মাত্রায় দেখা যায়, 'বিদ্যাপতির পদাবলীতে'ও। কিন্তু বাংলায় এগুলি একেবারেই অজানা।

(চ) চর্যায় ব্যবহৃত বেশ কয়েকটি প্রবাদ ও বাগধারা আধুনিক মৈথিলীতেও পাওয়া যায়।

(ছ) শব্দাবলী

যদিও চর্যায় ব্যবহৃত বহু শব্দই প্রায় সমস্ত মাগধী ভাষাগুলিতেই পাওয়া যায়— তবু বেশ কিছু খাঁটি মৈথিলী শব্দ রযেছে চর্যাগীতিতে যেগুলির দিকে দৃষ্টি দেওয়া অবশ্যই কর্তব্য।

(৫) যেমনটা ম. ম. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দেখিয়েছেন, স্থানীয় রঙ এবং প্রতীকের ব্যবহারে চর্যাগুলির সঙ্গে নদীপথ ও নৌকার একটা যোগাযোগ দেখতে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে মিথিলার অন্য নাম 'তিরভুক্তি'-র কথা তোলা সম্ভব— অথবা এই তথ্যের কথা যে প্রাচীনকালে মিথিলা মাত্র একটা জলাভূমি রূপে পরিচিত ছিল (জলোদ্ভবা) এবং তাকে মানুষের বাসযোগ্য করার জন্য দরকার হলো 'অগ্নি'-র যা বিদেঘ মাথব নিয়ে এলেন, উল্লেখনীয় 'বর্ণরত্নাকর'-এর বিস্তারিত আলোচনা এবং নৌকা ও নদী প্রসঙ্গে এবং এই দেশের ভূগোলে নদীমাতৃকতার প্রাধান্য। চর্যার মধ্যে রাখাল বালকের জীবনের থেকে নেওয়া প্রতীকের প্রাচুর্যও মিথিলার পক্ষেই স্বাভাবিক যেখানে 'গোয়ার' বা 'গোপ'-জনের আধিক্যই ছিল বিশেষ লক্ষণীয় এবং যেখানকার দই ও দুধ ঐতিহ্যগতভাবে বিখ্যাত ছিল।

(৬) এটা সত্যি যে বৌদ্ধিক চিন্তাধারা সরাসরিভাবে মিথিলার চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেনি। কিন্তু এইসব সিদ্ধাদের— যাঁরা মিথিলার দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে উদ্ভূত হয়েছিলেন গোষ্ঠীগতভাবে— নিজেদের শিক্ষার প্রসারের জন্যে তদ্দেশীয় ভাষার ব্যবহারে কারুর বাধাই ছিল না। আজকে আমরা যা জানি সেই তুলনায় হতে পারে মিথিলার নিম্ন শ্রেণীর মানুষের কাছে এই পাঠের গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি ছিল যার ফলে এই প্রদেশের ব্রাহ্মণ্য চিন্তাধারাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই রচনা প্রয়োজন ছিল। তবে একথাও সত্যি যে মিথিলায় যে তান্ত্রিক সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় তা বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের ফলেই এসেছিল।

(৭) শেষত, একথা মনে রাখা দরকার যে চর্যার মৈথিলী সুলভ বৈশিষ্ট্যগুলিকে শুধুমাত্র নেপালী ও মৈথিলী লিপিকারদের দ্বারা আনীত পাঠের পরিবর্তন মাত্র নয়।

সংক্ষেপে বলা যায়, চর্যাপদের ভাষা বলতে, চিকা-চিকি উপভাষা অঞ্চলের একটি প্রাক-মৈথিলী উপভাষাকেই বোঝানো হবে — যা আদর্শ বাংলা ও আদর্শ মৈথিলীর ঠিক মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আছে— যার সঙ্গে প্রথমেই দেখছি মাগধী ভাষাগুলির একটা গভীর মিল রয়েছে (বিশেষ করে প্রাচীন বিশিষ্টতাগুলির ক্ষেত্রে)।

চর্যাপদের রচয়িতাগণ (৮০০ থেকে ১১০০ খ্রি. প্রায়)

এই পদগুলির রচনা করেন কিছু 'সিদ্ধারা'(বা সাধুরা) মিলে যাদের বলা হতো 'চুরাশি সিদ্ধা' অথবা 'বজ্রায়ন সাধু' যাঁরা মধ্যযুগের ভারতের প্রথম পর্বেব ধর্মীয় ইতিহাসে বিখ্যাত ছিলেন। বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে এর মধ্যে অধিকাংশ নামই ছিল খুবই বিখ্যাত এবং এদের দ্বারা লিখিত বহু সাধনাই প্রকাশিত হয় 'সাধনা-মালা'য়। "এইসব রচয়িতাদের জীবন-বিষয়ক বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে 'পাগ-সাম-জন-ঝান্' প্রভৃতি তিব্বতী রচনাতে— তারানাথের জেস্চিয়েস্ট (Geschieste) (১৫০০ শতক) এবং জর্মনে প্রকাশিত 'চুরাশি সিদ্ধার ইতিহাস' (History of 84 Siddhas) গ্রন্থে যা আর্থার গ্রুনওয়েডেল রচনা করেন।" "ভদন্ত সাংকৃত্যায়ন এঁদের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ইতিহাসের আবিষ্কার করেছিলেন (এবং তা থেকে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন) যা থেকে বোঝা যাচ্ছে এঁরা মগধের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর এই ঐতিহাসিক নিবন্ধটি ফরাসীতে অনূদিত হয় এবং 'জুরন্যাল এশিয়াটিক'এ প্রকাশিত হয়। ব্যক্তিগত ইতিহাসের এই পুনরাবিষ্কার থেকে আমরা এইসব লেখকেরা বা সিদ্ধা রচয়িতারা কিভাবে ক্রমবিকশিত হলেন তার একটা হদিশ পেতে পারি।" (এতেও চাটিল ও ঢেণ্ঢনপাদকে বাদ দিতে হবে যাঁদের উল্লেখ আমরা 'বর্ণরত্নাকর'-এও পাই)।

পরম্পরাগতভাবে লুইপাদকেই প্রথম সিদ্ধা বলা হয়, কিন্তু মনে হয় প্রাচীনতম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধা ছিলেন 'সরহ'। এঁদের শিষ্যদের এই ক্রমিক চিত্র থেকে রচয়িতাদের কালক্রমের বিষয়ে একটা সঠিক আন্দাজ পাওয়া যাবে :

(ক)

১. সরহপাদ (ধর্মপালের সমসাময়িক)

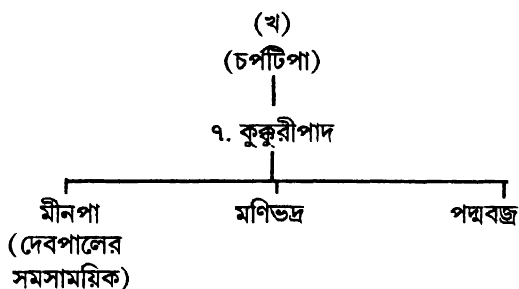
(নাগার্জুন) — ৯. আর্যদেব — ৪. কৃষ্ণাচার্য বা কাহ্নপাদ; মীনপা; ১৮. তন্ত্রী-পাদ বা তেন্তলপা ?
৪. কৃষ্ণাচার্য বা কাহ্নপাদ — ১৩.মহীধর (মহীপা ?) এবং মহীলপা); ১৯. ভদেপা; ১০.বীণাপাদ — ডোম্বীপাদ

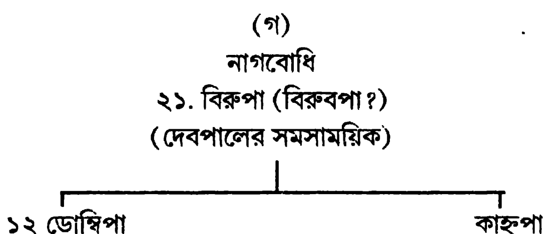
(জালন্ধর বা দড়িপা ?)

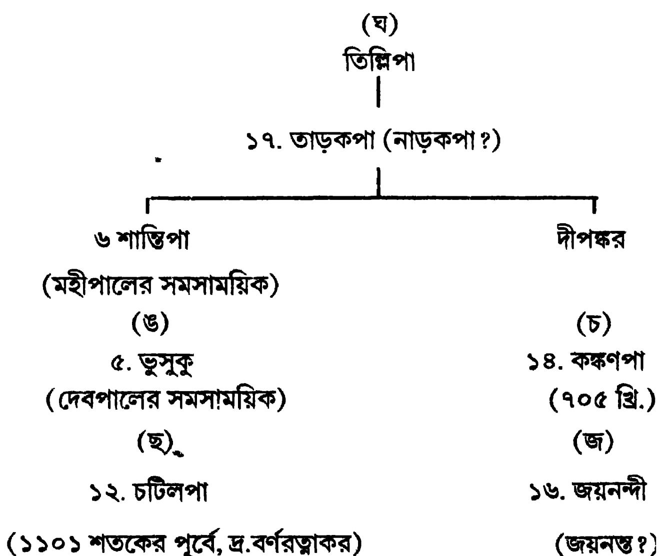
(?) — (লীলাপাদ) — ২১.গুঞ্জরীপাদ (ধর্মপাদ ?) — ৮. (গুড্ডরী বা গুণ্ডরী ? — (হালীপাদ)

(?) — (?) — ভদ্রপাদ — বীণাপা

২. শবরপাদ — ৩. লুইপাদ (ধর্মপালের সমসাময়িক) — ১২. ডোম্বী-পাদ; ১১.দরিঙ্কপা (দদিপা ?) — (ঘণ্টাপাদ, দেবপালের সমসাময়িক) — ১৫. কম্বলপাদ


(খ)
(চর্পটিপা)
৭. কুক্কুরীপাদ
মীনপা
(দেবপালের
সমসাময়িক)
মণিভদ্র
পদ্মবজ্র


(গ)
নাগবোধি
২১. বিরুপা (বিরুবপা?)
(দেবপালের সমসাময়িক)
১২ ডোম্বিপা
কাহ্নপা


(ঘ)
তিল্লিপা
১৭. তাড়কপা (নাড়কপা?)
৬ শান্তিপা
(মহীপালের সমসাময়িক)
দীপঙ্কর
(ঙ)
৫. ভুসুকু
(দেবপালের সমসাময়িক)
(চ)
১৪. কঙ্কণপা
(৭০৫ খ্রি.)
(ছ)
১২. চটিলপা
(১১০১ শতকের পূর্বে, দ্র.বর্ণরত্নাকর)
(জ)
১৬. জয়নন্দী
(জয়নন্ত?)

(ঝ)

ঢেণ্ঢনপা (১১০০ ?-এর পূর্বে ও দ্র. বর্ণরত্নাকর)

(এইখানে উল্লেখযোগ্য এই 'ঢেণ্ঢনপা' কোনোমতেই তন্তলপা বা তন্ত্রেপাদ হতে পারেন না, কারণ শেষোক্তনামদুটি সমসাময়িক ভাবে 'বর্ণরত্নাকর'-এ অন্তর্ভুক্ত ছিল।)

সবমিলিয়ে এই ২২ অথবা ২৩ জন চর্যা সিদ্ধারা জীবিত ছিলেন ধর্মপাল (৭৬৯-৮০৬ খ্রি.), দেবপাল (৮০৯-৮৪৯ খ্রি.) এবং মহীপাল (৯৭৪-১০২৬ খ্রি.) — এই সব পাল রাজাদের আমলে যাঁরা মগধ ও মিথিলার ওপরেও রাজত্ব করতেন। 'চর্যাপদ'গুলি তাই ওঁদের সক্রিয়তা যে অঞ্চলে দেখা গিয়েছিল, সেখানেই রচিত হয় — অর্থাৎ, বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে সৃষ্ট হয়েছিল সাধারণ মানুষের কথ্যভাষায় বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য। বর্তমানে যে চর্যাগুলি পাওয়া যায় তা হলো কাহ্নর ১৩টি পদ, ভুসুকুর ৮টি, সরহর ৪টি, কুক্কুরিপার ৩টি এবং লুই, শবর, ও শান্তির ২টি করে এবং বাকি সবার ১ টি করে মাত্র।

'চর্যাপদ'-এর দর্শন নিয়ে আলোচনা করা এই গ্রন্থের পরিধির মধ্যে সম্ভব নয়। স্বভাবতই এগুলি রহস্যময় ভাবের উদ্রেক করে এবং এই রহস্য ও দুর্বোধ্যতা আরো বেড়ে গেছে পাঠের বিকৃতির কারণে, যার জন্য দায়ী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় লিপিকর নয় সম্পাদক। "এই (কবিতা)-গুলির বিষয়বস্তু . . . অতি অলৌকিক, যার কেন্দ্রে রয়েছে একটি অতীন্দ্রিয়বাদী দর্শন এবং তান্ত্রিক ও যৌনতামূলক তত্ত্ব ও ব্যবহারসকল যা . . . পরবর্তীকালের বৌদ্ধধর্ম-দর্শন থেকে এসেছে। এর ওপর সংস্কৃতে রচিত টীকাও যেন অত্যন্ত কঠিন প্রযুক্তিকতার ছাপ বহন করে ভাষাগত ভাবে, পাঠগুলিকে বুঝতে বা অর্থভেদ করতে সাহায্য করে না আধুনিক পাঠকের কাছে, যদিও তাতে একই ধরনের সংস্কৃত রচনার থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দেওয়া হয়।" ড. জয়ধারী সিন্হা ইদানীং সেগুলির ব্যাখ্যা করেছেন এবং এগুলির সামাজিক ও ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন।

এইসব পদগুলি একটা বিশেষ সাংকেতিক ভাষায় লেখা যা "চরিত্রগত দিক থেকে 'সান্ধ্যভাষা' বলা যায়"। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী পাঠের সাহায্যে দেখান যে এই কথাটিকে শুদ্ধ করে বলতে হবে 'সান্ধ্য ভাষা' অর্থাৎ 'পরিকল্পিত ভাষা', মোটেই 'গোধূলিকালের ভাষা' নয় যা ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছিলেন এবং যা আজও অনেক বিদ্বান মনে করে থাকেন। চর্যাপদের তিব্বতী অনুবাদ এবং টীকা থেকে এখন একথা আরো স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী যা বলেছেন তা-ই ঠিক।

মৈথিলী সাহিত্যের ইতিহাসে 'চর্যা'গুলির গুরুত্ব ছিল অসাধারণ কেননা এগুলি যেন সংস্কৃত উদ্ভট কবিতা এবং অপভ্রংশ বা নব্যভাষার পদাবলী কবিতার মধ্যে একটি যোগসূত্র রচনা করেছে ('পদ' হলো, একটি দশ-পংক্তির ছোট কবিতা যার সঙ্গে রাগ-প্রভৃতির নির্দেশ রয়েছে, যা গীত হতে পারে)।

প্রাচীন মৈথিলী অবহট্‌ঠ উদাহরণসমূহ
(১১০০-১৩০০ খ্রি.)

'প্রাকৃত', 'অপভ্রংশ' ও 'অবহট্‌ঠ' — এই নামগুলির অর্থনির্ণয় ও প্রয়োগ নিয়ে অনেক অনিশ্চয়তা ও ভ্রম আছে।[১] অনেক সময় একে অন্যের জন্য ব্যবহার করা হয় অথবা ভাষিক প্রগতির একাধিক পর্বের জন্যই ব্যবহৃত হয় — এমন কি অনেক সময় আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির জন্য প্রযুক্ত হয়। কিন্তু যখন এগুলি সাবধানে এবং স্পষ্টত ভিন্নার্থে ব্যবহৃত হয় তখন মনে হয় এই তিনটি ভাষার তিনটি স্তরের প্রতি ইঙ্গিত করে :

(ক) 'প্রাকৃত' হলো এগুলির মধ্যে প্রাচীনতম স্তর যা বররুচি ও হেমচন্দ্রের ব্যাকরণে বর্ণিত হয়েছে এবং তার প্রকারভেদ হলো শৌরসেনী, মহারাষ্ট্রী, মাগধী প্রভৃতি আর এগুলির কাল হলো নিশ্চিতরূপেই ৭০০ খ্রি.-এর আগে। এগুলির মধ্যেই পালি এবং অর্ধমাগধীকে যোগ করেতে হবে।

(খ) 'অপভ্রংশ' হলো এর পরের স্তর যা বিশেষ করে জৈন লেখকেরা খুব ব্যবহার করেছেন এবং যার পশ্চিমা ও পূর্বী দুটি মুখ্য রূপ আছে এবং যা মোটামুটিভাবে সর্বভারতীয় সাহিত্য-মাধ্যম রূপে গড়ে উঠেছিল এবং যার কাল হলো ৭০০ থেকে ১১০০ খ্রিষ্টাব্দ।

(গ) 'অবহট্‌ঠ' হলো নব্যভাষাগুলির সর্বশেষ স্তরের আগের স্তর — যে ভাষাকে বিদ্যাপতি তাঁর রচনা-মাধ্যম হিসবে ব্যবহার করেছিলেন, এবং যার সঙ্গে তৎকালের কথ্য দেশীয়ভাষাগুলির খুবই মিল ছিল। এই ভাষার কালসীমা মোটামুটিভাবে বলা যায় ১১০০-১৩০০ খ্রি.। এই সময়েই কথ্যভাষা ও নব্যভারতীয় ভাষাগুলি সাহিত্যিক ভাষা হওয়ার সম্মান লাভ করে।

এখন মৈথিলী অবহট্‌ঠের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ — যা অদ্যাবধি পাওয়া গেছে, তা হলো বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতা' (১৩৭০ খ্রি.) এবং 'কীর্তিপতাকা' (১৪১৪ খ্রি.)। মনে রাখতে হবে এগুলি সাহিত্যের মাধ্যম রূপে মৈথিলীর পুরোপুরি ব্যবহার শুরু হওয়ার অনেক পরে লেখা হয়েছিল। এর আগের পর্বের খুব কম উদাহরণই আমাদের হাতে এসেছে। হতে পারে এর অনেকগুলিই এখনও পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলি আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

মৈথিলী অবহট্‌ঠের প্রাচীনতম উদাহরণ হলো বিনয়শ্রীর কবিতা[২]। এইগুলি সংখ্যায় মাত্র ১৫টি এবং এগুলিতেও চর্যা'র মতোই এক ধরনের গূঢ় ও রহস্যময় বক্তব্য রয়েছে। সহজগ্রাহ্য শৈলী অথচ প্রাচীন ব্যাকরণ এবং তার সঙ্গে জুটেছে নির্ভুল মৈথিলীর ভাবপ্রকাশ ও ভঙ্গিমা, উপরন্তু গ্রামদেশের জীবনের বিমল ছবি— সব এই গীতিকবিতার ঐতিহ্যে লেখা রয়েছে এতে, যার ফলে 'চর্যাপদ'-এর থেকে এগুলিকে পৃথক করে সহজেই চিনে

১. দ্র. ভোলাশঙ্কর ব্যাস (বারাণসী), সম্পা. 'ইনট্রোডাক্‌শান টু প্রাকৃত-পৈঙ্গলম', দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৬২, পৃ. ৭১, ৯২।

২. পণ্ডিত রাজেশ্বর ঝা-র 'মৈথিলী সাহিত্যিক আদিকাল' গ্রন্থের সংকলনরূপে পুনর্মুদ্রিত, পৃ. ৭।

নেওয়া যায়। সাহিত্যিক গুণের দিক থেকে অবশ্য এগুলি 'চর্যাপদ'-এর থেকে নিম্নতর মানের।

বিনয়শ্রীর কবিতাগুলির রাহুল সাংকৃত্যায়ন তিব্বতে গিয়ে প্রাচীন তালপত্র পাণ্ডুলিপিতে আবিষ্কার করেন। বিনয়শ্রী মূলত বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিবাসী ছিলেন, যিনি ১২০৩ খ্রিষ্টাব্দে তিব্বতে পালিয়ে গিয়েছিলেন পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে।

আরো মূল্যবান উদাহরণ পাওয়া যায় মৈথিলী অবহট্‌ঠের ' প্রাকৃত পৈঙ্গলম্' নামক বিখ্যাত অবহট্‌ঠ সংকলন থেকে— "এতে আছে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত অত্যন্ত জনপ্রিয় গান এবং কবিতা যা ৯০০-১৪০০ খ্রিষ্টাব্দ সুপরিচিত ছিল।"[১] এর মধ্যে কিছু কিছু কবিতা বাংলায় লেখা হয়েছিল বলে ধরা হয়।

এই সংকলনে কিছু কিছু অজ্ঞাত কবিতা আছে যেগুলিকে মৈথিলী বলে চিনে নিতে কষ্ট হয় না। এর মধ্যে একটি কবিতা (সং ১০৮) বিদ্যাপতির পূর্বজ চণ্ডেশ্বর ঠাকুরের প্রশংসায় লেখা— যিনি ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন এবং এই কবিতাটি ধরা হয় হরিব্রহ্ম লিখেছিলেন। কখনো এই গ্রন্থের সংকলন ও পরিমার্জনের শ্রেয় দেওয়া হয় এই হরিব্রহ্মকে (বা হরিহরকে)— যিনি রবিকরের পিতা ছিলেন। এই রবিকরই ১৪ শতকের শেষে এই সংকলনের একটি টীকা রচনা করেন, এখানে প্রচুর শব্দ ও গানের সুর চারিত্রিক দিক থেকে মৈথিলীই এবং এগুলির একটা বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ হওয়া দরকার। শুধু একথা বলে দিলেই চলবে না যে এগুলির উপস্থিতির জন্য দায়ী মৈথিলী ভাষী সংকলন-সম্পাদক এবং তাঁর আনা পরিবর্তনগুলি।[২] এই বিষয়ে যেমন বিস্তৃত ও বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়ন দরকার তা এখনো করা হয়নি।

শেষে একথাও বলা দরকার যে ইদানীং কিছু মৈথিলী অবহট্‌ঠ অংশ যা প্রাচীন সংস্কৃত পাঠে উদ্ধৃত হয়েছে— তা সবই অবশ্য জ্যোতিষ-বিষয়ক— প্রকাশিত হয়েছে।[৩] প্রাচীনকাল থেকে এই ভাষায় যে লোককবিতা প্রচলিত হয়ে এসেছে এগুলিই তার সম্পূর্ণ উদাহরণ নয়। তবে এগুলি যথেষ্ট প্রাচীন পাঠের উদাহরণ রূপে নেওয়া যেতে পারে যেগুলির উপর নির্ভর করে আমরা এমনই আরো পাঠের সন্ধান করতে পারি। এই জ্যোতিষ-বিষয়ক উদাহরণগুলি হয়তো ডাকের নিজের কথা নয় — যে ডাক ছিলেন বরাহমিহিরের সন্তান ও বিখ্যাত রাখাল- বালক— এমনও হতে পারে যে, এগুলি সাধারণ মানুষজনের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে এমন কিছু গ্রাম্য কথা ও চাষবাসবিষয়ক বক্তব্যের আকারে যা প্রাচীন পাঠে উদ্ধৃত হয়েছিল।

বিদ্যাপতি নিজে প্রচুর অবহট্‌ঠের ব্যবহার করেন। তবে এটি অবহট্‌ঠ না শৌরসেনী

১. দ্র. শিবনন্দন ঠাকুরের 'বিদ্যাপতি কী ভাষা'— 'মহাকবি বিদ্যাপতি' গ্রন্থে, পৃ. ১১৪।

২. যেমনটা 'প্রাকৃত-পৈঙ্গলম' খণ্ড ২ -এর (সম্পা. ড ভোলাশঙ্কব ব্যাস) ভূমিকায় করা হয়েছে, দ্র. পৃ. ৭৮, ৯৮ ও ১১০-১৭, প্রভৃতি।

৩. জীবানন্দ ঠাকুর, 'মৈথিলী ডাক', দ্বারভাঙার মৈথিলী সাহিত্য পরিষদ।

অপভ্রংশেরই একটি ভিন্নরূপ-বিশেষ (যা ড. এস. কে. চ্যাটার্জী বলেন) নাকি এটি একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাষা-শৈলী (— যাকে শিবনন্দন ঠাকুর এবং ড. উমেশ মিশ্র নাম দিয়েছেন 'মৈথিল অপভ্রংশ' অথবা যাকে ড. বি. আর. সাক্সেনা বলছেন 'মৈথিলী অপভ্রংশ') — একথা স্থির করা কঠিন; তবে এতে প্রাচীন মৈথিলীর সঙ্গে বহু চরিত্রগত মিল পাওয়া যাচ্ছে। যেমন :

১. বিশেষণ ও ক্রিয়ার স্ত্রী লিঙ্গ রূপ;

২. বহুবচনে যে বিশেষ্যপদগুলি আছে তাদের নির্দেশক-রূপে -হ্নি (-হ্নু), -আ অথবা কোনো পরসর্গেরই না থাকা;

৩. -এ বা -এঁ অথবা পরসর্গহীন কর্তৃকারকের নির্দেশক;

৪. করণের জন্য -এ এবং হি-র ব্যবহার (- এঁ-র প্রয়োগ করা হয় সেইসব শব্দের পরে যা -আ দিয়ে শেষ হচ্ছে) এবং অপাদানের জন্য তহুঁ এবং -সএঁ-এর প্রয়োগ;

৫. সম্বন্ধ-সূচক নির্দেশক রূপে (-কর-এরই অন্যসব রূপভেদ) -ক, - কের এবং -কেরি প্রভৃতির ব্যবহার;

৬. অধিকরণে -এ , -এঁ ও -হি- এর ব্যবহার;

৭. কারক -বিভক্তির নির্দেশনে 'চন্দ্রবিন্দুর' ব্যবহার;

৮. -ও, উত্তম পুরুষের ও , মধ্যম পুরুষের জন্য -সি, এবং তৃতীয় পুরুষের বেলায়, অর্থাৎ প্রথম পুরুষের বর্তমান কালে -ই, -এ এবং -থি- এর প্রয়োগ;

৯. অনুজ্ঞা-জ্ঞাপনার্থ -উ, উঁ এবং -হু -এর প্রয়োগ;

১০. অতীতকালে -ইয় এবং ভবিষ্যতে -ইহ-র ব্যবহার;

১১. -ন্তে, -ন্ত (-? -ইৎস ~ -ইতে আধুনিক মৈথিলীতে) প্রভৃতির ব্যবহার কৃদন্ত পদের নির্দেশক হিসেবে;

১২. ক্রিয়ার কালবোধক কৃদন্ত রূপের জন্য - ই এবং -এ-র প্রয়োগ;

১৩. নাসিক্য স্বরধ্বনি;

১৪. পরস্পরের সহজ পরিবর্ত ধ্বনিরূপে র ও ল, ষ ও খ, য় এবং ই, য় এবং য, ব এবং ৰ ও সবশেষে ন ও ণ-এর প্রয়োগ; এবং

১৫. বিশেষ করে আধুনিক কালেও প্রচলিত মৈথিলী শব্দ ও বাগ্‌ধারার ব্যবহার।

সপ্তম অধ্যায়

জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর (১২৮০-১৩৪০ খ্রি.)

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে মৈথিলীর প্রাচীনতম লেখক হলেন জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর। ওঁর উল্লেখ করা হয় 'কবিশেখর' রূপে এবং নিজের একটি কীর্তিতে উনি নিজেকে 'কবিশেখরাচার্য' বলে উল্লেখ করেন— সম্ভবত এই অর্থে যে তিনি কবিকুলের বা সঙ্গীতজ্ঞদের গুরু ছিলেন। ওঁর পরিচয় এবং যুগের বিষয়ে এখন আর কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।[১]

জ্যোতিরীশ্বরের জন্ম হয়েছিল একটি ব্রাহ্মণ পরিবারে যার নাম ছিল 'অবরঝট্ট পালি'। ওঁর পিতা ছিলেন ধীরেশ্বর ঠাকুর এবং মাতামহ ছিলেন রামেশ্বর ঠাকুর। জ্যোতিরীশ্বর ছিলেন প্রমুখ রাজসভাসদ বিশেষ, বৈদিক পুরোহিত, দর্শনশাস্ত্রী এবং অনেকগুলি ভাষার জ্ঞানী। উনি কর্ণাটরাজ হরিসিংহদেবের (১২৯৬-১৩২৪ খ্রি.) রাজসভায় ছিলেন এবং যুদ্ধ-শান্তি বিষয়ক মন্ত্রী গণেশ্বরের (সম্ভবত বিদ্যাপতির পিতামহ ধীরেশ্বরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) সংরক্ষণে ছিলেন। এছাড়া এঁর কন্যার সঙ্গে বিবাহ হয়েছিলো বীরেশ্বর ঠাকুরের কন্যার জামাতার কনিষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে। এই বীরেশ্বর ঠাকুর ছিলেন উপরিউক্ত গণেশ্বর (ঠাকুর)-এর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। এও জানা যায় যে বীরেশ্বর কর্ণাটরাজ শক্রসিংহ-র (১২৮৪-৯৬ খ্রি.) সৈন্য হিসাবে রণথম্ভোরে গিয়ে রাজপুত রাজকুমার হম্মীরকে (১২৯০ খ্রিষ্টাব্দে) পরাজিত করেন। সেভাবে দেখতে গেলে জ্যোতিরীশ্বর বিদ্যাপতির পিতামহের সমসাময়িক ছিলেন।

জ্যোতিরীশ্বর সংস্কৃত ও মৈথিলী উভয় ভাষাতেই লেখেন। সংস্কৃতে উনি রচনা করেন 'পঞ্চসায়ক' নামক একটি প্রেমকাব্যের এবং 'ধূর্তসমাগম' নামক প্রহসন। কিন্তু উনি খ্যাতি লাভ করেন ওঁর গ্রন্থ 'বর্ণরত্নাকর'-এর জন্য — যা ছিল ঐতিহ্যময় বর্ণনাত্মক গদ্যের সংকলন — এবং '(মৈথিলী) ধূর্তসমাগম', যা সংস্কৃত প্রহসনেরই কিছুটা সংক্ষিপ্ত ও মৈথিলীরূপ — এই দুটি গ্রন্থের জন্য। দুর্ভাগ্যবশত দুটি মৈথিলী পুস্তকেরই প্রথম কয়েকটি পৃষ্ঠা পাওয়া যায় না, যার ফলে দেশীয় ভাষায় ওঁর রচনানুরাগের সঠিক বর্ণনা করা কঠিন এবং এও জানা সম্ভব নয় যে উনি মৈথিলীর প্রথম সচেতন লেখক ছিলেন কি না যেহেতু মূল সংস্কৃত প্রহসনটি রচিত হয়েছিল কর্ণাট রাজা হরিসিংহদেবের নেপালে পলায়নের পরে (অর্থাৎ, ১৩২৪ খ্রি.), আন্দাজ করা যায় যে মৈথিলী রূপটিই ওঁর শেষ রচনা।

১. দ্র. ওঁর নিজের রচনা 'মৈথিলী ধূর্তসমাগম'-এর (ড. জয়কান্ত মিশ্র সম্পা.) ভূমিকা, পৃ. ৬-৮ এবং পণ্ডিত রমানাথ ঝা-র নিবন্ধ: 'জ্যোতিরীশ্বর: হিজ আইডেন্টিটি অ্যান্ড এজ', জার্নাল অব বিহার রিসার্চ সোসাইটি, ৩৭ (১৯৫১)।

জ্যোতিরীশ্বরের দেশীয় ভাষায় রচিত কর্মের শৈলীর পরিপক্কতা ও রচনার উৎকর্ষ দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় যে জ্যোতিরীশ্বরের মৈথিলী রচনাই প্রথম কিংবা সেই যুগের একমাত্র রচনা নয়। কিন্তু যতদিন অবধি না প্রাচীন মৈথিলীর অন্যান্য উদাহরণ আবিষ্কৃত হচ্ছে, এগুলিকেই প্রাচীনতম সচেতন মৈথিলী সাহিত্যের উদাহরণ রূপে মেনে নিতে হবে।

জ্যোতিরীশ্বরের রচিত দুটি মৈথিলী গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষাগত বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। গদ্যরচনাটির শৈলী অধিকতর পুরাতনপন্থী ও রীতিকঠোরতায় ভরা এবং এর এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যাতে মনে হয় ওঁর ভাষার সঙ্গে পশ্চিমে কথিত সহোদরা ভাষাগুলির বেশি মিল। সেই তুলনায় অন্য কৃতিটির নাট্যকবিতার সঙ্গে বিদ্যাপতির পদাবলীর ভাষা এবং জয়দেবের (যিনি সংস্কৃততে রচিত 'গীতগোবিন্দ' নামক সংস্কৃত পদাবলীর রচয়িতা — যা নাকি কোনো এক দেশীয় ভাষায় রচিত পদাবলীরই সমুন্নত রূপ) ভাষা ঐতিহ্যের মিল রয়েছে। এই পার্থক্যের একটা কারণ হলো যে এই গদ্যশৈলী সাধারণভাবে অধিকতর সচেতনভাবে গড়ে ওঠা একটি জটিলতর সৃষ্টিবিশেষ, এবং আংশিকরূপে অপভ্রংশে রচিত 'বর্ণ' রচনার পশ্চিমা ঐতিহ্যেরও ফলবিশেষ। তদুপরি গদ্য ও পদ্যের (নাট্যান্তর্গত কিংবা নাট্যবহির্ভূত) এই ধরনের পার্থক্য আমরা বিদ্যাপতির রচনাতেও দেখতে পাই, কারণ বিদ্যাপতি তার 'কীর্তিলতা'য় গদ্যশৈলীকে পূর্ণরূপে প্রাচীন ও পশ্চিমা ধাঁচের করে তুলেছিলেন। সত্যি কথা বলতে গেলে, জ্যোতিরীশ্বরের দুটি রচনার ভাষায় মূলগত কোনো প্রভেদ নেই — যা কিছু পার্থক্য তা রয়েছে সাহিত্যের দুটি বিধার এবং সেখানে যা কিছু ঐতিহ্য মেনে নেওয়া হয়েছে— তারই মধ্যে।

বর্ণরত্নাকর [১]-এর আবিষ্কার করেছিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, যিনি এই রচনার বর্ণনা এইভাবে করেন:

> এই কয়েক বছরে শেষ যে পুঁথি মৈথিলীতে লেখা পাওয়া যায় তা হলো জ্যোতিরীশ্বর, কবিশেখরাচার্য বিরচিত 'বর্ণ-রত্নাকর'। এই পুঁথিটি চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু যে অংশটি এখনও সুরক্ষিত আছে তাতে মোটা অক্ষরে ও সুন্দর হাতের লেখায় তা রচিত হয়েছে। অক্ষরের চরিত্র প্রাচীন মৈথিলীর যার সঙ্গে বাংলার পার্থক্য করা কঠিন, কারণ এমনিতেও শতকরা ৫০ ভাগ ভাবপ্রকাশই বাংলার। বইটি ১৪ শতকের প্রথম ভাগের রচনা। বাংলা বা মৈথিলীর অন্য কোনো পুঁথিই পাওয়া যায়নি সেই যুগের। বইটির বিষয়বস্তুও বিচিত্র। এতে কাব্যরচনার নিয়মাবলীও আছে; উদাহরণস্বরূপ, যদি রাজার বর্ণনা দিতে

১. এই কৃতির একটি সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, কলকাতা থেকে যাতে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একটি বিস্তারিত ভূমিকা লেখেন। ড. লক্ষণ ঝা-র জার্নাল অব বিহার রিসার্চ সোসাইটি-র ৩৬-৩৭ সংখ্যার লেখা এবং ড. শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রর নিবন্ধও দ্রষ্টব্য।

হয় তো তার মুখ্য রূপ কেমন হবে; ইত্যাদি। কখনো কখনো নিয়মাবলীর মধ্যে মজার ব্যাপারও দেখতে পাওয়া যায়। কুট্‌নী বা বেশ্যার দালালের বর্ণনা দিতে পারি: তার বয়স হবে প্রায় শতেক বছর — বুড়ির সারা গায়ের চামড়ায় থাকবে শতেক ভাঁজ, চুল হবে শঙ্খের মতন সাদা, মাথা হবে উঁচু, সারা গায়ে মাংসের লেশমাত্র থাকবে না, গাল হবে ভাঙা, দাঁত ঝরে যাওয়া। (কলহের দেবতা) নারদেরই (ভগ্নী) হতে হবে তাকে এবং দুটি মানুষকে কাছে আনায় হতে হবে দক্ষ। মনে হয় এই গ্রন্থ বিদ্যাপতির প্রতিভার উন্মেষে সহায়ক হয়েছিল।

জ্যোতিরীশ্বরের এই রচনার বিষয়ে মূল যা কিছু বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায় তার সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই উদ্ধৃতিতে আছে।

'বর্ণ-রত্নাকর' (অর্থাৎ 'বর্ণ' বা 'বিস্তারকথনের' সমুদ্র) প্রকৃতপক্ষে একটি দীর্ঘ গদ্যকৃতি — ৭৮টি পুঁথিপত্র (অথবা ১৫৬ পৃষ্ঠায়) জুড়ে লেখা। বইটিতে রয়েছে সাতটি অধ্যায় [১], যাকে সঙ্গত কারণেই নাম দেওয়া হয়েছে 'কল্লোল', কারণ সমগ্র গ্রন্থটিকে বলা হচ্ছে বর্ণনার 'সাগর' ('রত্নাকর')। এবিষয়ে যথেষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সম্ভবত আগে এই গ্রন্থটির পরিকল্পনায় অধিকতর সমতা ছিল — যা বর্তমান পাঠের [২] ভিত্তিতেই বোঝা যায়; প্রত্যেকটি অধ্যায়ে যে-কোনো একটি বিষয়েরই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, প্রথম কল্লোল যেখানে নগরবর্ণনা রয়েছে — সেখানে যে শুধু নিম্নবর্ণের বর্ণনাই রয়েছে তা নয়, সেখানে আভূষণ, গহনা, সূক্ষ্ম বস্ত্র, তাঁবু, জুয়ার আড্ডা, ডাক্তার, জ্যোতিষীর, দুর্গ প্রভৃতি সব বিষয়েরই বর্ণনা রয়েছে; 'নায়ক বর্ণনা' নামক দ্বিতীয় কল্লোলে শৃঙ্গার-বিষয়ক সমস্ত ধরনের বর্ণনাই রয়েছে — নায়ক, নায়িকা ও তার বন্ধুবান্ধবী, এবং আরো থাকতে পারতো প্রেমের বিভিন্ন স্থিতি, কুটনী এবং আট রকমের নায়িকা ও বেশ্যাদের বর্ণনা; তৃতীয় কল্লোল যাতে রয়েছে প্রাসাদ-বর্ণনা, এর অন্তর্গত আছে রাজসভা — যেখানে রাজা তাঁর দরবারে যাচ্ছেন, ব্যায়ামাগার, স্নানাগার ও মাথা ও চুল ধৌত করার উপকরণ — দেখা যাচ্ছে রাজা আহার করছেন এবং নিদ্রা যাচ্ছেন —এবং তার পরের দৃশ্য — রাত্রি, অন্ধকার, দ্বিপ্রহর, মেঘে ঢাকা আকাশ; চতুর্থ কল্লোল, যার নাম 'ঋতুবর্ণনা', খুব স্বাভাবিক ভাবেই তৃতীয় কল্লোলের পরেই এসেছে বছরের

১. মূল পাণ্ডুলিপি এখন আমরা পাই তাতে আরেকটি অধ্যায় রয়েছে (আট পৃষ্ঠার); কিন্তু দেখে মনে হয় যেন এটি মূল গ্রন্থের সঙ্গে সংযুক্ত নয়। এতে হয় এমন বিষয় নিয়ে বর্ণনা রয়েছে যা সম্ভবত এই বর্ণনাময় ঐতিহ্যের বৃহত্তর বহমান অংশবিশেষ ছিল, নয়তো এতে এমন কিছু রয়েছে যা প্রথম সাতটি অধ্যায়েরই অংশ হওয়া উচিত ছিল — একটি পৃথক অধ্যায় না হয়ে।

২. বর্তমান পাঠে অবশ্য অনেক অসংগতি রয়েছে। অষ্টম কল্লোল বলে কথিত অংশে অনর্থক 'বোহিতবর্ণনা' বারবার এসেছে 'বহিত্র বর্ণনা' নামে; বিদ্যাবন্তবর্ণনা, দ্যূতবর্ণনা, বেশ্যাবর্ণনা, কুট্টনীবর্ণনা এবং কামাবস্থাবর্ণনা প্রথম বা দ্বিতীয় কল্লোলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল। এভাবে সিদ্ধা, গ্রহ, পুরাণাদির সূচি ষষ্ঠ কল্লোলে যেতে পারতো।

বিভিন্ন সময়ের বর্ণনারূপে; 'প্রয়াণকবর্ণনা' নামক পঞ্চম কল্লোলে দেখানো হয়েছে রাজপরিবার — শিকার ও যুদ্ধযাত্রা—অরণ্য, পর্বত, সন্ন্যাসীর আশ্রম, প্রভৃতি ; 'ভট্টাদিবর্ণনা' নামক ষষ্ঠ কল্লোলে ভাটেদের কলা — কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং এখানেই 'কলাবর্ণনা'র স্থান হওয়া উচিত ছিল; 'শ্মশানবর্ণনা' নামক শেষ কল্লোল শুরু হয় শ্মশানের বর্ণনা দিয়ে, কিন্তু চলে যায় মরুভূমি, সমুদ্র, তীর্থ, নদী নৌকা ও পর্বতের বর্ণনায়।

বর্তমান পাণ্ডুলিপিতেও এই ধরনের বিন্যাসকেই মেনে নেওয়া হয়েছে তবে অনেক সময়েই দেখা যাচ্ছে নিয়মভঙ্গ করা হয়েছে। তবে কোথাও বিষয়ের প্রতি বীতরাগ দেখা যায় না : "বিষয়ের বিস্তার ও প্রাচুর্য থেকে তা বোঝা যাচ্ছে এবং এ থেকেও জানা যাচ্ছে যে মানবজীবনে যা কিছু বর্ণনার যোগ্য সবই এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।" [১] বলেছেন ড. চট্টোপাধ্যায়।

"মান্য ঐতিহ্য মেনে নেওয়ার ভার রচনাকারের ওপর চাপিয়েছে অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়ম। বর্ণনাগুলি কিংবা ওঁর গ্রন্থের বর্ণনাত্মক অংশগুলি প্রায়ই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, এবং অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলি শুধুমাত্র তুলনাত্মক কয়েকটি পংক্তির বেশি কিছু নয় কিন্তু এর সঙ্গে জড়িত বিষয়বস্তুগুলির সম্পূর্ণ উল্লেখ এতে রয়েছে এবং যে-কোনো প্রক্রিয়ার বর্ণনায় সঠিক ঘটনাক্রমের উল্লেখ রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, লেখক কোনো বর্ণনা দেননি, বরং বেশ কিছু জড়িত বস্তুর নামোল্লেখ মাত্র করেছেন, যেগুলির উল্লেখ করা প্রয়োজন যে-কোনো বস্তুর পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা দিতে গেলে।"

সাধারণভাবে মধ্যযুগীয় ভারত ও বিশেষ করে সে যুগের মিথিলার জীবন ও সংস্কৃতির এটি একটি শব্দসম্ভার বিশেষ। গ্রন্থটির বর্ণিত পরিবেশ তুর্কিদের আক্রমণের দ্বারা প্রভাবিত মনে হয় না— তা মূলত হিন্দু সংস্কৃতি নির্ভর— যে কটি পারসিক শব্দ এতে আছে সেগুলিও হয়তো পাণ্ডুলিপির অনুলেখকদের জন্যই এসেছে। লেখক "আমাদের শহরের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং মধ্যযুগের ভারতের শহরের যে কুৎসিত দৃশ্য— যেমনটা সব যুগে ও সব দেশেই দেখা যায়— তার একটা পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন; উনি আমাদের দেখাচ্ছেন যে ধুলোময়লা ও নোংরার মধ্যে দিয়ে কেমন চলাচল, কোলাহল, ও ধাক্কাধাক্কি হয়ে চলেছে," . . .। উনি আমাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন "শহরের চিৎকার-চেঁচামেচি ও আওয়াজের সঙ্গে, যার জন্য দায়ী নানান ধরনের গীতিবাদ্যের ব্যবহার, গান ও গীতিকবিতা গাওয়া লোরিক-বিষয়ক এবং লোকেদের পরস্পরের প্রতি নাও; দাও; ভাঙো; ওঠো; আরো দাও; বাড়াও— এসব বলে চেঁচামেচি, এবং আরো অনেক শোভন ও অশোভন কর্ম যা এমন সব ভিড়ে ভরা শহরে দেখতে পাওয়া যায়।"

উনি আমাদের সামনে একই সময়ে সুরম্য ছবি তুলে ধরছেন "আদর্শ নায়ক ও অপরূপা নায়িকাদের, যাঁরা ব্যক্তিগত রূপ ও কৃতিত্বে ভরা। উনি আমাদের রাজসভার

১. এখানে এবং এরপরের উদ্ধৃতিগুলি ড. চট্টোপাধ্যায়ের 'বর্ণরত্নাকর'-এর ভূমিকা থেকে নেওয়া।

চারিধারে নিয়ে যাচ্ছেন এবং চেনাচ্ছেন কোনটা কে ও কেমন। রাজকুমার ও রাজপুরুষদের অন্তরঙ্গ জীবনের গূহ্য কথা, তাঁরা কিভাবে স্নান করেন এবং কী খান এবং তাঁদের শয়নকক্ষেরও একটা ঝলক আমাদের দেখাচ্ছেন"। "নানান ধরনের মানুষের কত রকমের অবস্থার মধ্যে, তাদের ব্যবসার খুঁটিনাটি এবং পণ্য-পশরার মধ্যে কেমন সহজে আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন। একটা সুরম্য দ্যূতক্রীড়াগৃহে উনি আমাদের পথপ্রদর্শকের মতো নিয়ে যাচ্ছেন, এবং সেখানে যতরকমের খেলা চলছে সেগুলির সূক্ষ্ম জ্ঞান ও যেমন সব মানুষ সেখানে জুটে থাকে তাঁদের পরিচয়ের জ্ঞান দিয়ে উনি আমাদের আশ্চর্য করে দিচ্ছেন। বোঝাই যায় যে নানান ধরনের বহুমূল্য জিনিস, ধনরত্ন, মশলাপাতি ও গন্ধদ্রব্যের উনি রসজ্ঞ — বাজারের বণিকেরা এবং বস্ত্র-ব্যবসায়ী, মণিমুক্তার ব্যবসায়ী এবং ঔষধ-ব্যবসায়ীরা যা কিছু বিক্রি করে সেসব বিষয়ে উনি জানেন. . .। সৈন্যরা যখন কুচকাওয়াজ করে যায় উনি তখন দাঁড়িয়ে দেখছেন, অথবা তখনও যখন তরাইয়ের জঙ্গলে রাজা সপার্ষদ যাচ্ছেন শিকারে; যে রাজপুত সৈন্য ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে তার বংশপরিচয়ও ওঁর জানা, উনি জানেন ওরা কোন অস্ত্রে পারঙ্গম, কেমন ঘোড়ায় চড়ে, অথবা কেমন কুকুরকে চর্মরজ্জুর বন্ধনে রাখা উচিত।"

সত্যি কথা বলতে গেলে লেখকের জ্ঞান দেখা যাচ্ছে সর্বব্যাপী — উনি সবকটি পুরাণের নাম বলেছেন, সমস্ত ধরনের বায়ু ও সব কটি 'আদিত্যের' কথা বলছেন যেগুলি সম্ভবত মধ্যযুগের সামান্য লোকসংস্কৃতির অঙ্গ ছিল — তবে উনি কিন্তু যে কটি বস্তুর বর্ণনা করেছেন প্রত্যেকটির অনেকগুলি করে সমার্থক শব্দ দিয়েছেন; দ্যূতক্রীড়া ও দাবাখেলার নানান রকমের চালের বিষয়ে আমাদের উনি জানাচ্ছেন, কেশপরিষ্করণের নানান প্রক্রিয়ার (আর তার প্রায় ছত্রিশটি এখানে তালিকাবদ্ধ রয়েছে) কথা বলছেন — জানাচ্ছেন কত রকমের কুমির, ফুল, গাছ ও নৌকা প্রভৃতি হয় — এসব থেকে সমগ্র মানবতার প্রতি ওঁর ধারণার ও উৎসুকের কথাই জানা যায়।

উনি সুন্দর ও বীভৎস — দুইয়েরই বর্ণনা করেছেন। অবশ্য, ওঁর তুলনাগুলি সাধারণত পরিচিত উপমেয়তাই বটে, তবে কখনো কখনো এমন সব পংক্তি লিখেছেন যার ভিত্তিতে বোঝা যায় যে ওঁর 'কবিশেখরাচার্য' নামটি কেন সার্থক। যেখানে উনি হাসির সঙ্গে তুলনা দিচ্ছেন দুধের সমুদ্রে দখিনা হাওয়ায় ঢেউ খেলে যাওয়ার সঙ্গে, অথবা যখন উনি একের পর এক বিমূর্ত ও বাস্তব প্রতিবিম্বের পরে বিম্ব জমা করে যাচ্ছেন; অথবা যখন উনি প্রকৃতির বিভিন্ন দিকের বর্ণনা দিচ্ছেন প্রভাত, দ্বিপ্রহর, সন্ধ্যা, রাত্রি, ঋতু কিংবা জঙ্গলের বিষয়ে বলছেন।

যা কিছু ভয়ানক তাও ওঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। উনি খুব সাবধানতার সঙ্গে একটি সমগ্র কল্লোল ব্যয় করেছেন তা নিয়ে। জ্বলন্ত চিতার আগুন, মরদেহ ও মাথার খুলি — তাদের চুল, নাড়িভুঁড়ি, চর্বি, ঘিলু, রক্তের সঙ্গে পাশাপাশি বর্ণনা দিচ্ছেন ভয়াবহ শ্মশানভূমির বিষয়ে— নানান পৌরাণিক চরিত্র বিষয়েও বলছেন (যেমন ডাকিনী-

যোগিনী, রাক্ষসী কিংবা বেতাল), যেমন বলছেন সত্যিকারের কাপালিক বা অঘোরীদের বিষয়েও। মরুভূমি, উদ্বেলিত সমুদ্র এবং সুউচ্চ কঠিন পর্বতমালার বর্ণনাও উনি দিয়েছেন।

জঙ্গলের বর্ণনায় লেখকের দুই ধরনের জ্ঞানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। উনি জঙ্গলের বর্ণনা দিতে গিয়ে নানান রকমের ম্লেচ্ছ জনজাতির পরিচয় দিয়েছেন, অথচ একই সঙ্গে রয়েছে কিন্নর ও বিদ্যাধরদের সঙ্গীতও; সত্যি কথা বলতে গেলে উনি অরণ্যকে সুন্দর ও একই সঙ্গে ভয়াবহর সমন্বয় রূপে দেখিয়েছেন।

তবে সম্ভবত জ্যোতিরীশ্বর সর্বাপেক্ষা খুশি মনে বর্ণনা দিয়েছেন নিজের সমজীবীদের বিষয়ে। ভাট ও রাজসভার রাজকবিদের একটা বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন উনি। উনি জ্ঞানের নানান শাখায় পণ্ডিত ছিলেন এবং তদুপরি ছিলেন পেশাদার গায়ক ও সঙ্গীত শিক্ষকও — যাঁদের বলা হতো 'বিদ্যাবন্ত'। তিনটি সম্পূর্ণ অনুচ্ছেদ উনি ব্যয় করেছেন নৃত্য বিষয়ে — নর্তক ও নর্তকীদের বিষয়ে।

ড. চট্টোপাধ্যায় জ্যোতিরীশ্বরের শৈলীর সঙ্গে তুলনা করেছেন বাংলাভাষার কথকতার শৈলীর এবং বলেছেন:

> ওঁর সুনীতি সুলভ বর্ণনা — ঠিক আমাদের কথকদের মতন — যাঁরা নীতি-উপদেশ দিয়ে থাকেন বর্ণনায় — খুব স্বাভাবিকভাবে তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করবে এবং তাঁদের কথনে বিস্তারিতভাবে এর একটা সাদৃশ্য ও ছায়া আসতে বাধ্য। উনি যা কিছুর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন তার কোনোটিকেই খুব নিচু চোখে দেখেননি বা বর্ণনার অযোগ্য বলে মনে করেন নি।

'বর্ণরত্নাকর'-এ উনি প্রায় সেই সমস্ত বিষয়েরও বর্ণনা দিয়েছেন যেসব বিষয়ে পূর্ববর্তী কথকেরাও লিখে গেছেন।

প্রকৃতপক্ষে (১) 'পুনু কইসন', 'দেখু' এবং 'অপর প্রকার' প্রভৃতির ব্যবহার; (২) ওঁর গদ্যে প্রভূত অনুপ্রাস, অন্ত্যমিল ও ছন্দবোধের আধিক্য; (৩) কয়েকটি শব্দের পরে র যতিচিহ্নাদি — এসব দেখে ঐ কথাই মনে হয়। পরবর্তীকালে মৈথিলী নাটকে আমরা এমন কিছু উদাহরণ পাই যেখানে এই ধরনের অংশই পুনরুদ্ধৃত হয়েছে কীর্তনিয়া অভিনেতাদের দ্বারা, উদা. 'শ্রীকৃষ্ণকেলিমালা'। কিন্তু মৈথিলী কথকদের বিষয়ে কোনো গ্রন্থ নেই। তবে ১৯ শতকের বাংলা কথকদের গ্রন্থের সঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ অমিল রয়েছে এই গ্রন্থের — প্রধানত তৃতীয় কল্লোলে, যেখানে আমরা একটি পরম্পরের সঙ্গে অন্বিত কাহিনীর সন্ধান পাচ্ছি : আমরা রাজাকে দেখছি ব্যায়ামাগারে যাচ্ছেন, সেখান থেকে স্নানঘরে, এবং তারপর সারদিনের ক্রিয়াকর্মের বর্ণনা রয়েছে।

এই গ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে একটি কোষ গ্রন্থ-এর মতন ছিল এবং পরবর্তী বহু প্রজন্মের কাছে এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এ বিষয়ে বহু প্রমাণ আছে যে এই গ্রন্থটি বহুদিন পর্যন্ত

ছিল সম্মানিত ও সুপঠিত [১], যে জন্য দেখা যাচ্ছে ১৫০৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মণিকারেরা পুঁথিটির নকল করে গেছেন। মনে হয় মৈথিল ও নেপালের মৈথিলী কবিদের রচনায় এই গ্রন্থটি ক্রমাগত প্রেরণা জুগিয়েছে। যেমন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলে গেছেন, বিদ্যাপতির প্রতিভার উন্মেষের পিছনে এই গ্রন্থটির অবদান ছিল অনেক।[২] জ্যোতিরীশ্বরের দ্বিতীয় মৈথিলী গ্রন্থ, মৈথিলী ধূর্তসমাগম [৩] ১৯৫৭ সালে আমার দ্বারা আবিষ্কৃত হয়েছিল। এটি নেপালের বীর-গ্রন্থাগারে 'ভাষা-সংস্কৃত-নাটক' নামে একটি অপরিচিত পাণ্ডুলিপি রূপে পড়ে ছিল। এটিকে জ্যোতিরীশ্বরের 'ধারতিসমাগম' মৈথিলী রূপ বলে দেখতে পেয়ে এবং এর ভণিতায় 'কবিশেখর জ্যোতিক' অথবা শুধুমাত্র 'কবিশেখর' কথাটি পেয়ে আমি এর নাম দিয়েছিলাম 'মৈথিলী ধারতিসমাগম'। দুর্ভাগ্যবশত, এর প্রথম বারোটি পৃষ্ঠা (এবং সম্ভবত শেষের দুটি পৃষ্ঠাও) পাওয়া যায় না তবে গানগুলির ভণিতায় কবির সংরক্ষকদের নামগুলিকে সহজেই চেনা যায়। যেমন হরিসিংহদেব (যাঁর উল্লেখ সংস্কৃত রূপেও পাওয়া যায়) এবং 'মন্তি' বা 'মহামন্তি' গণেশ্বর (যাঁর উল্লেখ সংস্কৃত নাটকে পাওয়া যায় না)। লেখকের পরিচিতির প্রমাণ সহজেই পাওয়া যায় পরে যখন আমি 'পঞ্জি'তে (অথবা মিথিলার সমগ্র বংশলতিকার পঞ্জি) দেখতে পাই যে অনেকসময়ই জ্যোতিরীশ্বরের উল্লেখ করা হচ্ছে শুধুমাত্র 'কবিশেখর জ্যোতিষ' (এই গ্রন্থের ভণিতায় যে ছদ্মনাম পাওয়া যায় — 'জ্যোতিক' — তার মূলে রয়েছে 'ষ' এর 'খ' রূপে উচ্চারণের নিয়মের জন্য এটির 'ক' হয়ে যাওয়া)। লেখকের নামের সঙ্গে তার সংরক্ষকদের নাম জড়ানো এখানে পারম্পরিক প্রথাসুলভ উল্লেখরূপেই আসেনি বরং আত্মপরিচয়ের বিশেষ পদ্ধতি রূপেও দেখা দিয়েছে যার ফলে এই গ্রন্থটির বা এমন যে-কোনো অন্য গ্রন্থ বা কবিতার লেখক-কবির পরিচয় সহজেই প্রমাণ করা যেতে পারে।

অনেক বিদগ্ধজনই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন এই গ্রন্থটির বিষয়ে এই কারণে যে এই পাণ্ডুলিপিতে ব্যবহৃত মৈথিলী 'বর্ণরত্নাকর'-এর মৈথিলীর থেকে বেশ খানিকটা আলাদা ধরনের। কিন্তু এই গ্রন্থটিতে ব্যবহৃত মৈথিলী যথেষ্ট প্রাচীন শৈলীতে লেখা এবং ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের নিরিখে তা বিদ্যাপতির পদে ব্যবহৃত ভাষার কাছাকাছি বলে মনে হয়, যদিও এর সঙ্গে জ্যোতিরীশ্বরের গদ্য গ্রন্থের ভাষার অনেক ফারাক দেখা

১. জৈন অপভ্রংশ সাহিত্যের প্রথাগত বর্ণনা বা 'বর্ণক'- দ্রষ্টব্য (দ্র. প্রসিডিংস অব দ্য অল ইন্ডিয়া ওরিয়েন্টাল কনফারেন্স, ১২, পৃ. ৪৭২ পা. টী.; যেখানে শহর, রাজা, রানী, পবিত্রাবাস, স্নানাগার, ব্যায়ামশালা, রাজপ্রাসাদ ও অরণ্য প্রভৃতি ঠিক তেমনভাবেই বর্ণিত হয়েছে যেমনটি 'বর্ণরত্নাকর'-এ রয়েছে); দ্র. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা— 'বর্ণরত্নাকর'-এর, পৃ.২৪।

২. আমরা সম্ভবত 'কীর্তিলতা'র বেশ্যাদের বর্ণনার সঙ্গে তুলনা করতে পারি 'বর্ণরত্নাকর'-এর কিংবা বিদ্যাপতির পদে বর্ণিত নারীর সঙ্গে 'বর্ণরত্নাকর'-এর নায়িকাদের তুলনা করতে পারি।

৩. অখিল ভারতীয় মৈথিলী সাহিত্য সমিতি, এলাহাবাদ-২ দ্বারা প্রকাশিত।

যায়। এই পার্থক্যটা এই কারণে দেখা যায় যে কারণে বিদ্যাপতি তাঁর মুখ্যত গদ্যপ্রধান গ্রন্থ 'কীর্তিলতা' ও 'কীর্তিপতাকা'য় তাঁর পদের ভাষার থেকে ভিন্ন একটি শৈলীর ব্যবহার করেছেন। এ বিষয়ে জ্যোতিরীশ্বরের প্রশংসা না করে পারা যায় না যে গদ্যশৈলীতেও উনি সামান্যতম 'অবহট্‌ঠ' বা 'অপভ্রংশ'-র ব্যবহারও করেননি, যা সে যুগের সাহিত্যিক মহলে ও প্রাকৃত ভাষাদ্বয়ের পতনের পর খুবই সম্মানিত ছিল। উনি বরং গদ্যশৈলী রূপে কথ্যভাষারই

একটা প্রাচীন ও উন্নততর শৈলীর ব্যবহার করেন, যা সেযুগে মৈথিলী কাব্যে ব্যবহৃত হতো কিন্তু তখনও গদ্যসাহিত্যের অঙ্গ হয়নি। তদুপরি গদ্যসাহিত্যের কাব্যবিন্যাস ও শৈলী কবিতার শৈলীর থেকে পৃথক হবেই এবং জ্যোতিরীশ্বরের গদ্য ও কবিতায় যেসব পার্থক্য রয়ে গেছে এই দুই শৈলীতে, তার মূলেও এই কারণই কাজ করছে।

যে নাটকটিকে আমি 'মৈথিলী ধূর্তসমাগম' নাম দিয়েছি নানান কারণে, বিভিন্ন দিক থেকে দেখতে গেলে তার গুরুত্ব অনেক। মৈথিলী নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগের ইতিহাসকে এটি কয়েক শ বছর আগে নিয়ে যায় এবং মৈথিলীতে যে মহান 'কীর্তনিয়া নাটক'-এর ঐতিহ্য কালে গড়ে উঠেছিল, এটি তার প্রথম উদাহরণ। বিদ্যাপতি তাঁর 'গোরক্ষবিজয়' নাটকের ভূমিকায় যে এই নাটকের সংস্কৃত রূপের থেকে প্রথম দুটি পংক্তিকে উদ্ধৃত করেন সেটিকে পরবর্তীকালের নাট্যপরম্পরার সঙ্গে যোগসূত্র থাকার প্রমাণ হিসাবে দেখা যেতে পারে। এটা বোঝা খুবই দরকার যে সংস্কৃত রূপটি থাকা সত্ত্বেও এই নাটকটির মৈথিলী রূপটির প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল (এখন একথা বলা কঠিন যে কোনটি আগে লেখা হয়েছিল এবং একথায় এখন কিছু এসেও যায় না) সম্ভবত এইজন্য যে নাটকটির মঞ্চায়নের জন্য মৈথিলী গীতিগুলি অপরিহার্য হয়ে দেখা দিয়েছিল নাটকটিকে জনসাধারণের কাছে— বিশেষ করে নিরক্ষর ও অল্পসল্প অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন মানুষজনের কাছেও উপভোগ্য করার জন্য। নতুবা একথা বোঝা কঠিন যে মৈথিলী রূপটির হঠাৎ কেন প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল, শুধু মৈথিলী রূপটিতে (পৃ. ১৩, স্নাতকনৃত্য) 'স্নাতক' নামক একটি চরিত্রের অভিনয়ের কথা বলতে গিয়ে 'নৃত্য' শব্দটির ব্যবহার একথাই প্রমাণ করে।

এছাড়াও এটাও লক্ষণীয়— বেশ কটি নাটকীয় পাত্রের কথায় আর অভিনয়ে মৈথিলী গীতেরই ব্যবহার হয়েছে। এ প্রসঙ্গে একথা উল্লেখ করতেই হবে যে সংস্কৃত নাটকের ঐতিহ্যের অঙ্গরূপে যে ভৃত্য বা অন্য কোনো নিম্নতর মানের চরিত্রের জন্য দেশীয় বা প্রাকৃত ভাষার ব্যবহারের রীতি প্রচলিত ছিল, সেই প্রথা মৈথিলী গীতে অনুসৃত হয়নি। সত্যি কথা বলতে গেলে, জ্যোতিরীশ্বরের নাটকের নায়ক ও নায়িকা অর্থাৎ উচ্চ শ্রেণীর মানুষ মৈথিলীতেই কথা বলে এবং নাটকটি শুধুমাত্র প্রাচীনতর প্রাকৃত ভাষাগুলির পরিবর্তে মৈথিলীর (একটি আধুনিক প্রাকৃত ?) ব্যবহার সমন্বিত সংস্কৃত নাটকই — তা নয়। বরং এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্রভাবে মৈথিলী নাটকরূপেই পরিকল্পিত হয়েছিল যার থেকে খুব

সহজেই বেশিরভাগ সংস্কৃত ও প্রাকৃত বাদ দেওয়া সম্ভব কিন্তু মূল অর্থের বিনাশ না করে মৈথিলী গীতগুলিকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। অতএব এই অর্থে 'মৈথিলী ধূর্তসমাগম' একটি নতুন নাটক এবং শুধুমাত্র সংস্কৃত নাটকের বিষয়বস্তুর মৈথিলী গীতের দ্বারা অনুবাদ নয়। বিশেষত, এক জায়গায় নায়ক বিশ্বনগর, যিনি একজন সন্ন্যাসী, দেখা যাচ্ছে একজন প্রেমাহত নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করছেন (যেখানে 'সন্ন্যাসী' হলেন 'কামুক') — যেখানে দেখা যাচ্ছে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যা গানের মধ্যে দিয়ে হাস্যরস ও শৃঙ্গারের মিশ্রণেই সম্ভব। অতএব নাটকটির দুটি ভাষারূপের মধ্যে তুলনা করে তার পর সঠিক সিদ্ধান্তে এলে মনে হয় আমরা লাভবান হবো।

মৈথিলী রূপটিতে যতিচিহ্ন হিসাবে 'বিন্দুর'ব্যবহার দেখা গেছে ঠিক যেমনটি প্রাচীন ও মধ্যযুগের গ্রন্থে — যেমন 'বর্ণরত্নাকর' কিংবা নন্দীপতির 'শ্রীকৃষ্ণকেলিমালা'-য় দেখা যায়। একইভাবে আরেকটি যুক্তি হলো এই যে অন্তত একটি গানে সম্পূর্ণ নতুন বিষয়বস্তু পাওয়া যাচ্ছে — যে গানটি প্রবেশ-গীতিও নয় কিংবা সংলাপ-গীতিও নয় — বরং জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-এর অনুকরণে একটি শৃঙ্গারগীতি মাত্র। এটিকে শুধুমাত্র নাটকটির অতিরিক্ত আনন্দের সাধন বা অলঙ্করণ বলে একপাশে সরিয়ে রাখলে চলবে না, বরং সন্নিহিত পাঠের বাইরে বেরিয়ে ('অভিনীত') 'নৃত্যসঙ্গীত'-জনিত আনন্দের যে ব্যবহারিক দিকটি রয়েছে নাটকের, এটিকে তারই পরিপূরক তত্ত্ব রূপে মেনে নিতে হবে।

মৈথিলী গীতিকাব্যে জয়দেবের প্রভাবের প্রমাণ রূপেও এই নাটকটির গুরুত্ব অনেক। কখনো কখনো এও বলা যায় যে এই নাটকটির গানগুলির শৈলীর অপরূপতা জ্যোতিরীশ্বরেব 'বর্ণারত্নাকর'-এর বাক্‌শৈলীর চেয়ে নিকৃষ্ট মানের। কিন্তু যে গানগুলিতে জয়দেবের সংস্কৃত কবিতার প্রভাব দেখা যাচ্ছে সেগুলি কিন্তু জয়দেবের গীতের চেয়ে নিকৃষ্ট মানের নয়। এই গানগুলি নাটকের গান এবং এগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য হলো গীতিনাট্যের নাট্যগুণের উৎকর্ষবর্ধন — যে-কোনো পরিস্থিতিকে এগুলি যেন সমবেত স্বরে বর্ণনা করে, কোনো পাত্রের প্রবেশ ঘোষণা করে, কোনো সংলাপের বক্তব্যকে তা নির্দিষ্টভাবে বা বিশদভাবে স্পষ্ট করে — শুধুমাত্র কাব্যিক সৌন্দর্যসাধনের জন্য এগুলির সৃষ্টি হয়নি। বেশিরভাগ গানই এমন যা পরিস্থিতি বিশেষে কিংবা নির্দিষ্ট সংলাপের পক্ষে উপযুক্ত কিন্তু এর বাইরে তার আবেদন হবে সীমিত। যেহেতু এই নাটকটিতে বর্ণিত পরিস্থিতি 'কাব্যিক' নয়, 'প্রহসন'-এরই উপযুক্ত — এটা আশা করা অনুচিত যে এতে যে দেশীয় ভাষার ব্যবহার থাকবে তার মাধ্যমে কোনো মহান গীতিকাব্যের বা মহান সংলাপের পরিচয় পাওয়া যাবে; নাট্যকবিতারূপে সেগুলি নিশ্চিতরূপে মহান।

এখানে নাটকটির পশ্চাদভূমিতে যে নন্দনতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা কাজ করছে আমাদের তা বোঝা উচিত। এটি একটি প্রহসন। এর গল্পের কাঠামোটি খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়— সত্যি কথা বলতে কি, কাঠামোটি খুবই সামান্য মানের এবং শুধুমাত্র ধূর্তদের পরস্পর সাক্ষাত ঘটানোর (বা 'ধূর্তসমাগম'-এর) পক্ষে যথেষ্ট।

মৈথিলী নাটকটির পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ নয় তবে যা এখনও অক্ষত আছে তাতে নাটকটির বেশ কিছু মনমোহক অংশ আছে যাতে নাটকটির নন্দনতাত্ত্বিক উদ্দেশ্য ও এটি থেকে যে বহু বিচিত্র আনন্দরসের অনুভব সম্ভব তা বোঝা যায়।

নাটকটির আরম্ভ হয় বিশ্বনগর নামক একটি সন্ন্যাসীকে দিয়ে যে প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব ধূর্ত প্রতারক। তাঁর এক শিষ্যকে দেখা যাচ্ছে স্নাতক নামের। এই দুজনে মিলে একটি কৃপণ ধনী মৃতাঙ্গার ঠাকুরের কাছে যান যিনি কোনো এক মিথ্যে অজুহাতে এদের খাদ্যবস্তু দিতে অস্বীকার করেন। ওঁরা এঁকে তিরস্কার করলেও তিনি ওঁদের যেতে বলেন সুরত-প্রিয়া নামের একটি ধর্মপ্রাণ মহিলার বাড়িতে।

ধূর্ত বিশ্বনগর আগেই এই মহিলাটিকে দেখেছিলেন এবং ওঁর প্রেমে পড়েছিলেন। অতএব, উনি তাঁর বাড়ি যেতে সহজেই রাজি ছিলেন; এদিকে ঐ মহিলাও খুবই ধূর্ত— যদিও এখন বয়োবৃদ্ধা এবং উপভোগ করার মতো যৌবনের শক্তি রহিত —উনিও এই সুদর্শন সন্ন্যাসীটিকে নিজের প্রেমিক রূপে পেতে চান। অতএব সন্ন্যাসীকে তুষ্ট করার জন্য তিনি সব কিছু করতেই প্রস্তুত। উনি তাঁকে দ্বিপ্রহরের ভোজনের জন্য নানান ধরনের খাদ্য প্রস্তুত করতে বলেন।

যখন রন্ধন চলছিল তখনই শিষ্য স্নাতক ঐ শহরের একটি নটী অনঙ্গসেনার সন্ধান করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন, যাঁকে উনি ভালোবাসেন। বিশ্বনগরও ওঁর সঙ্গে যান এবং অনঙ্গসেনার দেখা পেয়ে দুজনেই প্রেমে হাবুডুবু খেতে থাকেন। নটী খুবই বিব্রত হয়ে পড়েন এবং জনৈক অসজ্জাতি মিশ্রকে মধ্যস্থতা করতে আহ্বান করেন। প্রথম অঙ্কের এইখানেই সমাপ্তি হয়।

দ্বিতীয় অঙ্কে অসজ্জাতি মিশ্রই নায়ক। ইনি একজন বৃদ্ধ শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ কিন্তু অসম্ভব ধূর্ত। ওঁর আবার একজন বিদূষক বন্ধু আছেন যাঁর নাম বন্ধুবঞ্চক। অনঙ্গসেনা কার হবেন—বিশ্বনগরের না স্নাতকের, যিনি নিজের কাপড়ের খুঁটে দশটি টাকা বাঁধা আছে বলে অনঙ্গসেনাকে গোপনে দেখিয়েওছেন — এই বিচার করার বাহানায় উনি নিজেই নারীর প্রেমে পড়েন ও এই দুজনের থেকেই তাঁকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যান। এইভাবে বিশ্বনগর ও তাঁর শিষ্য দুজনেই হতাশ হয়ে ফিরে আসেন। অতএব ঐ মহিলা ঠিকই বলেছেন— এইখানে যেন সকল ধূর্তের এক মহাসমাগম ঘটেছে।

মনে হয় এইখানেই তৃতীয় অঙ্ক আরম্ভ হয়, যদিও লেখক সেইরকম কোনো চিহ্ন দেন না। মূলনাশক নামক একটি নাপিতের আবির্ভাব হয় এই স্থানে এসে — যে নাকি নটী অনঙ্গসেনার প্রতিবেশী। সে এসে অনঙ্গসেনার কাছ থেকে তার গোপন অঙ্গে ক্ষৌরচালনার জন্য অর্থমূল্যের দাবি জানায়। অনঙ্গসেনা তাকে বলেন যে তার পাওনা অসজ্জাতি মিশ্র দেবেন মিটিয়ে।

অসজ্জাতি তাকে অর্থের বদলে কিছুটা গঞ্জিকা দেন, যা উনি নিজেই স্নাতকের কাছ থেকে পেয়েছিলেন অনঙ্গসেনা-বিষয়ক বিবাদের নিষ্পত্তির জন্য।

নাপিত এই মূল্যায়নকে যথেষ্ট নয় মনে করে এবং (শ্যালক) 'মিশ্রজী'কে খুব প্রহার করে তাঁর হাত-পা বেঁধে তাঁকে অজ্ঞান করে ফেলে রেখে চলে যায়। তারপর দেখা যাচ্ছে অসজ্জাতির মিত্র বিদূষক এসে ওঁকে মুক্ত করছেন।

সংক্ষেপে বলতে গেলে এই হলো কাহিনীর রূপরেখা। সংস্কৃত সমালোচনের শাস্ত্রে প্রহসনের একটি লক্ষণ বর্ণিত রয়েছে, সব কটির নিরিখে এটি একটি প্রকৃত প্রহসনই বটে। এটিকে শুদ্ধ প্রহসনই বলতে হবে কারণ এতে রয়েছে নানান ধরনের পাত্র — যাদের মধ্যে প্রধান নায়ক দুজন — একজন ভগত (সন্ন্যাসী) এবং অন্যজন শ্রোত্রীয় (দেশীয় ভাষার বিশিষ্ট উচ্চারণ 'সোতি' দ্রষ্টব্য) যাঁদের সহায়তায় রয়েছে নিম্নবর্গের শঠেরা — যেমন নাপিত ও বেশ্যা। নাটকটিতে দুটি অঙ্ক রয়েছে। যেমন হাসির উদ্রেক এতে হয় তাও নিম্নমানের — এমনকি পাত্রদের নামেও রয়েছে হাসির খোরাক (নায়কের নামের অর্থ পৃথিবী-শহর; শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণেরই নামের অর্থ জাতি-বহির্ভূত; বৃদ্ধার নাম যৌন-উপভোগক্ষম, যে নাকি আবার একমাসের উপবাসেরও ব্রত রাখে, ইত্যাদি)। হাস্যাস্পদ শব্দের ব্যবহারে, অবাস্তব সংলাপের মাধ্যমে (প্রলাপ), মজার বর্ণনা দিয়ে কিংবা অদ্ভুত সব পরিস্থিতির সৃষ্টি করে এখানে হাসির সৃষ্টি করা হয়েছে — ছলে, বলে, কৌশলে।

মৈথিলী সাহিত্যের ইতিহাসে এই প্রহসনটির গুরুত্ব হলো এতে ব্যবহৃত মৈথিলী গীতাবলী। সবসুদ্ধ কুড়িটি গান রয়েছে এতে যার মধ্যে অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পাওয়া যাওয়ায় আটটির খোঁজ পাওয়া যায় না। গানগুলি প্রাচীন কীর্তনিয়া নাটকের গীতির মতনই— 'প্রবেশ' গীতি, 'বর্ণনা' গীতি এবং অনেক সময়েই সংস্কৃত বা প্রাকৃত সংলাপের বা কবিতার অনুবাদ রূপে। এতে কাব্যিক সৌন্দর্য তেমন কিছু নেই — শুধু গানগুলি দেখলে এগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ ও রোচক মনে হবে না, তবে সমগ্র নাটকটির অগ্রগতির জন্য এগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অর্থে এগুলি নাটকেরই অংশবিশেষ। কবির ছন্দের উপর দখল এবং গানগুলির সুচারু মৈথিলী শৈলী লক্ষণীয়। জয়দেবের গীতগোবিন্দর একটি নিশ্চিত্ত প্রভাব এই গানগুলির উপর পড়েছে— সত্যি কথা বলতে গেলে, এগুলির মধ্যে একটা গীতগোবিন্দর গীতের প্রায় অনুকরণই বলতে হবে। চর্যাপদের মতন এখানে রাগ-রাগিণী ও তালের উল্লেখ করা হয় এবং মধ্যযুগীয় মৈথিলী পদাবলীর মতো এখানেও রচয়িতা ও সংরক্ষকের নামও থাকে এই গানগুলিতে।

শেষত মিথিলার চতুর্দশ শতকের সামাজিক ইতিহাসে 'বর্ণরত্নাকর'-এর মতই এই নাটকেরও একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। সে যুগের সমাজের নানান জাতি, খাদ্যবস্তু, অন্যান্য অভ্যাস এবং নিয়ম-কানুনের বিষয়ে এ থেকে অনেক কিছু জানা যায়। বিশেষ করে উৎসুক জ্ঞানপিপাসু মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এইগানগুলিতে বর্ণিত মিথিলার খাদ্যসম্ভার যা আজও মিথিলার একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষ।

সব মিলিয়ে, আমার বিশ্বাস মৈথিলী সাহিতাই নয়, উত্তর ভারতের দেশীয় ভাষার সাহিত্যও লাভবান হয়েছে এই আবিষ্কারের ফলে।

অষ্টম অধ্যায়

বিদ্যাপতি ঠাকুর (১৩৬০-১৪৪৮ খ্রি.)

১
যুগের বৈশিষ্ট্য

ইংরেজি সাহিত্যে শেক্সপীয়র যুগের মতই ছিল মৈথিলী সাহিত্যে বিদ্যাপতির যুগ। এই পর্যায়ে বিদ্যাপতির মধ্যে দিয়েই মিথিলা পেলো নিজস্ব জাতীয় মেধার প্রত্যক্ষ ও পরিপূর্ণ বিকাশ — গীতিকবিতাকে। সামান্য সময়ের ব্যবধানেই এটা এমন স্তরে গিয়ে পৌছলো যে জ্ঞানীগুণী থেকে শুরু করে অশিক্ষিত রাখাল পর্যন্ত সবার মুখে মুখে ঘুরতে লাগল। রাজারানীর প্রাসাদ থেকে শুরু করে গরিবের কুটির অবধি, সবচেয়ে জনাকীর্ণ এলাকা থেকে দূর-দূরান্তের বিজন বন অবধি — সর্বত্র হল এইসব গীতিকবিতার ঠাঁই। প্রত্যেকেই এর নানান প্রকারভেদে নিজের প্রাণের কথা খুঁজে পেলো।

এই যুগের সঙ্গে হরিসিংহদেবের যুগকে, অর্থাৎ জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুরের কালকে জুড়তে পারা এমন কিছু কঠিন নয়, তবে একথা ঠিক যে এযুগের গৌরবের মূলে ছিল নান্যদেবের শুরু করা এবং হরিসিংহদেবের সময় যা চরম উন্নত মান লাভ করেছিল, সেই সঙ্গীত ও নৃত্যের সাংস্কৃতিক জাগরণ। আমরা এ বিষয়ে আন্দাজ করতে পারি "এই তথ্য থেকে যে 'পঞ্চসায়ক' এবং 'ধূর্ত-সমাগমে' জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর নিজের কীর্তির কথা গর্ব করে বলছেন বিস্তারিতভাবে এবং ('বর্ণরত্নাকর'-এও) রয়েছে গায়ক, বাদক ও তাদের অনুচরবর্গের শোভাযাত্রার বিস্তারিত বর্ণনা"।[১] লোচনের 'রাগ-তরঙ্গিনী'তেও (১৬৮১ খ্রি.) বর্ণনা আছে যে কিভাবে মিথিলায় সঙ্গীতের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গীতিকবিতার জন্ম হলো। 'চর্যাপদে'র উদাহরণ এবং জয়দেবের সংগীত-বদ্ধ পদ রচনার উদাহরণ এই পর্যায়ের ঐতিহ্যকে আরো বেশি গরিমা-মণ্ডিত করেছিল।

বিদ্যাপতি নিজের মাতৃভাষায় লিখতে গিয়ে যে এত সফলতা পেয়েছিলেন তার মূলে ছিল এই যে সেই সময়েই দেশীয় ভাষা মনের কোমলতম আবেগের প্রকাশের উপযুক্ত বাহন রূপে গড়ে উঠে খ্যাতি ও সুনাম লাভ করেছিল। যে প্রাকৃতকে 'কর্পূরমঞ্জরী'র[২] স্রষ্টা সংস্কৃতের চেয়ে শ্রেয় বলে মনে করেছিলেন, বিদ্যাপতির যুগে তাও 'নীরস' (শুষ্ক) বলে প্রতীত হলো এবং 'দেসিল ব'য়না'কে (দেশীয় ভাষা শৈলী, অর্থাৎ দেশজ বাগধারা) মনে করা হলো বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে গৃহীত হওয়ার

---

১. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'বর্ণরত্নাকর'-এর উপক্রমণিকা, পৃ. ১৬।

২. ১.৮ 'কীর্তিলতা'র উপক্রমণিকায় ড. বাবুরাম সাক্সেনা দ্বারা উদ্ধৃত।

যোগ্য।[১] অবশ্য বিদ্যাপতি যুগ প্রাকৃত ও অপভ্রংশকে সম্পূর্ণরূপে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারেনি, কারণ তখনও তা সমস্ত ভারতবর্ষের সাহিত্যিক ভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিদ্যাপতি নিজেই তাঁর গদ্য রচনায় তার ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু শেষমেষ এগুলি বাতিল করে এবং গীতিকবিতায় মৈথিলী ব্যবহার করে বিদ্যাপতি প্রাকৃত ও অপভ্রংশ যুগের অবসান ত্বরান্বিত করলেন এবং নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির যুগের সূচনা করলেন।

তৃতীয়ত, এই যুগ থেকেই মিথিলা আবার হিন্দু সংস্কৃতি ও সংস্কৃত চর্চার পুরোধা রূপে গণ্য হতে থাকলো। এর আগে প্রায় ১৫০০ বছর পূর্বে প্রথম বার মিথিলা বুদ্ধদেবের নবীনপন্থী অনুগামীদের হাত থেকে হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী সনাতনপন্থীদের রক্ষা করেছিল। এইবার তাকে আরো কঠিন ও সর্বনাশা বিপদের মুখোমুখি হতে হলো। "একটু একটু করে হিন্দুরা তাঁদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারিয়ে ফেললো। হিন্দু সমাজের ঐক্যের গাঁথুনি খুব শিগগিরই আলগা হয়ে ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। আবার একবার ব্রাহ্মণের জয় হলো। যতদূর সম্ভব এই ভঙ্গুর অট্টালিকার ভিত সে আবার দিলো গেঁথে শক্ত করে। রাজনীতির ওপরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে . . . সে নিজেকে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের মধ্যে সীমিত রাখলো।"[২] হিন্দু সভ্যতাকে রক্ষা করার এই সমূহ প্রয়াসের সর্বাগ্রে পাওয়া গেল মিথিলাকে। মিথিলার শাসক-কুলের সাহায্যও এতে পাওয়া গেলো। মুসলমান শাসককুলের নিষ্ঠুরতার হাত থেকে তাঁরা একসঙ্গে দেশকে রক্ষা করেছিলেন এবং তাঁদের নিরাপদ এবং নির্জন রাজসভায় সংস্কৃত চর্চাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। সমস্ত ভারতবর্ষ থেকে জ্ঞানীগুণী মানুষ মিথিলায় যেতে লাগলেন। প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের দ্বারা আক্রান্ত ও পরাজিত হবার পর[৩] প্রায় তিন শতাব্দী ধরে মিথিলা ছিল বাংলার ছাত্রদের কাছে শিক্ষাভূমি। এই মৈথিল পণ্ডিতেরা তাঁদের মাতৃভাষাকেও একইরকমভাবে ভালোবাসতেন; তাঁরা সংস্কৃতের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই ভাষায় কাব্যরচনা করতে লাগলেন এবং তাঁদের ছাত্ররা সেগুলিকে নিজ নিজ দেশে নিয়ে গেলো সযত্নে বহন করে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায়, বিদ্যাপতির যুগ ছিল শেক্সপীয়রের যুগের মতোই সঙ্গীতের জন্য প্রখ্যাত, আধুনিক ভাষাসমূহের উদ্ভবের সূচক এবং মিথিলার

১. 'কীর্তিলতা', পৃ. ৩, ড. বাবুরাম সাক্সেনার সংস্করণ। এখানে লক্ষণীয়, 'অবহট্‌ঠ'— চর্চাকে জ্যোতিরীশ্বর ৬৪ কলার অন্যতম বলে মনে করেছিলেন ('বর্ণরত্নাকর', পৃ.৫৫খ)। অবশ্য উনি 'অবহট্‌ঠ' ও 'দেশ-ভাষা'র মধ্যে কোনো সূক্ষ্ম পার্থক্য নিরূপণ করেন নি (একটি বহু ব্যবহৃত ঐতিহ্যপূর্ণ সাহিত্যিক ভাষা এবং অন্যটি স্থানীয় কথ্য ভাষা)।

২. কে. পি. জয়সওয়াল, 'মিথিলা ম্যানুসক্রিপ্টস্ ক্যাটালগ'-এর ভূমিকা, ১, পৃ. ৩; এ প্রসঙ্গে এস. সি. বিদ্যাভূষণের 'হিস্ট্রি অব্ ইন্ডিয়ান লজিক', পৃ. ৩৫৫ দ্রষ্টব্য।

৩. ড. চট্টোপাধ্যায়, 'বর্ণরত্নাকর'-এর ভূমিকা। পৃ. ২০-২১।

পাণ্ডিত্যের দিক থেকে স্বর্ণযুগ বিশেষ। বিদ্যাপতিকে তাঁর যুগের এইসব স্রোতের মোহানার চরমবিন্দু রূপে চিহ্নিত করা যায় — উনি এই সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ সাঙ্গীতিকদের মধ্যে একজন ছিলেন; উনিই দেখালেন কিভাবে প্রাকৃত ও অপভ্রংশকে ছেড়ে একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষাকে গ্রহণ করা সম্ভব; এবং সে যুগের সংস্কৃত চর্চার প্রভাবের সবচেয়ে প্রকৃষ্ট এবং প্রখ্যাত উদাহরণরূপেও তাঁকে আমরা পেয়েছি।

এই যুগের রচনার সাহিত্যিক মান নিয়ে কোনো কথা বলতে গেলে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে এ যুগের প্রাচীন চরিত্র — বিদ্যাপতিকে আরো দুটি ভারতীয় ভাষা নিজের বলে মেনে নিয়েছে (বাংলা ও হিন্দি)। স্যার জন বীমস্ ঠিকই বলেছেন : "হোমারের জন্মস্থান বলে স্বীকৃত হওয়ার জন্য সাতটি শহর মিলে প্রতিযোগিতায় নেমেছিল, কিন্তু বিদ্যাপতির নাম ছাড়া আমি অন্য কোনো কবির নাম করতে পারবো না যাকে দু-দুটি ভাষাভাষীর মানুষেরা (মৈথিলী ও বাংলা) নিজের বলে দাবী করেছে।" এই ঘটনাকে স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন 'সাহিত্যের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা' [১] বলেছেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, "যেদিন হিন্দু ধর্মের সূর্য অস্ত হবে, যেদিন কৃষ্ণভক্তি ও প্রেম এবং অস্তি-রোগের ঔষধের ওপর বিশ্বাস হবে বিলুপ্ত, কৃষ্ণপ্রেমের মন্ত্র যাবে হারিয়ে, সেদিনও বিদ্যাপতির সেইসব সঙ্গীতরচনা থাকবে অমর হয়ে যেখানে উনি রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমের কথা বলছেন।"

দুর্ভাগ্যবশত এই যুগের সাহিত্য কর্মের একটা সঠিক কালানুযায়ী অধ্যয়ন সম্ভব নয়। বিভিন্ন লেখকের জীবনী ও রচনার বিষয়ে আমরা সঠিকভাবে কিছুই জানি না। এদের মধ্যে অনেকেই জ্ঞাত আছেন শুধু নামেই, এবং আজ এঁদের উপর গবেষণা করার মতো কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। অনেক সময়েই একটা আধটা গীতিকবিতা — যা অনেক সময়ে হয়তো খুবই উচ্চমানের হয়, আবার সাধারণত হয়ও না— যা এই সংকলন কিংবা ওই সংকলনে হয় উদ্ধৃত ও সংকলিত — এই সবই মাত্র রয়ে যায়। অনেকগুলি কবিতার স্রষ্টা কে সে নিয়ে অনিশ্চয়তার অবকাশ আছে কারণ হয় ভণিতাগুলি হারিয়ে গেছে আর নইলে সেগুলি ভুল নির্দেশ দিচ্ছে। অনেক সময়েই বিদ্যাপতির নাম আছে ধরেই নেওয়া হয় বা নাম ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যে-কোনো কবিতার মধ্যেই, অথবা রচয়িতার নাম দেওয়া থাকবে না আদৌ। এইসব ক্ষেত্রে আমরা নভোমণ্ডলের উদাহরণটা তুলে ধরতে পারি, যার মানে মাঝখানে বিদ্যাপতিকে রেখে বাকিদের ঐ একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। উনি শুধু ঐ যুগের একটা আদর্শই নন, প্রতিটি ক্ষেত্রেই উনি এই যুগের প্রতিচ্ছবি হয়ে রয়েছেন। ওঁর অনুপ্রাণিত হয়ে পড়ার মুহূর্তগুলিতে, ওঁর জীবনে ও ব্যবহারে, সংস্কৃতচর্চার প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব, সঙ্গীতের ওপরে ওঁর অধিকার, রাজসভায় স্থান এবং আরো যে-কোনো কঠিন কিংবা সহজ সরল বিষয়ে তিনিই ছিলেন ঐ যুগের আয়না বিশেষ।

১. 'মৈথিলী ক্রেস্টোম্যাথি', বিদ্যাপতির কবিতার ভূমিকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৩৪।

২
জীবন ও সময়

উত্তর-পূর্ব ভারতের নব্যভাষার কবিতার সৃষ্টিযজ্ঞে বিদ্যাপতি [১] ছিলেন একজন প্রাচীনতম কেন্দ্রীয় চরিত্র। যখন চসার (১৩৪০ খ্রি.) ইংরেজি সাহিত্যের ভাগ্য নিরূপণ করছিলেন, ঐ সময়ের কাছাকাছিই বিদ্যাপতি জন্মগ্রহণ করেন। অতএব উনি অসমিয়া কবি শঙ্করদেব (জন্ম ১৪৪৯ খ্রি.), বাংলার কবি চণ্ডীদাস (জন্ম ১৪১৮ খ্রি.), ওড়িয়া কবি রামানন্দ রায় (১৫ শতকের মাঝামাঝি সময়ে জাত) ও হিন্দি ভাষার কবি কবীর (জন্ম ১৩৯৯ খ্রি.), তুলসীদাস (জন্ম ১৫৪০ খ্রি.), মীরাবাঈ (জন্ম ১৪৯৭ খ্রি.) এবং সুরদাসের (জন্ম ১৪৩৫ খ্রি.) পূর্বেই জন্মগ্রহণ করেন।

বিদ্যাপতির পূর্বপুরুষদের বিষয়ে আমাদের খুব ভালোই জানা আছে। তাঁরা কাশ্যপ গোত্রের মৈথিল ব্রাহ্মণদের গড় বিসফী পরিবারের নামে পরিচিত। এই পরিবারের প্রাচীনতম পুরুষ হলেন বিষ্ণু ঠাকুর। তাঁর ছেলের নাম ছিল হরাদিত্য এবং পৌত্র ছিলেন কর্মাদিত্য ত্রিপাটি (বা ত্রিপাঠিন?)। এই কর্মাদিত্যকে আর একজন কর্মাদিত্যের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়, যিনি হাবীডীহ [২] নামক স্থানে ১৩৩২ খ্রিষ্টাব্দে দেবী শক্তির (হৈহটি দেবী) মন্দিরের স্থাপন করেছিলেন, এবং নিজেকে রাজমন্ত্রী বলে পরিচয় দিতেন।

কর্মাদিত্যের ছিল দুই পুত্র — দেবাদিত্য (বা শিবাদিত্য) এবং ভবাদিত্য। বড়ছেলে দেবাদিত্য ছিলেন 'সন্ধিবিগ্রহিক' (অর্থাৎ, যুদ্ধ ও শান্তিস্থাপনের মন্ত্রী) এবং রণথম্ভোরের (১৩০০-১৩০১ খ্রি.) যুদ্ধে ভারত সম্রাট আলাউদ্দীনকে সাহায্য করার জন্য 'মন্ত্রীরাজতিলক'-এর উপাধি লাভ করেছিলেন। উনি একজন প্রখ্যাত যোদ্ধাও ছিলেন যিনি কর্ণাটরাজ মহারাজা শক্রসিংহদেবের (১২৮৪-১২৯৬ খ্রি.) অধীনে হমীরকে পরাজিত করেছিলেন।

এই দেবাদিত্যের ছিল সাত পুত্র। জ্যেষ্ঠপুত্র বীরেশ্বর ছিলেন পিতার মতোই একজন গুরুত্বপূর্ণ খ্যাতিমান পুরুষ। উনিও পিতার পর যুদ্ধ ও সন্ধিস্থাপনের মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হন কর্ণাটরাজ মিথিলার মহারাজা শক্রসিংহের (১২৮৪-১২৯৬ খ্রি.) কালে। উনি ছিলেন জনপ্রিয় ধর্মশাস্ত্রগ্রন্থ 'দশকর্মপদ্ধতি'র রচয়িতা। অনেকগুলি মন্দির-স্থাপনা ও মহাদান যজ্ঞের জন্য এবং পুষ্করিণী খনন করানোর জন্য উনি খ্যাতিলাভ করেছিলেন। ওঁর কাছেই ছিল 'বীরেশ্বর রত্ন' নামের ওঁর নামেই পরিচিত বিখ্যাত রত্ন। বীরেশ্বরের পুত্র, বিখ্যাত নিবন্ধকার চণ্ডেশ্বর ঠাকুর ছিলেন একাধারে মুখ্য ন্যায়াধিপতি এবং যুদ্ধ ও সন্ধিস্থাপন মন্ত্রী। উনি যে রাজনীতিশাস্ত্রে খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন, তাই নয়

১ মহামহোপাধ্যায় ড. উমেশ মিশ্রের 'বিদ্যাপতি ঠাকুর', রমানাথ ঝা-র 'পুরুষপরীক্ষা'র ভূমিকা এবং ড. সুভদ্র ঝা-র 'দ্য সংগ্স অব্ বিদ্যাপতি' হলো কবির বিষয়ে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য কাজ।

২. এটি মধুবনী জেলার একটি গ্রাম যা কমতৌল স্টেশনের কাছে অবস্থিত।

(দ্র. ওঁর কৃতি 'রাজনীতিরত্নাকর'), জ্যোতির্বিজ্ঞান (দ্র. তাঁর 'সূর্যসিদ্ধান্ত' নামক কৃতি) ও ধর্মশাস্ত্রেও তাঁর দক্ষতা ছিল উল্লেখযোগ্য এবং একজন কুশলী যোদ্ধারূপে উনি মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য যুদ্ধ করে সাফল্যও পেয়েছিলেন। তাঁর কোনো সন্তান ছিল না, ফলে বীরেশ্বরের বংশের এখানেই হয় সমাপ্তি।

দেবাদিত্যের দ্বিতীয় পুত্র হলেন গণেশ্বর ঠাকুর। তাঁর উপাধি ছিল 'মহাসামন্তাধিপতি' (সামন্তদের প্রমুখ নেতা)। উনি 'সুগতি-সোপান' এবং 'গঙ্গপিত্তলকের' রচয়িতা বলে খ্যাত ছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রামদত্ত ছিলেন কর্ণাটরাজ দ্বিতীয় নরসিংহদেবের সভায় যুদ্ধ ও শান্তিস্থাপন মন্ত্রী এবং ইনি রচনা করেন 'দশকর্মপদ্ধতি' ও 'মহাদানপদ্ধতি' যা এখনও মিথিলায় সমাদৃত ও ব্যবহৃত হয়। গণেশ্বরের দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন গোবিন্দদত্ত, বিষ্ণুভক্তি বিষয়ক গ্রন্থ 'গোবিন্দমানসোল্লাস'-এর রচয়িতা। দুই পুত্রই অপুত্রক অবস্থাতেই মারা যান বলে মনে হয়।

ধীরেশ্বর ছিলেন দেবাদিত্যের তৃতীয় পুত্র। একমাত্র ধীরেশ্বরের বংশেরই অগ্রহতি ব্যাহত হয়নি। উনি 'মহাবার্তিক-নৈবন্ধিক' পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর দুই পুত্র — জয়দত্ত ও কীর্তি। জয়দত্তেরও ছিল দুটি পুত্র — গৌরীপতি ও গণপতি। এই গণপতিই বুদ্ধবালী পরিবারের জনৈক শ্রীকরের কন্যা গঙ্গাদেবীকে বিবাহ করেন এবং বিদ্যাপতি ছিলেন এঁদেরই সন্তান।

দেবাদিত্যের চতুর্থ পুত্র জটেশ্বর ছিলেন 'ভাণ্ডারীক' (ভাণ্ডারী); পরের জন, হরদত্ত ছিলেন 'স্থানান্তরীক' (স্থানান্তর সংক্রান্ত অধিকারী); ষষ্ঠ লক্ষ্মীদত্ত ছিলেন 'সন্ধিবিগ্রহিক' (যুদ্ধ ও শান্তিস্থাপন মন্ত্রী) এবং 'মুদ্রাহস্তক' (সীলমোহর রক্ষক) আর সপ্তম পুত্র ছিলেন একজন রাজপার্শ্বদ মাত্র ('রাজবল্লভ')। এঁরাও সবাই মনে হয় নিঃসন্তান ছিলেন।

এইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিদ্যাপতির পূর্বপুরুষেরা সবাই জনজীবনে খুবই বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন এবং সবারই মিথিলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে দান ছিল চিরস্থায়ী।

"এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে বীরেশ্বর ও রামদত্তের 'পদ্ধতিসমূহ' আজও মিথিলায় মানা হয় এবং চণ্ডেশ্বরের (বিখ্যাত রত্নাকরসমূহ) নিবন্ধগুলি আজও মিথিলার সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের ভিত্তিপ্রস্তরের মতো।" প্রকৃতপক্ষে এই দুটি তথ্যের ওপর নির্ভর করেই বলা যায় যে বিদ্যাপতির পূর্বপুরুষেরা মৈথিল সমাজের নেতৃস্থানীয় ছিলেন।

জীবন ও সাহিত্যিক জীবন

বিদ্যাপতির জীবনকে বহুরঙা জীবন বলা যায়। বিদ্যাপতির জন্মবর্ষ [১] হিসাবে নানান

১. ১৩৫৮ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত; ১৩৫৭ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী; ১৩৫০ বেণীপুরী এবং রমানাথ ঝা; ১৩৭২ বি.কে. চ্যাটার্জী; ১৩৮০ সতীশচন্দ্র রায়; ১৩৫৭ -৫৯ বি. আর. সাক্সেনা; এবং ১৩৬০ উমেশ মিশ্র এবং শিবনন্দন ঠাকুর।

মতামত পাওয়া যায়। মনে হয় কবি মহারাজ কীর্তিসিংহের সাথী ছিলেন (দ্র. কবির এক নাম— 'খেলন কবি'), যখন মহারাজ ছিলেন কিশোর বালক এবং যখন মহারাজের পিতা মহারাজা গণেশ্বরসিংহ ঘাতকের হাতে নিহত হয়েছিলেন ল. সং ২৫২, অর্থাৎ ১৩৭২ খ্রিষ্টাব্দে[১]। তা যদি সত্যি হয় তো ঐ কিংবদন্তী মেনে নিতে হয় যে বালক বয়সে বিদ্যাপতি পিতার সঙ্গে রাজা গণেশ্বরের রাজসভায় মাঝে মাঝে যেতেন। প্রাচীন গাথা থেকে আমরা এও জানতে পারি যে বিখ্যাত মহারাজা শিবসিংহ ৫১ বছর বয়সে রাজপদে আসীন হন এবং উনি কবির চেয়ে বয়সে দুবছরের ছোট ছিলেন। দুটি সূত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, শিবসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন ২৯৩ ল. সম্বতে (= ১৪১২ খ্রি.)। এই তারিখ আগের কিংবদন্তীর সঙ্গে মেলে। অতএব আমরা এ থেকে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসত পারি যে ওঁর জন্ম হয় ২৪১ ল. সম্বতে (১৩৬০ খ্রিষ্টাব্দে)। এই তারিখ চণ্ডেশ্বরের জন্মকাল (১৩১৫-১৩১৪ খ্রি.) থেকে বেশ পরে এবং এই একজন পূর্বপুরুষের জন্মের বিষয়েই নিশ্চিতরূপে জানা যায়।

বিদ্যাপতি বিখ্যাত নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রের সহপাঠী ছিলেন এবং সম্ভবত তাঁরই কাকা হরি মিশ্রের ছাত্র ছিলেন। এও মনে হয় উনি খুব বেশিদিন বিদ্যাশিক্ষা করেন নি এবং রাজপারিষদের জীবনে খুব অল্প বয়সেই প্রবেশ করেন। উনি মহারাজা কীর্তিসিংহের রাজসভায় একজন গুরুত্বপূর্ণ পার্শ্বদরূপে পরিচিত ছিলেন এবং ওঁরই প্রশংসা করে 'কীর্তিলতা'র (সম্ভবত ১৪০২-৫ খ্রিষ্টাব্দে) রচনা করেন।

মহারাজা কীর্তিসিংহের মৃত্যুর পরে বিদ্যাপতি ওইনিবার বংশের দেবকৌলী শাখার রাজসভায় যান। এখানেই তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। আমরা জানি না যে উনি ভবসিংহের সময়ে ছিলেন কি না, কিন্তু একথা নিশ্চিত যে মহারাজা দেবসিংহ এবং তাঁর পৌত্র মহারাজা শিবসিংহের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ সম্বন্ধ ছিল। এও সম্ভব যে শিবসিংহ ল. সং ২৯১ সালে (= ১৪১০-১১ খ্রি.) অভিষিক্ত হওয়ার আগে থেকেই রাজ্যশাসন করছিলেন। মনে হয় বিদ্যাপতি খুব কম বয়সেই তাঁর সংসর্গে আসেন। ল. সং ২৯১ (= ১৪১০-১১ খ্রি.) সালেই উনি 'কাব্যপ্রকাশে'র টীকার একটি প্রতিলিপি করানোর কথা বলেন কার্তিক মাসের অমাবস্যার দশম দিনে। মহারাজ শিবসিংহ ও তাঁর বিখ্যাত রানী মহাদেবী লখিমা দুজনেই ওঁকে বিশেষ পছন্দ করতেন এবং রাজ-অভিষেকের পর সাহিত্যিক অবদানের জন্য বিদ্যাপতিকে তাঁর নিজের গ্রাম দান করেছিলেন স্বীকৃতিরূপে। শিবসিংহের প্রশংসায় বিদ্যাপতি অবহট্‌ঠ ভাষায় লিখলেন 'কীর্তিপতাকা' এবং সম্পূর্ণ করেছিলেন সংস্কৃতে লেখা তাঁর ছোট গল্পের বিখ্যাত সংকলন 'পুরুষপরীক্ষা'। এই সময়েই লিখেছিলেন বহু সংখ্যক মৈথিলী গান, যার কিছু কিছু তিনি 'গোরক্ষবিজয়' নাটকের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

---

১. (ক) বিসফীর দলিল; এবং (খ) এই ঘটনার বর্ণনা আছে একটি অবহট্‌ঠ কবিতায়; দ্র. জার্নাল অব দি রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৮৯৫ এর প্রসিডিংস। চন্দা ঝা-র 'পুরুষপরীক্ষা'র অনুবাদের পরিশিষ্ট; জে. এ. এস. বি.; ১৯১৪-১৫, পৃ. ৪১৯।

মনে হয় শিবসিংহের সমসাময়িকদের মধ্যে বিদ্যাপতি খুবই সুনাম অর্জন করেছিলেন; ওঁর রচনাগুলিতে উল্লেখ রয়েছে শিবসিংহের এক খুড়তুতো ভাই রুদ্রসিংহের এবং অর্জুন ও কুমার অমরের। উনি একজন কায়স্থ মন্ত্রী অমৃতকর, মন্ত্রী 'মহেস' অথবা 'মহেসরা', রতিধর, শঙ্কর এবং জনৈক দামোদরেরও উল্লেখ করেন।

যখন মহারাজা শিবসিংহ মুসলমানদের হাতে পরাজিত হলেন ২৯৯ ল. সম্বতে, তাঁর 'লখিমা' নেপালের গ্রাম সপ্তরী জেলার রজা-বনৌলীতে ১২ বছর ছিলেন আত্মগোপন করে। ল. সং ২৯৯ সালে কবি ওখানে একটি কূপ খনন করিয়েছিলেন বলে জানা যায় এবং এখানেই উনি সংস্কৃতে পত্রলেখনপ্রণালীর একটি বই লেখেন, যার নাম ছিল 'লিখনাবলী'। ল. সং ২৯৯ থেকে ৩০৯ পর্যন্ত কবি মনে হয় 'শ্রীমদ্ভাগবতে'র প্রতিলিপি তৈরি করার কাজেই ব্যস্ত ছিলেন, যার একটি পাণ্ডুলিপি, কবির নিজের হাতের লেখায় অনুলিখিত, এখনও পাওয়া যায়। এই অনুলেখন মনে হয় সারা জীবন ভগবান কৃষ্ণ ও তাঁর প্রেমিকা রাধার পার্থিব প্রেম নিয়ে গীতিকবিতা রচনা করার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে করেছিলেন। তাঁর সাহিত্যিক জীবনের এই পরিবর্তন, যা এই সময়ে এসেছিল, হয়তো প্রায়শ্চিত্ত (বা পাপ-স্খালন) নয় — হয়তো এটা ঐ সময়ে উনি যে প্রতিকূল সময়ে মুখোমুখি হয়েছিলেন তার ফলে তাঁর উৎসাহ-উদ্দীপনা হারিয়ে ফেলার পরিণাম-স্বরূপ হয়েছিল। এও ঠিক যে যৌবন পার হয়ে আসার পর কবি আর এখন প্রণয়োদ্দীপক রচনা করতে চাইছিলেন না। তবু একথাও আমাদের মনে হয় 'ভণিতা' হিসেবে যে প্রচুর প্রেমের কবিতা আমরা আজ উত্তরাধিকার রূপে পাই যাতে লখিমা ও শিবসিংহের প্রেম রয়েছে বিধৃত, তা কবির এই দীর্ঘ পলাতক জীবনেই হয়েছে লেখা যে সময়ে অসুখী লখিমাকে সম্পূর্ণ 'ভাগবত' অনুলেখন করে পড়ে শোনানো ও সম্ভবত দেশীয় ভাষায় তার অংশবিশেষ গীতরূপে অনুবাদ করা এক কাজ হয়েছিল। এমনকি, লখিমার মৃত্যুর পরেও আমরা দেখি যে উনি লখিমাকে নিয়ে প্রেমের কবিতা লিখছেন। মহারাজা পদ্মসিংহ ও সম্ভবত মহারাজা ধীরসিংহের সময়ে উনি যে প্রেমগীতিগুলি লিখেছিলেন, আজও তা পাওয়া যায় না। এও নিঃসন্দেহে সত্যি যে বয়স বেশি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাপতিনিজেও প্রেমগীতি লেখার চেয়ে ধর্মশাস্ত্র ও কর্মকাণ্ড -বিষয়ক রচনার প্রতি বেশি উৎসাহী ছিলেন। রাজপণ্ডিতরূপে কবির দুঃখ-সাগরে নিমগ্না রানী লখিমাকে ভাগবত পড়ে শোনানোর ও ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব ছিল। তাই এও হতে পারে যে ভাগবত পড়ে শোনানোর সঙ্গে ওঁর নিজস্ব অনুভূতির কোনো সম্বন্ধ নেই।

লখিমার মৃত্যুর পর কবি পদ্মসিংহের রাজসভায় যান এবং তারপরে তাঁর বিধবা রানী বিশ্বাসদেবীর সভাসদ ছিলেন এবং এঁরই আদেশানুসারে রচনা করেন 'গঙ্গাবাক্যাবলী'। 'শৈবসর্বস্বসার'-এও উল্লেখ রয়েছে তাঁর পৃষ্ঠপোষিকার কথা। শিব ও গঙ্গা নিয়ে কবির গীতের অধিকাংশই এই সময়েই লেখা।

'বিভাগসার'-নামক স্মৃতি গ্রন্থে জানা যায় যে ওইনিবার রাজবংশের এই শাখা নিশ্চিহ্ন

হওয়ার পর কবি তাঁদেরই সমসাময়িক রাজা হরসিংহদেবের সভায় যান এবং মহারাজ হরসিংহদেবের (১৪৩৩ খ্রি.) অধীনেই এই গ্রন্থটির রচনা করেন। এই রাজারই রানী ধীরামতীর নির্দেশে উনি লেখেন 'দানবাক্যাবলী'। কিন্তু এঁর অধীনে লেখা কোনো প্রামাণিক কবিতা (বিদ্যাপতির) পাওয়া যায় নি।

এরপরে বিদ্যাপতিকে আমরা দেখি নরসিংহদেবের উত্তরসূরীর রাজসভায় — ধীরসিংহের (ল. সং ৩২১-৩২৭=১৪৪০-১৪৪৬ খ্রি.) অধীনে। এঁর রাজসভায় লেখা বিদ্যাপতির একটি মাত্র প্রামাণিক কবিতা পাওয়া যায়।

যে শেষ রাজার অধীনে বিদ্যাপতি গ্রন্থরচনা করেন তিনি হলেন ধীরসিংহের উত্তরসূরী মহারাজ ভৈরবসিংহ এবং এই সময়েই তিনি লেখেন 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী'। এই গ্রন্থে ভৈরবসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রসিংহের উল্লেখ রয়েছে। বলা হয় বিদ্যাপতি সভাসদ জীবন থেকে অবসর নেন ভৈরবসংিহের সময়েই [১]; প্রকৃতপক্ষে, তাঁর শাসনের পরের কোনো শাসকের সঙ্গে বিদ্যাপতির কোনো সম্বন্ধের বিষয়ে জানতে পারা যায়নি।

মনে হয় বিদ্যাপতি শেষ জীবন শান্তিতে নিজের গ্রামে অতিবাহিত করেন। উনি দুবার দার পরিগ্রহ করেন বলে জানা যায়। তাঁর প্রথম স্ত্রী সম্বল-সংকরী বংশের হরিবংশ শুক্রের কন্যা ছিলেন। এঁর দুটি পুত্র— হরিপতি ঠাকুর, যিনি ছিলেন পণ্ডিত ও কবি, এবং নরপতি ঠাকুর; আর ছিল দুই কন্যা। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী খণ্ডবা বংশের গোণ্ঢী ঠাকুরের পুত্র রঘু ঠাকুরের কন্যা ছিলেন, এবং তাঁর এক ছেলে বাচস্পতি ঠাকুর ও দুই কন্যা যার একজনের বিয়ে হয় সুপতমী-গংগৌলী পরিবারের জনৈক রামের সঙ্গে। আমরা ওঁর একটি পুত্রবধূর কথা জানতে পারি যার নাম চন্দ্রলেখা, যিনি ছিলেন খুবই উঁচুদরের কবি। মনে হয় তিনি হরপতি ঠাকুরের স্ত্রী ছিলেন, কারণ বিদ্যাপতির বংশে একমাত্র হরপতিই কাব্যচর্চার ঐতিহ্যকে অব্যাহত রেখেছিলেন। অন্যদের হয়তো বিয়ে হয়েছে, হয়তো হয়নি—- সঠিক জানা যায় না। একমাত্র হরপতিই কবি ছিলেন বলে জানা যায়।

কথিত আছে বিদ্যাপতি মহারাজ শিবসিংহের তিরোধানের ৩২ বছর পরে অনুভব করতে পারেন যে ওঁর দিন ঘনিয়ে এসেছে, যখন একদিন তিনি স্বপ্নে কালো ছায়া দেখতে পান। কথায় বলে স্বপ্নে মৃত মানুষের কালো ছায়া দর্শন মানে মৃত্যু আছে নিকটেই। শিবনন্দন ঠাকুর একটি জনপ্রিয় পুরাণের (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ) উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে এমন স্বপ্নের অশুভ ফল সাধারণত আট মাসের মধ্যে ফলে। অতএব, মহারাজা শিবসিংহ যে সময় তিরোহিত হন সেই সময়ের হিসেবে ল. সং ২৯৬-এর পৌষ মাস থেকে হিসাব করে শিবনন্দন ঠাকুর দেখিয়েছেন যে বিদ্যাপতি এই স্বপ্ন সম্ভবত ল. সং ৩২৮ সালের মাঘ ও ফাল্গুন মাসে দেখেছিলেন এবং ঠিক আট মাস পরে ল. সং ৩২৯-এর কার্তিক মাসে তিনি দেহত্যাগ করেন। এতে এই ঐতিহ্যেরই সমর্থন পাওয়া যায় যার অনুসারে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয় কার্তিক মাসের পূর্ণিমার ত্রয়োদশ দিনে।

১. দ্র. 'লিখনাবলী'র প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন, পৃ. ২।

খ্রিষ্টীয় সারণি হিসেবে এর মানে হলো বিদ্যাপতি ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের কোনো এক সময়ে মারা যান।

কবি কিভাবে কোন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সে বিষয়ে কয়েকটি গল্প প্রচলিত আছে। কথিত আছে, যখন শেষ সময় ঘনিয়ে আসে, তার আগে উনি নিজের কন্যাকে ওঁর গঙ্গাতটে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে বলেন। গঙ্গার ঘাটে পৌছনোর আগেই মরণ তাঁর কাছে পৌছায়। কিংবদন্তী আছে রাতারাতি গঙ্গায় বন্যা আসে এবং গঙ্গার জল এসে পৌছয় সেই স্থানে যেখানে কবি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ওঁর শবদাহস্থলে একটি শিবলিঙ্গ গজিয়ে ওঠে এবং এখনও এই শিবলিঙ্গ এবং বন্যার চিহ্ন দর্শকদের দেখানো হয়। পুরাতন দ্বারভাঙা জেলার বাজিতপুর গ্রামেই এই স্থানটি রয়েছে।

বিভিন্ন রাজা ও রানীর সভায় তাঁর এই দীর্ঘ জীবন যাপনের গল্প শুনলেই মনে হয় উনি বোধ হয় শুধুমাত্র একজন তোষামুদে পারিষদ মাত্র ছিলেন, জীবিকার জন্য যিনি একটি রাজসভা থেকে অন্য রাজসভায় যেতে বাধ্য হন। ওঁর ব্যক্তিগত জীবনের বিষয়েও এমনই কথা মনে হয়। দুটি বিবাহ ও অনেকগুলি সন্তানসন্ততি দেখে মনে হয় উনি এক সাধারণ স্বচ্ছল গৃহস্থ ও দুনিয়াদারীর জ্ঞানে গুণী মানুষ মাত্র। কিন্তু তাঁর প্রিয়তম বন্ধু মহারাজা শিবসিংহের রহস্যজনক অন্তর্ধান তাঁর মৃত্যুপূর্বের ৩২ বছরের একাকী ও হতাশাময় জীবনের অধ্যায়টি আমাদের কাছে কিছুটা কুয়াশাচ্ছন্ন। মনে হয় তাঁর পূর্বজীবনের বিরাট প্রভাব পড়েছিল পরবর্তী সময়ে। তাই ওঁর জীবনের শেষের ৩২টি বছর একটু অদ্ভুতভাবে কেটেছে যদিও প্রথম প্রথম বিদ্যাপতি নিশ্চয়ই আশা করেছিলেন যে তাঁর বন্ধু মহারাজা শিবসিংহ ফিরে আসবেন। একটি আশানুরূপ সফল স্বাভাবিক জীবন যাপন করা সত্ত্বেও যেভাবে উনি বেশ কিছু বছর ধরে 'ভাগবতে'র অনুলেখন করেন, তা থেকে মনে হয় যে উনি একজন ভক্তের মানসিকতা নিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছিলেন। জীবনের সায়াহ্নে তিন ভগবান শিবের একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে পড়েন— তাঁকে এভাবে চিত্রিত করার মধ্যেও আশ্চর্যের কিছু নেই। কথিত আছে ভগবান শিব তাঁর ভক্তি দেখে এতো তুষ্ট ছিলেন যে উনি নিজেই 'উগনা' নাম নিয়ে বিদ্যাপতির দাস হিসেবে তাঁর সেবা করেছিলেন এবং যখন কবি 'উন্মাদ'-প্রায় হয়ে গেছিলেন, তখন তিনি তাঁকে ছেড়ে চলে যান। শুক্ল যজুর্বেদের মাধ্যন্দিন শাখার রুদ্রাধ্যায়ে শিবকে 'উগ্র' বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এই পর্যায়ে কবির কবি-খ্যাতির চেয়ে শিব-ভক্তরূপেই অধিকতর সুনাম হয়েছিলো। একথা মনে করা অস্বাভাবিক নয় যে এই চরম ভক্তি এবং 'শিব'-এর জন্য' 'উন্মাদ' অনুসন্ধান আসলে তাঁর পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধুবর মহারাজ 'শিবসিংহ'-এর জন্যই

১. কৃষ্ণকায় মহারাজা শিবসিংহ যদি কবির কাছে তাঁর প্রেমিক স্বভাব ও যৌবনোচিত উদ্দীপনার জন্য 'কৃষ্ণ' বলে প্রতীত হয়ে থাকেন — যেমনটা পণ্ডিত রমানাথ ঝা 'পুরুষপরীক্ষা' গ্রন্থের কয়েকটি অংশের ভিত্তিতে দাবি করেছেন, তাহলে একথা খুবই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হবে যে জীবনের শেষে এসে তিনি তাঁকেই শিব বলে গণ্য করেছিলেন।

এবং এই জন্যই উগনার কিংবদন্তীর জন্ম হয়েছে। কারণ, একথা মনে করার কোনো কারণই নেই যে কবি কখনো সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করেছিলেন। বরং উনি তার পরও প্রেমগীতি রচনা করেছেন এবং নানান পার্থিব বিষয়ে নিবন্ধগ্রন্থ বা পাঠ্যপুস্তক লিখে গেছেন রাজ-পণ্ডিতরূপে তাঁর কর্তব্য পালনের জন্য। উনি একজন স্মার্ত গৃহস্থ ছিলেন এবং তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। উনি বৃদ্ধাবস্থা এবং জীবনের হতাশাপূর্ণ সময় শক্তি (দুর্গা), বিষ্ণু (কৃষ্ণ), শিব ও গঙ্গার ভক্তি ভাবনা নিয়ে অতিবাহিত করেছিলেন মাত্র। আমরা ভাবতেই পারি না যে জীবনের শেষে এসে উনি দীর্ঘকেশী, শ্মশ্রুগুম্ফময় একজন সন্ন্যাসী ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। উনি পরিপূর্ণ কর্মময় এবং জাগতিক সুখসমৃদ্ধিপূর্ণ একটি জীবন যাপন করেছিলেন জীবনের প্রথমার্ধে এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বয়স্ক, অধিকতর প্রজ্ঞাসম্পন্ন ও দুঃখী — বিশেষ করে তাঁর বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক মহারাজা শিবসিংহের অন্তর্ধানের দুঃখে শোকাহত হয়ে অধিকতর আধ্যাত্মিক এক ভক্ত হয়ে পড়েন, যদিও সেজন্য কোনোদিনও 'রাজ-পণ্ডিতরূপে' নিজের সভাকর্তব্যের কথা উনি ভোলেননি যেজন্য ওঁকে রাজা একটি গ্রামদান করে গৃহস্থ করে ফেলেছিলেন। যে-কোনো আর পাঁচজন মৈথিলী হিন্দুর মতো উনি গঙ্গার তীরে শান্তিতে ও সমাহিতভাবে মৃত্যুকে বরণ করেছিলেন।

কবির কাল

মিথিলায় কর্ণাট রাজাদের রাজত্ব শেষ হওয়ায় ঠিক পরেই বিদ্যাপতির জন্ম হয়, যে সময়ে মিথিলার নিরালা হিন্দুরাজ্যপাট সরাসরি চলে যায় ভারতের মুসলমান শাসককুলের হাতে। রাজ্যটির রাজনৈতিক স্বাধীনতা কিয়দংশে যদিও ওইনিবারের পুরানরুদ্ধার করেছিলেন, মোটামুটিভাবে মিথিলার সাধারণ মানুষের মনে ভয় ঢুকে গেলো যে ইসলাম এই এলো বলে। এই সময়ে এই দেশের মানুষ ও সংস্কৃতিকে একটা শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস হয়েছিলো রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যেও। মিথিলার সাধারণ মানুষদের জন্য একটা তরতাজা জীবন পদ্ধতি প্রস্তুত হয়েছিল যা আজও অবধি প্রচলিত থেকে মিথিলার মানুষজনকে একটা ঐক্য ও অচ্ছিন্নতা প্রদান করেছে।

এই প্রসঙ্গে বিদ্যাপতির পূর্বপুরুষদের অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। "গত ছ'শো বছর বা তার থেকেও বেশি সময় ধরে মৈথিলেরা একটা 'পদ্ধতি' (ধার্মিক ও সাংস্কৃতিক বিধিগ্রন্থ) মেনে আসছেন তাঁদের দৈনন্দিন জীবনে যা বিদ্যাপতির পূর্বপুরুষেরা আকলন করে গেছেন এবং সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রেই চণ্ডেশ্বর ঠাকুরের সাতটি 'রত্নাকর'কে মেনে চলেছেন।"[১] এভাবে রাজনৈতিক পরাধীনতা ও আসন্ন যুদ্ধের মুখে পড়ে ধূলিসাৎ হয়ে যাওয়ায় হিন্দুরা নিজেদের অস্তিত্বের ভিতকে আরো সুদৃঢ় করে নিতে

১. রমানাথ ঝা, 'পুরুষপরীক্ষা'-র ভূমিকা, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ.১৯।

চেষ্টা করছিল। এইজন্যই বিদেশী শাসন সত্ত্বেও মিথিলায় নিজস্ব দেশীয় কলা ও সাহিত্য চর্চা চলতে থাকলো এবং ব্রাহ্মণ্য মূল্যবোধ ও শান্তরসে সিক্ত কাজেরই ছিলো জয়। সমগ্র উত্তর ভারতে মিথিলাই একমাত্র রাজ্য ছিল যেখানে মুসলিম সংস্কৃতি জীবন ও দেশীয় সংস্কৃতির উপর সবচেয়ে কম প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। দেশীয় ও ভারতীয় ধাঁচের শিল্প ও সংস্কৃতি ও দেশীয় পাণ্ডিত্যই মিথিলায় চর্চিত ও বহুবিধভাবে বর্ধিত হতে থাকলো। প্রকৃতপক্ষে, দেশীয় সঙ্গীত ও দেশজ ভাষায় রচিত সাহিত্যের স্বর্ণযুগ ছিল এটা এবং তার কারণ এর আলোকেই পাওয়া সম্ভব। উত্ত র-পূর্ব ভারতের সমস্ত সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনাবলীর কেন্দ্রে পাওয়া যেতো মিথিলাকে; এর ভাষা মৈথিলী বিদ্যাপতির দ্বারা পরিচালিত হওয়ার পর নতুন যুগের কণ্ঠস্বর রূপে উচ্চ সম্মানের অধিকারী হয়েছিল, পরিচিত হয়েছিল নব সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ হিসেবে। সমস্ত উত্তর-পূর্ব ভারতের দেশীয় ভাষায় রচিত সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশের নিরিখে মৈথিলী ভাষা ও সাহিত্যের মতো অন্য কিছুই এতটা প্রভাব বিস্তার করেনি। এইভাবে অন্তত তিন শতক ধরে সমস্ত নেপাল, অসম, বাংলা ও ওড়িশায় মৈথিলীর প্রভাব ছিল অভূতপূর্ব; অবশ্য ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ ও প্রয়োজন বিশেষের উপর নির্ভর করে তারই মধ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ধ্বনিরূপে পরিবর্তন সাধন করা হয়েছিল।

ঘটনার স্রোত যখন এইরকম ভাবে বইছিল তখনই সৌভাগ্যবশত বিদ্যাপতির মতো একজন প্রতিভাবান মানুষ মিথিলায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। এটা মানতেই হবে যে তিনি শাস্ত্রের প্রচণ্ড ও গভীর জ্ঞানী ছিলেন না; তিনি ছিলেন একজন বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন সাহিত্যিক মানসিকতার মানুষ। উনি দেশীয় নব্যভাষা-গুলির গুরুত্ব বুঝেছিলেন এবং এই জনভাষার শ্রেষ্ঠতার কথা জোর গলায় ঘোষণা করেছিলেন। উনি এমনই দক্ষতার সঙ্গে ও নিখুঁতভাবে তার ব্যবহার করেছিলেন যার ফলে উনি মিথিলার ঘরে ঘরে সাধারণ মানুষদের মধ্যেও এমনভাবে প্রবেশ করেছিলেন যা শুধুমাত্র বিশ্বসাহিত্যের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ মানুষই নিজেদের দেশবাসীকে এমন সৎপ্রভাবে প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন— যেমন শেক্সপীয়র, কালিদাস, তুলসীদাস কিংবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অতীতে এবং বর্তমানেও লাখ লাখ মৈথিল ওঁর গান গেয়েছে বিশেষ করে ওঁর রচিত ধর্মীয় ও বিশেষ আবেদনসম্পন্ন গানগুলি। মিথিলায় গীতের পরম্পরার সঙ্গে বিদ্যাপতির নাম এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল যে লোকেদের মধ্যে প্রতিটি গানের সঙ্গে শেষে বিদ্যাপতির নাম ('ভণই বিদ্যাপতি') দেয়ার একটা রেওয়াজ হয়ে গেছিল— একটুও না ভেবে যে গানটি তাঁর রচনা কিনা? বিদ্যাপতির গোসাউনি (দেবী শক্তি), পবিত্র নদীমাতা গঙ্গা এবং ভগবান শিবকে নিয়ে লেখা মন্ত্রগীতি, সবচেয়ে বড়ো কথা তাঁর দীর্ঘ গীতি, 'অনিয়মিত' গানগুলি এবং পালাপার্বণের গানগুলি আজও জনপ্রিয় রয়েছে। তাঁর মহানতার সবচেয়ে বড়ো পরিচয় হলো লোকে তাঁকে জানে ও মনে রাখে একই সঙ্গে 'প্রেমের কবি' ও

'ভক্তির কবি' হিসেবে।[১] এই দিক দিয়ে তাঁর তুলনা সহজেই দেয়া সম্ভব ইংরেজ কবি জন ডন (John Donne)-এর সঙ্গে। আশ্চর্যের ব্যাপার মনে হলেও ডন-এর মতোই তিনি জ্ঞানীগুণী (বিশেষ করে যাঁরা সংস্কৃত কাব্য সাহিত্য ভালো করে পড়েছেন।) ও আধুনিকদের কবি হলেও এমন কিছু সরলতম কবিতা রচনা করেছেন যা সাধারণ নারী-পুরুষ গাইতে ও উপভোগ করতে পারবে। সংস্কৃতে লেখা তাঁর 'মানুষের পরীক্ষা' এবং দুর্গামাতার আরাধনা প্রভৃতি বিষয়ক গ্রন্থ আজও আদৃত ও অনুসৃত হয়। অবশ্য ওঁর কিছু কিছু রচনা যা পরবর্তীযুগের শত শত কবির কাছে আনন্দের উৎসধারা ও অনুপ্রেরণা হয়ে ছিল, তা আজ আর প্রচলিত নয়, যেমন তাঁর নাটকগুলি। অবশ্য এর কারণ সাহিত্যের এইসব বিধার উপযোগিতা ও জনপ্রিয়তা পরে নিঃশেষিত হয়ে গেছিল। যাই হোক, যেমনটা এখানে দেখানো হয়েছে, বিদ্যাপতির ব্যক্তিত্ব ও প্রভাবকে সম্পূর্ণ উত্তর-পূর্ব ভারতে সবচেয়ে শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হতো এবং এর ফলে অন্ততপক্ষে তিন শতাব্দী ধরে নন্দনতত্ত্ব ও সাহিত্যিক রসাস্বাদনের একটা মানের সৃষ্টি হয়েছিল। এবং সঙ্গীত ও নাট্যকলা চর্চার একটা মাধ্যমরূপে পরিচিত হয়েছিল তাঁর রচনাশৈলী।

কবির যে ব্যক্তিত্ব এইসব ছবি থেকে ফুটে ওঠে, বিশেষ করে তাঁর সারাজীবনের ক্রিয়াকর্মের থেকে — যার মধ্যে পড়েছে রাজসভার দর্শন এবং রাজার কাজে লাগে এমন প্রায় সমস্ত বিষয়েই ও সব পালা-পার্বণের জন্যই গ্রন্থ রচনা করা (বিশেষ করে শিক্ষাগ্রন্থও) যে জন্য ওঁর নামের আগে 'রাজপণ্ডিত'-ও জোড়া হতো— এসব থেকে মনে হয় তিনি ছিলেন একজন অসম্ভব সক্রিয় একজন মানুষ, যিনি ছিলেন সব বিষয়ে উৎসাহী, 'দেসিল বঅনা'র (অথবা নব্য দেশীয় ভাষার) অসীম গুরুত্ব নিয়ে অত্যন্ত সচেতন ও সতত চিন্তাশীল, কাব্যরচনা, নাটক ও সঙ্গীত আদি কলায় প্রবীণ, একই সঙ্গে সংস্কৃত, অবহট্‌ঠ ও মৈথিলী ভাষায় পারদর্শী এবং একই সঙ্গে একজন পাকাপাকি গৃহস্থ যিনি গার্হস্থ্য জীবনে ছিলেন অত্যন্ত সুখী — বেঁচেছিলেন খুব বিত্তশালী ও সুখী মানুষ রূপে ও উপভোগ করেছেন জীবনের শেষ কণা অবধি ও মারা গেলেন অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে যার আগে শেষ জীবনে উনি ঈশ্বরভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

তাঁর রচনাসমূহ

১. সংস্কৃত

বিদ্যাপতির যা কিছু সৃষ্টি তার মূলে রাজসভার সঙ্গে ওঁর যোগাযোগ। একাধিক প্রজন্মের জন্য ইনি ছিলেন রাজ-পণ্ডিত। একাধিক বিষয়ে ওঁকে শিক্ষাগ্রন্থ লিখতে হয়েছিল— এমনও যা রাজাদের ও রানীদের ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে সহায়কও ছিল। উনি লিখেছিলেন শিবঠাকুরের পূজা-বিধি ('শৈবসর্বস্বসার'), গঙ্গা ('গঙ্গাবাক্যাবলী'), এবং দুর্গার

১. এই প্রসঙ্গে (আকবরের সমসাময়িক) আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী'-তে তাঁর সাহিত্য কীর্তির বর্ণনা উল্লেখযোগ্য, যেখানে উনি বিশেষ করে বিদ্যাপতির 'লাচারী' (শিব ও গঙ্গার ভক্তিমূলক গীত) এবং কাব্যে তাঁর সকাম প্রেমের উন্মাদনার উল্লেখ করেছেন।

('দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী') আরাধনা গ্রন্থ — নানান ধরনের দানের প্রক্রিয়া ('দানবাক্যাবলী') এবং গয়া-শ্রাদ্ধের উপলক্ষে যে প্রণালী গ্রহণ করতে হবে তার বিধি ('গয়াপত্তলক') এবং এসব ছাড়াও সারা বছর গৃহস্থদের যে নানান পূজা-পার্বণ ও সাংস্কৃতিক উৎসবাদির মধ্যে দিয়ে যেতে হয় সেসবের বিধিবিধান ('বর্ষকৃত্য')। ওঁর একটি সুন্দর হস্তলিপির গ্রন্থও ('লিখনাবলী') আছে যা ব্যবহার করে জনসাধারণ রাজকীয় শাসনে নিজের রাজকীয় কাজ করতে পারে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও সুচারু ভাবে। তিনি আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেন যার নাম ছিল 'পুরুষপরীক্ষা' আছে যা ব্যবহার করে একজন মানুষের চরিত্র বিষয়ে জানা সম্ভব এবং যার সাহায্যে রাজা নিজের অধীনস্ত মানুষজনদের সহজে চিনতে ও জানতে পারেন। শেষত ওঁকে একটি গবেষণা-গ্রন্থও লিখতে হলো মানুষ মারা গেলে উত্তরাধিকারীরা ঠিক কিভাবে সুষ্ঠুরূপে তার সম্পত্তি ভাগ করতে পারবেন সে বিষয়ে (নাম দিলেন 'বিভাগসার')।

এই সমস্ত কৃতিতেই বিদ্যাপতি একথার প্রমাণ দিলেন যে উনি পুরাণ ও স্মৃতির সম্যক জ্ঞানী ছিলেন ও একজন সার্থক শাসকও ছিলেন। অবশ্য এইসব গ্রন্থ থেকে বোঝা যায় যে ওঁর অসীম ক্ষমতা ছিল বিভিন্ন সত্যের চয়নে ও কলনে— কিন্তু সর্ববিষয়ে যে জ্ঞানের গভীরতা ও সুপরিপক্কতা ছিল পাণ্ডিত্যে — তা নয়। সত্যি কথা বলতে গেলে ওঁর সমসময়ে যেসব সংস্কৃত বিশারদ মিথিলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের তুলনায় সংস্কৃত চর্চার ক্ষেত্রে বিদ্যাপতি অবশ্যই মহান বিদ্বান নন। ওঁর লেখা এমন কোনো শাস্ত্রীয় গ্রন্থ নেই সংস্কৃতে যা ওঁর কালেরই পক্ষধর মিশ্র, বাসুদের মিশ্র, শঙ্কর মিশ্র ও বর্ধমান উপাধ্যায় অথবা শ্রীদত্ত মিশ্র, মধুসূদন মিশ্র, বাচস্পতি মিশ্র, মিসরু মিশ্র, রুদ্রধর মিশ্র, ভবনাথ মিশ্র, মুরারী মিশ্র কিংবা জগদ্ধার বা রুচিপতির মতো পণ্ডিতের কৃতির সঙ্গে তুলনীয়। সেযুগের তুলনায় তাঁর সংস্কৃত কৃতিগুলি খুব উল্লেখযোগ্য নয়, খ্যাতিপ্রাপ্তও নয়।

২. অবহট্‌ঠ

একথা মানতেই হবে যে মৈথিলীর একজন বর্ণনাত্মক ও গীতিকবিতার কবি হিসাবেই বিদ্যাপতি তাঁর সমসাময়িক সবার ওপরে ছিলেন। তাঁর বর্ণনামূলক ও গাথাবহ কাব্যগুলি সবই মৈথিলী অবহট্‌ঠের প্রকৃষ্ট উদাহরণ তবে ওঁর গীতিকবিতাগুলি ছিল সম্পূর্ণভাবে মৈথিলীতে। এই মৈথিল অবহট্‌ঠ আধুনিক ভাষা এবং মাগধী প্রাকৃতের মধ্যে একটা যোগসূত্র বিশেষ ছিল।

বিদ্যাপতির প্রথম বর্ণনাত্মক কাব্য হলো 'কীর্তিলতা'[১] যাতে আছে ৮০০টি পংক্তি—

১. ম. ম. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সম্পাদিত (বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদ সহ, ১৯৪২), এবং ড.বাবুরাম সাক্সেনার দ্বারাও সম্পাদিত ১৯৩১-এর সংস্করণে (হিন্দি অনুবাদ সমেত)। আধুনিক মৈথিলীতে ড. উমেশ মিশ্র দ্বারা অনূদিত (১৯৫০)। দুটি বিশ্লেষণাত্মক বিদগ্ধ সংস্করণের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে ড. বাসুদেব শরণ অগ্রবাল ও ড. হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, বারাণসী (১৯৬৭) কর্তৃক এবং রমানাথ ঝা (১৯৭০), পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় -দ্বারা।

চার ভাগে বিভক্ত, প্রতিটি ভাগকে বলছেন 'পল্লব' (= পাতা অথবা অধ্যায় — 'লতার')। এতে আছে প্রধানত ছন্দোবদ্ধ স্তবক যার মধ্যে পড়ছে দোহা, চৌপাই, ছন্দ এবং কিছু বিলুপ্ত অপভ্রংশ ও প্রাকৃত ছন্দের ব্যবহার — তবে এতে কিছু গদ্য অংশও রয়েছে।

এই কাব্যের বিষয়বস্তু একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এতে দেখানো হয়েছে কিভাবে মিথিলার রাজ্যশাসন একজন মুসলিম আক্রমণকারী অসলানের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া সম্ভব হলো মহারাজকুমারদ্বয় বীরসিংহ ও কীর্তিসিংহের পক্ষে (এই কীর্তিসিংহের প্রশংসাতেই কাব্যটি রচিত হয়েছিল)।

কাব্যের গঠন বলতে দেখা যাচ্ছে শুরু হচ্ছে একটি ভৃঙ্গ (ভ্রমর) ও তার পত্নীর মধ্যে বার্তালাপ দিয়ে। প্রথম অধ্যায় বলতে দেশের শাসক রাজা কীর্তিসিংহের স্তবগান দিয়ে আরম্ভ হচ্ছে এবং মনে হয় যখন এই গ্রন্থের রচনা হচ্ছিল তখন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জীবিত ছিলেন না। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কুমারদের পিতার হত্যা বর্ণিত হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে কিভাবে তারা জৌনপুরের বিখ্যাত শারকী রাজা ইব্রাহিম শাহের সাহায্য চাইছেন ।এসবই কবিকে জৌনপুর শহরের বর্ণনার একটা সুন্দর সুযোগ করে দিয়েছে যার ফলে আমরা বেশ বাস্তবোচিত ও যথাযথ নগর-বর্ণনা পাচ্ছি। তৃতীয় অধ্যায়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে মুসলিম রাজাদের যুদ্ধযাত্রার একটা বিস্তারিত বর্ণনা পাচ্ছি এবং তারই সঙ্গে জানতে পারছি দুই রাজকুমারের কথা যাঁরা সাহায্য চেয়ে উৎকণ্ঠায় প্রতীক্ষায় দিন গুণছেন। শেষে চতুর্থ অধ্যায়ে এসে আক্রমণকারী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে মিথিলা ও তার মিত্রবাহিনীর ভীষণ যুদ্ধের বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে । এই ঘটনায় বীরত্বের এবং মিথিলার রাজ্য পুনরুদ্ধারের কাহিনী—দুইই সুষ্ঠুভাবে বর্ণিত হয়েছে।

মধ্যযুগের শহরের ও সেযুগের সৈন্যবাহিনীরও ছবির মতো প্রকৃত বর্ণনা রয়েছে এই কাব্যে। কবি উদ্যান, সেতু, নদীতীর, পুষ্করিণী, গৃহ ও মন্দিরের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন এখানে। তাছাড়া পথে ও গৃহে নরনারীর বর্ণনাও খুবই আকর্ষক।

এছাড়া এই কাব্যে বারবণিতাদের বর্ণনা এমন সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন কলমের আঁচড়ে যে এই চিত্রায়ণ হয়েছে প্রভাবশালী ও প্রত্যক্ষ—অথচ অতিরিক্ত অলঙ্করণ কিছু নেই।

এই পাঠে আমরা প্রাচীন গদ্যের কিছু সুন্দর উদাহরণ পাচ্ছি। এখানে 'বর্ণরত্নাকর'-এর মতো বিষয়সূচি নেই, কোনো উদ্ধৃতির সূচিও নেই; তবে স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট বাক্যাবলী রয়েছে আর আছে একটা পরিকল্পিত চিন্তার পরিচয়। অনুপ্রাস ও ধ্বনিরণন — দুইই আছে তবে উপমা এবং উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার এখানে খুবই আকর্ষণীয় ও প্রভাবশালী। শ্রী কে. পি. জয়সওয়াল বলেন, "বিদ্যাপতির বর্ণনায় কোনো উদ্ভট কিছুর সংমিশ্রণ নেই। এখানে কাব্যের চেয়ে ইতিহাসের অংশই বেশি। নিজের বর্ণনার মাধ্যমে ইনি যেন পাঠকদের নিয়ে যেতে পারেন সেযুগের শার্কি রাজধানীতে।"[১]

১. বিহার ও ওড়িশা রিসার্চ সোসাইটির জার্নালের তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয়-চতুর্থভাগে ২৯৮ পৃ. দ্র.—যেখানে শাস্ত্রীর 'কীর্তিলতা'-সংস্করণের আলোচনা রয়েছে।

বিদ্যাপতি নিজের বর্ণনায় মানবীয় স্পর্শ আনতে পেরেছেন যেখানে যেখানে প্রয়োজন সেখানে— যেমন, রাজকুমাররা যখন মায়ের কথা ভাবছেন বা জৌনপুরের পথে যখন তাঁরা নানান কষ্টের মুখোমুখি হচ্ছেন অথবা যখন এক মুসলিম সৈন্যদলের মধ্যে থেকেও নিজেদের ধর্মীয় শুদ্ধতাকে জিইয়ে রাখতে পারছেন।

সব মিলিয়ে গ্রন্থটি একটি উল্লেখযোগ্য সুন্দর রচনা। এই গ্রন্থটিকে একজন যুবক-কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু কবির বয়স তখন চল্লিশ বছর পার হয়ে গেছে। তাই তখন তাঁকে আর ঠিক যুবক-কবি বলা চলে না। তবে 'কীর্তিলতা'-র আগে ওঁর রচনা বলতে কোনো সংস্কৃত বা নব্যভাষার গ্রন্থ আছে বলে জানা যায় না। এ থেকে গ্রন্থটির ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যেরও ব্যাখ্যা মেলে। কবি সম্ভবত তখনও গদ্যে গ্রাম্যভাষার ব্যবহার করতে অরাজি ছিলেন সরাসরিভাবে। উনি এমন এক গদ্যভাষায় লেখার সিদ্ধান্ত নেন যা সাধারণ মানুষের পক্ষে বোধগম্য ছিল। অথচ উনি তখনও এমন ভাষা ব্যবহার করার সাহস করেননি যা উচ্চশ্রেণীর মানুষের কথ্যভাষার থেকে খুবই আলাদা। তাই উনি নিজের 'দেসিল বঅনা'র সঙ্গে মিশিয়ে ফেলছেন অপভ্রংশ। কবিতা তখন মানুষের কথ্যশৈলীর ছাঁচে রচিত হতে পারতো কারণ তার সঙ্গে মেশানো ছিল কবিতার সঙ্গীতে উত্তরণের প্রশ্ন অথবা কবিতাগুলিতে স্পষ্টভাবে ছন্দ ও অন্ত্যমিল ছিল গুরুত্বপূর্ণ। আর এও ধরা হতো যে বিষয়বস্তুর দিক থেকে কবিতা অনেক সহজ-সরল।

তবে একথা বলা ভুল হবে যে এই রচনা ছিল অপূর্ণ ও ত্রুটিতে ভরা। ইদানীং পণ্ডিত রমানাথ ঝা এই রচনাকে বাতিলের পর্যায়ে রেখে এটিকে "কুশ্রী, অসমান ও গ্রাম্যতায় ভরা" বলে বর্ণনা করে বলছেন "এতে মিষ্টতা ও স্পষ্টতা পুরোপুরিভাবে অনুপস্থিত" এবং এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে এটা সম্ভবত বিদ্যাপতির রচনা নয়। ইনি বলছেন "সম্পূর্ণ 'কীর্তিলতা'-র পাঠেই মনে হয় এটা একটা সাধারণ কবিযশপ্রার্থী নতুন লেখকের রচনা যার ভাষার উপর আদৌ কোনো দখল নেই কিন্তু যার তবু লেখার ইচ্ছা, নিজের কল্পনাকে প্রকাশের স্বাধীনতা দিয়ে — কোনো কাব্যিক সততা বা পরিমাপের তোয়াক্কা না করেই"। যে কারণটি প্রকৃত কারণ বলে মনে হয় পণ্ডিত ঝা-এর এই কবিতার শৈলীর ত্রুটি বিষয়ে তা হলো এই যে উনি সম্ভবত একথা মেনে নিতে পারছেন না যে বিদ্যাপতি মহারাজা শিবসিংহ ছাড়া আর কোনো কোনো শাসকের (বিশেষ করে যেখানে কোনো শাসকের সঙ্গে শিবসিংহের চরিত্রগত পার্থক্য রয়েছে) প্রশংসায় অথবা মিথিলার ওপর মুসলমান বিজয়ের বিষয়ে কাব্য রচনা আদৌ করতে পারেন। অতএব উনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে এটি নিশ্চয়ই বিদ্যাপতি নামেরই

আর একজন কবির রচনা — সম্ভবত সেই কবির কাব্যরচনা যিনি ভণিতায় ওইনিবার রাজা ভোগীশ্বরের প্রশংসায় একটি মৈথিলী কবিতা রচনা করেছিলেন। অথবা এও হতে পারে যে যদি সত্যিই এটি বিদ্যাপতি দ্বারা রচিত হয়ে থাকে তাহলে এই কাব্যটি হয়তো জৌনপুরের ইব্রাহিম শাহের বন্দনা রূপে রচিত হয়েছিল,স্পষ্টতই তাঁকে সন্তুষ্ট ক রার জন্য এবং ১৪০৬ খ্রিষ্টাব্দে মহারাজা শিবসিংহের চূড়ান্ত পরাজয়ের পর যাতে বিজয়ী জৌনপুরের যবন-সেনার হাতে মিথিলা তছনছ না হয়ে যায় সেজন্য লেখা হয়েছিল।

তবে বেশিরভাগ ব্যাখ্যা— যা পণ্ডিত ঝা দিয়েছেন— তার পেছনে এই ধারণা কাজ করছে যে ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে এই কাব্যে বর্ণিত সত্যের কোনো মিলই নেই। কিন্তু যদি সত্যিই এমন অমিল ও অসুবিধা থেকেও থাকে, তা থেকেই এই সিদ্ধান্তে আসা যায় না যে কাব্যটির উৎস ছিল কোনো গলদ বা অনৃতের আশ্রয়। মনে হয় এখানে মহারাজা কীর্তিসিংহের একটি বন্দনা-গীতিকে নিতে হবে — যিনি সন্তানহীন ছিলেন ও ছিলেন শিবসিংহের পূর্বপুরুষ। এমন কিছু নেই যে যা থেকে মনে করা যেতে পারে যে মহারাজা শিবসিংহের বংশ মহারাজা কীর্তিসিংহের বংশকে বৈরী মনে করতো। তার অর্থ এই অন্য আরো অনেক আন্দাজী কথার মতো পণ্ডিত রমানাথ ঝা-এর এই কথাও কোনো বিশ্বাসযোগ্য ও নির্দিষ্ট প্রমাণের উপর ভিত্তি করে বলা হয়নি। একথা অবশ্যই মানতে হবে যে 'কীর্তিলতা' ছিল একটি প্রাচীনপন্থী অবহট্‌ঠ কৃ তি যাতে যে-কোনো 'প্রেমকথার' পক্ষে আবশ্যিক সব গুণই ছিল— অতিশয়োক্তি, বর্ণনার মধ্যে অতিরিক্ততা ও ইতিহাস- বিমুখতা।

কবির পরবর্তী অবহট্‌ঠের রচনা হলো একটি কবিতা যাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বর্ণনা রয়েছে, যে ঘটনাটি হলো মহারাজা শিবসিংহের সিংহাসনারোহণ। তবে এখানে রচনাটির প্রামাণ্যতা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে কারণ এতে যে লক্ষ্মণ সংবতের সঙ্গে শকাব্দের সম্বন্ধের হিসাব দেওয়া আছে তার ভঙ্গি সেযুগের প্রচলিত মিথিলার রীতি অনুযায়ী নয়— বরং আধুনিক কালের পরিবর্তিত শৈলীর মতই।

তবে বিদ্যাপতির শেষ অবহট্‌ঠ কৃতি 'কীর্তিপতাকা' নিশ্চিতরূপেই একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। কিছুদিন আগে ম. ম. ড. উমেশ মিশ্র এটির সম্পাদনা করেছেন। এটির মূল আবিষ্কার নেপালে 'কীর্তিলতা'র পাণ্ডুলিপির সঙ্গেই হয়েছিল যা ম. ম. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রথম পেয়েছিলেন। এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি 'কীর্তিলতা'-র পাণ্ডুলিপি থেকে প্রাচীনতর এবং তার তারিখ হলো ২৪৬ ল. সং (= ১৫৪৫ খ্রি.), কিন্তু এটি খুবই বিনষ্ট ও বিকৃত পাণ্ডুলিপি।

এই গ্রন্থের নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে কবিতাটি একটি বন্দনাগীতি। সম্ভবত

এটি অর্জুন রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় লেখা যাঁকে ত্রিপুর সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র বলে চেনা যায়। এই ত্রিপুর সিংহ ছিলেন মহারাজা ভবসিংহের (১৩১৭ খ্রি.) পুত্র— যে ভবসিংহের উল্লেখ রয়েছে বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতা'-য়। এখানে বিদ্যাপতির পরবর্তী কবিতার সরক্ষক মহারাজ ধীর সিংহের (১৪৪০-১৪৭৫ খ্রি.) পুত্র জনৈক কুমার জগন্নারায়ণের সঙ্গে মেলানো যায় জগৎ সিংহকে — যিনি এখানে অর্জুন রায়ের মতোই সংরক্ষকরূপে উল্লিখিত হয়েছেন। তবে এটি সম্ভবত লেখা হয়েছিল মহারাজ শিবসিংহের (১৪১৬ খ্রিষ্টাব্দে) আকস্মিক অন্তর্ধানের পর। এটার উদ্দেশ্য ছিল কাব্যের মাধ্যমে তার মহানতা বর্ণনা করা।

এই পাঠটিও বেশ অস্পষ্ট ও বিকৃত এবং পরস্পরের সঙ্গে সংবদ্ধ কোনো বর্ণনা বা গল্প এ থেকে বোঝা যায় না। তবু এখানে এর উপজীব্য বর্ণনার একটা চেষ্টা করা হলো:

"কবি কাব্যের আরম্ভে সন্নিবিষ্ট করেছেন তিনটি শুভার্থক শব্দ দিয়ে— যা সংস্কৃতে রচিত হয়েছিল। প্রথমটিতে শিবের প্রেমভাবে উপবিষ্ট অর্ধনারীশ্বর রূপের বন্দনা স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয়টিতে উনি সরস্বতী— বিদ্যার দেবীর আশীর্বাদ চাইছেন। তৃতীয়টিতে উনি গণেশ ভগবানের চরণে আশ্রয় নিচ্ছেন সমস্ত বাধা বিঘ্ন দূর করার জন্য তাঁর 'বিশাল হস্তীসুলভ কান ও চিৎকার' দিয়ে।

"এরপর কবি নিজের কবিতার বিষয়ে কয়েকটি গর্বিত মন্তব্য করেছেন। উনি আশা ব্যক্ত করেছেন যে বিদ্বান পণ্ডিতেরা ওঁর কাব্য মাধুরীর আস্বাদ করবেন ওঁর কবিতার খ্যাতির কথা জেনে। 'কীর্তিলতা'র মতো এখানেও উনি আলোচনা করছেন যে পরিশীলিত মানুষ ওঁর কবিতা নিয়ে কী করবেন! ওঁর বক্তব্য মনে হয় এই যে অজ্ঞানী ওঁর কবিতায় অনেক দোষ খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন কিন্তু যাঁরা পণ্ডিতজন তাঁরা এই কবিতায় নানান গুণ আবিষ্কার করতে পারবেন।

"এরপর উনি অর্জুন রায়ের প্রশংসা করছেন। এও বলছেন যে 'নব জয়দেব' রূপে উনি এই বন্দনাগীত গাইছেন যা কবিতার অলঙ্কার বিশেষ। এখানে অর্জুন রায়কে ধার্মিক, সুবিবেচক এবং পৃথিবীত দেবপ্রতিম ও সর্বপ্রকার যুদ্ধের কুশলতায় পারদর্শী বলে বর্ণনা করেছেন।

"এরপর উনি জগৎ সিংহেরও প্রশংসা করছেন যার বিষয়ে উনি বলছেন যে ওঁর শরীরে তিনটি পৃথিবীর শক্তি সমাহিত সমস্ত শত্রুরাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য।

"আবার কবি অর্জুন রায়ের রাজারূপে প্রশংসা করছেন এরপর। বর্ণনা দিয়েছেন যে কিভাবে রাজকীয় কর্তব্য মনোযোগ সহকারে পালন করেন এবং কত আকুলভাবে ভোরবেলায় ঈশ্বরবন্দনা করেন এবং কত সাবধানতার সঙ্গে নিজে সৈন্যদলের প্রতিটি বিভাগের প্রতি লক্ষ রাখেন। এরপর সঠিক মানুষ চেনার নানান

পদ্ধতি নিয়ে উনি আলোচনা করেছেন। এই বিষয়টি মনে হয় ওঁর খুবই প্রিয়, কারণ উনি এই নিয়ে একটা গোটা বই লিখেছেন— 'পুরুষপরীক্ষা'।

"পরবর্তী পর্যায়ে তিনি তিরহুত এবং এখানকার শাসকদের প্রশংসা করেন। রাজার দুটি কর্তব্যের কথা আলোচনা করছেন উনি — ওঁকে প্রেমে হতে হবে কুশলী ও যুদ্ধে হতে হবে দক্ষ যদি ওঁকে রাজা রূপে সফল হতে হয়। এই প্রসঙ্গে উনি কৃষ্ণের অবতার রূপে জন্মগ্রহণের বিষয়ে নিজস্ব অবধারণার কথা বলেন। ওঁর মতে, যেহেতু সীতার থেকে পৃথকে থাকার ফলে রামচন্দ্র বৈবাহিক সুখ উপভোগ করতে পারেননি, তাই ওঁকে আবার কৃষ্ণরূপে জন্ম নিতে হয়েছিল নানান ধরনের যৌন প্রেমানন্দ পাওয়ার জন্য যাতে সংস্কৃত কাব্যে বর্ণিত আদর্শ রাজজনোচিত এই কর্তব্যটি উনি করতে পারেন।

"এরপর আলোচনা শুরু হয় প্রেম করার নানান রীতি-প্রকৃতি নিয়ে যার জন্য কৃষ্ণ নিজের জীবনে এতো সফল হতে পেরেছিলেন। এই সব ধরনের নায়িকাদের নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে— তাছাড়া সবিস্তরে নানা ধরনের যৌন আনন্দ ও ক্রীড়া নিয়ে বর্ণনা রয়েছে। এগুলির সঙ্গে ওঁরই রচনা 'গোরক্ষবিজয়'-এর প্রেমগীত ও কোনো কোনো অংশের সঙ্গে আশ্চর্যরকমের সাদৃশ্য আছে।

"এরপর কৃষ্ণের কাহিনীর এমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যেন কৃষ্ণ ঈশ্বর নন, বরং সাধারণ একজন নায়ক— সম্ভাবত ওঁর ইচ্ছা ছিল এখানে মহারাজ শিবসিংহের (কৃষ্ণ-) বর্ণের প্রশংসায় কিছু অংশের রচনা করা। এই ব্যাখ্যার সঙ্গে মিলে যায় মহারাজ শিবসিংহের নাম বারবার এই কবিতার পরের বহু বর্ণনা ও ঘটনায় ঘুরে ফিরে আসার ব্যাপারটা। ফলে এটাই দেখানো ওঁর উদ্দেশ্য যে সফল রাজা হওয়ার দুটো বিশিষ্টতাই শিবসিংহের মধ্যে ছিল।

"এরপরের প্রাপ্ত অংশে দেখতে পাচ্ছি যেখানে যুদ্ধবর্ণনা আছে, সেখানে মহারাজা শিবসিংহ নিজে যুদ্ধ করছেন। এবং শয়ে শয়ে সৈন্যকে আহত করছেন। শতসহস্র মৃত সৈনিক . . . যারা মাটিতে পড়ে আছে তাদের মাথার চুল দেখে মনে হচ্ছে পৃথিবীটা গাছে গাছে ভরা আর মনে হচ্ছে সমস্ত বিশ্বই তাঁর শক্তিরমদমত্ততায় থর-থর করে কাঁপছে।

"দেখানো হচ্ছে শত্রুসেনা পালিয়ে যাচ্ছে এবং পশ্চাদ্ধাবিত সেনার বর্ণনা একটা আছে একটি অনুচ্ছেদে। এই সেনারা ফিরে গিয়ে সুলতানকে যুদ্ধে তাদের দুর্দশার কথা বলছে। আর সুলতান প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছেন সব শুনে, এবং নতুন করে যুদ্ধের প্রস্তুতি করতে বলছেন। এই কাব্যের সবচেয়ে সুন্দর অংশ হলো এই যুদ্ধের প্রস্তুতির অংশটি। এইসব পদ্যাংশ থেকেই বোঝা যায় যে এটির রচয়িতা বিদ্যাপতি স্বয়ং।

"সত্যিকারের যুদ্ধের বর্ণনা দেওয়া হয় অত্যন্ত কাব্যিক শৈলীতে এবং সুরুচিপূর্ণভাবে।

"বলা হয়েছে এমনকি দেবতারাও নীচে নেমে এলেন মহারাজ শিবসিংহ কিভাবে এক সাংঘাতিক শক্তিশালী সৈন্যদলের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন তা দেখার জন্য এবং দেখা যাচ্ছে যে বীরেরা এই যুদ্ধে প্রাণ হারাচ্ছেন তাঁদের স্বাগত জানাবার জন্য স্বর্গে প্রস্তুত হচ্ছেন অপ্সরারা।

"শিবসিংহের সৈন্যর মনে করতে থাকে যে সুলতানের ঐ বিশাল সৈন্যদের সামনে তাদের দল খুবই ক্ষুদ্র এবং অস্ত্রশস্ত্রের দিক থেকেও খুবই দুর্বল। কিন্তু কবিকে দেখা যাচ্ছে এই ধরনের ভীরু মনোভাবের প্রতি তিরস্কার করছেন এবং উৎসাহপ্রদ নানান কথা বলছেন।

"এরপর বিভিন্ন যোদ্ধার নাম রয়েছে এবং প্রত্যেকের যুদ্ধক্ষমতার বর্ণনা রয়েছে। এমনকি শত্রুসেনারাও যে দারুণ ভালোভাবে লড়াই করেছে তাও দেখানো হয়েছে— বিশেষ করে তাদের বীরত্বের বর্ণনা মহারাজা শিবসিংহের মতই একইরকম উজ্জ্বল ভাবে করা হয়েছে।

"কিন্তু কবি স্বাভাবিকভাবেই নিজের দেশের বীরদের বর্ণনাতেই বেশি বাক্যব্যয় করেছেন। উনি তাদের স্বদেশ ও বিজয়কে ফিরে পাওয়ার প্রয়াসের প্রশংসা করেছেন প্রভূত পরিমাণে। শেষে দেখা যাচ্ছে ওঁরা শত্রুকে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। এখানেও পলায়নরত সৈন্যের বর্ণনা উনি দিয়েছেন অপূর্বভাবে— বিশেষ করে একথা বলার জন্য যে সুলতানের সৈন্যরা তীরহুতের সৈন্যদের বিষয়ে কী ভেবে এসেছিল এবং শেষ পর্যায়ে এসে কী হলো।

"সবশেষে দেখা যাচ্ছে শিবসিংহ জঙ্গলে নিজের পথ হারিয়ে ফেলেন এবং জনৈক সাঁসী ঝা-কে এক কাপালিক মেরে ফেলছে একজন যবনকে মারতে গিয়ে। তারপরই দেখা যাচ্ছে যে রাজা রহস্যজনকভাবে অন্তর্হিত হচ্ছেন।

"এইভাবে মহারাজা শিবসিংহের গৌরবময় কাহিনী শেষ হয়েছে।"

সত্যি কথা বলতে গেলে এই পাঠের প্রকৃত বিশ্লেষণের কাজে বাধা পড়েছে ভালো কোনো পাঠ না থাকার ফলে। পণ্ডিত রমানাথ ঝা আবার একটা তত্ত্ব খাড়া করেছেন যে এই কাব্যটি 'কীর্তিলতা'র থেকে অনেক উন্নত মানের এবং 'কীর্তিলতা' শুধুমাত্র এই কাব্যের অনুকরণ। আমি এমন অদ্ভুত বক্তব্য মেনে নেওয়ার সপক্ষে কোনো যুক্তিই খুঁজে পাচ্ছি না। পণ্ডিত ঝা একথা বলেছেন ওঁর কাছে যে পুঁথির প্রতিলিপি আছে তার ওপর ভিত্তি করে। যতদিন না এই প্রতিলিপিটি প্রকাশিত হচ্ছে এবং ভালো করে মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই পাঠটিই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য এমন কথা মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। তদুপরি এই দুটি পাঠের মূল কাহিনী কিংবা কথনশৈলীতেও নাকি কোনো মিলই নেই।

কিছুদিন আগে পণ্ডিত রমানাথ ঝা এও বলেছেন[১] যে 'কীর্তিপতাকা' সম্ভবত দুটি অজানা গ্রন্থের একীকৃত রূপ এবং সম্ভবত এই দুটির একটি বিদ্যাপতির নয়, অন্য কোনো কবির— বোধ হয় ভীখম কবির রচনা। যেহেতু এখনো এই গ্রন্থের কোনো ভালো আর

১. দ্র. ওঁর নিবন্ধ— 'মিথিলা মিহির', নভেম্বর ১৯৭১ সংখ্যা। এ প্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে যে আমরা একজন ভীষ্ম কবিকে মোরাং-এর এক রাজা জগন্নারায়ণের সূত্রে জেনেছি যিনি একটি অধুনা লুপ্ত নাটিকা রচনা করেছিলেন স্বর্গের অপ্সরা উর্বশীর ওপরে।

স্বয়ংসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি, তাই আন্দাজে ওঁর এই তত্ত্বের ওপর কিছু বলা আমার উচিত হবে না।

৩. মৈথিলী নাটক

ইদানীংকালে আবিষ্কৃত বিদ্যাপতির রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'গোরক্ষবিজয়' নাট কটিই সম্ভবত সর্বাধিক সফলকৃত। বিদ্যাপতির নামে আরেকটি নাটিকার রচয়িতা রূপে একটা কথা প্রচলিত আছে যার নাম হলো 'মণিমঞ্জরী-নাটিকা'। এটি সম্পূর্ণত সংস্কৃতে লেখা এবং পণ্ডিত রমানাথ ঝা পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এর একটি সংস্করণ প্রকাশিত করেন। ওঁর মতে নাটকটি মহাকবি বিদ্যাপতির কোনো প্রামাণ্য কৃতি নয়। এতে কোনো সংরক্ষকের নাম নেই। সেটা মনে হয় খুবই অস্বাভাবিক এবং এ থেকেই লোকের মনে সন্দেহ জাগায় যে এটি আমাদের কবির রচনা কি না! তেমনি গ্রিয়ারসনও ভুলবশত আরো অনেকগুলি নাটককে বিদ্যাপতির রচনা বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু 'গোরক্ষবিজয়' নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এটিকে একটি 'নাটক' বলা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছেযে এটির রচয়িতা হলেন: "সপ্রক্রিয়-মহারাজ-পণ্ডিতবর-বিদ্যাপতি-সৎ-কবি"— যা রচিত হয়েছে "মহারাজাধিরাজ শিবসিংহ রূপনারায়ণ"-এর আদেশে। বরং ভণিতাতেও— যতগুলি গান আছে, তাদের ভণিতাতে— কবির নানান চেনা-জানা উপাধির সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে "কবি কণ্ঠহার", শুধু 'কবি' বা 'কণ্ঠহার' প্রভৃতি উপাধি।

মৈথিলীতে 'গোরক্ষবিজয় লেখা হয়েছিল 'নিয়মিত' মৈথিলী নাটকের ধাঁচে— প্রাচীন মৈথিলী পর্বের নিরিখে যা পরে গিয়ে মিথিলার মহান কীর্তনিয়া নাটকে বিকশিত এবং পরিবর্তিত হয়। জ্যোতিরীশ্বরের 'মৈথিলী ধূর্তসমাগমে'র মতই এতেও মঞ্চ-নির্দেশনে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে, কিন্তু নান্দী, নৃত্য, গীত ও বক্তৃতাতেও ব্যবহৃত হচ্ছে মৈথিলী গীতিকবিতাই— যার সংস্কৃত ও প্রাকৃতে রচিত বক্তব্যের ও কবিতার সঙ্গে কোনো মিলই নেই। সংস্কৃত নাটকে যেমন প্রাকৃতের অংশগুলি থাকতো, যেগুলি সংস্কৃত অংশের তুলনায় ছিল কিছুটা নিম্নমানের বা নিম্নস্থানপ্রাপ্ত, সেই তুলনায় কিন্তু মৈথিলীকে সংস্কৃতের সঙ্গে সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এ যুগের নাটকে। প্রথম পর্বের কিছু কিছু কীর্তনিয়া নাটকে মৈথিলী অংশগুলি বাদ দিয়ে দিলেও নাটকটির কোনো পাঠভেদ ঘটতো না। কিন্তু এই নাটকের বেলায় তা খাটে না— এমনটা করলে এই নাটকটি দুর্বোধ্য রচনা হয়ে যাবে। অনেক ক্ষেত্রেই নাটকটি মৈথিলীতেই অনেকটাই এগিয়ে যায়, নাটকীয়তা পায় যেমনটা পরবর্তীকালের কীর্তনিয়া নাটকে হতো।

এই নাটকটির সঙ্গে জ্যোতিরীশ্বরের নাটকের তুলনা থেকে বেশ মজার তথ্য পাওয়া যায়। 'গোরক্ষবিজয়' নব্যভাষাকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়। এখানেও শিবের প্রতি সংস্কৃতে একই রকম দুটি নান্দী রয়েছে যেমনটা জ্যোতিরীশ্বরের নাটকে রয়েছে এবং একই পরিমাণ গান রয়েছে দুটোতে নব্যভাষা মৈথিলীতে—২৫টি। প্রশ্ন হচ্ছে এইটেই কী অভিনেতাদের

পক্ষে একটি নাট্যাভিনয়ের বেলায় উচ্চতম সীমা ছিল গানের? এ থেকে দুটি নাটকেই পরম্পরার ছাপ যে রয়েছে, সেটা ভালোভাবেই জানা গেলো।

'গোরক্ষবিজয়' মৈথিলীর নাট্যসাহিত্যের বিকাশের ইতিকথার পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। ন্যূনতম সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিস্তারের চয়ন এবং মৈথিলী গানের ব্যবহার যে-কোনো পাত্রের প্রবেশের বেলায় — এবং বিশেষ করে সংলাপেও মৈথিলীর অধিকতর ব্যবহার— এসব থেকেই প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের কাঠামো ভেঙে যে নতুন নব্যভাষার নাটক বেরিয়ে আসছে এখানে তা বোঝা যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে যদিও সংস্কৃতে 'নাটক' বলতে যেসব বৈশিষ্ট্য এই বিধার সংজ্ঞাতেই সদা উল্লেখিত হয়েছে, তার সব কটি এইসব কৃতিতে নেই— তাও এগুলিকে 'নাটক'-ই বলা হচ্ছে। নাটক যে মঞ্চাভিনয়ের জন্যই মুখ্যত লিখিত হবে, শুধুমাত্র যে তা সীমিত বোদ্ধার সামনে প্রদর্শনের বস্তু থাকবে না (যা এই পর্যায়ে ধীরে ধীরে সংস্কৃত নাটকের অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে) — এই বোধ যে এঁদের আছে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। এখানে প্রায়ই অভিনয়ের জন্য 'নৃত্য' কথাটির ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। এ নিয়ে গবেষণার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে যে কীভাবে গীতিকবিতার সঙ্গে নাটকে ব্যবহৃত গীতিময় রচনার পার্থক্য নিরুপণ করা যায়। এইসব নাট্যগীতের তুলনায় এমনি গীতিতে রয়েছে সংলাপের পরিস্থিতিগত সংক্ষেপ অথবা দীর্ঘায়িত করা এবং নন্দনতাত্ত্বিক রসবোধের তৃপ্তি বা গ্রাহ্যতা— যা কোনো একটি গানের থেকে পাওয়ার সম্ভাব্যতা বা অসম্ভাব্যতা — এসব বিষয়ে পার্থক্য।

নাটকটির বিষয়বস্তু খুবই পরিচিত। এতে মৎস্যেন্দ্রনাথের (যোগী গোরক্ষনাথের খ্যাতনামা গুরু) পরম্পরাগত কাহিনীরই চিত্রণ করা হয়েছে। এটি কাহিনীটির মৈথিল রূপ এবং এই প্রসঙ্গে দুটি জিনিস লক্ষণীয়— প্রথম, মৎস্যেন্দ্রনাথ ও মীননাথকে এক করে ধরে নেয়া হয়েছে এবং দ্বিতীয়, মৎস্যেন্দ্রনাথের পুত্র যাকে গোরক্ষনাথ হত্যা করেন, তাকে বলা হচ্ছে বুদ্ধনাথ বা রুদ্রনাথ।

নাটকটি শুরু হচ্ছে দুটি স্তবক ও একটি মৈথিলী গান দিয়ে যাতে নটরাজ শিবের আশীর্বাদ চাওয়া হয়েছে। তারপর আসছে সূত্রধার যে সংস্কৃতে পরম্পরাগতভাবেই নিজের পত্নী নটীর সঙ্গে কথা বলছে এবং প্রস্তাব রাখছে যে সে মহারাজ শিবসিংহের আদেশ পালন করবে— যা মানতে গেলে তাকে ভৈরবের বন্দনা করতে হবে ও তাঁকে খুশি করার জন্য গোরক্ষনাথের বিজয়ের ওপর একটা নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। নটী তখন প্রাকৃতে জিজ্ঞাসা করেন যে এই নাটকটি কোন ঋতুর সঙ্গে জড়িত? সূত্রধার বলেন যে শরৎকালই এই নাটকের অভিনয়ের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত। নটী তখন মঞ্চের বাইরেই সাজ-কক্ষ থেকে সংস্কৃতে শরতের বর্ণনা করে একটি গান গেয়ে ওঠে।

তখন দুজন যোগীর প্রবেশ হয় তাঁদের গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথের জন্য যিনি নাকি কদলীপুরের (যার অর্থ কদলীতে ভরা শহরে, অর্থাৎ অসমে) রাজা হয়ে গেছেন এবং

সমস্ত পার্থিব আনন্দ-উপভোগে বিলীন হয়ে গেছেন— এঁদের একজন হলেন গোরক্ষনাথ ও অন্যজন কাননীপাদ (চতুর্থ গান)। তাঁরা তখন নিজেদের যোগ-জনিত শক্তির বর্ণনা করেন এবং দ্বাররক্ষীকে অনুরোধ করেন তাঁদেরকে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করতে দেওয়ার জন্য। কিন্তু দ্বাররক্ষী ছিল খুবই কড়া লোক এবং বহু অনুরোধ ও আধিভৌতিক অলৌকিক ক্ষমতার কথা শোনা সত্ত্বেও সে ওঁদের প্রাসাদে ঢুকতে দেয় না (ষষ্ঠ ও সপ্তম গান)।

পরের দৃশ্যে মহামন্ত্রী (মহামতি)— মহারাজা মৎস্যেন্দ্রনাথের মন্ত্রীকে দেখানো হচ্ছে এবং তাঁর ক্ষমতার বিষয়ে একাধিক গানে বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে (১৮-২০ সংখ্যক গান)। এঁকে দ্বাররক্ষী এই দুই যোগীর আগমনের খবর দেয়। ইনি তখন তাকে যোগীদ্বয়কে রাজার সামনে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি দেন কারণ দেখা যাচ্ছে যে এঁরা রাজার বহু পুরানো পরিচিত মিত্রসম ছিলেন। তখন মন্ত্রীকে বলা হয় যে রাজা এখন বহু সুন্দরীর দ্বারা পরিবেষ্টিত আছেন।

পরের দৃশ্যে একটি দীর্ঘ গান আছে যেখানে দেখানো হচ্ছে রাজা অনেক সুন্দরী নারী-পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন। তাঁর মুখে রাজোচিত ঔজ্জ্বল্য রয়েছে এবং তাঁর আনন্দও অশেষ-প্রায় (১৩ সংখ্যক গান)। চতুর্দশ গীতে দেখানো হচ্ছে উনি নানান প্রেমানুভূতির রসগ্রহণে ব্যস্ত আছেন যখন দ্বাররক্ষী এসে ওঁকে বলছে যে 'তেলঙ্গ' প্রদেশ থেকে দুজন নর্তক এসেছেন রাজাকে নৃত্য পরিবেশনের জন্য। তখন রাজা দুজনকে তৎক্ষণাৎ তাঁর সামনে হাজির করতে বলেন।

দুজন যোগী তখন নর্তকের বেশে এসে দারুণ সুন্দর নৃত্য ও গীত পরিবেশন করেন। এখানে একটি গান মনে হয় অসমাপ্ত রয়ে গেছে। রাজা তখন তাদের ওপর এতই সন্তুষ্ট যে যা ইচ্ছা তাই উপহার-স্বরূপ দিতে তিনি প্রস্তুত। এইখানে এসে নাটকটির বর্তমান পাণ্ডুলিপি মনে হয় বিনষ্ট হয়ে গেছে: এটা স্পষ্ট নয় যে কিভাবে তাদের ছদ্মবেশ খসে পড়লো এবং কিভাবে রাজা জানতে পারেন যে এই দুজন যোগী তাদের যোগসিদ্ধ ক্ষমতায় রাজকুমারকে হত্যা করেছেন।

রাজা তখন আদেশ দেন যে এই দুজন যোগীকে ফাঁসি দিতে হবে। তাঁরা তখন বলেন যে তরুণ যুবরাজকে আবার বাঁচিয়ে তুলতে পারেন। রাজা প্রথমে তাদের ওপর আর বিশ্বাস রাখতে চাননি কিন্তু যখন তাঁরা সত্যি সত্যি রাজকুমারকে জীবিত করে তুললেন, রাজার আনন্দের সীমা-পরিসীমা রইলো না। তখনই রাজা গোরক্ষনাথকে চিনতে পারলেন এবং মৎস্যেন্দ্রনাথ তখনি বুঝতে পারলেন যে সন্ন্যাসী থেকে রাজা হয়ে তিনি কতখানি ক্ষমতা হারিয়েছেন।

এরপর দেখা যায় এই দুই পথের মধ্যে সংঘাত চলছে— একদিকে ইহজাগতিক সমস্ত আনন্দের হাতছানি এবং অন্যদিকে যোগসম্মত পথ। রাজা বিশেষ করে নারীদের সাহচর্যকে বিসর্জন দেওয়া একেবারেই অসম্ভব বলে মনে করলেন।

শেষ দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে বহু রানী একত্রে রাজাকে অনুরোধ করছেন তাদের ছেড়ে চলে না যাওয়ার জন্য। তাঁরা নিজেদের অপরূপ সাজে সাজিয়ে যা বললে রাজার মত পাল্টানো সম্ভব সেসব কথা বলেন যাতে রাজা তাঁদের সঙ্গেই থাকেন। কিন্তু রাজা তখন অবিচলিতচিত্ত : উনি সব কিছু ত্যাগ করে ঐ দুইটি যোগীর সঙ্গে চলে যাওয়াই মনস্থির করেন। শেষে গোরক্ষনাথ তাঁকে সরাসরি তিরস্কার করেন এবং এরপর রাজা প্রাসাদ ত্যাগ করে চলে যান। এভাবেই গোরক্ষনাথের বিজয়কে দেখানো হয় [১]।

এই নাটকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো এই যে দ্রাবিড় দেশ 'তেলঙ্গ' প্রদেশ থেকে নৃত্য এবং সঙ্গীত এসেছে মিথিলায়। এই বিষয়ে প্রচলিত ধারণার প্রমাণ এখানেই পাওয়া যায়। জাগতিক উপভোগের পথ এবং সাধুতা ও সন্ন্যাসের পথের মধ্যে যে সংঘাত আছে তার যথাযথ বর্ণনা কবির এই পরিণত বয়সেই দেখানো সম্ভব ছিল।

৪. মৈথিলী গীতিকবিতা [২]

বিদ্যাপতির খ্যাতি ওঁর মৈথিলীতে রচিত পদাবলীর জন্যই হয়। এখানেই ওঁর প্রতিভা সর্বাপেক্ষা অধিক বিকশিত হয়। এই গানগুলির ভাব এবং বিষয় বৈচিত্র্য লক্ষ করার মতন। তবে অধিকাংশই প্রেমগীতি; কয়েকটি ভক্তিমূলক গান এবং আরো কিছু আছে বিভিন্ন বিষয়ে। প্রেমগীতি মোটামুটি মৈথিলী কবিতার পরম্পরাগত সমস্ত শাখাকেই ছুঁয়ে গেছে— 'তিরহুতি', 'বটগমনী', 'মান', 'গোয়ালরী', প্রভৃতি। এখানের ভক্তিগীতিগুলি মূলত শক্তি, শিব ও গঙ্গার আরাধনা। নানা ধরনের গানের মধ্যে ধাঁধা ও পালাপার্বণ উপলক্ষে লেখা গানও রয়েছে।

বিদ্যাপতির প্রেমগীতিগুলির বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে সবাই সাধারণত গানগুলিকে রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমের বিভিন্ন পর্যায় ও দিকের উপর নির্ভর করেই ভাগ করে থাকেন— নবযৌবন, কৃষ্ণের প্রতি রাধার (এবং রাধার প্রতি কৃষ্ণের) প্রেমের উন্মেষ, রাধার সৌন্দর্য, গোপন অভিসার, প্রথম রাত্রিবাস, বাহানা, ছদ্ম কলহ ও ক্রীড়া, বিচ্ছেদ, বিরহ ও পুনর্মিলন। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ', যা বিদ্যাপতির সামনে ছিল একটা আদর্শের মতো, প্রেমগীতিগুলির মাধ্যমে একটা ক্রমনিষ্ঠ কাব্যের মতো রচিত হয়েছিল, কিন্তু বিদ্যাপতির প্রেমকবিতাগুলি জুড়ে কাব্য হয়না। এটা এখন জানা যায় না যে কখনো এইগুলি বিভিন্ন অধ্যায়ে সাজানো হয়েছিল কি না। তাঁর গানগুলি রচিত হয়েছিল প্রেরণা ও অভিজ্ঞতা থেকে অথবা রাজসভার প্রাত্যহিক চাহিদা মেটাতে —

১. দ্র. বিদ্যাপতি বিমর্শ (কলকাতা) এবং কীর্তনিয়া নাটক নিবন্ধাবলী।

২. দ্র. সুভদ্র ঝা-র বারাণসী থেকে প্রকাশিত সংস্করণই এখনো বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠ সংস্করণ। এরপর অনেক সুন্দর সংস্করণ বেরিয়েছে এর কবিতার তবে কোনোটাই অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও খগেন্দ্রনাথ মিত্রের সংস্করণের মতো বিশাল ও সর্বব্যাপী নয়। এটি নগেন্দ্রনাথেরই বিদ্যাপতি পদাবলীর একটি গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কলনের পরিমার্জিত সংস্করণ — যা শরৎকুমার মিত্র, বি. এল, ৮৫, গ্রে স্ট্রিট, কলকাতা থেকে ১৮৪৮-এ বেরয়, ২য় সংস্করণ।

যার বহু আদর্শ ছিল সংস্কৃত কবিতার অনুসারী। ওঁর প্রেমগীতিগুলি তাই বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ও উপলক্ষে লেখা গানের সংমিশ্রণ বিশেষ।

মূলত প্রেমের কবি, ইনি সৌন্দর্যের নানান পরিমণ্ডল তৈরি করেছিলেন। একটি সদ্যস্ফুট নারীর মনে যৌবন ও উজ্জ্বল অনুভূতি কিভাবে ফুটে ওঠে উনি তার অদ্ভুত বর্ণনা দিয়েছেন— যেখানে নবযুবতীর হৃদয়ে অর্ধ-সুপ্ত ও অর্ধ-জাগ্রত অনুভূতিগুলির মধ্যেকার সংঘাতের ভিতর দিয়ে কিভাবে শেষে তার শরীরের ওপর যৌবনেরই জয় হয়। প্রেমিকার পূর্ণযৌবনা দেহের সুষমার বিষয়ে বর্ণনায় উনি সম্ভবত আগলহীন সৌন্দর্যে দেন পংক্তিতে উপমার ওপর উপমায় ভরিয়ে— যার মধ্যে দিয়ে অপরূপার শরীরের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুগঠিত সৌন্দর্য ফুটে ওঠে । তখন উনি নায়িকার বিভিন্ন ভঙ্গিমা [১], নানান ইঙ্গিত ও চলার বিভিন্ন ভঙ্গি এবং তার হৃদয়ের স্পন্দন— সবই কলমের আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলেন। যদিও এসব বর্ণনা অত্যন্ত সূক্ষ্ম অনুভূতির— পাঠক মাত্রেই এগুলিকে গ্রাম্য নরনারীর সরল ও প্রাকৃতিক জীবনের উপভোগ্য অথচ সীমিত ছবি বলে চিনতে পারেন। এই প্রসঙ্গে এটা লক্ষ করতে হবে যে তিনি সৌন্দর্যকে কোনো কৃত্রিম অলঙ্করণ বা মহামূল্যবান গহনার সঙ্গে কোথাও জোড়েননি। অবশ্য একথা সত্যি যে কিছু কিছু প্রতীকের এবং কিছু বর্ণনারও পুনরাবৃত্তি ঘটেছে তাঁর কবিতায় কিন্তু প্রত্যেকবারই সেগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষতা, সহজতা ও সতেজতার জন্য সেসব আমাদের রসবোধের কাছে সহজেই গ্রাহ্য হতে পারে।

উনি একই সঙ্গে নায়ক ও নায়িকার বর্ণনায় দক্ষ ছিলেন— সব রকম মানসিক স্থিতিতেই— আবেগবিহ্বল, গ্রহণকারী, ক্রুদ্ধ ও রাগত। প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যেকার ঝগড়া, খুনসুটি— যেখানে কৃষ্ণ ও গোপিনীদের মধ্যে যে ভালোবাসা তার দক্ষ প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছিল তাঁর পক্ষেই। এই বিষয়টি জয়দেব ও অন্যান্য সংস্কৃত কবিদের খুব বেশি ব্যবহার করতে হয় নিজেদের রচনায়। এখানে শয়ে শয়ে গান আছে বিরহ ও প্রেম-বাসনার, গোপন অভিসারের, নদীতীরে কৃষ্ণের কেলি, গোকুলে প্রস্থান, পুনর্মিলন ও হাজারো প্রেম- ক্রীড়ার বিষয়।

এঁর গানে মান ও উপভোগের, আবেগ ও বিষাদের অনুভূতির সংঘাত চিত্রিত হয়েছে খুব সুন্দর ভাবে। সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ ও গভীরতম দুঃখের মুহূর্ত যেমন আছে, সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার দুইই সম্পূর্ণ সুযোগ পায় ফুটে ওঠার, এগুলির প্রায় সব স্থিতিই তাঁর গানে স্পষ্ট হয়। বিশেষ করে বিরহ গীতিগুলি যেন গীতিকবিতার চরম সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলে এঁর কবিতায় ও গানে।

ওঁর রাত্রি কিংবা প্রাতঃকালের বর্ণনায়, বসন্ত ও বর্ষার চিত্রণে— এভাবে প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ ও রঙের ছবি আঁকতে গিয়ে ওঁর ভাষার দখল বোঝা যায়— দেখা যায় কিভাবে মানবীয় অনুভূতিগুলি প্রকৃতি-বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে মনোরমভাবে ফুটে উঠছে।

---

১. উদা: স্নানরতা, পথগামিনী, নদীপারগতা, নদীতীরস্থা, প্রথম দর্শন, আসন্ন বিরহিণী, প্রেম-বিহুলা, প্রেমিকের সঙ্গভোগ, ছদ্মরাগ, প্রভৃতি।

এখানে দেখার মতো ব্যাপার হলো এই যে যদিও বেশিরভাগ গান সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের নিয়ম মেনে লেখা হয়েছে এবং প্রেম-রীতিকেও দেওয়া হয়েছে প্রাধান্য, প্রতিটি স্থানেই যেন মনে হয় এই অনুভূতিগুলি তার ক্ষমতা ও একাগ্রতা নিয়ে এমনভাবে প্রকাশিত হচ্ছে যে মনে হচ্ছে যেন লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই সেসব অনুভূতি জন্ম নিয়েছে। কবির লেখা ভক্তিগীতির সংখ্যা খুবই অল্প। এরই মধ্যে একটিতে উনি দুঃখ করছেন যে ইহজাগতিক আনন্দের বিষয়ে গান লিখেই ইনি নিজের জীবন ব্যয় করলেন এবং এখন বুঝতে পারছেন যে মাধবের আশীর্বাদই এখন ওঁর মুক্তি পাওয়ার একমাত্র আশা। আরেকটি গানে উনি যৌবনের নানান ক্রিয়াকর্ম নিয়ে লিখেছেন যার দাস্য উনি সারা জীবন করেছেন। ইনি কৃষ্ণ, শিব (ও গঙ্গা) এবং শক্তির প্রশংসায় ভজন লিখেছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো মহেশবাণী ও নচারীগুলি। এই কবিতাগুলিই ধরা হয় ওঁর সর্বাধিক ভক্তিমূলক রচনা। ইনি হরকে মাধবের সমকক্ষ বলে মনে করেন। তাই ইনি মাধবের মূর্তির পূজা করছেন তার পায়ে নিজের সব ঢেলে এবং অতীব সুন্দর রসবোধের পরিচয় দিয়ে গাইছেন ওঁর বন্দনা-গীতি।

বিদ্যাপতির কবিতা

এই বিষয়ে আর এখন নতুন করে জোর দিয়ে বলার দরকার নেই যে বিদ্যাপতির প্রেমকবিতার বাঙালি বৈষ্ণববাদের দর্শনের কবিতার সঙ্গে মিল নেই। ম. ম. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এও স্পষ্ট করে যান যে তাঁর প্রেমের গানগুলি আদৌ 'ভজন' নয়। এদিক থেকে দেখলে এগুলি 'গীতগোবিন্দ'রই মতো। "আমাদের একথা মানতেই হবে যে কৃষ্ণের মধ্যে কিছুই ঐশ্বরিক নেই, শুধুমাত্র একটা মাঝে মধ্যে জানান দেওয়া ছাড়া যে তিনিই সর্বশক্তিমান— এটা একটা অলস আনন্দ যা সুন্দরী রমণীদের সঙ্গে ঈশ্বরের ক্রীড়ার মধ্যে নিজের আত্মাকে মনে করছে বিস্রস্ত এবং অসংলগ্ন— যেখানে উনি রাধার প্রতি নিজের প্রেম ও পরম মিলনের আশীর্বাদ নিয়ে জেগে উঠছেন।" জয়দেবের মতো বিদ্যাপতির কাছেও কৃষ্ণের কেলি ও ক্রীড়া তাঁকে একটা সুযোগ করে দিলো "প্রেম কলার পুরোটাই — যা কিছু কামসূত্র ও সাহিত্য-শাস্ত্র তাঁকে শিখিয়েছে", তার বর্ণনা করার মতো। এইজন্যেই 'অভিনব জয়দেব' বলা হয় বিদ্যাপতিকে এবং এজন্যই ওঁর কবিতায় এতো উল্লেখ ও উদ্ধৃতি আছে সংস্কৃত গীতিকবিতার থেকে। মনে হয় এইসব কবিদের রহস্যময় প্রেমগাথা পরে গিয়ে চৈতন্যবাদের মধ্যে এক দর্শনকে খুঁজে পেলো, কিন্তু এ. কে. দে বলছেন— পরবর্তীকালের বৈষ্ণব শাস্ত্রে যেসব ব্যাপার এসেছিল, নিশ্চিতভাবে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের এই পরবর্তী পর্যায়ের ছায়া বিদ্যাপতির কবিতায় খোঁজা উচিত নয়।

এ প্রসঙ্গে একথা উল্লেখযোগ্য যে বিদ্যাপতি 'ভাগবত পুরাণ' অনেকাংশেই জানতেন,

তবু এটা আশ্চর্যের বিষয় যে ওঁর রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের বর্ণনায় তার কোনো ছাপ নেই, বরং মূলগত পার্থক্য রয়েছে। 'ভাগবত' রাধা যে কৃষ্ণের প্রেমসঙ্গিনী ছিলেন তার প্রত্যক্ষ উল্লেখ করে না একবারও— শরতের ঋতু নির্ভর রাসলীলার কথা বলে, ইহজাগতিক মানবীয় রাসলীলা নয়, কিন্তু বিদ্যাপতি রাধা ও কৃষ্ণকে প্রেমিক-যুগল রূপে চিহ্নিত করার ওপরেই বেশি জোর দেন। জয়দেবের বেলাতেও একথা খাটে এবং এর মূল খুঁজতে গেলে আমাদের যেতে হবে ব্রহ্মবৈবর্ত পুবাণে যেখানে রাধার বর্ণনা আছে সৌন্দর্যের মহান পরাকাষ্ঠা-রূপে ও যেখানে স্পষ্টতই দেখানো হচ্ছে কৃষ্ণ ও রাধার স্বাভাবিক বিবাহকে যাতে 'পরকীয়াভাব'-এর কোনো স্থান নেই। তবে বিদ্যাপতির সরাসরি ও প্রাথমিক উৎস নিশ্চয়ই ছিলেন জয়দেব। তবে আমরা আজ একথা বলতে পারি না যে'ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে'র বিষয়ে উনি জানতেনই না যতদিন না উনি 'ভাগবত-ব্রহ্মবৈবর্ত' পড়েছেন যা মিথিলায় প্রচলিত পুরাণগুলির মধ্যে বোধ হয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ পুরাণটি হয় মিথিলায় নয় পূর্ব ভারতের কোথাও রচিত হয়।

যে পরিবেশে বিদ্যাপতি এই কবিতাগুলি রচনা করেছিলেন তাও দ্রষ্টব্য— আর তা হলো রাজসভা; এইজন্য আমরা তার মধ্যে রাজকীয় জীবনের নানান প্রতীক ও অন্যান্য বস্তু সহজেই পাই। উনি ব্যবসায়ী ও কৃপণ দুজনেরই সম্পত্তি নিয়ে কবিতা লেখেন। ইনি মুসলিম সহ সমস্ত শাসক রাজার প্রশংসায় লেখেন। ব্যবহার করেন খুবই শৌখিন একটি ভাষা ও শৈলী যাতে বিদগ্ধজন ও সভাসদেরা খুবই প্রসন্ন ও আনন্দিত হন। উনি খুব কম সময়েই এই আবহাওয়া থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে রচনা করেন— ওঁর 'ধাঁধা' ও 'পালাপার্বণের গান' সম্ভবত এই উৎস থেকেই অবচেতনে উঠে আসে যে তাতে সাধারণ মানুষের সামাজিক প্রয়োজনগুলি মেটানো সম্ভব হয়।

যাই হোক, উনি রাজসভার বাইরের জীবনকেও খুব সুন্দরভাবে নিজের কবিতায় নিয়ে আসেন। যে অসংখ্য প্রবাদ এবং অর্থান্তরন্যাস উনি ব্যবহার করেছেন তার মধ্যে দিয়েও উনি সাধারণ জীবনের বহু দিক উদ্ভাসিত করেন। মিথিলার সাংস্কৃতিক জীবনের সর্বরকমের পর্ব নিয়ে উনি রচনা করেন ও এভাবে সাধারণ মানুষের জন্য প্রভূত কাব্যরচনা ছেড়ে যান— যেমন, গোসাউনি, জোগ, উচিতী, মহেশবাণী প্রভৃতি অনেক রচনা। শিবসঙ্গীতগুলি সামান্যজনের জীবনের বর্ণনাই করে এবং কবির বাস্তবসম্পন্ন কল্পনার জন্য অনেকটা জায়গা করে দেয়। এছাড়া, শিশুবিবাহের দোষ নিয়েও উনি যেমন লেখেন, তেমনি ওঁর কিছু শব্দচিত্র আছে বৃদ্ধ ও দরিদ্র মানুষের দিনচর্যা নিয়ে।

নিজের তুষ্টির জন্য মনে হয় কবি মাত্র দুইটি ধরনের কবিতা লিখেছিলেন: প্রথমটি হলো এমন কিছু প্রেমের কবিতা রচনা যাতে কোনো সংরক্ষকের নাম নেই; দ্বিতীয় গুচ্ছ হলো নচারীগুলি যেগুলি অন্য সব কিছু বাদ দিলেও সম্ভবত শ্রেষ্ঠ ভক্তিমূলক রচনা রূপে গণ্য হবে। এই গানগুলিতে আছে উল্লেখযোগ্য স্বতঃস্ফূর্ততা, অনবদ্য সরলতা

এবং ভাবপ্রকাশের চরম প্রত্যক্ষতা। হতে পারে এর মধ্যে কিছু গান ওঁর জীবনের প্রথমাংশে রচিত হয়েছিল, কিন্তু এগুলির মধ্যে অনেকাংশই শেষের পর্বে লেখা।

ওঁর প্রতীকের ব্যবহার (উপমা, লক্ষণা ও সংকেতন) সংস্কৃতের ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করেছে। সবচেয়ে বেশি বার যেসব তুলনা এসেছে ঘুরে ফিরে সেগুলি হলো: চকোর, মধুমক্ষী, পদ্ম, সিংহ, স্বর্ণ, হরিণ, ডালিম, অমৃত, তীর, রাহু, চন্দ্রমা, খঞ্জন, পক্ষী, বিদ্যুৎ, কদলীবৃক্ষের কাণ্ড, শ্রীফল, মলয় বা দখিনা বাতাস, বিম্ব, প্রবাল, পর্বত প্রভৃতি। ওঁর পূর্বসূরী জ্যোতিরীশ্বরের সহজ প্রভাব ওঁর ওপরে পড়েছিল এই প্রসঙ্গে। নিজের উপমাগুলিকে উনি খুব সুন্দরভাবে দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করেন এবং অনেক সময়েই পরম্পরাগত সংকেতন ও লক্ষণা-গুলিকে নিয়ে উনি খেলা করেন। সমস্ত ধরনের উপমার উনি এক সুকৌশলী জ্ঞাতা— দীর্ঘ ও হ্রস্ব দুয়েরই — সবগুলি যে পরম্পরা থেকে পাওয়া তা নয়— এর মধ্যে বেশ কিছু প্রতীকই পুরুষের নারীর প্রতি ব্যবহারের মধ্যে যে নিষ্ঠুরতা ও কঠিনতা আছে সেটাকে ফুটিয়ে তোলে। এগুলির ধ্বনির উপর ভিত্তি করে তার চরিত্র-নিরূপণ হচ্ছে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে উনি খুব সাবধানী ও মহান ভাষা-কারিগর ছিলেন যিনি আবেগ ও কল্পনার কবিও ছিলেন। "বিদ্যাপতির কবিতার শব্দাবলী ও ভাষা তুলনামূলকভাবে পবিত্র, কিন্তু যেমনটা আশা করা গেছিল— ওঁর কবিতা অনেক সময়েই প্রাচীন, প্রায়শই দুর্বোধ্য এবং অত্যন্ত অবোধগম্য।" কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার শ্রেষ্ঠ কবিদের মতো উনিও নিজের হৃদয়-বিদারক ও গভীরতম অনুভূতিগুলিকে সরলতম ভাষায় কোনো অলঙ্করণ না করেই প্রকাশ করতে পারতেন।

বিদ্যাপতির চরম সাফল্য ও গৌরব একজন কবি রূপে ছিল তাহলে তার অসামান্য অনুভূতিপ্রবণতার সৌভাগ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করা, এবং দ্বিতীয়ত এই অনুভূতিকে সাংগীতিক ও শৈল্পিক মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে— ভাষা দিয়েও পরিস্ফুট করা। ওঁর মহান কৃতিত্ব হলো— কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতনই— প্রতিটি কাব্যিক একক নিয়ে তাকে শিল্পীর সমাপিত নিপুণতা দিয়ে, ইন্দ্রিয়াবেগনিষ্ঠ বর্ণনার সৌন্দর্য দিয়ে— অর্থাৎ একটা বিরল ও সমরসতা দিয়ে প্রায় ডুবিয়ে দেওয়া। ইনি দেখতে পারতেন এবং প্রকাশ করতেও পারতেন— সশক্ত আবেগের ভাষায়— রূপ ও বর্ণের সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্যের আবেদনের কথা। উনি মৈথিলী সাহিত্যের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন গভীরভাবে এবং চূড়ান্তভাবে— এতো সফলতা উনি পেয়েছিলেন যে বহু যুগ পর্যন্ত ওঁর পংক্তি ও স্তবকের নকলে রচনা করতে পারাটাকেই অধিকাংশ নবীন রচয়িতা নিজেদের কবিসত্তার পরিচয় বলে মনে করতেন।

৩

বিদ্যাপতি ঠাকুরের প্রভাব

মিথিলায়: একথা ভাবলে ভুল হবে যে, সমালোচকেরা যতদিন বিদ্যাপতির বিশিষ্টতার কথা সকলের সামনে তুলে ধরেন নি, ততদিন পর্যন্ত তিনি তাঁর নিজের দেশেই অবহেলিত ছিলেন, কিংবা কোনো প্রশংসাই পান নি। তবে একথা ঠিক যে আধুনিক সমালোচনার মাপকাঠিতে বিদ্যাপতির কাজের উপর গবেষণা মিথিলায় শুরু হয় অনেক দেরিতে। তবে এটা খুবই স্বাভাবিক, কারণ ইংরেজি শিক্ষা সেখানে অনেক পরে শুরু হয়।

তাঁর নিজের যুগে বিদ্যাপতি ভাগ্যবান ছিলেন একারণেই যে তিনি অত্যন্ত উৎসাহী এবং প্রতিবেদনশীল শ্রোতা পেয়েছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকরাও ছিলেন তার প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। মহারাজ কীর্তিসিংহের কাছে তিনি ছিলেন 'ক্রীড়াসঙ্গী কবি'; মহারাজ শিবসিংহ ও তাঁর রানী মহাদেবী লখিমার কাছে তিনি ছিলেন 'নতুন জয়দেব' যাঁকে তাঁরা তাঁর গ্রাম বিস্কি দিয়ে পুরস্কৃত করেন ও তাঁর সমসাময়িক কবিদের কাছে তিনি ছিলেন 'সুকবি', 'সরস-কবি', 'সুকবি-কণ্ঠহার' এবং জনসাধারণের কাছে তিনি ছিলেন ব্যবহারিক (আনুষ্ঠানিক) গান এবং ভক্তিমূলক শিব ও শক্তিস্তোত্রের শ্রেষ্ঠ গায়ক। বস্তুত আইন-ই-আকবরি (আ. ১৫৯৮)-র সঙ্গীত বিষয়ক অংশে বিদ্যাপতির নচারীর উল্লেখ আছে এবং লখনসেনী 'হরিচরিত বিরাটপর্বে'ও বিদ্যাপতির নচারীর প্রশংসা করেন।

সঙ্গীতকার হিসেবে বিদ্যাপতির খ্যাতি সম্পর্কে লোচন তাঁর 'রাগতরঙ্গিণী'তে যা বলেছেন তা থেকে মনে হয় যে বিদ্যাপতির গান গাইতেন এমন একদল সঙ্গীতশিল্পীগোষ্ঠীই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। মহারাজ শিবসিংহ জয়ত নামে এক শিল্পীকে নিয়োগ করেছিলেন সঠিক সুরে বিদ্যাপতির গান গাওয়ার জন্য। তাঁর পুত্র বিতৃষ্ণ, তাঁর পৌত্র হরিহর মল্লিক এবং প্রপৌত্র ঘনশ্যাম মল্লিক এই ঐতিহ্য বহন করেন। লোচনের সময় ঘনশ্যাম মল্লিকের তিন পুত্র বর্তমান ছিলেন যাঁরা বিদ্যাপতির গানে সুপণ্ডিত ছিলেন। লোচন নিজেও বিদ্যাপতির বিশেষ ভক্ত ছিলেন।

এছাড়াও, বর্তমানে যুগের গুরু পণ্ডিত একদল তাঁকে অনুকরণ করে চলেছিলেন। বিদ্যাপতি-ধারার এই সব কবিদের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এঁদের নামের শেষে 'পতি' শব্দের যোগ, যেমন, উমাপতি, নন্দীপতি, রমাপতি, কৃষ্ণপতি, কুলপতি, শ্রীপতি, হরপতি, মহীপতি এবং লক্ষ্মীপতি। এঁরা প্রত্যেকেই এই কৃতী কবির কল্পনা, পদ্ধতি এবং ছন্দ অনুসরণ করেন। এই কবিরা 'ভণিতা'য় নিজেদের পৃষ্ঠপোষকদের নামোল্লেখ করেছেন যাঁদের আনন্দ দানার্থে বা যাঁদের নির্দেশে কাব্য রচনা করে তাঁরা কবি হিসেবে পরিচিত হতে চান বা হন। এইসব কবিতাই অবশ্যম্ভাবীভাবে সুরে বসানো হয় এবং প্রচলিত সব

ধর্মনিরপেক্ষ এবং পবিত্র বিষয়াদি— বিশেষ করে প্রেমের গান— এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিদ্যাপতির ধারার উপর সংস্কৃত নন্দনতত্ত্ব— কল্পনা এবং কাব্যিক রীতির স্পষ্ট এবং নিশ্চিত ছাপ ছিল।

প্রতিবেশী রাজ্যসমূহ

১. বাংলা

প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতেও বিদ্যাপতির খ্যাতি যথেষ্ট। নিজের রাজ্যে তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন কবি এবং শিবভক্ত হিসেবে। বাংলা, ওড়িশা এবং অসমে তিনি পরিচিত ছিলেন এক মহান বৈষ্ণব হিসেবে। পূর্ব ভারতে তিনিই প্রথম গায়ক যিনি দেশীয় ভাষাকে সাহিত্যের ভাষায় মর্যাদা দেন; এমন এক দেশে তাঁর কাব্যের জন্ম এবং চর্চা যে দেশ ছিল সংস্কৃত শিক্ষা ও হিন্দু সংস্কৃতির পীঠস্থান; যেখানে দেশের সমস্ত দিক থেকে মানুষ আসতেন পণ্ডিত হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। মুসলমান পটভূমিকায় পুরাণে অদ্ভুত ইন্দ্রিয়গত ভোগভাবসম্পন্ন বাগ্‌ধারায় রাধাকৃষ্ণের যে অর্চনা শুরু হয় এবং যাকে জয়দেব কবি সংস্কৃতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মর্যাদা দেন— সেই ভক্তিভাব জনপ্রিয় করে তোলায় বিদ্যাপতি সহায়ক ছিলেন। এবং শেষ কিন্তু সামান্য নয় যা তা হল এই যে— সে যুগে তাদের নিজস্ব ভাষা থেকে খুব বেশি আলাদা নয় যে ভাষা সে ভাষায় লেখা তাঁর গানে দেশজ মিষ্টত্ব ও অসাধারণত্ব প্রদান; এইসব প্রতিবেশী রাজ্যে বিদ্যাপতির বিশেষ প্রসারের কারণ।

বিদ্যাপতির গানে নতুন মাত্রা যোগ হল যখন তাঁর নামের সঙ্গে যোগ হল চণ্ডীদাসের নাম। যাই হোক, রমেশচন্দ্র দত্তের মতো পণ্ডিতদের মতে এ দুজনের দেখা হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না এবং চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পরে কাব্য রচনা করেন। তাঁর কাব্য বিদ্যাপতির, বিশেষ করে তাঁর 'কৃষ্ণকীর্তন' দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল, বিদ্যাপতির গান সে সময় বাংলার বিখ্যাত বৈষ্ণব গুরু চৈতন্যের ভীষণ ভালো লাগে এবং তাঁরই মাধ্যমে সে সব গান যা বিদ্যাপতির বলে মনে করা হত, বাংলার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে যেমন ইংরেজের ঘরে ঘরে বাইবেল। গ্রিয়ারসন বলেছেন:

> " আর এখন এক কৌতূহলকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হল, যা সাহিত্যের ইতিহাসে আমার মতে প্রথম। তাঁর গান বাংলা ভাষা ও ছন্দের শক্তিশালী ক্ষেত্রে নানাভাবে পরিবর্তিত এবং বিকৃত, সঙ্কোচিত, বা বর্ধিত হয়ে এমন এক অদ্ভুত ভাষার জন্ম দেয় যা ছিল না বাংলা না মৈথিলী। কিন্তু এই শেষ নয়। একদল অনুকরণকারীরও উদ্ভব হল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন যশোরের এক বসন্ত রায়। ইনি বিদ্যাপতির নামের আড়ালে এই মিশ্র ভাষায় গান লেখেন যার বিষয় বিদ্যাপতির

> সঙ্গে যথেষ্টই মেলে; কিন্তু এতে অভাব ছিল এই প্রবীণ কবির পরিমার্জনা ও প্রকাশ সৌষ্ঠবের . . . (এই নকল গান যাকে 'ব্রজবুলি' গান বলা হত) ধীরে ধীরে বাঙালিদের মধ্যে বিদ্যাপতির মূল গানের চেয়েও বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।"[১]

এই সমস্ত 'ব্রজবুলি'-র কবিদের সম্পর্কে বিবরণ পাওয়া যায় ড. সুকুমার সেনের 'ব্রজবুলি সাহিত্যের ইতিহাস'-এ।[২] ব্রজবুলির কবিদের নাম পাওয়া যায় নিম্নলিখিত সংগ্রহগুলিতে—'ফণদা-গীত-চিন্তামণি, (আ. ১৭০০), 'পদামৃত-সমুদ্র (আ. ১৭২৫), 'পদ কল্পতরু' (আ. ১৭৫০), 'সংকীর্তনামৃত' (আ.১৭৭১), 'পদরসসার' (আ. ১৯২৫), 'পদরত্নাকর' (১৬৩৩-এর পাণ্ডুলিপি), 'পদকল্পলতিকা' (১৮৪৯), 'গঙ্গ-পদ-তরঙ্গিণী' (১৯০৩), 'অপ্রকাশিত-পদ-রত্নাবলী' ('পদকল্পতরুর'র পরিপূরক) এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায় কিছু কবিতা, ও বৈষ্ণব কাব্যের সংগ্রহ যেমন 'রসকল্প-বল্লী', 'রস মঞ্জরী', 'ভক্তি রত্নাকর' এবং 'নায়িকা-রত্নমালা'।

ড. সুভদ্র ঝা এই গানগুলি বিশ্লেষণ করেছেন এবং তাদের চারটি ভাগে ভাগ করেছেন [৩]—

(অ) যেসব গানের ভাষা মৈথিলী ;

(আ) যেসব গান মৈথিলীতে, তবে সে মৈথিলী বাংলা মিশ্রিত;

(ই) যেসব গানের ভাষা শুদ্ধ বাংলা ;

(ঈ) যেসব গান বাংলায় তবে শব্দ মূলত হিন্দি থেকে নেওয়া (ব্রজভাষা)।

স্থানাভাবে এখানে ব্রজবুলির কবিদের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা বিশেষ কয়েকজন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারি।

জ্ঞানদাস (জন্ম আ. ১৫৩০) প্রায় ১৫০টি কবিতা লেখেন ব্রজবুলি ভাষায় এবং এ ভাষার তিনি অন্যতম সতর্ক লেখক। তাঁর ভাষাশৈলীর সৌন্দর্য ও শব্দবিন্যাসের জন্য বিখ্যাত।

ব্রজবুলির অন্তত তিনজন কবির নাম গোবিন্দদাস। এঁদের মধ্যে একজন সত্যিই বড় কবি যিনি ১৬৭০ সালে মৈথিলী সাহিত্যে তাঁর নাম অবিস্মরণীয় করে গেছেন। এঁর কবিতা পরে আমরা আলোচনা করবো। অন্য গোবিন্দদাসেরা হলেন—(১) গোবিন্দদাস কবিরাজ (?১৫৩৫-?১৬১৩), (২) গোবিন্দদাস চক্রবর্তী (প্রথমজনের সমসাময়িক), (৩) গোবিন্দদাস আচার্য (আ. ১৫৩৩)।

১. গ্রিয়ারসন, মৈথিলী ক্রেস্টোম্যাথি, পৃ. ৩৪।

২. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা কর্তৃক প্রকাশিত।

৩. দ্র. 'প্রসিডিংস অব্ অল ইন্ডিয়া ওরিয়েন্টাল কনফারেন্স' ১০, পর্ব ১ (সারাংশ), ১৯৪৩, পৃ. ১৩০। আরো দ্র. ড. শৈলেন্দ্র মোহন ঝা-কৃত 'ব্রজবুলি কা ইতিহাস' (বিহার হিন্দি গ্রন্থ অকাদেমি দ্বারা প্রকাশিত)।

বাংলার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ব্রজবুলি কবিদের মধ্যে বলরামদাস একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেন। তার সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় নি। জ্ঞানদাসের মতোই তাঁর ব্রজবুলি কবিতাও (প্রায় ৮০-র মতো) অবশ্যই তাঁর বাংলা কবিতার চেয়েও নিকৃষ্ট। গোবিন্দদাসের মতো তিনিও ছিলেন ক্ষমতাসম্পন্ন ছান্দসিক, এবং অলঙ্কারপূর্ণ কাব্য রচনা করতে পারতেন (যেমন, তাঁর ব, চ, ক দিনে শুরু অনুপ্রাসযুক্ত কবিতা দর্শনীয়)। ড. সুকুমার সেনের মতে প্রেমিকের আবেগ ও দুঃখের বর্ণনার ক্ষেত্রে এই কবি বাংলার সব ব্রজবুলি কবিদের উর্ধ্বে, যদিও এটি ছিল বৈষ্ণব কবিদের বিশেষ ক্ষেত্র। বাংলার সমস্ত ব্রজবুলি কবিদের মধ্যে এই কবি একমাত্র সন্তানের জন্য মায়ের আকুল ভালোবাসার বাৎসল্য রস বর্ণনা করেছেন মোটামুটি কৃতিত্বের সঙ্গেই।

নরোত্তম দাস (আ. ১৫৮৩)-এর সম্পর্কে আমরা অনেক তথ্য পাই। তাঁর রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কবিতা মাঝারি হলেও তাঁর 'প্রার্থনা'র কবিতা সবার মতেই তাঁর শ্রেষ্ঠ কাজ। এবং যদিও ব্রজবুলির উপাদান তাঁর বাংলায় যথেষ্টই পাওয়া যায়, তবু মাত্র একটি কি দুটি 'প্রার্থনা'ই শুদ্ধ ব্রজবুলিতে লেখা। তাঁর কবিতায় কল্পনার বিকাশ, শৈলীগত বা ভাষাতে অসাধারণত্ব (বুদ্ধিগত বা দার্শনিক) পাওয়া যায় না, তবে আকুলতা ও করুণরস, ব্যক্তিগত আবেগ ও স্পষ্ট সরলতার এমন সংমিশ্রণ আমরা পাই যে তা পাঠককুলকে বিমুগ্ধ করে।

'গোবিন্দদাস কবিরাজের পরবর্তী কবিদেব' মধ্যে রায়শেখর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

এখানে বাংলায় ব্রজবুলির আধুনিককালে পুনরুত্থানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা দরকার। অবশ্য এর দ্বারা ব্রজবুলির ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়েছিল এমন বোঝানো হয় না। সমস্ত শতক ধরেই এর চর্চা চলেছিল। সাম্প্রতিককালে যাঁরা এই ভাষায় লিখেছেন তাঁদের মধ্যে জন্মেজয় মিত্র (রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পিতা), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-১৮৯৪), রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৫৫-১৪৯৩) এবং সবশেষে এঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)-এর নাম উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'তাঁর (বিদ্যাপতির) গান ও কবিতা ছিল আমার প্রথম আনন্দের একটি যা আমার যৌবনের কল্পনাকে নাড়া দেয় এবং আমি তাদের একটিতে সুরারোপের কাজও করি সে সময়।' মৈথিলী কবিদের কবিতা পড়ে তিনি মৈথিলী ভাষা আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন। কৈশোরের গোড়ায় ভানুসিংহ (ভানু 'রবি'র সমার্থক শব্দ—অর্থ সূর্য) ছদ্মনামে মৈথিলী ভাষায় তিনি অনেকগুলি গীতিকবিতা রচনা করেন . . . রবীন্দ্রনাথ মৈথিলী কবি বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। একথা বললে ভুল হবে না যে তাঁদেরই আলোয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিভা আলোকিত হয় এবং খ্যাতির বিপুল সম্ভার তাঁর জন্য বয়ে আনে।

'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' প্রকাশিত হয় ১৮৮৪-তে। রবীন্দ্রনাথ এর প্রকাশের ঘটনা বিবৃত করেছেন 'জীবনস্মৃতি'তে (পৃ. ১৩৬ দ্র.): "যেমন বলেছি, আমি ছিলাম

বৈষ্ণব কবিতার এক আগ্রহী পাঠক; এগুলি সেসময় অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র একত্র করে প্রকাশ করছিলেন। এঁদের অনেকাংশে মৈথিলী মেশা ভাষা আমার বুঝতে অসুবিধে হত; কিন্তু সেই কারণেই আরও আমি এঁদের অর্থ বোঝার চেষ্টা করতাম। এদের বিষয়ে আমার ছিল উগ্র কৌতূহল যার ফলে আমি বীজের মধ্যে সুপ্ত অঙ্কুর বা ধূলাস্তরে আবৃত পৃথিবীর নীচের তলার রহস্যের মতো এদের দেখি। আমার উৎসাহ ছিল এই আশায় যে আমি কিছু অজানা মণি আলোয় নিয়ে আসব, কারণ ক্রমশই আমি এই মণিকোঠার অভ্যন্তরের অনাবিষ্কৃত অন্ধকারে প্রবেশ করছিলাম।

আমি যখন অত্যন্ত বেশীরকম জড়িয়ে পড়ি, আমার নিজের লেখাও এমন এক রহস্যের আবরণে ঢেকে দেবার পরিকল্পনা আমার মনে আসে। অক্ষয় চৌধুরীর কাছে আমি ইংরেজ বালক কবি চ্যাটারটনের কথা শুনেছিলাম। তাঁর কবিতা কেমন ছিল সে বিষয়ে আমার কোনো ধারণা ছিল না; সম্ভবত অক্ষয়বাবুরও না। তা যদি জানতাম গল্পের সৌন্দর্যই হয়তো যেত হারিয়ে। এমন না হওয়ার ফলে এর মধ্যেকার নাটকীয় উপাদান আমার কল্পনাকে জাগিয়ে তুললো। কারণ তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির অনুকরণ অনেককেই বিভ্রান্ত করে। আর শেষ পর্যন্ত এই যুবক নিজেই মৃত্যুবরণ করেন। আত্মহত্যার অংশটুকু সরিয়ে রেখে আমি কোমর বেঁধে নেমে পড়ি তরুণ চ্যাটারটনের কৃতিত্বকে ছাপিয়ে যাবার কাজে।

এক দ্বিপ্রহরে ঘন মেঘে ছেয়ে গেল আকাশ। মেঘাচ্ছন্ন মধ্যাহ্নের পূর্ণ ছায়াচ্ছন্নতায় বিশ্রামগৃহে আমি ভিতরের ঘরে শয্যায় উপুড় হয়ে পড়েছিলাম। সেদিন একটি স্লেটের উপর নকল মৈথিলী কবিতা লিখি।

এই রচনায় আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছিলাম এবং প্রথম যে মানুষটিকে দেখি তাকেই এটি পড়ে শোনাতেও এতটুকু দেরী করিনি। তাঁর বোধের উপর এতটাই ভরসা ছিল যে জানতাম যে একটি শব্দও বিপদের সম্মুখীন হবে না। তিনি এরপর গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন— 'ভাল, খুব ভাল'।

কিছু পূর্বে উল্লিখিত বন্ধুকে আমি একদিন বললাম— 'আদি ব্রাহ্ম সমাজ গ্রন্থাগার তন্ন তন্ন করে খুঁজে একখানা ছিন্ন পুরনো পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছে এবং তার থেকে এক পুরনো বৈষ্ণব কবি ভানুসিংহের কিছু কবিতা আমি টুকে রেখেছি।' তাঁকে আমি আমার কিছু নকল কবিতা পড়ে শোনাই। তিনি ভীষণভাবে নাড়া খেয়েছিলেন। 'এ বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসের পক্ষেও লেখা সম্ভব ছিল না'— তিনি পরম বিস্ময়ে ব্যক্ত করলেন। 'আমি অবশ্যই সেই পাণ্ডুলিপিটি অক্ষয়বাবুকে দিতে চাই প্রকাশ করার জন্য।'

তখন আমি তাঁকে আমার পাণ্ডুলিপির খাতাখানা দেখাই এবং প্রমাণ করি যে এ সত্যিই বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসের লেখা হতে পারেনা কারণ এর লেখক স্বয়ং আমি। আমার বন্ধুর মুখখানা ছোট হয়ে যায়; তিনি আস্তে বলেন— 'হুঁ, হুঁ, ওগুলো মন্দ নয়।'

এই ভানুসিংহের কবিতা যখন 'ভারতী'তে প্রকাশিত হচ্ছিল ড. নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়

তখন জার্মানীতে। তিনি আমাদের দেশের গীতিকবিতাকে ইউরোপীয় গীতিকবিতার সঙ্গে তুলনা করে একটি গবেষণাপত্র লেখেন। সেখানে ভানুসিংহ পুরনো কবিদের একজন হিসেবে বিশেষ সম্মান পান যা কোনো আধুনিক লেখক কামনা করবেন না।

ভানুসিংহ যিনিই হোন না কেন, তাঁর লেখা যদি পরবর্তীকালের লোকেদের হাতে পড়তো, আমি হলফ করে বলতে পারি, আমি বঞ্চিত হতাম না। ভাষা উতরে যেত, কারণ যে ভাষায় আদি কবিরা রচনা করেছিলেন তা তাঁদের মাতৃভাষা ছিল না; ছিল একটি কৃত্রিম ভাষা যা বিভিন্ন লেখকের হাতে বিভিন্ন চেহারা নেয়। ভানুসিংহের কবিতাকে যাচাই করার যে কোন চেষ্টাই এর মূল ধাতুকে চিনিয়ে দিত। এতে প্রাচীন বাঁশীর কোন বিহ্বল করা সুরই ছিল না, ছিল শুধু আধুনিক বিদেশী কোন অর্গানের সুর।"

এই কবি রাধাকৃষ্ণের বিষয় নিয়ে কাজ করেছেন, কিন্তু তাতে ধর্মীয় ভাবনার ছোঁয়া নেই। এর ভাষা মৈথিলী; তার সঙ্গে যথারীতি ইতস্তত কিছু বাংলা উপাদান। কবিতার সংখ্যা মাত্র কুড়ি। তাঁদের বিষয় বসন্ত-বাসনা, শূন্য কানন, বিফল রজনী, বিরহ-বেদনা, মিলন-সজ্জা, মিলন, বংশী-ধ্বনি, অভিসার, প্রতীক্ষা, ব্যাকুলতা, রসাবেশ, নিদ্রা, অভিসার, বর্ষা, অনুতপ্ত, বিদায়, দূতীর প্রতি, সমস্যা, মরণ এবং কো তুহু।

বাংলায় বিদ্যাপতির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে দুটি কারণে— প্রথমত তিনি ছিলেন সম্ভবত অতি প্রাচীন বাংলার শিল্পী এবং দ্বিতীয়ত তিনি ছিলেন খুব বড় এক 'বৈষ্ণব গায়ক'। বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন প্রথম কারণের জন্য এবং চৈতন্য ও অন্যান্য বৈষ্ণবরা দ্বিতীয় কারণে। আমার মনে হয় এখনো পর্যন্ত বিদ্যাপতিকে প্রাচীন বাংলার কবি হিসেবেই মনে করা হয় এবং অনেকদিন পর্যন্ত মিথিলার সাহিত্যও এ কারণে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গ বলে মনে করা হত অসমীয়া বা উড়িয়ার মতো।

২. অসম

অসমে বিদ্যাপতির খ্যাতি মূলত একজন বৈষ্ণব গায়ক হিসেবে। অসমের এক বড় বৈষ্ণব গুরু শঙ্কর দেব (১৪৪৯-১৫৬৮) একবার ভ্রমণকালে ব্রজবুলি বা মৈথিলী ভাষার বৈষ্ণবত্ব প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ করে অসমে এর প্রচলন করেন।

একথা বলা ঠিক নয় যে অসমের সাহিত্য বাংলার থেকে অভিন্ন। পণ্ডিতেরা দুইয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখিয়েছেন। প্রথমত অসমের ব্রজবুলি সাহিত্যে রাধার কোনো স্থান নেই; দ্বিতীয়ত, অসমের ব্রজবুলির গীতিকবিরা 'দাস্য' ভাব বজায় রাখতে মনস্থ করেন। কিন্তু বাংলায় আমরা পাই 'অর্ঘ্য', এমনকি 'পতিপত্নীভাব'। শেষে বলা যায়, অসমের লেখকরা মৈথিলী নাটকও লেখেন যা বাংলায় একেবারে অনুপস্থিত।

অসমে ব্রজবুলির ক্রমবিকাশের কারণ মূলত "কামরূপের মানুষদের সঙ্গে বিদেহর (মিথিলা) মানুষদের যোগ . . . এবং শঙ্কর দেবের সঙ্গে শিক্ষিত সম্প্রদায়সহ মৈথিলী ভাষাভাষীদের সোজাসুজি সংযোগ, যখন তিনি পনেরোশ সালে তীর্থভ্রমণে যান, এই

মহান ধর্মপ্রণেতা এবং তাঁর শিষ্যরা অসমে বিরাট ব্রজবুলি সাহিত্য সৃষ্টি করেন, যদিও তার এক নগণ্য অংশমাত্র সম্প্রতি প্রকাশ হয়েছে।"

অসমীয়া ভাষার ইতিহাসে ব্রজবুলির উল্লেখযোগ্য স্থান আছে; এটি অসমীয়া সাহিত্যের ভিত্তিস্থাপনে সমর্থ হয়েছিল। প্রাচীনকালের ইতিহাস সংক্রান্ত বিভাগ, অসম সরকার, গুয়াহাটি— প্রথম এই সাহিত্য প্রকাশ করেন। সম্প্রতি এলাহাবাদের হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনে দেবনাগরী লিপিতে লেখা সব ব্রজবুলি কাজ প্রকাশ করেছেন।

বিদ্যাপতি দ্বারা প্রভাবিত ব্রজবুলি গীতিকবিতাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। বরগীত (দিব্যগীতি) এবং অঙ্কের গীত ('অঙ্কিয়া নাট' নাটকগুলির গান)। এছাড়া বিদ্যাপতির মৈথিলী গানের মতো এতেও আছে— (১) রাগের নির্দেশ যা থেকে বোঝা যায় এগুলি গাওয়ার জন্যই রচিত, (২) ভণিতা, (৩) ধ্রু-পদ, (৪) এবং বিষয় হল কৃষ্ণের গল্প। ব্রজের প্রত্যক্ষ প্রভাব বাংলার চেয়ে অসমের ব্রজবুলির কবিদের উপরেই বেশি।

বরগীতের ভাষা অঙ্কিয়া নাটকের মৈথিলীর মতো শুদ্ধ নয়। শুধু বেশ কিছু ব্রজভাষার শব্দই নয়, যেখানে আমরা মৈথিলী বানান ও ধ্বনিবিজ্ঞানেও পরিবর্তন পাই, যদিও মৈথিলীর বিশেষত্ব এখানেও পাওয়া যায়; যেমন, দন্ত্যবর্ণের আধিক্য (বিশেষ করে দন্ত্য 'স'), 'য' কে 'জ' হিসেবে লেখা যেখানে উচ্চারণ 'জ', য বা ব কে 'অ' লেখা যখন উচ্চারণ য বা ব; হ্রস্ব ই এবং হ্রস্ব উ ইত্যাদির ব্যবহার।

প্রাচীন ঐতিহ্য অনুযায়ী বরগীতের সংখ্যা ২৪০[১]। কিন্তু পাওয়া যায় মাত্র ২০৭টি, যার মধ্যে ৪১টি (বা ৩৫টি অন্তত) শঙ্কর দেবের রচনা; ১৫৪টি মাধবদেব, ১টি রামচরণ ঠাকুর, ১টি দৈত্যারি ঠাকুর এবং ১০টি পুরুষোত্তম ঠাকুরের রচনা।

বরগীতগুলিতে আছে 'কাব্যিক সৌন্দর্য, পেলবতা এবং ভাবনার মহিমা'। এগুলি মধ্যযুগের অসমীয়া সাহিত্যে বিপ্লব আনে এবং দেশীয় ভাষাকে নতুন শক্তি দেয়।

৩. ওড়িশা

ওড়িশায় মৈথিলীর প্রভাব প্রথম দেখা যায় ষোড়শ শতকের প্রথম দশকগুলিতে। আমরা জানি 'পূজাপ্রদীপ' এবং 'কাব্যপ্রদীপ' এর লেখক মহামহোপাধ্যায় গোবিন্দ ঠাকুর ওড়িশায় গিয়েছিলেন, কিন্তু ওড়িশায় মৈথিলী প্রভাবের মূল সূত্র ছিল বাংলা। কারণ, ওড়িশায় সবচেয়ে পুরনো ব্রজবুলি কবিতা উৎসর্গ করা হয়েছিল ওড়িশার রাজা প্রতাপ-রূদ্র-দেব (১৫০৪-১৫৩২)-এর প্রতি। এর লেখক ছিলেন ওড়িশার বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার রামানন্দ রাই। ড. সুকুমার সেন এঁর সঙ্গে চৈতন্যের সমাজের একটি বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন :

১. বরগীতগুলি সম্পাদনা করেছেন (ক) শিবনাথ ভট্টাচার্য্য এবং (খ) কান্তিরাম বুড়াভক্ত। শঙ্করদেব-এর বরগীতগুলি সম্পাদনা করেছেন রাজমোহন নাথ, বি. এ. এবং প্রকাশ করেছে অসমীয়া প্রাদেশিক শঙ্কর সংঘ, প্রধান কার্যালয় পো : পুরানিপদম, নওগাঁ, অসম।

চৈতন্য যখন উপকূলবর্তী ভারতের উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রা করেন, তখন সে কালের বাংলার এক বিখ্যাত পণ্ডিত বাসুদেব-সার্বভৌম তাঁকে বিদ্যানগরে রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুরোধ জানান। একজন সুপণ্ডিত ও অতীন্দ্রিয়বাদের কবি হিসেবে রামানন্দ বিখ্যাত ছিলেন। গুরু এবং এই কবির দেখা হয় গোদাবরীর তীরে এবং তাঁরা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন। সন্ধ্যায় এক কর্তাব্যক্তির বাড়িতে আলোচনায় বসেন এবং তা থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উদ্ভূত হয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃত'-র দ্বিতীয় খণ্ডের অষ্টম অধ্যায়ে এই সাক্ষাৎকার এবং কথপোকথনের একটি সুন্দর, বুদ্ধিদীপ্ত, সম্পূর্ণ বিবরণ আমরা পাই। চৈতন্যদেব রাইকে বৈষ্ণব ধর্মের ও দর্শনের শেষ লক্ষ্য কি জিজ্ঞেস করেন। রামানন্দ প্রকৃত উত্তর দিয়েছিলেন তবে গুরুকে তা সন্তুষ্ট করতে পারে নি। ক্রমান্বয়ে বুদ্ধিদীপ্ত এবং তীক্ষ্ণ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হতে শেষ পর্যন্ত রামানন্দ কোনো পুঁথি বা অন্য কোনো কিছু থেকে উদ্ধৃতি দিয়েই তার উত্তর দিতে ব্যর্থ হন। তখন তিনি গুরুর কাছে অনুমতি চান নিজের লেখা একটি কবিতার মধ্য দিয়ে তাঁর ভাবপ্রকাশের জন্য। মাত্র দু'লাইনও পড়া হয়নি; চৈতন্যদেব মুগ্ধ হন এবং আর পড়তে নিষেধ করেন। সমকালীন তথ্যাদি থেকে মনে হয় এটিই ব্রজবুলি রচনার প্রাচীনতম (?) কবিতা . . ." [১]

এই ঘটনা ঘটে গোদাবরীর তীরে বিদ্যানগরে ১৫১১ বা ১৫১২ সালে।

অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন রায় রামানন্দের ব্রজবুলি [২] কবিতাসংগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এতে কৃষ্ণভক্তিবিষয়ক শতাধিক সুন্দর কবিতা স্থান পেয়েছে এবং সাধারণ ব্রজবুলি কবিতার তুলনায় এগুলি অনেক উচ্চদরের। এর মৈথিলী ব্রজভাষা, ওড়িয়া ও বাংলার সঙ্গে মিশ্রিত।

এর বিশেষত্ব হল, ভক্তিরস পরিবেশিত হয়েছে অসাধারণ সুন্দর রুচির সঙ্গে এবং দিনের বিভিন্ন সময়ে কৃষ্ণের ক্রীড়ার বিবরণ এতে আছে।

ষোড়শ শতকে আর যেসব ওড়িয়া কবি ব্রজবুলিতে কাব্য রচনা করেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন চম্পতি রাই— মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেবের এক মহাপাত্র এবং মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেব স্বয়ং। এছাড়া অতিপরিচিত কবিরা হলেন মাধবী দাসী (এক মহিলা), কাহ্নু দাস এবং মুরারী; এদের উল্লেখ আছে 'পদকল্পতরু' এবং 'ক্ষণদা চিন্তামণি'তে।

পরবর্তী শতকে আমরা তিনজন বড় কবির নাম পাই যাঁরা ওড়িয়া ব্রজবুলি সাহিত্যে কৃতিত্ব দেখান। তাঁরা হলেন রাই দামোদর দাস, চন্দকবি এবং যদুপতি দাস। প্রথম দুজন রামচন্দ্র দেবের (১) সভায় খ্যাতিমান হন যিনি ছিলেন পুরীর গজপতি (রাজা); এবং

১. ব্রজবুলি সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ১।

২. 'রায় রামানন্দের ভণিতাযুক্ত পদাবলী', প্রকাশ করেছেন মানিকলাল দত্ত, ২৪ বাগমারি রোড, কলতাকা, ১৩৫২।

শেষজন ওড়িশার শাসক নরসিংহ দেবের সভায় খ্যাতিলাভ করেন। এঁরা সবাই বিদ্যাপতির অনুসরণে গান লেখেন যদিও এঁদের ভাষা ছিল বেশিটাই চণ্ডীদাসের মত।

ওড়িয়া ব্রজবুলি সাহিত্যে এখনো অনাবিষ্কৃত। আমি ভুবনেশ্বরে এই সমস্ত কাজের অনেক পাণ্ডুলিপি দেখি অসম্পাদিত অবস্থায় রাখা আছে। এর প্রয়োজন বিস্তারিত গবেষণা এবং ব্যাপক প্রকাশনা। মূলত এগুলি ছিল বাঙালি বৈষ্ণবদের সঙ্গে ওড়িশার কবিদের সংযোগের ফল।

৪.নেপাল

এই আর একটি দেশে বিদ্যাপতির বিশেষ প্রভাব পড়েছিল। নেপালে বহুদিন আগেই মৈথিলরা যাতায়াত শুরু করেন এবং ক্রমে তাঁরা প্রচলিত সংস্কৃত নাটক যা অবশ্যই যে-কোনো অনুষ্ঠানে অভিনীত হত তাতে নিজেদের ভাষণ প্রয়োগ করেন। এটি এভাবে ক্রমে নেপালের রাজদরবারের ভাষায় পর্যবসিত হয়; নেপালের মল্লরাজারা নিজেরাই বিদ্যাপতির অনুকরণে রচনা করেন এবং বহু কবি ও সঙ্গীতকারকে একাজে উদ্বুদ্ধ করেন। মৈথিলীর প্রভাবের বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে।

যেখানে প্রাচ্যদেশে (পূর্বভারত) বিদ্যাপতির অনুকরণ, প্রশংসা এবং তাঁকে বোঝার চেষ্টা এত ব্যাপক, সেখানে মধ্যদেশে (হিন্দুস্থান বা মধ্যদেশ) বলা যায় তাঁর খুব সামান্যই পরিচিতি ছিল অথবা একেবারেই ছিল না।

উপসংহার

এই কবি গর্ব করে বলেছিলেন যে তাঁর কাব্যের বিরূপ সমালোচনা সম্ভব নয়, কারণ তা নিমেষেই সংস্কৃত মানুষের হৃদয়কে মুগ্ধ করে। বলা হয় 'বিদ্যাপতি, কবীর, মীরাবাঈ, তুলসীদাস এবং নানক শুধু মৈথিলী, হিন্দি, গুজরাতী বা পাঞ্জাবীর কবিই নন, তাঁরা সারা ভারতের কবি"। (সর্দার পানিক্কর—'Golden book of Tagore')। এছাড়া রমাঁ রলাঁ, কুমারস্বামী, রবীন্দ্রনাথ এবং আরো অনেকে এই কাব্যের অসম্ভব প্রশংসা করেছেন। এসবেরই যথার্থ্য আছে।[১]

১. ফরাসি ও ইংরেজিতে ডব্লু. আর. আর্চার-এর অসাধারণ অনুবাদ ('দি লাভ সংগস্ অফ বিদ্যাপতি') ইউনেস্কো থেকে প্রকাশিত হওয়ার পরেই বিদ্যাপতি 'আন্তর্জাতিক কবি'র মর্যাদায় উন্নীত হন। মিথিলা সংস্কৃত পরিষদ, কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'বিদ্যাপতি ভাণময়' প্রবন্ধ সংকলনটিকেই বিদ্যাপতি বিষয়ক সেরা সমালোচনা গ্রন্থ বলা যায়।

নবম অধ্যায়

চতুর্দশ থেকে সপ্তদশ শতকের গীতিকবিতা

১
ভূমিকা

বিদ্যাপতির পরের কাব্যরচনার ইতিহাস, যদি নাটকগুলিকে বাদ দেওয়া হয়, মূলত গীতিকবিতা রচনার ইতিকথাই বলতে হবে, যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রাচীন ভাষা-শৈলীর ব্যবহার ও মহান কবির অনুকরণ— দুইই। এই পর্বের কাব্যরচনায় এমন একরূপতা দেখা যাচ্ছে ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দ অবধি যে তার পরই নন্দীপতি ও মনবোধের কৃতি থেকে নতুন ভাষা ও শৈলীর ব্যবহার শুরু হয়— অনেকটা দেশীয় কীর্তনীয়া নাটকের প্রভাবে— যার ফলে এই পর্বের গীতিকবিতা আলোচনা করতে গিয়ে পূর্বে নির্ধারিত 'প্রাচীন মৈথিলী সাহিত্যের' ১৩০০-১৬০০ খ্রিষ্টাব্দের কাল-সীমাকে পেরিয়ে যেতে হবে।

এই পর্বের কবিতার প্রগতির আলোচনার ক্ষেত্রে আরেকটি সমস্যা আছে। কাব্যরচনার পরিমাণের দিক থেকে এই পর্বের কাজের সংখ্যা খুবই বিশাল এবং আমরা আজও বহু কবির সম্পূর্ণ কাব্যকৃতির হদিশ পাইনি— যার প্রধান কারণ গবেষণার অভাব এবং এজন্যও যে এই রচনাগুলির একটির থেকে অন্যটির পার্থক্য— বিষয় বৈচিত্র্য, ভাষা এবং শৈলীর নিরিখে— এমনই নগণ্য এবং যেহেতু সবই সেযুগের কবিদের আদর্শ ও দেবতাবিশেষ বিদ্যাপতির নামে চালানোর চেষ্টা হয়েছে, এই কবিতাগুলির রচয়িতাদের সঠিক সন্ধানও পাওয়া যায় নি এবং অনেকগুলিরই কবি অজ্ঞাত থেকে গেছেন। সুখকর বিষয় এই যে আমরা নানান সংকলনের সাহায্যে প্রমুখ কবিদের পরিচয় পেতে পারি, কারণ দেখা যাচ্ছে যে এই কাব্য সংকলনগুলিতে সে যুগের জনপ্রিয় ও প্রতিভাশালী কবিদের মধ্যে প্রায় সবাই স্থান পেয়েছেন। তবে খুব সম্ভবত আরো কিছু প্রতিভাবান অজ্ঞাত কবিকে আমরা বাদ দিয়ে গেলাম, কারণ এই সংকলনে তাঁদের কোনো উল্লেখ নেই বলে। তবে বেশি সম্ভাবনা— শুধুমাত্র গৌণ কবিরাই বাদ পড়ে গেছেন। মোটামুটিভাবে সে-যুগের প্রধান কবিদের আমরা এই সব সংগ্রহ থেকে পেয়ে যাই — বিশেষ করে যখন লিপিকরেরা খুব সাবধানে ও সুচারুরূপে প্রতিলিপি তৈরি করেন, তাতে প্রধান প্রধান কবিদের সহজেই চেনা যায়।

এই সময়ের গীতিকবিতাগুলি সংকলনে, শিলালেখে এবং নাটকে পাওয়া যায়। এখানে নাটকে ব্যবহৃত গীতিকবিতাগুলিকে আমরা বাদ দেবো— বিশেষ করে সেগুলিকে যেগুলি নাটকের মূল কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত এবং যেগুলি বোঝার জন্য পুরো নাটক পড়া দরকার। সংকলনগুলি ছিল দু ধরনের: (ক) 'ভাষাগীত-সংগ্রহ' অথবা দেশীয় ভাষায়

রচিত গীতিকবিতা, ও (খ) 'রাগমালা' অর্থাৎ রাগসমূহের সংগ্রহ। 'ভাষাগীত-সংগ্রহ'গুলির মধ্যে কিছু আছে যাতে মূলত বিদ্যাপতির পদাবলী আছে এবং কখনো সখনো অন্য কবিদের পদ এতে রয়েছে। এই সংগ্রহগুলির মধ্যে নিম্নোক্ত সংকলনগুলিই আমরা পেয়েছি :

(১) 'তরৌণীর তালপত্র পাণ্ডুলিপি— বিদ্যাপতির পদসমূহের': মূল পাণ্ডুলিপিটি এখন পাওয়া যায় না কিন্তু অন্যান্য সূত্র থেকে জানা যায় যে এতে ১০০টিরও বেশি এমন কবিতা ছিল যা বিদ্যাপাতি-ভিন্ন অন্য কবিদের রচনা ছিল। নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'বিদ্যাপতি পদাবলী'তে এই পাণ্ডুলিপির সম্পাদিত সংস্করণ পাওয়া যায়।

(২) 'বিদ্যাপতির পদাবলীর নেপাল পাণ্ডুলিপি' : এটির সম্পাদনা করেন ড. সুভদ্র ঝা এবং শশীনাথ ঝা। এতে বিদ্যাপতি-ভিন্ন ১৩ জন কবির রচনা ছাড়াও বেশ কিছু অজ্ঞাতনামা কবিদের কবিতা আছে।

(৩) 'বিদ্যাপতির পদাবলীর রামভদ্রপুরের পাণ্ডুলিপি': শিবনন্দন ঠাকুরের দ্বারা সম্পাদিত এই সংকলনে ২৪ জন অজ্ঞাতনামা কবি ছাড়াও অমৃতকরের দুটি পদও রয়েছে।

(৪) 'বিদ্যাপতির পদাবলীর রাজ পাঠাগার পাণ্ডুলিপি': এই কয়েকটি পদের পাণ্ডুলিপি, যার সম্পাদনা করেন রমানাথ ঝা, এটিতে রয়েছে একটি অজ্ঞাত কবির রচনা ও একটি লখিমিনাথের কবিতা।

সাধারণ সংকলনগুলির মধ্যে যে-কটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার মধ্যে শুধুমাত্র প্রথম চারটিই এখনও পর্যন্ত পরীক্ষা করা হয়েছে :

(৫) 'চেতনাথ ঝা-র সংস্করণ' যার অংশরূপে ভূমিকা-সহ উমাপতির 'পারিজাতহরণ'ও আছে এবং আরো দুজন কবির রচনাও রয়েছে।

(৬) 'কংসনারায়ণ-পদাবলী' : সর্বপ্রথম আমি এটির আবিষ্কার করি— এখন এটি পণ্ডিত রমানাথ ঝা কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে 'ভাষাগীতসংগ্রহ' নামে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৈথিলী উন্নয়ন কোষের আনুকূল্যে প্রকাশিত হয়। এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত সংকলনগুলির মধ্যে সম্ভবত এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ। এতে বিদ্যাপতিসহ ২৭ জন কবির রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর বর্তমান নামকরণ আমারই করা সেই রাজার নামে যাঁর সময়েই এই পর্বের এই ঐতিহ্যটি মিথিলায় শেষ হয়ে যায় এবং যাঁকে এই সংকলনের অধিকাংশ কবিই নিজেদের সংরক্ষক বলে অভিহিত করেছেন।

(৭) 'ভাষাগীত পাণ্ডুলিপি-১': মূলত ভূপতীন্দ্রনাথমল্লের রচনা— প্রথম ড. প্রবোধ চন্দ্র বাগচীই এটি লক্ষ করেন।

(৮) 'ভাষাগীত পাণ্ডুলিপি-২': সর্বপ্রথম আমিই এটি দেখতে পাই রাজগুরু হেমরাজ পাঠাগারে (যা এখন নেপালের জাতীয় গ্রন্থাগার)। এতে একদিকে রয়েছে ভূপতীন্দ্রমল্লের ৯৭টি পদ (হতে পারে এই অংশটি পূর্বোক্ত পাণ্ডুলিপির থেকে ভিন্ন নয়) এবং বাকি ৭৬টি পদ নেপালের অন্য সাতজন কবির রচনা : এগুলিকে বিভিন্ন গুচ্ছে

ভাগ করা হয়, যেমন জগৎপ্রকাশমল্ল ও চাণ্ডপ্রকাশের 'দশাবতার কীর্তন', চাণ্ডপ্রকাশের 'বিষ্ণুভক্তি ভাবগীত' ও 'সদাশিবভক্তি -ভাবগীত' এবং এগুলি ছাড়াও বেশ কিছু অজ্ঞাত কবির পদও আছে। এই সব কটি পদই ভক্তিমূলক।

(৯) 'দশাবতারগীতম্'— ৯০ পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি, যা ছিল জিতামৃতমল্লের পদের সংকলন, তবে অন্যদের কবিতার সঙ্গেও মিলে গেছে বাজে ভাবে। মনে হয় এর পূর্বে কথিত 'দশাবতারগীতের'ই এটি একটি বিলম্বিত সংকলন— নেপালের বীর পাঠাগারের পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ১-৩৩০-এ এটি সংরক্ষিত আছে।

(১০) 'প্রকীর্ণভাষাগীতানি': এটি মূলত ভক্তিগীতির সংকলন— যেগুলির রচয়িতা হলেন জগজ্জ্যোতির্মল্ল এবং জগৎপ্রকাশমল্ল; এটিও আমি বীর পাঠাগারে দেখি (পাণ্ডুলিপি সংখ্যা ১-৩৩০ ও ১-৩৩৮)।

(১১) 'দশাবতারগীতম্': অষ্টম সংকলনটিরই অন্য একটি সংস্করণ বলেই মনে হয়। এতে ভক্তিসূচক এবং বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন পদের ১৪৫ পৃষ্ঠার একটি সংগ্রহ রয়েছে জগজ্জ্যোতি, ভূপতীন্দ্র, জগৎপ্রকাশ, চন্দ্রপ্রকাশ ও রণজিতের পদ। এটিও প্রথম ১-৭৯২ সংখ্যক পাণ্ডুলিপিরূপে নেপালের পাঠাগারে আমি আবিষ্কার করি। এছাড়াও এর মধ্যে ধরতে হবে বংশমণি ও জগজ্জ্যোতির ৬৩ পৃষ্ঠার একটি অংশকে (পাণ্ডুলিপি ১-৩৩৮ ঘ)।

(১২) 'প্রকীর্ণগীতানি': এই সংকলনে আছে ছটি গুচ্ছ ধর্মনিরপেক্ষ পদাবলী নেপালের চারজন কবির— জগজ্জ্যোতি (১৮টি পদ), ভূপতীমল্ল (১৮টি পদ), জগৎপ্রকাশ (৪), রণজিত (৪)। সর্বপ্রথম আমিই এটি নেপালের বীর পাঠাগারে ১-৭৯২ সংখ্যক পাণ্ডুলিপি গুচ্ছে দেখি।

(১৩) 'নানার্থদেবীগীতানি': এই পাণ্ডুলিপির তারিখ হলো নেপাল সংবৎ ৭৮০ (অর্থাৎ ১৬৬০ খ্রি.) ও এতে ৯০টি পদের মিশ্র সংকলন রয়েছে, যেমনটা বিদ্যাপতির পদে জগৎপ্রকাশমল্ল কর্তৃক সংকলিত হয়েছিল। এটি আমি নেপালের বীর পাঠাগারে সং ১-৩৫৭-য় লক্ষ করি।

(১৪) 'গীতগোবিন্দভাষা' : এটি জিতামৃতমল্ল দ্বারা নে. স. ৭৯৮-এ (১৬৯৮ খ্রিষ্টাব্দে) সংকলিত হয়— যার মধ্যে ১৮টি পৃষ্ঠা আছে। প্রথমে জয়দেবের সংস্কৃত পদ থাকলেও পরে জগৎচন্দ্র, চন্দ্রশেখরসিংহ, জগৎপ্রকাশ ও জগজ্জ্যোতি প্রভৃতির পদ ছিল এবং সর্বশেষে পদগুলির একটি সূচি ছিল, বিশেষ করে সেইসব পদের তালিকা যা লেখা সম্ভব হয়নি। সর্বপ্রথম আমিই এটি বীর পাঠাগারে দেখি তিনটি ভিন্ন ভিন্ন দৈর্ঘ্যের পাণ্ডুলিপিতে রক্ষিত আছে, খ-৪৪, ক-৫২৮ এবং গ-৫৫৪ সংখ্যক গুচ্ছে।

(১৫) 'পঞ্চতীর্থনানাগীতসংগ্রহ': এতে বিদ্যাপতি ছাড়াও আরো অনেক কবির পদ রয়েছে। লেখক কর্তৃক বীর পাঠাগারে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি সং ক-৩৫৩-র ১৪৬ পৃষ্ঠার অংশ রূপে।

(১৬) 'গীতপঞ্চকম্ (পঞ্জিকাসহিতম্)': এই সংকলনে ৩১টি পৃষ্ঠা জুড়ে জগৎপ্রকাশের সংস্কৃত এবং মৈথিলী গান পাওয়া যায় যা আমি বীর পাঠাগারে পাই— পাণ্ডুলিপি সংখ্যা ক ৩৫৭-য়।

(১৭) 'গীতপঞ্চকম্': জগৎপ্রকাশের দ্বারা রচিত চন্দ্রপ্রকাশের উদ্দেশ্যে শোকসংগীতের সংকলন যা এক ভাগে ৫৬টি পদে লিখিত ও যা শেষ হয় ৩১পৃষ্ঠায়। প্রথম দেখি বীর পাঠাগারে উপরোক্ত সংখ্যক পাণ্ডুলিপির গুচ্ছেই।

(১৮) 'রামগীতাবলী পঞ্জিকা': অজ্ঞাত কবিদের পদ, ১২ পৃষ্ঠা ব্যাপী যা আমি উপরোক্ত সংখ্যক পাণ্ডুলিপির গুচ্ছেই পাই।

(১৯) 'গীতপঞ্চাশিকা': ২৩ পৃষ্ঠা ব্যাপী জগজ্জ্যোতির্মল্লের ৫০টি পদের একটি সংকলন যাতে মূলত ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়ে অধিকাংশ পদ রয়েছে— বীর পাঠাগারের ক ৬৪১ সংখ্যক পাণ্ডুলিপির গুচ্ছে আছে।

(২০) 'গীতসংগ্রহ (পঞ্জিকাসহিতম্)': অসমাপ্ত সংকলন— ৫৬ পৃষ্ঠায় জগজ্জ্যোতির্মল্লের ১৪৬টি পদ সহ ৮ পৃষ্ঠার গ্রন্থসূচীসহ। বেশির ভাগ পদই নচারীর গীত যা আমি ক-১৪৬ সংখ্যক পাণ্ডুলিপি গুচ্ছে বীর পাঠাগারে প্রথম দেখি।

(২১) 'গীতপুস্তকম্': ৩৫ পৃষ্ঠা ব্যাপী ভাস্করমল্লের পদের সংকলন যা দেখি খ-২৪৭ সংখ্যক পাণ্ডুলিপির গুচ্ছে, বীর পাঠাগারেই।

(২২) 'গীতমালা': ভূপতীন্দ্রনাথের ৫৬ পৃষ্ঠা জুড়ে নারায়ণ ও মহাদেব-বিষয়ক পদাবলী; এটিও অসমাপ্ত গ্রন্থ, যা আমি একই পাঠাগারে ক-১৬৫৬ এবং ক-১৫৮৪ সংখ্যক পাণ্ডুলিপির গুচ্ছে দেখি— দ্বিতীয়টি ধ্বংস প্রায় ছিল।

(২৩) 'গীতমালা-ভাষাত্মিকা': প্রতাপমল্লের ১৫ পৃষ্ঠা ব্যাপী পদ-সংকলন যা আমি বীর পাঠাগারে খ-২৫৪ সংখ্যক পাণ্ডুলিপি গুচ্ছে প্রথম পাই।

এইসব পাণ্ডুলিপি ছাড়াও সঙ্গীত-বিষয়ক আরো বেশ কিছু সংকলন পাওয়া যায় যার সঙ্গে কোনো কোনো সময়ে সংকলনগুলিকে অনেকে পৃথক্ করতে পারেন না; এখানে পার্থক্য শুধু এইটুকু যে (অন্তত কিছু ক্ষেত্রে) এইসব নিম্নে বর্ণিত পাণ্ডুলিপিগুলি মূলত রাগ-রাগিণীর শিক্ষার্থে ও মিথিলার সংগীত শিক্ষার জন্য রচিত হয়েছিল, শুধুমাত্র সাহিত্য-কৃতিরূপে নয়— কারণ এর মধ্যে অনেকগুলি সংকলনের ওপরেই নাম নেই— বরং এগুলির নামকরণ আধুনিক গ্রন্থাগারিকেরা যথেচ্ছভাবে করেছিলেন।

(২৪) 'রাগতরঙ্গিনী'— লোচন-কৃত: ইদানীং কিছুদিন পূর্বে ড. সুধাকর ঝা এটির সম্পাদনা করেন এবং পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৈথিলী উন্নয়নী কোষের দ্বারা এটি প্রকাশিত হয়। এতে বিদ্যাপতি সমেত ৩৮ জন অন্য কবির কবিতা সংকলিত হয় — এতে উল্লেখিত কাল ছিল ১৬০৭ শকাব্দ (১৬৮৫ খ্রি.)।

(২৫) লোচনের 'রাগগীতসংগ্রহ': এই সংকলনটি আজও পাওয়া যায়নি; লোচন উপরোক্ত সংকলনে (২৪ সংখ্যক) এটির উল্লেখ-মাত্র করেন।

(২৬) 'নানারাগগীতসংগ্রহ': এই নামে নেপালের পাঠাগারগুলিতে বেশ কটি পাণ্ডুলিপি আছে। এরই মধ্যে একটি প্রথমে লক্ষ্মীনাথ ঝা দেখেন যাতে বিদ্যাপতি ও ২২ জন অন্য কবির পদ আছে (দ্র. ড. রামদেব ঝা সম্পাদিত জগজ্জ্যোতির্মল্লের 'হরগৌরীবিবাহ-নাটকে'র সংস্করণ)। এই সংকলনেরই নিম্নোক্ত অনুলিপিগুলি গানের সংগ্রহ রূপে বীর পাঠাগারেই পাওয়া যাচ্ছে যা আমি প্রথম দেখি :

(ক) পাণ্ডুলিপি-গুচ্ছ, সং ক-৩৩৮গ: জগজ্জ্যোতির পদ, ১৯ পৃষ্ঠার।

(খ) ঐ, সং ক-৩৩৮গ: মূল ৩৪ পৃষ্ঠার মধ্যে মাত্র ২৯ পৃষ্ঠা রয়েছে;

(গ) ঐ, সং ক-৩৩৮ চ: ১২ পৃষ্ঠার, মূলত জগৎপ্রকাশের পদ আছে এবং একটি প্রতাপমল্লের;

(ঘ) ঐ, সং ক-৩৪৯: ১৭ পৃষ্ঠার মধ্যে মাত্র ১৫টি পাতা আছে— মূলত জগৎপ্রকাশের পদ;

(ঙ) ঐ, সং ক-৪০৩: ২০ পৃষ্ঠার ভক্তিমূলক ও শৃঙ্গার-রসাত্মক পদের সংকলন— মূলে রচয়িতারা হলেন জগজ্জ্যোতি, জগৎপ্রকাশ, চন্দ্রশেখর এবং ভূপতীন্দ্র।

(২৭) 'রাগমালা': নেপালের পাঠাগারগুলিতে এই নামে অনেকগুলি সংকলন রয়েছে। এছাড়া আমি বেশ কটি সংকলন দেখি পাটনের কার্তিক-নাচ-গুরুর কাছে যাতে রাগ-রাগিণীর ক্রমে ১০০ থেকে ১০০০টি পদ আছে সাজানো গায়ন বা আবৃত্তির জন্য। এর মধ্যে দুটির আমি বিস্তৃত অধ্যয়ন করেছি :

(ক) একটি ১০০-পদের সংকলন যাতে ৫৬টি রাগ-রাগিণী রয়েছে এবং যাতে আছে বিষ্ণুমল্ল, শ্রীনিবাস, শ্রীনরসিংহ, বিদ্যাপতি, জয়দেব, বীরযোগ-নরেন্দ্রমল্ল, বিদ্যাধর পণ্ডিত, ইন্দ্রমল্ল, প্রতাপমল্ল ও চন্দ্রশেখর প্রভৃতির পদাবলী। এই পদগুলির মধ্যে অনেকগুলিই সংস্কৃত অথবা নেওয়ারীতে লেখা— বাকিগুলি সব মৈথিলীতে রচিত।

(খ) ১০০০-পদের বৃহৎ সংকলনে ২৪৮ পৃষ্ঠায় ৬টি রাগ ও ১৬টি রাগিণী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং এর প্রথম ২৫টি পদ হলো জয়দেবের সংস্কৃত পদ, বিদ্যাপতির ৬১টি পদ, সিদ্ধ নরসিংহের ৩৩টি নেওয়ারী পদ এবং আরো বহু নেওয়ারী পদ যেগুলির রচয়িতা হলেন গণেশ, সূর্য, চন্দ্রমা, মহাদেব, নারায়ণ ও ভীমসেন। বীর পাঠাগারে আরো যেসব 'রাগমালা' পাওয়া যায় তার মধ্যে আমি এগুলি দেখতে পাই :

[১] পাণ্ডুলিপি-গুচ্ছ, সং খ-২৬২, যাতে রয়েছে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ';

[২] ঐ, সং খ-৩৪১ : ১৩ পৃষ্ঠার সংকলন, যাতে জগৎপ্রকাশ ও জগজ্জ্যোতির পদ রয়েছে;

[৩] ঐ, সং খ-৩৩৫ : এতে বিদ্যাপতি, জগজ্জ্যোতির্মল্ল এবং যোগনরেন্দ্রমল্লের পদ আছে;

[৪] ঐ, সং খ-২৪৭ : এই অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে আছে ৩২টি পৃষ্ঠা যাতে বাংলা ও মৈথিলীর মিশ্র পদ রয়েছে। এখানে বেশির ভাগ পদ মহীনরসিংহের, কয়েকটি জগজ্জয়-রাজার।

(২৮) 'সহগীততরু' : ৮৯ পৃষ্ঠার একটি অসমাপ্ত সংকলন, যা আমি বীর পাঠাগারের পাণ্ডুলিপি-গুচ্ছ ক-৩৩০ক-এ প্রথম লক্ষ করি।

(২৯) 'সংগীতচিন্তামণি সংগীতসারসংগ্রহ' (যেটাকে 'নেপাল ম্যানুস্ক্রিপ্ট ক্যাটালগ' গ্রন্থের ২৬০-২ পৃষ্ঠায় বেণ্ডাল বলছেন 'সংগীতচন্দ্র')। এটি আসলে ১০৭ পৃষ্ঠার সংগীত-বিষয়ক সংস্কৃত কৃতি যাতে বেশ কিছু নব্য ভাষার পদ আছে।

(৩০) 'সপ্ততালগীতম্' : জগৎপ্রকাশ ও জগজ্জ্যোতির লেখা ৩৫টি গানের একটি সংকলন যা আমি ঐ পাঠাগারেই ক-৩৩৮জ সংখ্যক পাণ্ডুলিপি-গুচ্ছে দেখি।

(৩১) 'রাগভজনসংগ্রহ' : ৮২টি ভজনের একটি সংগ্রহ, যাতে জগজ্জ্যোতির্মল্লের রচনা ছাড়াও আছে বংশমণি ঝা, চতুর চতুর্ভুজ ও আরো অনেকের রচনা— সর্বপ্রথম ড. রামদেব ঝা ও আমি এটি বীর পাঠাগারে দেখি (ক-৩৭৯ সংখ্যক পাণ্ডুলিপি)।

(৩২) 'নাদোৎপত্তিমৃদঙ্গোৎপত্যাদি ভাষাসংগীত' : নাদ প্রভৃতি নানা বিষয়ে লেখা একটি তালপত্রের পাণ্ডুলিপি যাতে শিবের ভজন রয়েছে ৮৮টি — পদগুলি জগজ্জ্যোতির। চতুর্থ পৃষ্ঠায় কার্তিক পূর্ণিমার উল্লেখ রয়েছে যাতে মনে হয় পরবর্তীকালে নেপালের পাটনে যে কার্তিক-নাচের ঐতিহ্য শুরু হয়েছিল— এই গানগুলির তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ রয়েছে। প্রথম আমিই বীর পাঠাগারে দেখি (পাণ্ডুলিপি সং ৪৬১)।

(৩৩) 'রাগার্তিক্যম্' : শক্তির আরতিরূপে গানগুলি রচিত— পাণ্ডুলিপি সং ক-২৫৪-য় আমি প্রথম লক্ষ করি।

(৩৪) 'রাগার্ণবভাষা' : বীর পাঠাগারে পাণ্ডুলিপি গুচ্ছ গ-৮৪-তে আমি এটি পাই।

(৩৫) 'রাগসংগীতম্' : বীর পাঠাগারে ক-১১১০ সংখ্যক গুচ্ছে এই পাণ্ডুলিপিগুলি পাওয়া যায়।

(৩৬) 'রাগগীতাবলীপঞ্জিকা' : রাগের পঞ্জিকা— সূচিপত্রবিশেষ— যা পাণ্ডুলিপি গুচ্ছ ক-৩৫৭-য় আমি প্রথম বীর পাঠাগারে দেখি।

(৩৭) 'ভাষাগীতম্' : বীর পাঠাগারে পাণ্ডুলিপি গুচ্ছ ক-১৫৩৯-এ আমি প্রথম দেখি।

যেসব শিলালেখে মৈথিলী পদ পাওয়া যায় তা হলো এগুলি [১] —

(ক) ভাতগাঁও শিলালেখ : এখানে শিব-পার্বতীর মন্দিরে তিনটি এবং জিসবন মোড়ে দুটি গান আছে জগচন্দ্রের লেখা (১৬৭২ খ্রি.)। রণজিতমল্লের (১৬৭৮ খ্রি.) একটি গান কুনান মোড় ও অন্যটি পশ্চিমা পুকুরের কাছে। জিতামৃতমল্লের (১৬৭৮ খ্রি.) একটি গান আছে পূর্ব জলাধারের কাছে খোদাই করা।

(খ) কাঠমাণ্ডুর শিলালেখ : এখানে ১৬৭২ সালের প্রতাপমল্লের লেখা নটি গান আছে তেলেজু মন্দিরে যার মধ্যে তাঁর একজন রানীর বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে উনি মিথিলার কর্ণাট বংশের রাজ-কন্যা ছিলেন বলে।

১. এ বিষয়ে দ্র. ড. রামদেব ঝা-র নিবন্ধ 'মৈথিলী', দশেরা সং ৪, ১৯৭১-এ।

২

বিদ্যাপতির সমসাময়িক কবিগণ

(১৪০০-১৫২৭ খ্রি.)

সত্যি কথা বলতে গেলে বিদ্যাপতির সমসাময়িক কবিদের তাঁর উত্তরসূরীদের থেকে পৃথক করে দেখা কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু মোটামুটিভাবে বলতে গেলে যাঁদের ওইনিবার বংশের রাজারা সংরক্ষণ প্রদান করেছিলেন বা যাঁরা এই রাজাদের সমসাময়িক বলে জানা যায়, তাঁদেরই বিদ্যাপতির সমসময়ের পদকর্তা বলে ধরে নিতে হবে। যাঁরা খাণ্ডব রাজবংশের মিথিলার সিংহাসনে আরোহণের পর আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁদেরকে বিদ্যাপতির উত্তরসূরী বলে ধরে নিতে হবে। এই সব কবিদের ঠিক সময়ক্রম হিসেব করে আলোচনা করা যায় না। তাই, যেখানে কবিদের কালক্রম-নির্ধারিণে কঠিনতা দেখা গেছে সেখানেই নামের আদ্যক্ষর অনুযায়ী তাদের আলোচনা করা হয়েছে।

১. অমৃতকর (১৪০০-১৪৮২ খ্রি.) : ইনি বিদ্যাপতির সত্যিকারের সমসাময়িক কবি ছিলেন কারণ মহারাজ শিবসিংহ ও মহারাজ ভৈরবসিংহের সংরক্ষণে ওইনিবার বংশের কালেই কাব্য-রচনা করেছিলেন বলে প্রমাণ আছে। ইনি নিজের পদে জনৈক 'কৃষ্ণচরণ'-এর নাম উল্লেখ করেন, যিনি সম্ভবত চতুর চতুর্ভুজের (যিনি ভৈরবসিংহের সমসাময়িক ছিলেন) সংরক্ষক 'কৃষ্ণচরণ'ই ছিলেন। ইনি সেকালের রাজনীতিতেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বলা হয় পাটনার জনৈক বৈদ্যনাথের হাত থেকে মিথিলার রাজত্ব ফিরিয়ে আনার জন্য এক প্রতিনিধিমণ্ডলের নেতৃত্ব করেছিলেন উনি [১]। উনি রাজার দেওয়ানের বংশে জন্মগ্রহণ করেন, যে বংশ মহারাজ নান্যদেবের সময় থেকেই রাজপরিবারের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাঁর পিতামহ শ্রীধরদাস ছিলেন 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-এর (সংস্কৃতে লেখা কবিতার একটি সংকলন) সংকলক এবং মহারাজ নান্যদেবের (১০৯৭-১১৩৮ খ্রি.) একজন খ্যাতনামা সমসাময়িক ব্যক্তি। বিদ্যাপতি তাঁর নিজের একটি কবিতায় অমৃতকরের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন— তাঁর কূটনীতিজ্ঞান, বদান্যতা এবং পাণ্ডিত্য প্রভৃতি বিভিন্ন গুণের গুণাগুণ গেয়েছেন। মনে হয়, যদিও উনি কবি, নাট্যকার ও সাহিত্যিক এবং বিদগ্ধজন ছিলেন ও কবিদের সংরক্ষণও করতেন, উনি মূলত একজন রাজপুরুষই ছিলেন।

২. হরপতি : ইনি বিদ্যাপতিরই পুত্র বলে মনে হয়। এই প্রসঙ্গে একথা উল্লেখ করা উচিত যে নেপালের পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক-ঐতিহ্য মতে যে 'গোরক্ষবিজয়' নাটকটি বিদ্যাপতির রচনা বলে মেনে থাকি তা নাকি হরপতিরই রচনা। হস্তরেখা ও ভাগ্যগণনা-বিদ্যার জনপ্রিয় গ্রন্থ 'ব্যবহারদীপকে'র রচয়িতা হরপতি এবং এই হরপতি একই লোক বলে ধরা হয়।

১. দ্র. ড. শৈলেন্দ্র মোহন ঝা-র নিবন্ধ 'বৈজলদেব', মিথিলা ভারতী ২, খ-৩-৪।

৩. চন্দ্রকলা : লোচনের মতে ইনি বিদ্যাপতির পুত্রবধূ, হরপতির পত্নী। আমরা এর বিষয়ে বিশেষ জানি না— 'রাগতরঙ্গিণী'তে এঁর লেখা একটি সংস্কৃত-নিষ্ঠ পদ পাওয়া যায়।

৪. বিষ্ণুপুরী : উনি বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থ 'ভক্তিরত্নাবলী'-র রচয়িতা। মাত্র কিছুদিন আগে পণ্ডিত রমানাথ ঝা একথা প্রমাণ [১] দেন যে ইনি আগে মিথিলার তরৌনী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন এবং সন্ন্যাসী হওয়ার আগে এঁর নাম ছিল রমাপতি। উনি দেখিয়েছেন যে সম্ভবত ১৪২৫-১৫০০ খ্রিষ্টাব্দে ইনি জীবিত ছিলেন। জগজ্জ্যোতির্মল্লের 'হরগোবিন্দ-বিবাহ' থেকে আমরা আন্দাজ করতে পারি যে যদিও উনি বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ছিলেন, উনি যথেষ্ট সংস্কারমুক্ত ছিলেন, যেজন্য ওঁর পক্ষে শিব-বন্দনাও লেখা সম্ভব হয়েছিল। অতএব ইনি বিদ্যাপতির বেশ নিকট কালের মানুষ ছিলেন এবং সেযুগেও এঁর ভক্তিগীতির খ্যাতি বহুদূরব্যাপী ছিল।

৫. ভানু : ইনি নামকরা সংস্কৃত গ্রন্থ 'রসমঞ্জরী'র লেখক ছিলেন। কবি-রূপে এঁর পরিচিতির বিষয়ে পণ্ডিত রমানাথ ঝা অকাট্য প্রমাণ দিয়েছেন। এঁর শৈলী ছিল বেশ সংস্কৃতনিষ্ঠ ও প্রাচীনপন্থী এবং এঁর রচনায় আমরা জনৈক চন্দ্রসিংহের উল্লেখ পাচ্ছি যিনি ওইনিবার রাজবংশের মহারাজা ভৈরবসিংহের (১৪৪৬-১৪৮২) বৈমাত্রেয় ভাই বলে পরিচিত ছিলেন। সংস্কৃত কাব্যের সংকলনে এঁর নাম আমরা পাচ্ছি, ভানুদত্ত, ভানু ও ভানুকর-কবি রূপেও। অতএব এঁর জীবন-কাল ছিল ১৪৫০-১৫০০।

৬. যশোধর 'নব-কবিশেখর' (অথবা, শুধুমাত্র 'কবিশেখর') : এক সময়ে 'কবিশেখর' এই উপাধিটি বিদ্যাপতিরই উপাধি বলে ধরে নেওয়া হতো, কারণ 'রাগতরঙ্গিণী'র রচয়িতা লোচন এভাবে তাঁকে অভিহিত করেছিলেন ভুল করে। 'রাগতরঙ্গিণী'তে যে গানটি যশোধরের রচনা বলে বর্ণিত আছে তাতে উনি নিজেই নিজেকে 'নব-কবিশেখর' বলে অভিহিত করছেন। এই পদগুলির মধ্যে একটি বাংলার শাসক (পঞ্চ-গৌড়েশ্বর) 'নাসির শাহে'র ও অন্য একটি নসরত শাহের উল্লেখ করছে, কিন্তু যে কবিতাটি 'নব-কবিশেখর-যশোধর' নামে রয়েছে তার ভণিতায় আমরা হুসেন শাহের উল্লেখ পাচ্ছি। এই দুজন সংরক্ষক— নসরত শাহ ও হুসেন শাহ মনে হয় একে অন্যের পরবর্তী সংরক্ষক ছিলেন। এঁদের মেলানো যাচ্ছে হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) এবং নসরত শাহ (১৫১৯-১৫৩১) নামক দুই শাসকের সঙ্গে। বঙ্গদেশের এই দুজন মুসলমান শাসক শোনা যায় বিদ্যাচর্চার মহান প্রেরণাদাতা ছিলেন। ভারতের প্রথম মোগল সম্রাট বাবরও নসরত শাহের শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি প্রেরণার কথা উল্লেখ করেছেন। 'নব-' এই উপনামটি 'কবিশেখর'-এর আগে ব্যবহার করা হয়েছিল সম্ভবত কোনো প্রাচীনতর 'কবিশেখরের' (সম্ভবত জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুরের) থেকে পৃথক করে বোঝানোর জন্য।

যশোধর সম্ভবত নরসিংহ ঠাকুরের (১৬১২ খ্রি.) দ্বারা উল্লিখিত যশোধরোপাধ্যায়ই

১. পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, তৃতীয় সং, ১-২ দ্রষ্টব্য।

বটেন— যা ইনি নিজের 'কাব্যপ্রকাশ'-এর ওপর লিখিত টীকা 'নরসিংহ-মনীষা'-তে উল্লেখ করেছেন। সেখানে ওঁকে 'কাব্যপ্রকাশে'র প্রাচীনতর টীকাকার বলে উল্লেখ করা হয়। এর সঙ্গে (নব) 'কবিশেখরে'র সন-তারিখের মিল পাওয়া যাচ্ছে। তাঁর নামেরই আরেক কবির লেখা কিছু সংস্কৃত কাব্যস্তবক আমরা পাচ্ছি সংস্কৃত কবিতার একটি সংকলন—'বিদ্যাকরসাহস্রকম্' গ্রন্থে পাই। পণ্ডিত রমানাথ ঝা অবশ্য এই কবিকে বর্তমানকালের এক যশোধরের সঙ্গে অকারণে একাত্ম করে দেখিয়েছেন, যিনি ছিলেন পালি মহীন্দ্রবলা পরিবারের একজন।

এখন অবধি সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ে আমরা যা জানি তা থেকে সহজেই একথা বলা যায় যে যশোধর নবকবিশেখর ১৪৯৩-১৫৩১ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন এবং যে কবি নিজেকে শুধুমাত্র 'কবিশেখর' বা 'নবকবিশেখর' বলে অভিহিত করেছেন তিনি এই যশোধরই এবং হয়তো উনি নিজেকে 'নব' বলেছেন 'কবিশেখর জ্যোতিকে'র (জ্যোতিরীশ্বর) থেকে পৃথক করার জন্য যাঁর জন্ম এই কবির আগে হয়েছিল।

এঁর পদগুলি নিশ্চিতরূপেই কবিতার সাধারণ মানের থেকে উঁচুতে ছিল।

৭. গজসিংহ : ইনি 'আসামতী দেবী'র পতিদেব 'পুরুষোত্তমদেবে'র সমসাময়িক ছিলেন। লোচনের আগে (এই লোচনই গজসিংহের পদের উদ্ধৃতি দেন) আমরা দুজন পুরুষোত্তমদেবকে পাচ্ছি— (ক) ওইনিবার্-রাজ মহারাজা পুরুষোত্তম অর্থাৎ গরুড়নারায়ণ, মহারাজা ভৈরবসিংহ (১৪৪৬?-১৪৮২?) ও মহারানী জয়ার পুত্র, যাঁর প্রশংসা করেছেন বাচস্পতি মিশ্রও (দ্বিতীয়) এবং যিনি নিজে কোনো সন্তান না রেখেই মারা গিয়েছিলেন বলে জানা যায়। এবং (খ) খণ্ডবলাকুল-রাজ মহারাজ পুরুষোত্তম ঠাকুর (১৬১৭-১৬২৬) স্বয়ং নিজে। এই অবস্থায় এখন মনে হয় গজসিংহ সম্ভবত প্রথমোক্ত পুরুষোত্তমেরই সংরক্ষণে কাব্যরচনা করেছিলেন।

'রাগতরঙ্গিণী'-তে একটি কবিতা আছে যা থেকে মনে হয় একজন 'কুমার' শ্রীগজসিংহ ছিলেন যিনি তখনও জীবিত ছিলেন (যা শ্রী থেকে বোঝা যাচ্ছে)। প্রকৃতপক্ষে 'তরৌনী তালপত্র-পাণ্ডুলিপি'তে যাতে বিদ্যাপতির পদ পাওয়া যায়। গজসিংহের কবিতার ভণিতাতে আবার আমরা এক গজসিংহদেবকে পাচ্ছি যিনি হাসিনীদেবীর পতি ছিলেন এবং যাঁকে বিদ্যাপতি চিনতেন। যদি এই কবিতাটি নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ঠিক ঠিক উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন তো বিদ্যাপতিকে এই কবি গজসিংহের সমসাময়িক বলেই ধরে নিতে হবে।

গজসিংহের কবিতার নানান কাব্যিক উৎকর্ষ আছে। এঁর কবিতায় একটা বিরল সৌন্দর্য ও সূক্ষ্মতা আছে ছন্দের প্রয়োগে। এছাড়া পদগুলিতে একটা আশাভঙ্গের মানসিক স্থিতির অস্পষ্ট ইঙ্গিতও পাওয়া যাচ্ছে। ইনি একটি নাটকও লিখেছিলেন।

৮. মোরাঙের কবিরা— লছমীনারায়ণ, গোপীনাথ, বীরনারায়ণ, ধীরেশ্বর, ভীষ্ম কবি এবং গঙ্গাধর : মোরাঙ নেপালের একটি মৈথিলী-ভাষী জেলা। ফলে এটা খুবই স্বাভাবিক যে দূরস্থ নিরালা অঞ্চলের মৈথিলী কবিরাও রাজকীয় সংরক্ষণ পাবেন। আমরা মোরাঙের

রাজবংশের বিষয়ে যা জানি তাতে জানতে পারছি যে মীমাংসার বিখ্যাত বিদ্বান মুরারী মিশ্রের সময়ে (যিনি প্রায় ১৫০০-১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে খ্যাতি পেয়েছিলেন) এঁরা মিথিলার নানান সাহিত্যিকদের সংরক্ষণ প্রদান করেছিলেন। ফলে আমরা এইসব কবিদের বিষয়ে ওঁর কৃতি থেকেই জানতে পারছি যার ফলে এঁদেরকে স্পষ্টতই বিদ্যাপতির সমসাময়িক বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই কবিদের মধ্যে ভীষ্ম কবি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। ইনি জগন্নারায়ণ এবং নরনারায়ণকে নিজের সংরক্ষক বলে বর্ণনা করেছেন এবং সম্ভবত নিজেও ছিলেন রাজপরিবারেরই একজন কারণ একটি গানে উনি নিজেকে 'কুমার' বলে অভিহিত করেছেন। বাকি কবিদের বিষয়ে আমরা বিশেষ কিছুই জানতে পারি না। এঁদের মধ্যে অনেকে হয়তো অনেক পরবর্তী সময়ের কবি।

৯. কবিরাজ (ভিখারী মিশ্র) : মনে হয় 'কবিরাজ' উপাধিটি সে যুগের কবিদের একটি সাধারণ উপনাম ছিল। অতএব কোনো সংকলনে 'কবিরাজ' বলে উল্লেখিত এবং অভিহিত কবিদের পরিচয়ের বিষয়ে আমরা জোর দিয়ে কিছু বলতে পারি না। আরেকজন কবি আছেন যিনি নিজেকে 'নব কবিরাজ' বলতেন। তবে এই কবিরাজের বিষয়ে আরো কিছু নির্দিষ্টভাবে জানা যায় যা উল্লেখ করা যেতে পারে।

কবিরাজ একটি পদে আসামতী দেবীর পতিকে নিজের সংরক্ষক বলে উল্লেখ করেছেন। এখন আমরা জানি যে একজন আসামতী দেবী ওইনিবার রাজা পুরুষোত্তম ওরফে গরুড়নারায়ণের রানী ছিলেন— এবং এই রাজার পিতা ছিলেন ভৈরবসিংহ (১৪৪৬?-১৪৮২)।

কিন্তু আরেকটি গানে 'কবিরাজ' জনৈক সুন্দরদেব-এর নাম উল্লেখ করেছেন নিজের সংরক্ষক বলে। অবশ্য সেখানে এমনও হতে পারে যে নিজেকেই উনি 'সুন্দরদেব' বলে উল্লেখ করেছেন। তবে এটি যদি সংরক্ষককে বোঝায় তো মহারাজা পুরুষোত্তম ঠাকুর (১৬১৭-১৬২৭ খ্রি.) এবং মহারাজা সুন্দর ঠাকুরকেই (১৬৪১-১৬৬৮ খ্রি.) ওঁর সংরক্ষক বলে ধরতে হবে।

আমি অবশ্য 'কংসনারায়ণ পদাবলী'র পাণ্ডুলিপিতে একথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে বলে দেখেছি যে জনৈক ভিখারী মিশ্র তাঁর দেশীয় ভাষার পদের ভণিতায় 'কবিরাজ' এই ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন। সংস্কৃত কবিতার একটি সংকলন থেকে ('বিদ্যাকর সাহস্রকম্') অবশ্য আমরা জনৈক ভিখারী, ভিখিয়া বা ভিখাইয়ের নাম জানতে পারি যিনি মৈথিলী কবি ছিলেন, তবে ইনি প্রকৃতপক্ষে কে ছিলেন তা জানতে পারি না। অতএব এটা হতে পারে যে এইসব কবিরা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন।

১০. রাজপণ্ডিত : এটিও একটি সহজপ্রাপ্য উপাধি বলেই মনে হয়, কিন্তু যেহেতু ইনি সংরক্ষক-রূপে ধন্যমাণিক্যের উল্লেখ করেন, তাই একে ত্রিপুরার ১৫০তম রাজা ধন্যমাণিক্য (১৪৯৯-১৫১৫) বলেই ধরে নেয়া যেতে পারে যিনি মিথিলা থেকে কুশলী গায়ক ও বাদকের দলকে নিজের রাজত্বে আমন্ত্রিত করে এনেছিলেন। এখানে উল্লেখ

করা যেতে পারে যে স্বয়ং বিদ্যাপতিকেও 'মহারাজপণ্ডিত' বলা হতো তবে উনি নিজে কখনো নিজের কোনো পদে এভাবে নিজেকে অভিহিত করেন নি।

১১. জীবনাথ : ইনি নিজের পদে মেধাদেবীর পতি 'রূপনারায়ণে'র উল্লেখ করেন, যাকে ওইনিবার রাজা মহারাজা শিবসিংহ 'রূপনারায়ণে'র সঙ্গে একাত্ম করা যায় — যিনি বিদ্যাপতির বিখ্যাত সংরক্ষক ছিলেন (১৪১৩-১৪১৬ খ্রি.)। তবে এঁর কবিতায় বিশেষ কাব্যগুণ পাওয়া যায় না তেমন।

১২. 'দশাবধান' ঠাকুর : 'দশাবধান' কথাটির অর্থ হলো "এমন একজন মানুষ যে একই সঙ্গে দশটি বা তার চেয়েও বেশি কাজ একই সঙ্গে করতে পারে'। এক সময় ধরা হতো এটা বিদ্যাপতিরই উপাধি। কিন্তু 'কংসনারায়ণ পদাবলী'র পাণ্ডুলিপি থেকে আমরা নিশ্চিতভাবে একথা জানতে পারি যে এই মৈথিল কবিরও উপাধি ছিল "ঠাকুর"। তাও একেবারে সঠিকভাবে এঁর পরিচয় এইজন্য বার করা যায় না যে সে-সময়ে একাধিক দশাবধান ছিলেন মিথিলায়। এই বিশেষ 'দশাবধান' নিজের সংরক্ষক রূপে উল্লেখ করেছেন আলম শাহ, দামোদর ও বাংলার একজন শাসক চাঁদ রায়কে। এই আলম শাহকে চেনা যাচ্ছে আলম শাহ সৈয়দ (১৪৪৪-১৪১৫ খ্রি.) বলে; তবে দামোদর হলেন (খণ্ডবলা-রাজ মহারাজ মহেশ ঠাকুরের ভাই) মহারাজ দামোদর ঠাকুর (১৫৫৭-১৫৭১ খ্রি.) এবং চাঁদ রায় ছিলেন বাংলার রাজমহলের রাজা যিনি পরে বৈষ্ণব সন্ন্যাসী হয়ে যান নরপতি ঠাকুরের (জন্ম ১৫৩২ খ্রি.) প্রভাবে প্রায় ১৫৫০ খ্রিষ্টাব্দে, এবং যাঁর বিষয়ে 'ভক্তমাল'-এ উল্লেখ করা হয়েছে। তাই একথা মনে হতে পারে যে দশাবধান ঠাকুর নামের দুজন কবি ছিলেন; একজন, যিনি বিদ্যাপতির সমসাময়িক ছিলেন এবং আরেকজন যিনি ছিলেন উত্তরপর্বের কবি।

এই দুজনের মধ্যে দ্বিতীয়োক্ত কবিকে চেনা যাচ্ছে বহরাঢ়ী বাংলার প্রজ্ঞাকর ঠাকুরের পুত্র রত্নাকর ঠাকুর বলে।

১৩. কংসনারায়ণ এবং তাঁর অনুযায়ীগণ : ওইনিবার বংশের শেষ শাসক লক্ষ্মীনাথ 'কংসনারায়ণ' হলেন বিদ্যাপতির পরবর্তী কালের নাটক—ইতর গীতিকাব্যের ইতিহাসে সম্ভবত সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কবি। অবশ্য আমরা অনেকগুলি পদের ভণিতাতেই রচয়িতা-রূপে কংসনারায়ণ বা লখিমিনাথ-নরেশ অথবা দুটি নামেরই উল্লেখ পাচ্ছি। এছাড়া কিছু কিছু পদে লখিমিনাথের নাম আমরা পাচ্ছি রচয়িতা-রূপে ও 'রানী সোরমার' সঙ্গী 'কৃষ্ণনারায়ণ' তার সংরক্ষক একথাও পাচ্ছি। যদি 'লখিমিনাথ' নামটিকে আমরা 'লক্ষ্মীনাথ কংসনারায়ণে'র থেকে পৃথক নাম বলে ধরে নিই যাঁর সংরক্ষক ছিলেন জনৈক 'কৃষ্ণনারায়ণ'— রানী দেবজনার পতি, তাহলে এঁকে ওইনিবার রাজা ধীরসিংহ 'হরিনারায়ণে'র (১৪৪০ খ্রি.) অধীনস্ত বলে মনে করতে হবে— যিনি নিজেও 'কংসনারায়ণ' হয়ে থাকতে পারেন। অবশ্য অন্য একজন কবি গোবিন্দও 'লক্ষ্মীনাথ কংসনারায়ণ'—এই নামটিরই উল্লেখ করেন নিজের কবিতায় (নিচে দ্রষ্টব্য)।

জনৈক শ্যামসুন্দরও 'কৃষ্ণনারায়ণ'কে নিজের সংরক্ষক বলে উল্লেখ করেন, তবে ইনি ছিলেন অন্য এক কৃষ্ণনারায়ণ, কমলাবতীর পতি। মনে হয় এই সব কবিরা বিদ্যাপতির সমসাময়িক ছিলেন, কিন্তু এঁদের কাল ও পরিচয় নিয়ে আর বেশি কিছু জানা যায় না। কৃষ্ণ রায় বা কৃষ্ণনারায়ণ নিজেও নেপালী নাটক 'হরগৌরী-বিবাহ'-তে শিব বিষয়ক কবিতা লিখেছিলেন।

কংসনারায়ণ একজন নসীর শাহের নাম উল্লেখ করেন তাঁর প্রভু হিসেবে যেখানে উনি নিজেকে নিজের রানীসহ রচয়িতা-রূপে পরিচয় দিয়েছেন। এই নসীর শাহ অবশ্যই হলেন বাংলার নসরত শাহ (১৫১৯-১৫৩১ খ্রি.), হুসেন শাহের পুত্র যিনি ১৫২৭ খ্রিষ্টাব্দে মিথিলা আক্রমণ করেছিলেন এবং বস্তুতপক্ষে ওইনিবার বংশের পতন ঘটিয়েছিলেন। এও সম্ভব যে এই একই কবি লক্ষ্মীনাথের নামেও কাব্যরচনা করেন (নিচে গোবিন্দর বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য যেখানে দুটি নামই পাওয়া যাচ্ছে)।

'কংসনৃপতি' সম্ভবত এই রাজকীয় কবি কংসনারায়ণেরই নামের আর একটি রূপ।

কংসনারায়ণের অধীনে বেশ কিছু কবি মনে হয় সে যুগে কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন : গোবিন্দ, কাশীনাথ, রামনাথ ও শ্রীধর। এঁদের মধ্যে গোবিন্দই সম্ভবত কবি কংসনারায়ণের নিটকতম ছিলেন, ঠিক যেমন কবি বিদ্যাপতি রাজা শিবসিংহের কাছের মানুষ ছিলেন। ইনিও একজন 'বাসুদেব নরেশের' উল্লেখ করেন যিনি কমলা দেবীর পতি ছিলেন— নিজের একটি কবিতায় এই উল্লেখ রয়েছে। যদিও কমলাবতী কংসনারায়ণের রানীর নামও ছিল, সম্ভবত এই বাসুদেব হলেন সেই বাসুদেব যিনি ছিলেন গোঢ়ী মিশ্রের সংরক্ষক— যিনি রামভদ্রসিংহদেবের (১৪৮২-১৪৯৬ খ্রি.) সমসাময়িক— এই রামভদ্রসিংহদেবই ছিলেন কংসনারায়ণের পিতা। অতএব গোবিন্দের সময় সীমা এখন বেশ ভালোভাবেই বোঝা যাচ্ছে— প্রায় ১৪৮২-১৫২৭ খ্রি.।

অবশ্য এই কবির পরিচিতির বিষয়ে অনেক অসুবিধাও আছে। কারণ 'গোবিন্দ' নামটি মিথিলায় খুবই সহজলভ্য এবং এই নামের অনেক খ্যাতনামা মানুষ মিথিলায় আছে। হতে পারে এই গোবিন্দ এইসব মানুষদের মধ্যে একজন :

(ক) ঘুসাওতয় পরিবারের মহামহোপাধ্যায় গোবিন্দ ঠাকুর যিনি, কৃষ্ণের নামকরা ভক্ত ছিলেন এবং 'কাব্য-প্রকাশ'-এর একটা বিখ্যাত টীকা লিখেছিলেন 'কাব্য-প্রদীপ' নামে। তাঁর পুত্র দেবনাথ ৪১০ ল. সং বা ১৫২৯ খ্রিষ্টাব্দে রচনা করেছিলেন একটা তান্ত্রিক গ্রন্থ ('মন্ত্র কৌমুদি')। এই গোবিন্দ ঠাকুর ছিলেন কেশব ঠাকুর এবং সোনো দেবীর সন্তান এবং উনি ভদৌরা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি ওড়িশাতেও ভ্রমণ করেছিলেন বলে জানা যায়।

(খ) দিঘবে পরিবারের গোবিন্দ যিনি মৈথিলীতে 'নলচরিতনাট'-এর রচনা করেছিলেন। এর বিষয়ে পরে আরো বিস্তারে আলোচনা করা হবে। ইনি নিজের একটি গানে নিজেকে 'মন্ত্রী' বলেও অভিহিত করেন— তা থেকে বোঝ যায় যে উনি কোনো রাজার সভাকবি ছিলেন।

অবশ্য বেশি সম্ভাবনা হলো এই যে ইনিই বিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় গোবিন্দ ঠাকুর যদিও 'কংসনারায়ণ-পদাবলী'র একটি গানে 'জুয়াড়ি' কথাটির সঙ্গে 'নলচরিতনাট'-এর লেখকেরই সম্বন্ধ আছে বলে মনে হচ্ছে।

গোবিন্দর পদের ভাষা ও ওঁর ভাবপ্রকাশের শৈলী দুই দিক থেকেই দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি সংস্কৃতের পণ্ডিত ছিলেন এবং কংসনারায়ণের সংরক্ষণে অনেকগুলি গীতরচনাই করেছিলেন।

কাশীনাথের পরিচয় দেওয়া খুবই কঠিন। আমরা একজন আধুনিক কাশীনাথের কথা জানি যিনি ছিলেন একটি সংস্কৃত গ্রন্থ 'যদুবংশ-কাব্যে'র রচয়িতা। এঁর বাবা ছিলেন শঙ্কর এবং মা ছিলেন রোহিণী। তবে এ বিষয়ে কিছু জানা যায় না যে ইনি মৈথিলী বা অন্য নব্যভাষাতেও কবিতা লিখতেন কি না! আরেকটা মত হলো ইনিই হলেন নেপালী নাটক 'বিদ্যা-বিলাপের' রচয়িতা।

রামনাথ স্পষ্টভাবে একথার কোথাও উল্লেখ করেননি যে কংসনারায়ণই ওঁর সংরক্ষক। তবে উনি তাঁর প্রিয় রানী সোরমার উল্লেখ করেছেন তাঁর কবিতায় যা সেই সংকলনে পাওয়া যায় যা কংসনারায়ণের সভার কবিদের নিয়ে গ্রন্থিত হয়েছিল।

১৪. শ্রীধর : নেপালের জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত এঁর একটি মৈথিলী রচনা 'বিদ্যা-বিনোদ-নাটক-তন্ত্র' নামক গ্রন্থে উনি নিজেকে ফিরোজ শাহের (ফিরোজ তুঘলক?) সমসাময়িক বলে ঘোষণা করেন। হয় এঁকে বিষ্ণুপুরীর পূর্বপুরুষ শ্রীধর হিসেবে নির্দেশিত করা যায় অথবা বলা যায় যে ইনি 'শ্রীধর তর্কাচার্য ঠাকুর', যিনি 'কাব্যপ্রকাশের' একটি টীকার রচয়িতা— যার কাল সম্ভবত ল. সং ২৯১ (১৪১০ খ্রি.) যখন মিথিলায় ওইনিবার রাজবংশের শাসক দেবসিংহ ও শিবসিংহ রাজত্ব করছিলেন।

সিদ্ধান্ত

মিথিলার ইতিহাসে ওইনিবার বংশের পতন একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজবংশের বিলোপ থেকেই যার সূত্রপাত। এই বংশের শেষ রাজা ছিলেন কংসনারায়ণ এবং তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই মূল মিথিলায় সাহিত্যিক গতিবিধি বহু বছর পর্যন্ত বিশ্রস্ত হয়ে গেলো!

এই ওইনিবার বংশ মৈথিলী সাহিত্যের ইতিহাসে একটা অনপনেয় চাপ রেখে গেলো। অন্তত আটজন প্রমুখ কবি এই পর্বের অবদানরূপে উঠে এলেন যাঁরা হলেন বিদ্যাপতি, অমৃতকর, বিষ্ণুপুরী, গজসিংহ, ভিখারী মিশ্র, গোবিন্দ, ভীষ্ম এবং কংসনারায়ণ। এই বংশের রাজাদের মতো তাঁদের রানীরা, আত্মীয়-পরিজনেরা এবং সভাসদেরাও বিদ্যাচর্চা ও শিল্প-সাহিত্যের প্রতি অতীব উৎসাহী ছিলেন। সামাজিক জীবনে প্রায় সবকজন প্রমুখ ব্যক্তিই এই দেশীয় ন্যবভাষার কবিদের উৎসাহ প্রদান করেন। আমাদের সামনে প্রমাণরূপে আছেন বিখ্যাত রাজা শিবসিংহ ও রানী লখিমা, পদ্মসিংহ ও রানী বিশ্বাস

দেবী, চন্দ্রসিংহ এবং তাঁর পত্নী প্রভৃতি অনেকে— এঁদের থেকেই বোঝা যায় যে রাজপুরুষেরা বিখ্যাত বিদ্বান ও সাহিত্যিকদের কেমন বন্ধু ছিলেন অথবা তাঁদের রচনার প্রতি কতটা উৎসাহী ছিলেন। মৈথিলী কবি এবং সঙ্গীতজ্ঞদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপাল, এবং মোরাঙ ও বাংলার রাজসভাতেও স্থান হয়েছিল সমাদরে। এই ঐতিহ্যের চরমে ছিল সম্ভবত কংসনারায়ণের কালই। মনে হয় ওঁর শাসনকালে যে এতো সাহিত্যিক গতিবিধি হয়েছিল তার মূলে ছিলেন উনিই। বহু কবিতার ভণিতাতেই ওঁর নাম আসছে কবি হিসেবে এবং গোবিন্দর সঙ্গে ওঁর প্রিয় ও নিকট সম্বন্ধের সঙ্গে তুলনা করা যায় শুধুমাত্র মহারাজা শিবসিংহের সঙ্গে বিদ্যাপতির সম্বন্ধেরই।

এই সমস্ত যুগ ধরেই আমরা দেখছি মহান কবি বিদ্যাপতির রচনার অনুকরণ অনুসরণ। প্রায় সব কবিই রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-প্রীতি নিয়ে বা সাধারণভাবে প্রেম নিয়ে অথবা গঙ্গা, শিব কিংবা শক্তিকে নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন। বিদ্যাপতির মতোই প্রতীকের ব্যবহারে ঐ ধরনেরই অনুভূতি ও আবেগের সৃষ্টি হয় এঁদের কবিতাতেও। খুব কম ক্ষেত্রেই আমরা এমন কবিকে পেয়েছি যাঁর মধ্যে একেবারেই অন্য ধরনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকবে বা যিনি একেবারে পৃথক পদ্ধতি বা রচনা-প্রক্রিয়া দেখান। তবে এঁরা সবাই ভাষা, সাংগীতিক ছন্দ ও সুরের মাধুরী নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গেছেন এবং এসব ক্ষেত্রে সংস্কৃত কাব্যরীতিকে অনুসরণ করেছেন।

ওইনিবার রাজবংশের পতনের পরই একটা রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা যায় এবং এই দেশের শাসনব্যবস্থায় একটা নৈরাজ্য আসে। ১৫২৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৫৫৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে যতদিন না মহারাজা মহেশ ঠাকুর একটি নতুন রাজবংশের স্থাপনা করেন— মৈথিলী- সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে একটা শূন্যতা দেখা দিয়েছিল। সাহিত্য সৃষ্টির কেন্দ্র তখন সরে গেলো নেপালে যেখানের রাজসভায়, ঘটনাচক্রে হোক, অথবা জোর করেই হোক মৈথিল বিদ্বজ্জনেরা আশ্রয় পেলেন। এইজন্যই এর পরবর্তী অনুচ্ছেদে আমরা বিদ্যাপতির উত্তরসূরিদের নিয়ে আলোচনা করছি, সেখানে দেখতে পাচ্ছি যে অধিকাংশ লেখকই নেপালী সাহিত্যিক। এর অর্থ এও নয় যে ১৫২৭ খ্রিষ্টাব্দের ঠিক পরেই মিথিলায় কোনো লেখকই জন্মান নি— তবে ঠিক এই সময় থেকে ১৫৫৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কবি-সাহিত্যিকের অভাব— মূল মিথিলায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে যখন ১৫২৭-এর আগ ও ১৫৫৭-র পরে আমরা অনেক লেখক-কবির হদিশ পাচ্ছি।

৩
বিদ্যাপতির উত্তরসূরিরা
(১৫২৭-১৭০০ খ্রি.)

এই গোষ্ঠীতে যে কবিদের রাখা যায়, তাঁদের নিয়ে আলোচনার আগে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার যে এই অংশটি কালক্রমের হিসাব অনুযায়ী মৈথিলী সাহিত্যের ইতিহাসের মধ্যযুগে পড়বে, এটি কোনোক্রমেই প্রাচীন মৈথিলী সাহিত্যের অংশ বলে ধরা যায় না। অতএব একথা এখানে বলা ভালো যে নিম্নে বর্ণিত কবিদের শুধু আলোচনার জন্য নেওয়া হচ্ছে।

মিথিলায়

১. হরিদাস : হরিদাস ব্রজবুলি সাহিত্যের ইতিহাসে একটি পরিচিত নাম। কিন্তু আমাদের এই হরিদাসকে প্রখ্যাত মৈথিল কবি গোবিন্দদাসের (১৬৪৩-১৬৭০ খ্রি.) ভাই বলেও শনাক্ত করা যায়। ওঁর একটি মাত্র কবিতা, যা একটি নচারী, 'রাগতরঙ্গিণী'তে পাওয়া যায়— যা অত্যন্ত সহজ ও সুমধুর।

২. মহেশ ঠাকুর (১৫৫৭-১৫৬৯ খ্রি.) : ১৫৫৭ খ্রিষ্টাব্দে মিথিলায় নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠার পর, আবার বিদ্যাচর্চা ও কাব্যরচনাকে উৎসাহিত করে এই রাজদরবার, যার ফলে মিথিলায় রাজপরিবারের সঙ্গে যে গৌরবগাথা জড়িত ছিল, সেই হারানো গৌরব আবার ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল। এই নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা মহেশ ঠাকুর তাঁর সমকালীন অন্য বিদগ্ধজনের মতোই নিজেও মাতৃভাষার চর্চায় উৎসাহী ছিলেন। ইনি ১৫৬৭-তে সিংহাসন ত্যাগ করার পর বাকি জীবন বারাণসীর গঙ্গার ঘাটেই কাটিয়ে ছিলেন। এই সময়ে উনি গঙ্গা ও তারা-র আরাধনার প্রচুর স্তব রচনা করেছিলেন। এটি লক্ষ করার মতন যে তাঁর প্রকাশভঙ্গিতে কতো সহজতা ও প্রত্যক্ষতা ছিল! যদিও উনি একজন প্রথম সারির পণ্ডিতরূপে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সবচেয়ে জটিল বিষয় (উদাহরণ, 'নব্য-ন্যায়') নিয়ে চিন্তিত ছিলেন, যখন ওঁর মাতৃভাষায় কোনো গভীর ও ভাবগম্ভীর চিন্তাধারাকে ব্যক্ত করার প্রয়োজন বোধ করতেন, তখন উনি খুবই সহজ ও সরল ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করতে পারতেন। এবং তখন বিদ্যাপতির কাব্য-ঐতিহ্যে যে অতি জটিলতা ও অতি মাত্রায় শ্রমসিদ্ধ পদবিন্যাসের ধারা তৈরি হয়েছিল উনি সেই ধারাকে নাকচ করতে দ্বিধা করেন নি।

৩. ভগীরথ কবি : আমরা বেশ কিছু কবিতা পাই যেগুলির ভণিতাতে ভগীরথ বা ভরথ এই নামটি আছে। সম্ভবত একই কবির লেখা ছিল এইসব কবিতাই। উনি মানসিংহকে (মৃত্যু ১৬১৮ খ্রি.) নিজের পৃষ্ঠপোষক বলে ঘোষণা করেছেন। মানসিংহ ১৫৮৯- ১৬০৪ খ্রি. পর্যন্ত আকবরের বিখ্যাত সেনাপতি ছিলেন প্রথমে কাবুল ও পরে

বিহরের রাজমহলে। গ্রিয়ারসন মানসিংহ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লিখেছিলেন : উনি "বিদ্বান ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং কবিদের . . . কখনো প্রতিটি স্তবকের জন্য এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত দিতেন।"

মহারাজা মহেশ ঠাকুরের এই ভাই ভগীরথ ঠাকুরের (বা মেঘ ঠাকুরের) কালের সঙ্গে মানসিংহের সময়সীমার মিল আছে। তাই এই ভগীরথকে ভগীরথ ঠাকুর রূপে শনাক্ত করা যায় এবং ওঁর কাল ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে নির্ধারিত করা যায়।

৪. শঙ্কর : ইনি সম্ভবত রঘুনন্দন রায়ের পুত্র, যিনি দ্বারভাঙা রাজ্য জয় করে মহারাজা মহেশ ঠাকুরের হাতে তুলে দিয়েছিলেন (১৫৫৭ খ্রি.)। ইনিও নিজের পৃষ্ঠপোষক রূপে মানসিংহের (১৫৮৯-১৬০৪ খ্রি.— উপরে দ্রষ্টব্য) উল্লেখ করেন। এঁর প্রাপ্ত কবিতা কিন্তু বিশুদ্ধ সংস্কৃতে লেখা।

৫. চতুর চতুর্ভুজ : মনে হয় ইনি খুবই বিখ্যাত ও জনপ্রিয় কবি ছিলেন। তাঁর একটি সংস্কৃত স্তবক 'বিদ্যাকরসাহস্রকমে' উদ্ধৃত আছে যেখানে ওঁর নাম দেখানো হয়েছে চতুর্ভুজ রায় হিসাবে। নেপালের বীর পাঠাগারে একটি ১৩ পৃষ্ঠার কবিতার পাণ্ডুলিপি আছে যার নাম 'গীতগোপাল' এবং যা মৈথিলাক্ষরে লেখা— ৪৯৯ ল. সং (অর্থাৎ ১৬১৮ খ্রি.) যেখানে বলা হচ্ছে যে উনি ছিলেন 'পণ্ডিতরাজ সিংহদলন রায়ের' পুত্র। এই সিংহদলন রায়ই সংস্কৃতভাষায় 'আকবরনামা'-র রচনা করেন। আমরা চতুর চতুর্ভুজের প্রচুর পদ পাই— সম্ভবত গোবিন্দর যতো পদ পাওয়া যায় ততোগুলিই। প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সংকলনেই তাঁর পদ উদ্ধৃত হয়েছে এটা দেখা যায়। এর মধ্যে একটি পদ ১৮১৪ সালে গ্রিয়ারসন রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির (বঙ্গের) জার্নালে ছেপেছিলেন। ওঁর লেখা কবিতাগুলির মধ্যে একটি বাংলাতে লেখা। সংস্কৃতে মহাপণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও উনি সহজ ও সরল ভাষাতেও লিখতে পারতেন। উনি ছিলেন শঙ্কর রায়ের বৈমাত্রেয় ভাই যার বিষয়ে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে এবং যাঁর সংরক্ষক ছিলেন মানসিংহ (যিনি রাজমহলে ১৫৮৯ থেকে ১৬০৪ সাল পর্যন্ত ছিলেন)। পঞ্জীকারদের দলিলে দেখা যাচ্ছে উনি মেকমানির নেপালী শাসক ছিলেন : সম্ভবত এইজন্যেই নিজেকে মজা করে 'চতুর'= চালাক হিসেবে অভিহিত করতেন।

ওঁর একটি কবিতাতে উল্লেখ আছে জনৈক 'কৃষ্ণচরণে'র (ইনি হচ্ছেন সেই একই কৃষ্ণরায় যাঁর উল্লেখ আছে 'হরগৌরীবিবাহে'র একটি অজ্ঞাত গানে)। নিশ্চিতরূপেই এই কৃষ্ণরায় তাঁর পরিবারেরই একজন ছিলেন। কৃষ্ণচরণ কথাটা অবশ্য হতে পারে ভগবান কৃষ্ণের একজন কৃষ্ণপদে অনুরক্ত ভক্ত— এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ড. শৈলেন্দ্র মোহন ঝা চতুর্ভুজের পদাবলীর একটি অপূর্ব সংস্করণ প্রকাশিত করেছেন কিছুদিন আগে। ওঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা হলো সেইটি যেখানে দুজন সুন্দরী রমণী জাঁতা পিষতে পিষতে নিজেদের মনোভাবকে ব্যক্ত করছেন। উনি শিব ও কৃষ্ণ দুজনকে নিয়েই লিখেছেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি ইনি এযুগের সেই মুষ্টিমেয় কবিদের

একজন যাঁদের কিছু না কিছু নবীনতা ছিল।

৬. মহীনাথ ঠাকুর : (১৫৫৯/৭১-১৬৯০/৯৩ খ্রি.) এবং ৭. লোচন : লোচনের থেকে একটি নতুন যুগের সূত্রপাত হয় যে যুগের আরম্ভ হয়েছিল খণ্ডবাকুলের রাজবংশের প্রতিষ্ঠার পর। ওঁর সময়ে আসতে আসতে নতুন রাজবংশ নিজেকে ঐতিহ্যপূর্ণ প্রাক্তন রাজসভার মতোই পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছিল শিল্প-সাহিত্যের কেন্দ্র রূপে। মহারাজ মহীনাথ ঠাকুর নিজেও নব্যভাষায় কাব্যরচনায় খুবই উৎসাহী ছিলেন যা তাঁর ভক্তিমূলক শ্যামাসঙ্গীত থেকেই বোঝা যায় যা উনি ১৬০১ সালে ওঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরপতি ঠাকুরের বিদায়কাল রচনা করেছিলেন— যখন নরপতি মোরাঙের বিদ্রোহী শাসকদের বশে আনতে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন।

মহীনাথ ঠাকুর ও তাঁর ভাই নরপতি ঠাকুরের রাজত্বকালেই মৈথিলী গীতিকবিতা আবার আগের মতোই খ্যাতি-লাভ করেছিল। নরপতি নিজে ছিলেন একজন খ্যাতনামা সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞ এবং ওঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বা দক্ষতা ছিল 'ধুনি'-তে বা ধ্রুপদে। লোচন এঁর এই বিশেষ কুশলতার কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন যে তাঁর নিজের কৃতিত্বের জন্যও এঁরই অনুগ্রহ ও প্রেরণা দায়ী।

ইদানীং কালে সঙ্গীত বিষয়ক বিদ্বানেরা নানান রচনায় মধ্যযুগের ভারতীয় একজন প্রমুখ জ্ঞাতারূপে লোচনের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত যতদিন না বিদ্যাপতির পদাবলীর (১৯১০) মুখ্য উৎসরূপে লোচনের বিখ্যাত গ্রন্থ 'রাগতরঙ্গিণী'র উল্লেখ না করেন এবং যতদিন না উনি এ নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন ততদিন লোচনের জীবনী ও কৃতির বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় নি। ইতিমধ্যে ১৯১৮ সালে পুনা থেকে পণ্ডিত দত্তাত্রেয় কেশব যোশী এলাহাবাদে রক্ষিত এই গ্রন্থেরই একটি পাণ্ডুলিপির ওপর নির্ভর করে রাগতরঙ্গিণীর একটা সংস্করণ প্রকাশিত করেন। শ্রীভালচন্দ্র সীতারাম সুখথানকরও এর একটি সম্পাদিত সংস্করণ বের করেন বলে কথিত আছে। এই দুটি সংরক্ষণের মধ্যে কোনোটিতেই এই গ্রন্থের নব্যভাষার অংশগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়নি। সর্বপ্রথম পণ্ডিত বলদেব মিশ্রই রাজ প্রেস, দ্বারভাঙা থেকে এই সম্পূর্ণ সংস্করণের সম্পাদনা ও প্রকাশনা করেন (১৯৩৭)। ১৯৬৪ সালে ড. সুধাকর ঝা পাটনা থেকে এর একটি প্রামাণ্য সংস্করণ বের করেন। হালে শ্রীমন নারায়ণ দ্বিবেদীর মতো বিদ্বানেরা দেখিয়েছেন যে কিভাবে শুভঙ্করের 'সঙ্গীতদামোদর' থেকে এখানে প্রচুর মাত্রায় ধার নেওয়া হয়েছে।

অনেক দিন পর্যন্ত, দুর্ভাগ্যবশত, লোচনকে বাঙালি লেখক বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। দ্বাদশ সর্বভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনের একটি প্রযুক্তিবিষয়ক অধিবেশনে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন বিস্তারিত যুক্তি দিয়েছেন যে কেন লোচনকে বাঙালি লেখক বলা উচিত। এ প্রসঙ্গে ড. সুভদ্র ঝা তাঁর বিস্তারিত নিবন্ধ 'লোচনের কাল ও বাসস্থান'[১]-এ

১. দ্র. পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ১.২, পৃ. ৩৮-৩৯।

লেখেন :

> যে স্তবকটি পুনা সংস্করণ থেকে শ্রীযুক্ত সেন (উপসংহার অংশ থেকে) উদ্ধৃত করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে লোচন ছিলেন বল্লাল সেনের সমসাময়িক, সেটিতে রচয়িতা অথবা সংকলনের নামের উল্লেখ নেই। এর অর্থ শুধু এইটুকু যে কোনো এক বিশেষ দিনে যখন ১০৮২ শকাব্দে বল্লাল সেন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন সপ্তর্ষির স্থান ছিল বিশাখা নক্ষত্রে। যদি এতে সংকলনটির বা পাণ্ডুলিপিটির রচনার সন-তারিখ কিছু পাওয়া যেতো তাহলে 'আসন্' বলে ('ছিল' এই অর্থে) কোনো শব্দ পাওয়া যেতো না, অথবা 'যদা', 'তদা' প্রভৃতি অব্যয় ব্যবহৃতই হতো না এই স্তবকের কোনো পংক্তিতেই . . . যা থেকে এই ধারণা হয় যে এই পদ-স্তবকটিও মূল উপসংহারের অংশ ছিল। অতএব আমি এর থেকে এই সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হচ্ছি যে এই স্তবকটি লোচন নিজে নন, অন্য কোনো লিপিকর বা পাঠক এই পাণ্ডুলিপিতে জুড়ে দেন। সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিতে বা পাঠে পরবর্তীকালের লিপিকরদের দ্বারা এই ধরনের অপ্রয়োজনীয় কথা বা রচনা যোগ করা যে সে যুগের পাঠক বা লিপিকরদের অভ্যাস ছিল, সে বিষয়টি অজানা কিছু নয়।

অতএব আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনকে সমর্থন করার কিছু নেই,—

> সম্ভবত এই নবরচিত গ্রন্থটি জনসমক্ষে রাজসভার সঙ্গীতজ্ঞদের দ্বারা উপহার-রূপে প্রদত্ত হয়েছিল বল্লাল সেনের সিংহাসনে আরোহণের শুভ-দিনে।

বরং অন্যদিকে আমরা দেখছি পণ্ডিত বলদেব মিশ্রের সংস্করণে এই বিশেষ পদ্যাংশটি একেবারেই অনুপস্থিত রয়েছে। বরং এতে মিথিলার রাজা মহেশ ঠাকুর থেকে মহীনাথ ঠাকুরের প্রশংসায় বেশ কটি ছত্র আছে দেখতে পাচ্ছি যেখানে দেখতে পাচ্ছি দ্বিতীয়োক্ত রাজার ভাই নরপতি ঠাকুরের (১৬৭৩-১৬৯০ খ্রি.) আনন্দ-বিধানের জন্য পাণ্ডুলিপিটি রচিত হয়েছিল। এছাড়া লোচনের দ্বারা সংকলিত আরেকটি ' নৈষধ'-এর পাণ্ডুলিপির অনুলিখনে দেখছি ১৬০৩ শকাব্দ (বা ১৬৮১ খ্রি.) উল্লেখিত আছে। অতএব এ নিয়ে, বিশেষ করে চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে যদি পঞ্জীকারদের বিস্তারিত বর্ণনার দিকে দেখি লোচনের পূর্বপুরুষ উত্তরসূরিদের বিষয়ে, তাহলে লেখক ও লোচনের বা লোচনের কৃতির মূল মিথিলা কি না তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করার কোনো অবকাশ থাকবে না।

চন্দা ঝা লোচনের নিজের হাতে লেখা একটি পাণ্ডুলিপি থেকে একটি পদ উদ্ধৃত করেন— যে বিশেষ পাণ্ডুলিপিটি আজ পাওয়া যায় না— একথা প্রমাণ করতে যে লোচন ১৬২৪ শকাব্দে (বা ১৭০২ খ্রিষ্টাব্দে) জীবিত ছিলেন। আরেকটি পাণ্ডুলিপিতেও (সম্ভবত 'রাগতরঙ্গিণী'রই প্রতিলিপি) চন্দা ঝা দেখেছেন যে ১০৬৭ শকাব্দ (বা ১৬৮৫ খ্রিষ্টাব্দ) উল্লেখিত রয়েছে যা সম্ভবত এই বিশেষ কৃতিটির রচনা-কাল ছিল।

মিথিলার সংগীতের ইতিহাসে 'রাগতরঙ্গিণী'র স্থান নিয়ে এখানে আলোচনা করার অবকাশ নেই। এটা বলাই যথেষ্ট হবে যে যেখানে এই সংকলনটির মধ্যে দিয়েই বহু কম জানা বা অজানা কবির [১] কবিতা রয়ে গেছে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য, যা থেকে সবার কাল-নিরুপণে সুবিধা হয়— এ থেকে বরং এও জানা যায় যে সে যুগে ও কালে কী প্রচণ্ড কাব্যরচনাত্মক প্রক্রিয়া দেখা গেছিল। এই কৃতির থেকে লোচনের সংগীত বিষয়ক অগাধ জ্ঞানেরও সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। খুব দক্ষতার সঙ্গে ইনি মিথিলার বিভিন্ন সংগীত ঘরানার সুরলহরীর আবরণের মধ্যে পার্থক্যকে দেখিয়েছেন এই গ্রন্থে। সত্যি কথা বলতে গেলে, উনিই প্রথম মানুষ ছিলেন যিনি মিথিলার সব রাগ ও রাগিণীর বর্ণনা ও সংজ্ঞা নিরুপণ করেছিলেন ছন্দের ওপর ভিত্তি করে। অতএব এটি মিথিলার গীতি-কবিতার ছন্দ-মীমাংসার অধ্যয়নেরও একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

লোচন মধ্যদেশের ভাষা (হিন্দি) ও মৈথিলী— দুটোই ভালো জানতেন। দুটি ভাষার মধ্যেকার পার্থক্যও উনি স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন, তবে দ্বিতীয় ভাষাটির প্রতি অধিকতর টান থাকা ওঁর পক্ষে স্বাভাবিক। উনি নিজের মৈথিলী কাব্যরচনাকে বিদ্যাপতির সমান স্তরের বলে মনে করতেন। যেখানেই উনি বিদ্যাপতির পদের উদাহরণ দিয়েছেন, তার অব্যবহিত পরেই উনি নিজের পদ উদ্ধৃত করেছেন উদাহরণ হিসেবে।

ওঁর রচিত গীতিকবিতাগুলি ঐতিহ্যেরই অনুপন্থী, যদিও বিদ্যাপতির পরম্পরায় যেসব কবিরা কাব্যরচনা করেন, তাঁদের মধ্যে ওঁর স্থান একেবারেই স্বতন্ত্র ছিল। ওঁর কবিতাতে দক্ষ কারিগরির ছাপ তো ছিলই, এছাড়াও সেই গুণটিও ছিল যাকে তাঁর পরবর্তীকালে গোবিন্দদাস আরো উন্নত ও মার্জিত করতে পেরেছিলেন। এই গুণটি হলো পদে ব্যবহৃত শব্দগুলিকে গীতিময় (অনুপ্রাসময় ও ধ্বন্যাত্মক করে তুলে) করে তোলা যাতে তাদের কাব্যিকতা যায় বেড়ে। উনি অবশ্য কখনোই দুর্বোধ্য ও রহস্যময় নন। বরং উনি বিদগ্ধজনের কাছে বেশ আনন্দকর ও সুমিষ্ট— তবে এজন্যই উনি আজও বিদ্যাপতির সমান জনপ্রিয় নন।

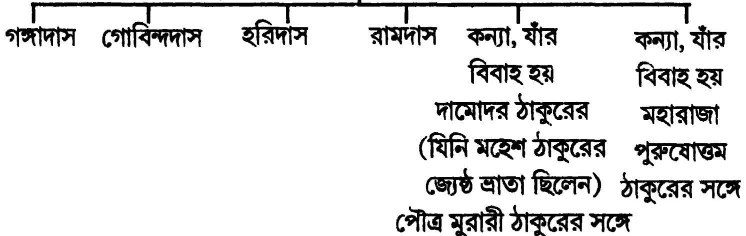
৮. গোবিন্দদাস : এবার আমরা বিদ্যাপতির উত্তরসূরিদের মধ্যে প্রধানতম ও মহানতম কবি গোবিন্দদাসকে নিয়ে আলোচনা করবো। ইনি সেই কজন গৌরবময় কবিদের মধ্যে একজন যাঁদের বাংলোভাষী নিজেদের কবি বলে মনে করে ও পরিচিতি দিয়ে ধন্য হয়েছিলেন। বাবু নগেন্দ্রনাথ গুপ্তই প্রথম একথা প্রমাণ করেন যে গোবিন্দদাস বাঙালি কবি নন, মৈথিল কবি ছিলেন— যেজন্য আমরা তাঁর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। চেতনাথ ঝা ও চুন্দা ঝা-ও একথার সপক্ষে মত দেন— বিশেষ করে মথুরাপ্রসাদ দীক্ষিত গোবিন্দদাসের পদের একটি সম্পাদিত সংকলন প্রকাশিত করার পরে।

---

১. সব মিলিয়ে ৪০ জন কবি এই সংকলনে স্থান পেয়েছেন। এখানে বিদ্যাপতির ৪৫টি এবং লোচনের নিজের ৯টি পদও আছে।

ড. অমরনাথ ঝা শেষে গোবিন্দদাসের কবিতার একটি প্রামাণ্য মৈথিলী সংস্করণ বের করেন চন্দা ঝা-র সংকলনের উপর নির্ভর করে।[১]

গোবিন্দদাসের জীবন ও কাল সম্বন্ধে আমাদের কাছে প্রচুর তথ্য রয়েছে। রামদাসের 'আনন্দবিজয় নাটকে' তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও শিক্ষাগুরু গোবিন্দদাসের হৃদয়বৃত্তি ও বুদ্ধির একাগ্রতার সম্যক বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে। উনি মহারাজা সুন্দর ঠাকুরের সমসাময়িক (১৬৬৩/৪-১৬৭০/১) ছিলেন এবং স্বর্গত মহারাজা রামেশ্বর সিংহ বাহাদুরের (১৮৮৮-১৯২৯ খ্রি.) মায়ের বংশে ওঁর জন্ম হয় বহুকাল আগে। পঞ্জী থেকে আমরা গোবিন্দদাসের বংশ ইতিহাস নিয়ে জানতে পারি যে তাঁর সব কটি ভাইই ছিলেন কবি। আমরা গঙ্গাদাসকে দুটি সংস্কৃত গ্রন্থের লেখক-রূপে জানি— দুটিই কাব্যগ্রন্থ : 'গঙ্গাভক্তি' এবং 'গঙ্গাবিলাস'। আগেই বলা হয়েছে হরিদাস ছিলেন একজন মৈথিল কবি। রামদাসকে আমরা পরবর্তী পর্যায়ে একজন মৈথিল নাট্যকার-রূপে পাবো। এর বংশলতিকা ছিল এইরকম :



১. ড. সুকুমার সেনের 'হিস্ট্রি অব ব্রজবুলি'-তে গোবিন্দদাসের ওপর যত গ্রন্থাদি রয়েছে তার তালিকা দেওয়া আছে। আশ্চর্য ব্যাপার হলো অদ্যাবধি মিথিলায় প্রাপ্ত প্রাচীন পুঁথির মধ্যে একটিতেও এইসব পদাবলীর একটি কবিতাও সংকলিত হয়নি। তদুপরি, হরিনারায়ণ, নরনারায়ণ ও রায় চম্পাতির (দ্র. ড. ঝা-র সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃ.১৫, ৩১-৫ এবং ২য় খণ্ড, পৃ.১৫) কোনো ব্যাখ্যা মিথিলার ইতিহাস থেকে পাওয়া যায় না, যায় বাংলার ইতিহাস থেকে। দ্র. ড. সেনের উপরোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১০৬ পা. টী.। আমার মনে হয় গোবিন্দদাসের কবিতা ঠিক লোচনের মতই তার বিদগ্ধতার জন্য বিদ্যাপতির মতো জনপ্রিয় হয়নি, তবে এগুলি বঙ্গভাষীদের নজরে ঠিকই পড়েছিল—যে জন্য ওদেশে তাঁর সংরক্ষণ হয়। এও সত্যি হতে পারে যেমন পণ্ডিত রামনাথ লিখেছেন যে (প্রবন্ধ পত্রিকায়) উনি কয়েক বছর নবদ্বীপ কাটিয়ে তারপর বাঙালি বৈষ্ণববাদ গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে ড. বি. এন ঝা-র গোবিন্দদাস বিষয়ক গ্রন্থও উল্লেখযোগ্য।

কথিত আছে গোবিন্দদাস 'কৃষ্ণ-লীলা' নামের একটি গ্রন্থ-রচনা করেন। সম্ভবত ওঁর রচনা বলে আজ যেসব রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদ জানা যায় এই নামটি তারই কোনো সংকলন বা ক্রমবদ্ধ গ্রন্থের প্রতি প্রযোজ্য ছিল। কারণ তাঁর কবিতায় কৃষ্ণের কেলি ও গোপিনীদের বিরহ-নিয়ে যে দুধরনের বিষয়বস্তু ছিল তার বিষয়ে বর্ণনা ও ভাবপ্রকাশের ভঙ্গিমায় একটা একরূপতা দেখা যায়।

গোবিন্দাদাসের কবিতার সঙ্গে বিদ্যাপতির একটা বিরাট পার্থক্য আছে। যেখানে বিদ্যাপতিতে আছে বেশ শৌখিনতা, রূপকের ওপর রূপকালঙ্কারের পাহাড়, যেমন সহজে তা মানবজীবনের দুঃখ ও আনন্দের একটা সহজ পরিবেশের সৃষ্টি করে এবং যেভাবে সরল অথচ প্রত্যক্ষভাবে অনুভূতিপ্রবণ প্রতীকের সাহায্যে সাধারণ নরনারীর হৃদয়াবেগের কাছে তার আবেদন থেকে যায়, সেই তুলনায় গোবিন্দদাস কিন্তু অন্যদের অনুভূতির চেয়ে ব্যস্ত নিজের শৈলী নিয়ে। অর্থের বেলায় উনি বেশ প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী, কিন্তু সাধারণভাবে উনি শব্দের ও বর্ণের ধ্বনি ও অর্থ নিয়ে খেলা করতে ভালোবাসেন— সাধারণভাবে উনি প্রেমভাব নিয়ে ভক্তিকে দেখছেন — কোনো রাজসভার শ্রোতার প্রতি লক্ষ্য করে কাব্যরচনা করছেন না, বরং নিজের আত্মতুষ্টির জন্য কাব্য সৃষ্টি করে চলেছেন অথচ এতৎ সত্ত্বেও অসম্ভব অনুভূতিপ্রবণ ভাষায় এবং একজন কাব্যশিল্পীর আবেগকে কবিতায় ঢেলে পদরচনা করতে পেরেছিলেন। বিদ্যাপতির সঙ্গে কালিদাসের মিল আছে— দুজনেরই 'প্রসাদগুণ' (অন্যকে প্রসন্ন করার ক্ষমতা, কবিতার মাধ্যমে) খুবই বেশি, অথচ গোবিন্দদাস প্রায় মাঘের মতোই— কিছুটা দুর্বোধ্য। লোচনের কবিতায় যা শুধু প্রবণতা, উনি তাকেই করে তুললেন আরো উন্নত মানের— যেজন্য আজকের সাধারণ মানুষের কাছে উনি লোচনের মতোই বিস্মৃত প্রায়।

ড. সুকুমার সেন গোবিন্দদাসের কাব্যের বৈশিষ্ট্যকে এভাবে সংক্ষেপে ব্যক্ত করেছেন :

> উনি মাতৃভাষায় উৎকৃষ্ট মানের রচনার জন্য মুলত প্রাচীন গীতিকবিতার উপরেই নির্ভর করেছেন। আমাদের এই কবি সংস্কৃতের ছন্দশাস্ত্রে প্রাপ্ত সব কটি অলঙ্কার ও অন্যান্য প্রক্রিয়ার সফল ব্যবহার নিজের রচনায় করেছিলেন। এতে কিন্তু মহানতম সফলতা হলো . . . ছন্দগত শুদ্ধতা অর্জন, যার ফলে সাংগীতিক স্বরসাদৃশ্য ও স্বচ্ছন্দ পাঠ হয়েছে সম্ভব। এজন্য কবিকে নিতে হয়েছে 'অনুপ্রাসের'[১]

---

১. উনি 'অনুপ্রাসের' ব্যবহার করেছেন নানাভাবে। অনেক সময়েই উনি এক একটি পদের গোড়ায় এমন শব্দাবলী ব্যবহার করতেন যা একই ধ্বনি দিয়ে আরম্ভ হয়; দ্রষ্টব্য 'শৃঙ্গার ভজনাবলী' (সাহিত্যপত্র সংস্করণ), প্রথম খণ্ডের এইসব পদগুলি: ১৩৯ (গ), ১৪১ (ণ), ১৪২ (র), ১৪৩ (ত), ১৪৪ (দ), ১৪৫ (য), ১৪৬ (থ), ১৪৮ (ছ), ১৪১ (ব), ১৫১ (ভ), ১৫২ (হ) ও ১৫৯ (ধ)। ড. সেন অন্য কথা বললেও এর মধ্যে অনেকগুলির সৌন্দর্য নষ্ট হয়েছে অতিরিক্ত স্বরসাদৃশ্য ও অনুপ্রাসে— এগুলি যে কবিতায় নেই তা এগুলির চেয়ে অনেক উন্নত মানের।

> সাহায্য যাতে তাঁর কবিতার সৌন্দর্যকে কখনোই বিনষ্ট করেনি যা অন্য সাধারণ মাপের কবির রচনায় হতে পারতো। এমন নয় যে অনুপ্রাস ও স্বরসাদৃশ্যের প্রতি এই অতিরিক্ত প্রবণতার জন্য কবিতায় গম্ভীর চিন্তাধারার কোনো ছাপ নেই। যদিও আপাত ভাবে শুধু ওঁর কবিতার বহিরঙ্গটিই দেখা যাচ্ছে, একথা অস্বীকার করা যায় না যে প্রণয়োদ্দীপক অনুভূতিকে ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে এবং বেশ রঙিন কল্পনার বিস্তারে উনি অত্যন্ত সফল ছিলেন . . . তাঁর কাব্যের ছন্দের থেকে যে সংগীত এসেছে এবং তাঁর ভাষা-শৈলীর মধ্যে যে গীতময়তা আছে—তৎসম শব্দ ও রূপে ভরা— তাতে সব দোষ পুষিয়ে দেয়। কবি বিদ্যাপতির পদকে নিজের কবিতার আদর্শ বলে করতেন ইনি (এবং নিজের একটি পদে বিদ্যাপতিকে বলেছেন নিজের গুরু) . . . রাধা-কৃষ্ণের নানান ধরনের প্রেমকাহিনীর মনস্তাত্ত্বিক দিকের ওপরে উনি বিস্তারে লিখেছেন . . . ওঁর বিশেষত্ব ছিল সংগীতসমৃদ্ধ শব্দ-চিত্র তৈরি করা। তবে প্রেমাবেগের বর্ণনা ও প্রেমের গভীরতা ও হতাশা নিয়ে ওঁর লেখা পদের জুড়ি মেলা ভার। উনি বাৎসল্য ও সখ্যভাব নিয়ে বিশেষ কিছু লেখেন নি। . . . যখন এগুলি ঠিকমতো কীর্তনের ভঙ্গিতে গাওয়া হয়, গোবিন্দদাসের পদ খুবই উপভোগ্য হয়ে দাঁড়ায় . . . শ্রবণ সুখকরতা এবং গীতলালিত্যময়, গোবিন্দদাসের রচিত এই গীতপদগুলির প্রভাব সুদূরপ্রসারী।[১]

ওঁর কবিতায় যে দোষ আছে তা ওঁর গুণেরই অপরপিঠ। ওঁর প্রতিটি পংক্তির মধ্যে যে সচলতা আছে অথবা যে শৈল্পিকতা, মধুরতা এবং স্বচ্ছন্দতা আছে সেই কারণেই ভাবের গভীরতা, দর্শনের বিরাটতা ও কল্পনার তীব্রতার চেয়ে বেশি রয়েছে কৃত্রিমতা। একথা বললে অতিশয়োক্তি হবে না যে ওঁর কবিতার গঠনের সৌন্দর্যের জন্য অর্থের সৌন্দর্যকে দেওয়া হয়েছে বিসর্জন।

নেপালে

নেপালের রাজসভার সঙ্গে মিথিলার যোগাযোগের কাহিনী খুবই আকর্ষক কিন্তু এ বিষয়ে বিস্তারে পরে একটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। এখানে একথা বলে নেওয়া প্রয়োজন যে মিথিলায় মুসলমান আক্রমণের ফলে শিল্প সাহিত্যের চর্চা যাঁরা করতেন তাঁরা দূরে ও নিশ্চিত স্থানে আশ্রয় নিতে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। মল্লবংশের নেপালী রাজারা ছিলেন খুবই বিদগ্ধ এবং তাঁরা বিদ্যাপতির ভাষাকে পেলেন খুবই উন্নত ও যথোচিতভাবে তাঁদের নিজেদের ভাবপ্রকাশের মাধ্যমরূপে।

১. মান (বিচ্ছেদ ও ক্রোধ), নায়িকা, রতিবল্লভ-নায়ক, অক্ষ-ক্রীড়া, হোলি-বসন্তলীলা, কৃষ্ণবর্ণনা, রাধাবর্ণনা, অভিসার ও মিলন— এই সব ভাবই ওঁর কাব্যে স্থান পেয়েছে। তবে বিদ্যাপতির মতো ওঁর কবিতা চরম শৃঙ্গারের গান নয়।

নেপালর কবিরা ছিলেন অত্যন্ত প্রতিভাশালী ও বহুমুখী স্রষ্টা— ওঁদের নিজেদের বিভিন্ন প্রয়োজনে ওঁরা নানা ধরনের রচনা করেছেন— ভক্তিগীতি যা ওঁরা দশটি হিন্দু দেব-দেবীর উদ্দেশে লিখেছিলেন— গণেশ, সূর্য, চন্দ্রমা, মহাদেব, নারায়ণ, ভীমসেন ও ভৈরবকে নিয়ে— রাধা-কৃষ্ণ এবং হর-গৌরী বিষয়ক ঐতিহ্যের বিদ্যাপতির শৈলীতে লেখা কবিতাসহ। ধর্মনিরপেক্ষ বিষয় নিয়ে লেখা কবিতাগুলি দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে জরুরি এমন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অথবা কারুর তিরোধানের শোকপ্রকাশ করতে অথবা রাজার প্রশংসা ও বন্দনা করার জন্য লেখা হতো। তবে বিদ্যাপতির ঐতিহ্যের প্রভাব মোটামুটিভাবে সর্বত্র পরিলক্ষিত হতো। নাটকের বাইরে শুধু গীতিকবিতা রচয়িতাদের সবচেয়ে সুন্দর পদরচনা এঁরা করেছিলেন :

১. ভাতগাঁওয়ের রাজবংশ

(এক) বীরনারায়ণ : এঁকে সেই কবির সঙ্গে এক করে দেখা যায় যিনি একটি অজ্ঞাতনামা নাটক-রচনা করেছিলেন কৃষ্ণের জীবন নিয়ে ত্রিভুবনমল্ল ওরফে ত্রৈলোক্যমল্লের (১৫২৭-১৫৮৫/৬) সংরক্ষণে।

(দুই) জগজ্জ্যোতির্মল্ল (১৬১৩-১৬৩৩ খ্রি.) : নাটকের বাইরে ওঁর লেখা গীতিকবিতার মধ্যে এইগুলি আমি বীর পাঠাগারে লক্ষ করেছি :

ক. প্রকীর্ণভাষাগীতম [পাণ্ডুলিপি-গুচ্ছ সংখ্যা ক-৩৩০- (ট); ক-৩৩৮-(ঙ); ক-৩৩৮-(ছ); ক-৭৯২ খ-(১)];

খ. দশাবতারগীতম্ [ক-৩৩৮-(ঘ), ক-৭৯২(ক)];

গ. গীতগোবিন্দ [খ-৪৪];

ঘ. গীতপঞ্চাশিকা [ক-৪৬-(ক); ক-৩৯৯];

ঙ.গীতসংগ্রহ [ক-৪৬১-(খ)];

চ. নানাগীত্ব [ক-৩৩৮];

ছ. নানারাগ গীতসংগ্রহ [ক-৩৩৮ (গ); ক-৪০৩];

জ. রাগমালা [খ-৩৪১; খ-৩৫৩]; এবং

ঝ. রাগভজনসংগ্রহ [ক-৩৭৯-ঘ]।

ওঁর লেখা দুটি রচনা এবং এছাড়া বেশ কয়েকটি সঙ্গীত বিষয়ক পাঠগুলি— সংস্কৃতে লেখা : প্রথম, 'কীচকবধ' (ক—৩৭১) এবং নীতিসংগ্রহ (ক-১৫২)। 'ভাষাগীতসংগ্রহ'-এও ওঁর লেখা অনেকগুলি পদ আমরা পাই। সংগীত বিষয়ে উনি সংস্কৃতে একজন সুপরিচিত লেখক ছিলেন; অতএব ওঁর মৈথিলী গীতিকবিতা-বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকলনের নাম হলো 'নাদোৎপত্তি-মৃদঙ্গেত্যাদিভাষা' যাতে সংগীতের প্রায়োগিক দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ওঁর শ্রেষ্ঠ রচনা হলো 'দশাবতাররাগম্'— যা ছিল ঈশ্বরের দশটি অবতার নিয়ে লেখা ভক্তিগীতির এক অপূর্ব সংকলন। ওঁর কবিতার ভণিতায়

প্রায়ই আমরা বংশমণি ঝা-র উল্লেখ পাই, যেমন ক-৩৩০ (ট) সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে। এই বংশমণিই পরে প্রতাপমল্লের অধীনে কাজ করেছেন। একথা এখানে উল্লেখযোগ্য যে মোটামুটিভাবে জগজ্জ্যোতির সব গানই ভক্তিমূলক।

(তিন) যোগনরেন্দ্রমল্ল (১৬৩৫-৫৫ খ্রি.) অনেক গ্রন্থ লিখেছিলেন এমনটা জানা যায় না। সত্যি কথা বলতে গেলে ওঁর একমাত্র কাব্যকৃতি মনে হয় 'রাগমালা'-তে (খ-৩৫৩) সংকলিত হয়েছে যেখানে বিদ্যাপতি ও জগজ্জ্যোতির্মল্লের পদও আছে। বলা হয় মহাভারতের ওপর একটি সংস্কৃত নাটকও রচনা করেছেন।

(চার) জগৎ(ত)প্রকাশমল্ল (১৬৪৪-১৬৭২ খ্রি.); ইনি নাটকের থেকে অনেক বেশি কবিতাই লেখেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই নিজের নামের থেকে ছদ্মনামেই ('প্রকাশ') অধিকতর পরিচিত ছিলেন। নেপালে সর্বাধিক সংখ্যক মৈথিলী গীতিকবিতা ইনিই লেখেন। ওঁর পদগুলি ছিল প্রত্যক্ষ, সহজ ও অকৃত্রিম সৌন্দর্যের অধিকারী। ওঁর নাটক-ইতর সম্পূর্ণ কাব্যসাহিত্য বলতে নিম্নোক্ত কাব্যকৃতিকে বোঝানো হবে :

ক. পদ্য-সমুচ্চয় [ক-১৫০২];

খ. গীতসংগ্রহ [ক-৩৪৯];

গ. গীতপঞ্চক [ক-৩৪৯];

ঘ. গীতাবলী ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে রচিত— যে কটি ড. রামদেব ঝা উল্লেখ করেছেন, এবং

ঙ. নানারঙ্গগীতানি [ক-৩৪৯; ক-৩৩৮ (-চ); এবং ক-৪০৩]

চ. নানার্থদেবদেবীগীতম্ [ক-৩৫৭];

ছ. গীতপঞ্চকম্ [ক-৩৫৭];

জ. প্রকীর্ণপত্রা [ক-৩৩৮ (ঙ এবং ছ), ক-৭৯২];

ঝ. দশাবতার [শিলালেখে এবং ক-৭৯২ পাণ্ডুলিপিতে]— যেগুলি আমি বীর পাঠাগারে আবিষ্কার করি। বিখ্যাত মৈথিল সংকলনে ওঁর কবিতা বেশি উদ্ধৃত হয়নি কিন্তু সেযুগের নেপালী সংকলনে ইনি নিশ্চিত রূপে গুরুত্বপূর্ণ কবি-রূপে অন্তর্ভুক্ত হন, যেমন এইসব সংগ্রহে : 'সপ্ততালগীতম্' (ক-৩৩৮ (ঝ-), 'ভাষাগীত' পাণ্ডুলিপি- ব; 'গীতগোবিন্দ-ভাষা' (খ-৪৪), 'রাগমালা' (খ-৩৪), এবং অধ্যাপক লক্ষ্মীনাথ ঝা-এর দ্বারা পরিলক্ষিত 'নানাসংগীতসংগ্রহ'। ওঁর লেখা তিনটি গান শিলালেখেও পাওয়া যায়।

ওঁর রচনার দুটি গুণের জন্য ওঁকে অন্যদের থেকে পৃথক করে চিনে নেওয়া যায়— ওঁর প্রায় সব রচনাই ভক্তিমূলক এবং উনি লেখন এবং লেখকদের প্রতি ছিলেন তদ্গতপ্রাণ। কবি চন্দ্রশেখর, যিনি ছিলেন একজন মন্ত্রী এবং ওঁর প্রিয় রানী অন্নপূর্ণা লক্ষ্মীর ভাইও— তাঁর সঙ্গে জগৎপ্রকাশের প্রিয় সম্বন্ধের থেকে বোঝা যায় ওঁর সাহিত্যিক মনের প্রতি কেমন মনোভাব ছিল। নিজের শ্যালক এই চন্দ্রশেখরসিংহের তিরোধান উপলক্ষে ৮টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত প্রত্যেকটিতে ৫৬টি করে গান নিয়ে যে বিস্তারিত শোকসংগীত রচনা করেছিলেন একেবারে বিশুদ্ধ মৈথিলীতে তার তুলনা মেলা ভার।

অথচ এসব সত্ত্বেও একথা বলতেই হয় যে জগৎপ্রকাশের কবিতায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো ওঁর অনুভূতির সততা যদিও কাব্যিক গঠন বা মহানতার দিক থেকে ওঁকেবিশাল উঁচু আসনে রাখা যাবে না। এই কাব্যগুলি সুন্দর ছন্দোবন্ধনে বাঁধা শব্দগুচ্ছের মতো যা গানে ব্যবহার করা যায় — অবশ্য এই শোকগীতগ্রন্থ এই পর্যায়ে পড়ে না। ওঁর ভজনে সাধারণত তিন-চারটি বিষয়ই ঘুরে ফিরে আসে 'দশাবতার' (ঈশ্বরের দশটি অবতার), বিষ্ণু, শিব এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দের 'কৃষ্ণের' মতো শ্রীকৃষ্ণ : 'ভাষাগীত' পাণ্ডুলিপিতে এগুলি এভাবেই সাজানো আছে।

এঁর সক্রিয় পৃষ্ঠপোষণের ফলে অনেক কবিই মনে হয় পদরচনা করেছিলেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিভাশালী ছিলেন তাঁর নিজের শ্যালক ও সেনাপতি চন্দ্রশেখর যিনি সর্বদা নিজের নামের সঙ্গে সঙ্গে জগৎপ্রকাশের নামও উল্লেখ করেন। নিজেকে অনেক সময় উনি 'শশিশেখরসিংহ' বলতেন, কখনো 'শেখর' কখনো 'চন্দ্র', কখনা 'শেখরসিংহ' ও কখনো 'চন্দ্রশেখর'। দেখে এও মনে হয় যে হয়তো চূড়ান্তভাবে দেখলে সাহচর্যে এবং ও তাঁর সঙ্গে নিকট যোগাযোগের ফলে উনিও কাব্যরচনায় উৎসাহী বোধ করেছিলেন। উনি নিজেকে 'কবীন্দ্র' বলেছেন ও পরে ১৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে একটা নেওয়ারিতে রচিত 'গীতাবলী' উপহার দিয়েছিলেন এবং ধর্মীয় উপহার রূপে এবং এই নামটির বিষয়ে শুধু এটুকুই বলা যায় যে উনি নিজেই নিজেকে 'গান্ধর্ব-বিদ্যাগুরু' বলে অভিহিত করেছেন।

বংশমণি ঝা ও জগৎচন্দ্র বলে একজন হলেন অন্য কবিরা যাঁরা ওঁর আনুকূল্য লাভ করেছিলেন। প্রথমোক্তের বেলায় আগেই লেখা হয়েছিল জগৎপ্রকাশের লেখা নাটকে আলোচনা করার সময়। জগৎচন্দ্রের পরিচয় এখানেই দেওয়া হবে, কিছু পরে।

(পাঁচ) জিতামৃত (১৬৭২-১৬৯৬ খ্রিষ্টাব্দে) : উনি যতটা মহান নাট্যকার ছিলেন, সেই তুলনায় তিন ততোবড়ো কবি যে ছিলেন না, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এখনও পর্যন্ত এমন কোনো প্রামাণ্য সংকলন পাওয়া যায় নি যাতে শুধু ওঁর কবিতা আছে। মনে হয় একটিই পাণ্ডুলিপি (যা আমি বীর পাঠাগারে দেখেছি পাণ্ডুলিপি গুচ্ছ ক-৩৩০-এর সংখ্যক) আছে নাটকের 'দশাবতার' নামের যদিও সেখানে অন্য কবিদের লেখা গানের সঙ্গে তা মিশে আছে। শিলালেখে এঁর পাঁচটি ভজন আছে কালিকা, চণ্ডিকা ও শিবের প্রতি। কিন্তু ওঁর কাব্যকুশলতা এবং ভাষার ওপর দখল নিশ্চিতরূপেই জগৎপ্রকাশমল্ল ও অন্যদের থেকে বেশি ছিল। ওঁর সমস্ত গীতিকবিতাই ভক্তিমূলক, উনি সম্ভবত কোনো ধর্মনিরপেক্ষ কবিতা রচনা করেন নি— এমনকি ভালোবাসার কবিতাও নয়।

ওঁর সংরক্ষণে পাঁচজন কবি খুবই জনপ্রিয় হন— শ্রীধর, অমিয়কর বা অম্বিত, দ্বিজ, শিবহরি এবং জগচ্চন্দ্র। এঁদের মধ্যে জগচ্চন্দ্র বিশেষ আকর্ষণের পাত্র।

(ছয়) জগচ্চন্দ্র (১৬৫৭ খ্রি.) : ইনি ছিলেন একজন বিখ্যাত কবি যিনি ভাতগাঁওয়ের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর পূর্ণ পরিচয় একাধিক স্থানে পাওয়া যায় : (১) দুটি সংগীত বিষয়ক পুস্তকে (দ্র. বীর পাঠাগার, পাণ্ডুলিপি গুচ্ছ ক-৩৩৬; খ এবং ক- ৩৭৬)

বলা হচ্ছে ইনি উগ্রমল্ল ও রাজা জিতামৃতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও অনুযায়ী ছিলেন; (২) নিজের সংকলন নানারাগসংগ্রহে (দ্র. পৃষ্ঠাসংখ্যা ৮ক, খ এবং ৯ক) ইনি বিস্তারে আলোচনা করেছেন যে কিভাবে ইনি জগৎপ্রকাশমল্লের রাজসভায় ছিলেন দুই রাজকুমার জিতামৃত এবং উগ্রমল্লের সঙ্গে।

(সাত) চন্দ্রশেখরসিংহ (যাঁর ছদ্মনাম ছিল চন্দ্র, শেখর, শেখরসিংহ, চাঁদশেখর, চন্দশেখর অথবা শেখরচন্দ্র কিংবা শশিশেখরসিংহ) : ইনি খুব অল্প বয়সে মারা যান এবং ইনি ছিলেন জগৎপ্রকাশমল্লের প্রিয় শ্যালক ও সেনাপতি যাঁর নামে জগৎপ্রকাশ দীর্ঘ শোকসংগীত লিখেছিলেন। এছাড়া ভক্তপুর ভবানীশঙ্কর মন্দিরের শিলালেখে উনি এঁকে 'মহাবীর' বলে উল্লেখ করেছেন, বলেছেন ''স্বপ্রাণোপম— চন্দ্রশেখর— বরামাত্যাগ্রণী'' (অর্থাৎ মন্ত্রীদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় এবং আমার প্রাণের থেকেও প্রিয়) এবং ঘোষণা করছেন যে ওঁর এতো প্রিয় এমন আর কেউ কেউ ছিল না। চন্দ্রশেখর অবশ্যই জনপ্রিয় কবি ছিলেন— জগৎপ্রকাশের চেয়েও এবং জগচ্চন্দ্রের থেকেও।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে যদিও 'ভাষাগীত', পাণ্ডুলিপি-'খ' তিনবার 'নৃপ চন্দ্রপ্রকাশ' কথাটা উপসংহারে এসেছে— এই নামের প্রতি একটি গীতও উৎসর্গ করা হয়নি। এ থেকে মনে হয় যেসমস্ত কবিতা জনৈক ''প্রকাশ''-এর নামে চালানো হয় তার সবগুলিরই রচয়িতা সম্ভবত জগৎপ্রকাশমল্ল স্বয়ং, শুধুমাত্র 'দশাবতারনৃত্যগীতম্' [পাণ্ডুলিপি গুচ্ছ ক-৭৯২-(ক) গ্রন্থটি] বাদ দিলে যা সম্ভবত একজন কবি ''চন্দ্রপ্রকাশের দ্বারা রচিত হয়েছিল বলে কথিত হয়েছে, যিনি ছদ্মনামে চন্দ্রশেখর স্বয়ং''।

(আট) ভূপতীন্দ্রমল্ল (১৬৯৫-১৭২২ খ্রি.) : ওঁর লেখা সঙ্গীতের একটি বৃহৎ সংকলন পাওয়া যাচ্ছে 'ভাষাগীত পাণ্ডুলিপি ক ও খ তে'— সব মিলিয়ে এঁর রচিত ৯১টি গান সেখানে পাওয়া যাচ্ছে। ইনি নাট্যকার রূপে বেশি কুশলী ছিলেন— গীতিকবিতার লেখকরূপে নয়। বীর পাঠাগারে ওঁর অন্যান্য আর যেসব রচনা আমার নজরে এসেছে, তার মধ্যে রয়েছে 'নানারাগ-গীতসংগ্রহ' (ক-৪০৩), 'প্রকীর্ণপত্র'(ক-৩৩০-(ঙ); ক-৭৯২ (খ); এবং ক-১৪৫৫), এবং একটি সুবিস্তৃত সংকলন যার নাম হলো 'গীতিমালা' (ক-১৬৫৬)। অন্য একটি সংকলন 'নানারাগগীতমে'ও (ক-৪০৩) ওঁর কিছু পদ পাওয়া যায়। অতি বিশুদ্ধতাবাদী মনের ছিলেন না— তাই এখানে ও সেখানে বাংলা ও হিন্দির ব্যবহারও করেছেন। এইসব সংকলনে সংগৃহীত গানের থেকেও ওঁর নাটকে ব্যবহৃত ওঁর গানগুলি শিব, গৌরী, হরি এবং শক্তি-বিষয়ক। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক গান উনি লিখেছেন 'শক্তি'কে নিয়েই ('গোসাউনিক গীত')। পরম্পরাগতভাবে বিদ্যাপতির অনুসরণে উনি কিছু তিরহুতিও লিখেছেন।

(নয়) রণজিতমল্ল (১৭২২-৭২ খ্রি.) : ইনি সঙ্গীত বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ যাতে মৈথিলীর গীতিকবিতাও রয়েছে— 'সঙ্গীত চূড়ামণি' —তার সংকলন ও সম্পাদনা করেন। ইনি পদের থেকে বেশি উৎসাহী ছিলেন গদ্য-রচনায়—তাই গীতিকবিতার থেকে

বেশি উনি লেখেন গদ্যনাটক। ওঁর বিভিন্ন স্বাদের গীতিকবিতার একটি সংকলন 'প্রকীর্ণপত্রম্'-ও (পা ণ্ডুলিপি গুচ্ছ ক-৭৯২৬) পাওয়া যায়। আর পাওয়া গেছে প্রায় এক ডজন গান 'ভাষাগীত, পাণ্ডুলিপি ' খ' গ্রন্থে। ওঁর গীতিকবিতাগুলি ভক্তিমূলক। ভাতগাঁও-এর বংশ ওঁর মৃত্যুর পরই বিলুপ্ত হয়ে যায়।

২. কান্তিপুরের রাজবংশ

ভাতগাঁও-এ মৈথিলী পদকর্তাদের দীর্ঘতম সংরক্ষণ সম্ভব হয়েছিল। অন্যত্র এঁরা ততো সৃজনশীলতা দেখান নি যদিও পরে বর্তমান সময় পর্যন্ত এটি টিকেছে পাটনে— ভাতগাঁও-এ নয়। কান্তিপুরে (বা কাঠমাণ্ডুতে) যাঁরা কবিতা-রচনা করেন তাঁরা হলেন:

(দশ) প্রতাপমল্ল (১৬৩৯-১৬৮৯) : ইনিই সম্ভবত কাঠমাণ্ডুর সবচেয়ে খ্যাতনামা কবি ছিলেন যিনি নিজেকে 'কবীন্দ্র' বলতেন। ইনি সংস্কৃত নিষ্ঠ শৈলীর প্রতি বেশি আকৃষ্ট ছিলেন। ড. রামদেব ঝা ওঁর নিজস্ব গীতিকবিতার বেশ কটি সংকলন পেয়েছেন, যেমন 'গীতম্ প্রতাপমল্লীয়ম্' (ক-১৬৯৬; ক-১৮৪১), 'গীতগোবিন্দম্ প্রতাপমল্লস্য' (ক-১৬৯৬/২) এবং 'প্রতাপমল্ল-বীরোচিতগীতম্' (ক-১৬৯৬/১৫৫৪)। ইনি এঁর নটি গীতিকবিতা যা তালেজু মন্দিরে [১]-র শিলালেখে পাওয়া যায় প্রকাশিতও করেছেন। ড. রামদেব ঝা ওঁর যেকটি গীতাবলীর নাম উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে অধিকাংশই মনে হয় সংস্কৃতে লেখা। বীর পাঠাগারে আমি ওঁর সম্পূর্ণ মৈথিলীতে লেখা একটি গীতিকবিতার সংকলন দেখি— যার নাম 'গীতমালা ভাষাত্মিকা' যার বিস্তৃতি ১৫ পৃষ্ঠা (গুচ্ছ খ-২৫৪)। এছাড়া কিছু গান রাগের একটা সংকলনে উদ্ধৃত হয়েছে যা এখনও আছে কার্তিক-নাচ-গুরুর কাছে। প্রতাপমল্ল খোলাখুলিভাবে শক্তিকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দেবতা বলে ঘোষণা করেন এবং বিষ্ণু ও শিবকে অবহেলা করেন। ওঁর পারিবারিক দেবতা হলেন 'কার্ণাটি কিশোরী'। এঁর লেখা গানগুলির সাহিত্যিক মূল্য খুব বেশি নয় কিন্তু সহজ ভাবে, সরলতায় ও ভক্তিভাবনায় বোধ হয় এগুলির জুড়ি মেলা ভার হবে। বিখ্যাত কবি বংশমণি ঝা প্রথমে এঁরই সভায় ছিলেন এবং এঁরই সংরক্ষণে নাট্যরচনা করেন।

(এগারো) মহীন্দ্রসিংহ (১৬৮৯-১৬৯৪ খ্রি.) : ইনি পিতা প্রতাপমল্লের পর সিংহাসনে আসীন হন বেশ বয়স্ক অবস্থায় এবং এজন্য মাত্র কয়েক বছরই রাজত্ব করতে পারেন। বীর পাঠাগারে একটি পুরো 'রাগমালা' আছে (গুচ্ছ খ-২৪৭) যাতে শুধু এঁরই গান আছে। এঁকে এঁর পূর্বপুরুষ কাঠমাণ্ডুর মহেন্দ্রমল্লের (১৫৬৬ খ্রি.) থেকে পৃথক করতেই হবে কারণ এই 'রাগমালা'-য় জগজ্জয়মল্লের গানেরও উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে যাঁকে মহেন্দ্রমল্লের সঙ্গে সম্পর্কিত কেউ বলে চিহ্নিত করা যাবে না— বরং খুব সহজেই চিনে নেওয়া যাবে মহীন্দ্রসিংহের পৌত্র বলে যাঁর নাম ছিল জগজ্জয়মল্ল।

---

১. নেপালী পত্রিকা — মৈথিলীতে প্রকাশিত — নাম মৈথিলী; চতুর্থ খণ্ড।

(বারো) ভাস্করমল্ল (১৬৯৪-১৭০২ খ্রি.) : এঁর গান রাগের কিছু কিছু সংগ্রহ আমি দেখতে পেয়েছি বীর পাঠাগারে (পাণ্ডুলিপি গুচ্ছ খ-২৪৩) : যেমন 'গীতরাগসংগ্রহ' (১৭০৩ খ্রি.) যাতে শুধু প্রথম পৃষ্ঠাতে ওঁর গান রয়েছে এবং 'গীতপুস্তকম্' (ভাষাত্মকম) গ্রন্থ (গুচ্ছ খ-২৪৭) যাতে অনেকগুলি গান আছে ৩২ পৃষ্ঠা জুড়ে। অবশ্য এই গানগুলিকে দেখে মনে হয় কোনো নাটক থেকে নিয়ে এখানে সংকলিত করা হয়েছে।

(তেরো) জগজ্জয়মল্ল (১৭০২-১৭৩২ খ্রি.) : এঁর লেখা গান উদ্ধৃত আছে দুটি 'রাগমালা'-তে— একটা মহীন্দ্রসিংহের নামে (বীর পাঠাগার, পাণ্ডুলিপি গুচ্ছ খ-৩৫৩)। পরেরটিতে ওঁর ছেলে জয়প্রকাশের উল্লেখ রয়েছে ওঁর কবিতাতে। হয়তো এটি সেই 'রাগমালা'-ই যা বীর পাঠাগারে পাণ্ডুলিপি গুচ্ছ খ- ৩৪১-এ -তে আছে।

৩. ললিতপুরের (পাটন) রাজবংশ

(চোদ্দো) সিদ্ধি নরসিংহ (১৬২০-১৬৫৭ খ্রি.) : এঁর লেখা অনেক ভণিতাতেই আমরা পাচ্ছি একাধিক নাম : 'ভূপতি', 'নরসিংহ' বা 'সিংহ ভূপতি'। সমস্যা হলো একথা বের করা যে এঁরা পৃথক পৃথক কবি না সবাই একই ব্যক্তি— সিদ্ধি নরসিংহ!

বাবু নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ত্রুটিবশত 'ভূপতি' বা 'সিংহভূপতি'-কে শিবসিংহ বা বিদ্যাপতির অন্য নাম বলে মনে করেন। একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে এই নামটি বিদ্যাপতি-ভিন্ন অন্য একজন কবির। 'ভূপতি' হতে পারে নেপালের রাজকবি 'ভূপতীন্দ্র'-রই নাম। অথবা ইনি হতে পারেন জনৈক সিংহভূপাল যিনি শৃঙ্গারদেবের 'সঙ্গীত রত্নাকর' এবং 'রসার্ণব সুধাকর'-এর ওপর টীকা লিখেছেন।

তবে মনে হয় ওঁকে 'সিংহ-নৃপতি'-র সঙ্গে একাত্ম করেই দেখা ভালো, যিনি ছিলেন পাটনের সিদ্ধি নরসিংহ। ইনি মনে হয় খুব প্রতিষ্ঠিত কবি ছিলেন যিনি প্রচুর লিখেছেন এবং একটি সম্পূর্ণ পদাবলী এঁর নামে প্রচলিত আছে। এঁর কবিতার ভণিতায় 'নৃপসিংহ'. 'নরসিংহ' এবং 'সিদ্ধি নরসিংহ'— এই সব কটি নাম আছে। ইনি একটি নাটকও রচনা করেন।

'সিদ্ধি' নরসিংহ একজন 'সন্ন্যাসী' (বা জীবনমুক্ত) চরিত্রের ছিলেন এবং ইনি প্রায় চল্লিশ বছর রাজত্ব করেন। ইনি ললিতপুরের (বা পাটনের) রাজবংশের সম্মানের প্রচুর বৃদ্ধি করেন। ইনি জনৈক বিশ্বনাথ উপাধ্যায়কে (মৈথিল?) নিজের গুরু বলে মানতেন; কৃষ্ণ ও রাধার ভক্ত ছিলেন। ১২ই মাঘ কৃষ্ণ নেপালী সংবত ৭৭২ সালে (অর্থাৎ ১৬৫২ খ্রিষ্টাব্দে) ইনি সংসার ত্যাগ করেন এবং তীর্থাটনে প্রস্থান করেন। এই কবি-রাজের ব্যক্তিত্বের বিষয়ে পরম্পরাগত ব্রাহ্মণ-এ এভাবে সংক্ষেপে বলা আছে :

> সিদ্ধি নরসিংহ যিনি ছিলেন একজন সর্বজ্ঞ, জীবন্মুক্ত, পরিশীলিত. কৃষ্ণপ্রিয়, যোগসিদ্ধ, কবিশ্রেষ্ঠ, পার্থিবজগৎ থেকে মুক্ত— ছিলেন হরিসিংহের (বংশের উত্তরাধিকারী ও) পুত্র। যে এই শ্লোক বারাবার পাঠ করবে সে সর্বপাপ মুক্ত হবে।

নরসিংহের প্রাপ্ত কবিতাগুলিই যথেষ্ট স্পষ্টভাবে আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে তিনি কতো জনপ্রিয় কবি ছিলেন। এই কবিতাগুলি প্রায় প্রতিটি সংকলনে পাওয়া যায়, যেমন 'কংসনারায়ণ-পদাবলী', 'রাগতরঙ্গিণী', বর্তমান কার্তিক-নাচ-গুরুর 'রাগমালায়' এবং 'ভাষাগীতসংগ্রহ'-র পাণ্ডুলিপি ২-এ। কথিত আছে ইনিই পাটনে 'কার্তিক নাচের' নৃত্যগীতের উৎসবের গোড়াপত্তন করেন।

(পনেরো) রাজা শ্রীনিবাসমল্ল (১৬৫৭-১৭০১ খ্রিষ্টাব্দে) : শ্রীনিবাস ছিলেন সিদ্ধি নরসিংহের উত্তরাধিকারী। ইনি কার্তিক নাচের কালে পরিবর্তন করে কার্তিকের পরেও নাচের ব্যবস্থা করেন— যা ওঁর বাবার সময়ের ১৫ দিনের পরিসর থেকে ২৫ দিনের উৎসবে পরিণত হলো। মনে হয় ইনি সঙ্গীত ও নৃত্যের খুবই রসজ্ঞ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ওঁর গান পাওয়া যায় কার্তিক নাচের বর্তমান গুরুর 'রাগমালা' ও 'রাগতরঙ্গিণী'-তেও।

(ষোলো) নৃপ মল্লদেব (?) : এঁকে কোনো পরিচিত কবির সঙ্গে এক করে দেখা কঠিন। মনে হয় এঁকে উপরোক্ত দুজন কবির মধ্যে একজন বা অন্য কোনো মল্ল রাজা বলেই ধরে নিতে হবে। হয়তো ইনি সিদ্ধি নরসিংহ নন কারণ তিনি নিজের কোনো কবিতাতেই নিজেকে 'মল্ল' এই উপাধিযুক্ত করে নাম লেখেন নি। সম্ভবত ইনি ভূপতীন্দ্রই কারণ কবি মল্লরাজাদের মধ্যে ইনিই একমাত্র যাঁকে 'ভাষাগীতে'র (পাণ্ডুলিপি ২) কবিদের মধ্যে মল্ল নৃপ বলে অভিহিত করা হয়। তবে যতক্ষণ না আরো নতুন তথ্য জানা যায় এবিষয়ে আমাদের কিছু না বলাই ভালো। এই নামের ভণিতা-সহ কবিতা 'বিদ্যাপতির নেপালী পদাবলী'তে ও 'কংসনারায়ণ-পদাবলী'তেও স্থান করে নিয়েছে।

(সতেরো) বিষ্ণুসিংহমল্ল (১৭৩৭ খ্রি.) : এঁকে কবি-রূপে আমরা রাগ-বিষয়ক সংকলন ও বর্তমান কার্তিক-নাচ-গুরুর সংকলনে কবি-রূপে দেখতে পাচ্ছি। ইনি ছিলেন শ্রীনিবাসমল্লের প্রপৌত্রের পুত্র।

গৌণ কবিরা

বিভিন্ন সংকলনে বহু গৌণ কবিদের রচনা থেকে উদ্ধৃতি পাওয়া যায়— তবে হয়তো এঁরা আরো অনেক বেশি লিখেছিলেন— যদিও আমাদের বর্তমান জ্ঞান যতটুকু তা থেকে এঁদের গৌণ কবিই বলতে হয়। এঁদের মধ্যে আছেন : 'ভবেশ' (যিনি গুণীশ্বরের পুত্র এবং হ্রীমতীর পতি জনৈক দামোদরকে সংরক্ষক বলেন), 'ভবানীনাথ' (যিনি জনৈক নৃপদেবকে নিজের সংরক্ষক বলেন), 'চতুরানন', ধরণীধর', 'জয়কৃষ্ণ' (ইনি সম্ভবত বিষ্ণুপুরীর 'ভক্তিরত্নাবলী'র লিপিকর ছিলেন), 'জয়রাম' (যাঁকে বনেপা বংশের শাসক জয়রামদত্তের সঙ্গে এক করা যেতে পারে — যিনি ছিলেন 'পাণ্ডববিজয়নাটকে' রচয়িতা), 'কুমুদিষ', 'মধুসূদন', 'করণ মহেশ', 'রাজা লখনচন্দ্র', 'পৃথ্বীচন্দ্র' (যিনি মল্লিক দুলার নামের পৃষ্ঠপোষকের নাম উল্লেখ করেছেন), 'নৃপ প্রীতিনাথ', 'কবি-রাজ পূর্ণমল্ল' (যাঁকে জগজ্জ্যোতির্মল্লের পৌত্র বলে চেনা যাচ্ছে), 'কবি রত্নাই' (যিনি মনে হয় বেশ

পরিচিত কবিই ছিলেন— যাঁকে কবি রতনাগ্রিঙ বা 'কবি রত্ন'-র একাত্ম সঙ্গে করে দেখা যায়; ইনিই আবার রাজা লখনচন্দ্রের উল্লেখ করেন যিনি সম্ভবত কবি ও রাজা লখনচন্দ্রই হবেন যাঁর কথা আগেই বলা হয়েছে), 'জগদীশ' (যাঁর নাম ভূপতীন্দ্রমল্ল 'হরগৌরীবিবাহ'তে উল্লেখ করেছেন), রুদ্রধর (ইনিই সম্ভবত ছিলেন রুদ্রধর উপাধ্যায়, যিনি সংস্কৃতে 'শ্রদ্ধাবিবেক' ও বেশ কটি ধর্মশাস্ত্রের রচনা করেন), 'ইন্দ্রমল্ল' এবং 'বিদ্যাধর পণ্ডিত' (যে দুজনেরই উল্লেখ আছে কার্তিক-নাচ-গুরুর 'রাগমালা'-য় [১])। এই কবিদর বিষয়ে নিশ্চিতভাবে একটা কথাই বলা যাবে যে এঁরা সবাই ১৬৮৫ খ্রিষ্টাব্দের আগেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

অবশ্য এঁদের বাদ দিলেও প্রচুর অজ্ঞাত কবির কবিতা এইসব সংকলনে আছে এবং অনেকগুলি কবিতা থেকেই ভণিতা গেছে হারিয়ে, এবং এর ফলে আমাদের জ্ঞানের বর্তমান সীমাকে নজরে রেখে বলতে হবে যে এঁদের নামও করা যাবে না আজ।

৪
সিদ্ধান্ত

এখানে আমার মৈথিলী গীতিকবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাচীন মৈথিলী পর্বকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে এসেছি। বিদ্যাপতির পদবলীর থেকে যে গীতিকবিতা রচনার পরম্পরা শুরু হয়েছিল তা গোবিন্দদাস বা মল্লরাজাদের অথবা সেইসব কবিদের কবিতাতেই শেষ হয়নি যাঁরা এঁদের সংরক্ষণে কাব্যরচনা করেছিলেন। এই কবিতার ঢেউ এসে পৌঁছলো নাট্যরচনার বেলাতেও— বিশেষ করে সেইসব নাটকে যা এই সময়ে মিথিলায় এবং নেপালে লেখা হয়েছিল। একের পর এক কবিরা সংস্কৃত নাটকে মৈথিলীর ব্যবহার শুরু করে দিয়েছিলেন, এবং সর্বশেষে কাব্যনাটক নেপালে ও মিথিলাতে শুধুমাত্র মৈথিলী ভাষাতেই রচিত হতে লাগলো। নাটক ছাড়াও কবিতার এই ঐতিহ্যটি কিছুদিন আগে অবধিও চালু ছিল। অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে বিদ্যাপতি এবং তাঁর সমসময়ের কবিদের গীতিকবিতার ঐতিহ্য পরবর্তী সব কটি প্রজন্মের মৈথিল কবিদেরই অত্যন্ত বেশি অনুপ্রাণিত করেছিল।

১. অধ্যাপক লক্ষ্মীনাথ ঝা-র দ্বারা 'নানারাগগীতমে' যে ২৩ জন কবির নাম উল্লিখিত হয়েছে তার মধ্যে সবার নাম এখানে দেওয়া হলো না কারণ, তাঁরা মনে হয় ছিলেন বাঙালি কবি। এঁরা হলেন নৃপ বৈদ্যনাথ, নরপতিসিংহ, দামোদর, নৃপ শিবসিংহ রবিনাথ, ধনপতি, রামদেব, রায় হরিহরা রায় রাঘব, রাজা সংগ্রাম সিংহ, রামদাস, সুরদাস, সোনামূল, দীনমণি, চক্রপাণি, ভবানী, রূপনারায়ণ, নৃপতি, ত্রিভুবন, দুর্জন্ম, বনীকর ও গোকুলভট্ট। এঁরাই ছিলেন অনুল্লিখিত কবি।

দশম অধ্যায়

নেপালের মৈথিলী নাটক

১

আধুনিক দেশীয় ভাষায় নাটকের উৎপত্তি

উত্তর ভারতের দেশীয় ভাষাগুলির নাটকের উদ্ভব হয়েছিল সংস্কৃত নাট্য-ঐতিহ্যের মৃতদেহের ওপরেই। একটা সময় ছিল যখন দেশীয় ভাষাগুলি ধীরে ধীরে উপরে উঠে আসছিল এবং সংস্কৃত নাটকের চূড়ান্ত অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল। মুসলমানদের আক্রমণ বরং ধীরে ধীরে এর মৃত্যুকে নিকটতর করেছিল কারণ মুসলমানেরা নাট্যশিল্পের বিকাশের দিকটা খুব একটা সুনজরে দেখেননি। নাটক দেশের সেইসব অংশে গিয়ে আশ্রয় নিল যেখানে মুসলমান শক্তির অনুপ্রবেশ হয়েছিল বহু বিলম্বিত [১]।

সংস্কৃত নাটকের প্রভাব এমনই শক্তিশালী ছিল যে "সেইসব প্রদেশেও" প্রথম পর্বে চেষ্টা করা হয়েছিল একটা সহজবোধ্য নাট্য-ঐতিহ্যের নির্মাণ কারণ ততদিনে সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাধারণ মানুষের কাছে হয়ে গিয়েছিল দুর্বোধ্য। এ থেকে যা ফল হলো তাতে সংস্কৃত ও প্রাকৃতকে আগের মতোই নাটকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হলো; শুধু পার্থক্য এই হলো যে অন্যান্য আধুনিক দেশীয় ভাষাগুলিও ধীরে ধীরে বেশি পরিমাণে নাটকে ব্যবহৃত হতে থাকলো।

সমগ্র উত্তর পূর্ব ভারতে— যেখানে মুসলমান শাসন বা তাঁদের সুবেদারেরা পৌঁছতে পারেন নি— একটা তরতাজা নতুন ধরনের নাট্য-ঐতিহ্যের জন্ম হলো যার প্রতিনিধি বাংলার 'যাত্রা', অসমের 'অঙ্কিয়ানাট' ও মিথিলার 'কীর্তনিয়া নাটক'। এই সব কটি নাটকেরই জন্ম হয়েছিল কৃষ্ণ-ভক্তি থেকেই কিন্তু ধীরে ধীরে তা এই ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক এই বিধি-নিষেধকে গেলো ছাড়িয়ে। অবশ্য যখন ধর্মনিরপেক্ষতার প্রারম্ভ হলো, তখনও পৌরাণিক কাহিনী ও পুরাকথার ওপরেই জোর দেওয়া হলো।

মধ্যযুগের মৈথিলী নাটকের বৈশিষ্ট্য হলো মঞ্চের সরলীকরণ ও পুনরুজ্জীবন। এর কেন্দ্র ছিলো সঙ্গীত ও নৃত্য। জোর দেওয়া হতো জনপ্রিয়তার ওপর। এখানে নাটকে যে সঙ্গীতের মাধ্যমে মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা ছিল তার তুলনায় কাব্যিক সৌন্দর্য, ঘটনার জটিলতা এবং চরিত্রবিশেষের মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ হয়ে গেল গৌণ। বিষয় বিশেষের নবীনতা এবং কাহিনীর কথাবস্তুর ওপর জোর দেওয়ার কোনো চেষ্টাই করা হতো না। এইজন্যই আমরা দেখতে পাচ্ছি একই বিষয় নিয়ে বিভিন্ন নাট্যকার অনেকগুলি পৃথক্ পৃথক্ নাটক লিখেছেন গল্পে সামান্য সামান্য পরিবর্তন এনে।

১. কীথের 'সংস্কৃত ড্রামা', ২৪২-৪৩ পৃ. দ্রষ্টব্য।

সংস্কৃত নাটকের মতোই প্রথম প্রথম মৈথিলী নাটকের দর্শকবৃন্দ ছিলেন রাজসভার নারী-পুরুষেরা মাত্র। কিন্তু পরবর্তী পর্বে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের জনপ্রিয় নাটকের— কীর্তনিয়া নাটকের যখন জন্ম হলো, তার অভিনয় হতে থাকলো এমন সব দর্শকদের সামনে যাঁদের মধ্যে শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত এবং অশিক্ষিতরা ছাড়াও ছিল নারী, শিশু এবং ঐ স্থানের সাধারণ মানুষ। অতএব এই দ্বিতীয় ধরনের নাটকে খুব স্বাভাবিক কারণেই সংস্কৃত ও প্রাকৃতের যেটুকু প্রভাব বাকি ছিল তাও মিলিয়ে গেলো।

এইভাবে মিথিলায় দেশীয় ভাষার মাধ্যমে ভারতীয় নাট্য ঐতিহ্য খুবই তাজা ও নব আস্বাদ নিয়ে মানুষের সামনে এলো। দুর্ভাগ্য এই যে এখনো বিদগ্ধজনেরাও একথা জানেন না যে উত্তর ভারতের নাটকের ক্রমবিকাশের একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র ছিল মধ্যযুগীয় মৈথিলী নাটক।

২
মিথিলায় দেশীয় ভাষায় নাটকের আরম্ভ এবং নেপালে এই নাট্যকর্মের বিকাশের কারণ

প্রাচীন মিথিলায় সংস্কৃত নাটকের কোনো ঐতিহ্য ছিল না। এমন জনশ্রুতি থাকলেও কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না যে প্রাচীন মিথিলাতেই কালিদাস তাঁর নাটকগুলির রচনা করেছিলেন কি না। মিথিলায় সঙ্গীতের ঐতিহ্য এসেছিল কর্ণাট প্রদেশ থেকে এবং মনে হয় নাট্য-ঐতিহ্যও কর্ণাট সংস্কৃত নাটকের জন্মভূমি; প্রকৃতপক্ষে, বিদ্যাপতি নিজের মৈথিলী নাটক 'গোরক্ষবিজয়ে' স্পষ্ট বলেছেন যে সে যুগের অভিনেতারা আসতেন 'তেলঙ্গ-দেশ' থেকেই। জ্যোতিরীশ্বরের 'বর্ণরত্নাকরে' প্রভূত প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন ধরনের নর্তক ও অভিনেতাদের বিষয়ে (১৩২৪ খ্রি.) এবং তাঁর 'মৈথিলী ধূর্তাসমাগমে'-ও আমরা দেখতে পাচ্ছি নাটকে মৈথিলী ভাষার ব্যবহার সর্বপ্রথম করা হয়েছে। এই ভাষার ব্যবহার সেভাবে করা হয়নি যেভাবে সংস্কৃত নাটকে নারী এবং নিম্নস্তরের পাত্রের মুখে প্রাকৃত সংলাপ দেওয়া হতো। মৈথিলীর ব্যবহারে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সংস্কৃত অংশগুলি অধিকতর সহজবোধ্য করে তোলা— কারণ এখানে দেখতে পাচ্ছি নায়ক এবং বাকি সবাই মৈথিলীতে কথা বলছে। বিদ্যাপতি মৈথিলীতে রচিত গানগুলি আরো সচেতনভাবে ব্যবহার করেছেন যা ওঁর নাটকের মুখ্য আকর্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উনি সংস্কৃত নাটকের জনজাতীয় ভাষায় উত্তরণের ঘোষণা করেছিলেন নিজের রচনায়। এই প্রক্রিয়াই পরবর্তীকালে জন্ম দিলো পূর্ণাঙ্গ মৈথিলী নাটকের। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিদ্যাপতির ঠিক পরবর্তী সময়ে এইসব পরিবর্তনের সঠিক হদিশ আজও পাওয়া যায় না। কারণ অদ্যাবধি ওঁর সমসাময়িক এবং ঠিক পরের প্রজন্মের লেখকদের নাটকের উদাহরণ আজও পাওয়া যায় না, যদিও একথার কিছু প্রমাণ আমরা পাই অমৃতকরের

রত্নাবলীর উপর নির্ভর করে লেখা একটি নাটকে এবং ভীষ্ম কবির লেখা অন্য দুটি নাটকে— যার একটি হলো বৎসরাজ-সাগরিকার জীবন নিয়ে লেখা ও অন্যটি উর্বশীকে নিয়ে। এও জ্ঞাতব্য যে মিথিলায় সম্পূর্ণ সংস্কৃতে লেখা নাটকও সে যুগে রচিত হতো মৈথিলীর পাশাপাশি, যার মধ্যে কোনো মৈথিলী ভাষার ব্যবহারই হতো না— বিদ্যাপতি ও জ্যোতিরীশ্বর স্বয়ং এমন সব নাটক লিখেছিলেন।

তবে এই বিকাশের পথে যাত্রা চলতেই থাকলো এবং নেপালে লিখিত নাটকগুলির মধ্যে— যা এই পর্বে লেখা হয়েছিল— এই বিকাশের প্রমাণ আছে। এখানে মৈথিল বিদ্বানেরা ও সংগীতজ্ঞেরা আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন কারণে সেখানে তারা ঠাঁই পেয়েওছিলেন।

প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন কারণে মিথিলা ও নেপালের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। সেযুগে মিথিলার একটা অংশ ছিল নেপালে সীমানার ভিতরে। আজও অনেকগুলি মৈথিলী-ভাষী জেলাই নেপালের রয়ে গেছে। মিথিলার প্রাচীন রাজধানী জনকপুর এবং মহারাজা নান্যদেবের (১০৯৭ খ্রি.) রাজধানী সিমরাওন ছিল নেপালেরই অধীন সেযুগেও। মনে রাখতে হবে এই নান্যদেবের থেকেই মিথিলার প্রথম রাজবংশের সন্ধান আমরা পাচ্ছি ইতিহাসে।

কথিত আছে বহুদিন অবধি মিথিলা থেকেই সরাসরি নেপালের তরাইয়ে যাওবার পথ ছিল। এজন্যই যখনই মুসলমান আক্রমণ হতো, প্রয়োজন হলে মিথিলার এই পথ দিয়ে সহজে নেপালে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারতেন। মহারাজা হরসিংহদেবের (১২৯৬-১৩২৩/৪ খ্রি.) বিষয়ে কথিত আছে যে উনি ১৩২৫ খ্রি. মুসলমানদের হাতে পরাস্ত হওয়ার পর ওদেশে গেছিলেন এবং নিজেকে পাটনের কাছে কোথাও প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। নেপালের ইতিহাসে এবং মিথিলা-নেপালের সম্বন্ধে ওঁর এখানে আগমন ও বসবাসের জন্য প্রচুর পরিবর্তন হয়েছিল। অনেক বিদ্বান বলেন যে এই গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাটি কোনোদিনই ঘটেনি কিন্তু মিথিলার পঞ্জীকারেরা এবং নেপালের বংশাবলীর বর্ণনা" থেকে এ বিষয়ে স্পষ্ট জানা যায়।

হরসিংহদেবের মৃত্যুর পর প্রায় সাতাশ বছর ধরে তাঁর দুই সন্তান মানসিংহদেব এবং শ্যামসিংহদেব নেপালে রাজত্ব করেন। শ্যামসিংহদেবের কন্যার বিবাহ হয়েছিল নেপালের প্রাচীন রাজপরিবারের এক রাজপুরুষের সঙ্গে এখন যাঁরা মিথিলাতেই থাকেন। এর ফলে নেপালের রাজসভায় নিশ্চিতরূপেই প্রাধান্য লাভ করেন এবং সর্বত্র তাদের মাতৃভাষা আদর ও সম্মান পায়। আমরা এমন বেশ কজন পণ্ডিতদের জানি যারা নেপালের রাজদরবার থেকে আমন্ত্রণ পেয়েছেন। উদাহরণ হিসাবে নেওয়া যায় এই নামগুলি— জয়স্থিতিমল্ল (১৩৮০-১৩৯৪ খ্রি.) আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কীর্তিনাথ উপাধ্যায়, রঘুনাথ ঝা, শ্রীনাথ ভট্ট, মহীনাথ ভট্ট, এবং রমানাথ ঝা-কে গৃহনির্মাণ, ভূমিরাজস্ব, জাতিপ্রথা ও মৃতদেহ নিয়ে আইন-কানুন রচনার জন্য। তেমনি জগজ্জ্যোতির্মল্ল ও

(১৬১৮-১৬৩৩ খ্রি.) পণ্ডিত বংশমণি ঝা-ও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, প্রথমে হরসিংহদেবের নেপাল-গমনের পর, তারপর ওইনিবার রাজবংশের পতনের পর এবং মুসলমান শাসক-কর্তৃক মিথিলায় আক্রমণের পর প্রচুর মৈথিল বিদ্বানই নেপালের রাজদরবারে বহুদিন অবধি আশ্রয় ও সংরক্ষণ পেয়েছিলেন।

এই সম্মিলনীর ফলে নেপালে মৈথিলী সম্ভবত সর্বাধিক আভিজাত্যপূর্ণ ভাষা হয়ে দাঁড়াল। ভাতগাঁও, পাটন ও কাঠমাণ্ডুতে এই ভাষা বেশ শক্তপোক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। বিদ্যাপতির গীতিকবিতার সফলতা, তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের সুন্দর কাব্যকৃতি ও মিথিলার সেযুগের সংগীতজ্ঞদের গৌরবময় কৃতিত্ব — এইসব মিলিয়ে নেপালে মিথিলার প্রতি একটা অতিরিক্ত উৎসাহ জাগিয়ে তুলতে পেরেছিল।

ইতিমধ্যে নেপালে নাটক খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। মুসলমান আক্রমণকারীদের তাড়া খেয়ে নাটক ও অভিনয় দুইই গিয়ে উঠলো নেপালের রাজদরবারের নিশ্চিন্ত এবং নিরালা আশ্রয়ে। নেপালের প্রাচীনতম সংস্কৃত নাটক রচনার কৃতিত্ব বোধ হয় জয়স্থিতিমল্লেরই (১৩৮০-১৩৯৪)। মনে হয় নাট্য সাহিত্যের প্রতি এই ভালোবাসা, মৈথিলী সাহিত্য ও মিথিলা থেকেই তিনি পেয়েছিলেন :

> সূক্ষ্ম সাহিত্যিক রুচি লাভ করেছিলেন যার প্রদর্শনের জন্য নেপালের নতুন রাজা রূপে ওঁর প্রচুর অবকাশ ছিল। (উনিই রাজকীয় সমাধিস্থলে দীপক-রাগে যন্ত্রসঙ্গীত বাজাবার প্রথা আরম্ভ করেন।) ওঁর পুত্র ধর্মমল্লের জন্মোৎসব উপলক্ষে উনি চার-অঙ্কের (একটি নাটকের) 'রামায়ণ'-অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন।

এই নাটক মূলত ১৩৬০ খ্রিষ্টাব্দে রচিত ও মঞ্চস্থ হয়েছিল ওঁর পিতাকে প্রসন্ন করার জন্য এবং তারপরও আবার অভিনীত হয়েছিল সম্ভবত জয়স্থিতির এক আত্মীয় এবং সেসময় মিথিলার রাজা যূথসিংহের অনুরোধে। এরপরও আরো দুটি অনুষ্ঠানে এই নাটকের অভিনয় হয়েছিল :

> একবার (উপরিল্লিখিত) জন্মোৎসবে এবং অন্যবার ধর্মমল্লের অধিরোহন উৎসবে।

জয়স্থিতির নামের সঙ্গে জড়িত আরেকটি নাটক হলো 'ভৈরবানন্দ-নাটকম্'—এরও রচনা করেচিলেন একজন মৈথিল— মণিক নামের—

> রাজবর্ধনের পুত্র যিনি নাট্যকলার একজন বিশারদ ছিলেন। এটি মনে হয় একটি ধর্মনিরপেক্ষ নাটক ছিল, যার নায়ক ছিল ভৈরব এবং নায়িকা মদনাবতী, যিনি ছিলেন স্বর্গের একজন অপ্সরা— এক মুনির দ্বারা শাপভ্রষ্টা মানুষী হয়ে জন্মাবার জন্য। এই নাটকটির অভিনয় হয়েছিল উচিত অনুষ্ঠান উপলক্ষে— যেমন, ধর্মমল্লের বিবাহ উপলক্ষে . . . যিনি ছিলেন জয়স্থিতিমল্লের পুত্র . . .

জয়স্থিতির পরবর্তী প্রজন্মের শাসকেরা কোনো সাহিত্যিক বা নাট্য-প্রযোজনা বিষয়ক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। এটার প্রধান কারণ ছিল নেপালের বিশৃঙ্খল অবস্থা। ওঁর

সর্বাধিক সফল বংশজ যক্ষমল্ল নেপালে ৪৩ বছর রাজত্ব করেন (১৪৭৪ খ্রি. অবধি)। বলা হয় উনি মগধ পর্যন্ত গেছিলেন, পথে মিথিলাকে জয় করে এবং সমগ্র নেপালে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে ও পাহাড়ের সব কটি "পাহাড়ী রাজাকে" পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ওঁর মৃত্যুর পর, সম্পূর্ণ রাজ্য তিনভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। ওঁর জ্যেষ্ঠতম পুত্র রাইমল্ল ভাতগাঁও যাবার রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র রামমল্ল বনেপা-র (বা বণিকপুর) স্থাপন করেন এবং কনিষ্ঠতম পুত্র রত্নমল্ল (কান্তিপুর এবং ললিত পাটনাকে মিশিয়ে) স্থাপনা করলেন কাঠমান্ডুর। নেপাল রাজ্যের এই বিভাগের পর থেকেই আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক ঘটনাবলীর লিখিত প্রমাণ পাই।

৩

নেপালের মৈথিলী নাটকের বৈশিষ্ট্য

সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্ভ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ অবধি নেপালে মৈথিলী নাটক খুবই জনপ্রিয় ছিল। দেশীয় ভাষা-নাটকের মধ্যে দিয়ে নাট্যাভিনয়ের একটা নতুন পদ্ধতি এই ঐতিহ্য থেকে এখানে এসেছিল যার ফলে সংস্কৃত নাটকীয় ঐতিহ্যকে দিলো খারিজ করে। সংস্কৃতের ব্যবহার ধীরে ধীরে কমেও গেলো, যদিও সংস্কৃতের কাঠামোর ব্যবহার আরো কিছুদিন পর্যন্ত চললো। এই নতুন নাটকে অধুনাতন ভাষাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হতো।

নেপালের 'অনিয়মিত' মৈথিলী নাটকের আকরণ— যা সংস্কৃত নাটকের কাঠামোকে বাদ দিয়ে সংগঠিত হয়েছিল— ছিল এই রকম : নান্দীর পর (কখনো কখনো নান্দীর সঙ্গে যোগ হতো অষ্টমঙ্গলা ও পুষ্পাঞ্জলী) সূত্রধার ও নটী আসতেন মঞ্চে এবং নাটকের বিষয়বস্তুকে উপস্থাপিত করতেন, নাট্যকার সংরক্ষক ও সেই অনুষ্ঠানের বিষয়ে কিছু বলতেন যার উপলক্ষে নাটকটির রচনা ও অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরপর সাধারণত হতো রাজবর্ণনা ও দেশবর্ণনা এবং তদুপরি নাট্যবিশেষের ঘটনার সূত্রপাত হতো। অভিনেতারা মঞ্চে প্রবেশ করতেন এবং নিজেদের পরিচয় দিতেন "প্রবেশ"-গীতি দিয়ে। ঘটনাগুলি এগোতোও গানের মাধ্যমে ও শেষ হতোও গান দিয়ে। কখনো কখনো দুটি গানের মধ্যে ফাঁক থেকে যেতো যা কোনো গদ্যাংশ দিয়ে ভরা হতো। অনেক সময় এই ফাঁক ভরানোর জন্য আশু বক্তৃতা, ঘটনা বা গান জুড়ে দেওয়া হতো যা মূল নাটক নেই। 'নিয়মিত' নাটকে— যেখানে সংস্কৃত নাটকের কাঠামোকে ব্যবহার করা হতো— কিছু কিছু ছোটখাটো সহজ ও সরল গদ্যাংশ থাকতো পাঠের অঙ্গ রূপে। জগজ্জ্যোতির্মল্লের 'হরগৌরী বিবাহের' হালের প্রকাশন (১৯৬২) থেকে অবশ্য দেখা যাচ্ছে নেপালের মৈথিলী নাটকগুলিতে বেশ কিছু পূর্ব নির্দিষ্ট গদ্যের আবৃত্তি করা হতো।

এই সব নাটকে নতুন ধরনের চরিত্র বা ঘটনাবলী আনার কোনো প্রয়াসই সে যুগে করা হতো না। নাট্যকারের মূল উদ্দেশ্য ছিল একটা গীতমালার শৃঙ্খলকে মঞ্চে সুন্দর করে উপস্থাপিত করা যদিও তার সঙ্গে জোড়া হতো কিছু মূকাভিনয় এবং ঘটনাবলীকেও। নাটকের বিষয় সাধারণত পরিচিতই হতো। আসলে এইসব ঘটনাগুলি কারুর পক্ষেই বোঝা সম্ভব হতো না যদি না গল্প আগে থেকে জানা থাকতো। এইজন্যই এতবার করে 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'হরিবংশ', 'বিদ্যাবিলাপ', 'মাধবানল' এবং নানান পুরাণের গল্পের পুনরাবৃত্তি করা হতো বিষয়-নির্বাচনের বেলায় — ভিন্ন ভিন্ন নাট্যকার দ্বারা।

মনে হয় মঞ্চে কোনো রঙিন পর্দার ব্যবহার তখনকার দিনে হতো না। সম্ভবত তখন মঞ্চে কোনো বাস্তবতা আনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করা হতো না। কোনো কোনো নাটকে গানের প্রসঙ্গ ও বর্ণনা থেকেই দর্শক-শ্রোতার পক্ষে কোনো দৃশ্য-বিশেষের বিষয় বোঝা সম্ভব হতো। অভিনেতারা (একথা জানা যায় না যে এখানে কোনো অভিনেত্রী ছিল কিনা) সুন্দর পোশাক পরতেন। এঁদের সংখ্যা অসমের অঙ্কিয়ানাটের মতো সীমিত ছিল না। বরং এমনও হতো যে মঞ্চে যুদ্ধের অংশ কিংবা পুষ্করিণীতে জলকেলীর দৃশ্য সত্যি সত্যি দেখানো হতো। নাটকের সঙ্গে নিয়মিত আবহ সঙ্গীতের ব্যবস্থাও থাকতো— আসলে, মনে হয়, এইসব অভিনেতাদের প্রধান গুণই ছিল এই যে তাঁরা দক্ষ সঙ্গীতজ্ঞ হতেন। কখনো কখনো মঞ্চ নির্দেশ ছিল এইসব নাটকে শুধুমাত্র বাজনদারদের জন্য— বিশেষ করে সেইসব ক্ষেত্রে যেখানে কোনো কণ্ঠসঙ্গীত ছিল না, অন্য কোনো ঘটনাও নয়।

নাটকের অভিনয় হতো দিবালোকে এবং উন্মুক্ত জায়গায়। অঙ্কের বিভাজন নির্ভর করতো এক দিনে কতোটা অভিনয় নির্ধারিত হতো।

কুমার গঙ্গানন্দ সিংহ ঠিকই বলেছেন :

> সব মিলিয়ে এই নাটকগুলি পড়ে নেপালের রাজ-দরবারের বিষয়ে বেশ সদর্থক ধারণা হয়। দরবারের বিশালত্ব ও গৌরবময় পরিবেশে যেখানে সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পকে এমন উৎসাহ দেওয়া হতো, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ যার ফলে এখানে এসে এইসব সৃজনশীলতার মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষের পছন্দেও রদবদল করে দিতে পেরেছিলেন। সর্বোপরি এইসব জনপ্রিয় নাটকের ভাষা থেকেও বোঝা যায় যে তখন নেপালের সাহিত্যিক ভাষা-রূপে মৈথিলীই স্বীকৃতি পেয়েছিল।

৪
নাট্যকারগণ

ভাতগাঁও-এ

যক্ষমল্লের (১৪৭৪ খ্রি.) তিরোধানের পর যে তিনটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তার মধ্যে ভাতগাঁও-এ সবচেয়ে বেশি সংখ্যক নাট্যকারদের সংরক্ষণ-দান করা হয়েছিল। বিশ্বমল্লের (১৫৩৩ খ্রি.) সময়েই আমরা প্রথম মৈথিলী নাটকের কথা জানতে পারি। যার নাম ছিল 'বিদ্যাবিলাপ'। তাঁর উত্তরসূরি ত্রিভুবনমল্ল বা ত্রৈলক্যমল্লের (১৫৭২-১৫৮৫/৬ খ্রি.) রাজত্বেও কিছু গতিবিধির কথা জানা যায়। একটি মৈথিলী নাটকের ধ্বংসপ্রায় পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় কৃষ্ণজীবন-বিষয়ক যা ওঁর সংরক্ষণে রচিত হয়। তার একাধিক গানের ভণিতায় দুজন কবির নাম পাওয়া যায়— রামচন্দ্র ও বীরনারায়ণ। নাটকটি জয়দেব এবং বিদ্যাপতির গীতিকবিতা থেকে উদ্ধৃত হয়েছিল।

এরপর নেপালের নাট্যবিষয়ক প্রয়াস খুবই ঘনঘন ও বিস্তারিতভাবে হতে থাকলো। ত্রিভুবনমল্লের উত্তরসূরি জগজ্জ্যোতির্মল্ল (১৬১৮-১৬৩৩ খ্রি.) ছিলেন বিদ্যাচর্চা ও সঙ্গীতের একজন মহান পৃষ্ঠপোষক । ওঁর সময়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংস্কৃত রচনা ওঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় লেখা হয়েছিল; যেমন পদ্মশ্রীর 'নাগরসর্বস্ব', 'শ্লোকসারসংগ্রহ', 'সঙ্গীতসারসংগ্রহ', 'সঙ্গীতসারার্ণব', 'সংগীতভাস্কর' ও সঙ্গীতচন্দ্রে'র ওপর টীকা এবং নরপতির লেখা 'স্বরোদয়দীপিকা'—বিষয়ক টীকা (১৬১৭ খ্রি.)।

ওঁর লেখা মৈথিলী নাটকগুলির মধ্যে প্রাচীনতম হলো 'মিদিতকুবলয়াশ্ব' (১৬২৬ খ্রি.) যার থেকে বিদ্বানেরা প্রায়ই উদ্ধৃতি দেন কারণ এতে নেপালের মল্লরাজবংশ বিষয়ক অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে। এরপর এলো 'হরগৌরীবিবাহ' (১৬২৭ খ্রি.) যা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উদাহরণস্বরূপ, সূর্যগ্রহণের সময় ওঁর নিজের তুলাদান উপলক্ষে অভিনীত হয়েছিল। এটিই সম্ভবত 'নিয়মিত' নাটকের সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ উদাহরণ যেখানে সম্পূর্ণ নাটকটিই মৈথিলীতে লেখা হয়েছিল। কিছুদিন আগে ড. রামদেব ঝা এটির সম্পাদনা করেন। এতে কীর্তনিয়া শৈলীতে শিব-পার্বতীর বিবাহ প্রসঙ্গে কিছু মৈথিলী গান আছে। এতে প্রবেশ-গীত ও প্রস্থান গীতিও আছে— এমনকি বিদ্যাপতি, বিষ্ণুপুরী, সদানন্দ, গোবিন্দ, করণ মহেশ, কৃষ্ণ রায়, কবি রতন (রতনানী), চতুর চুতর্ভুজ, জগদীশ, শশিশেখরসিংহ এবং বংশমনির লেখা বিভিন্ন গানও এই নাটকের মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করা হয়েছে [১]। এর নটি অংশ (অঙ্ক) আছে যাকে বলা হচ্ছে "সম্বন্ধ", কিন্তু গল্পটিতে যে

১. এই কৃতির অংশরূপে পরবর্তী লেখকদের কাব্যকৃতি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যেমন হয়েছে অন্যান্য গ্রন্থেও। কারণ নেপালের মৈথিলী নাটকগুলি এতো ঘনঘন মঞ্চায়িত হতো যে পরবর্তীকালের। দ্বারা এগুলিতে কিছু কিছু রদবদল আনা স্বাভাবিক ছিল।

খুব বেশি বিস্তার আছে তা নয়; নাটকের পরিকল্পনাটি খুবই সহজ সরল এবং এতে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে অভিনয়, নৃত্য ও গীতের ওপরেই। নাটকটিতে অবশ্য পরবর্তী কালের কীর্তনিয়া নাটকের সব কটি গুণ রয়েছে— শিব গৌরীকে বিয়ে করার জন্য অত্যন্ত অধীর হয়ে পড়েছেন, বিবাহের সব ব্যবস্থা হলো ও শেষে সবাই ভগবানের প্রার্থনায় কীর্তন করে। ফলে এটিকে নেপালের কীর্তনিয়া নাটকের একটি উদাহরণ বলে মেনে নেওয়া হয়। এখানে মেনকার বাবা ঋষিবর সূত্রধারের ভূমিকা পালন করছেন— যেমনটা অঙ্কিয়া নাট অথবা কীর্তনিয়া নাটকে হয়। গৌণ পাত্রদের মধ্যে রয়েছে শিবের দুই অনুচর নন্দী ও ভৃঙ্গী, শিবের সাধকদ্বয়— বসু ও বিধি এবং গৌরীর দাসী। পাঠে প্রতিটি বক্তৃতার মধ্যে বিরতির চিহ্ন রয়েছে যেমন জ্যোতিরীশ্বরের 'বর্ণরত্নাকর' বা 'ধূর্তসমাগমে' আছে। আর নেপালের অন্যান্য নাটকের মতোই এখানেও অভিনেতাদের প্রতি অভিনয়-নির্দেশ সর্বত্র সংলাপের মধ্যে মধ্যে ছড়ানো রয়েছে— বিশেষ করে তাঁদের মঞ্চের কোন কোণে বা কোথায় দাঁড়াতে হবে কথা বলা, গান গাওয়া বা নৃত্যের জন্য। এটা প্রায় মঞ্চ নির্দেশনারই সামিল এবং এ থেকে বোঝা যায় যে নেপালের নাট্যকারেরা মঞ্চায়ন ও প্রযোজনার বিষয়ে কতো সাবধান ছিলেন। যে গদ্যটি এখানে ব্যবহৃত হয় তাতে আমার প্রচুর অনুপ্রাস পাচ্ছি ঠিক 'বর্ণরত্নাকরের' ঐতিহ্যেই, শুধু পার্থক্য এই যে এসব অলংকারের ব্যবহার ততো বিদগ্ধ নয়।

তৃতীয় নাটক, 'কুঞ্জবিহারনাটিকা' হলো রাধা-কৃষ্ণ ও গোপিনীদের কাহিনী-নির্ভর। ড.প্রবোধ চন্দ্র বাগচী এটির সম্পাদনা ও প্রকাশনা করেছেন। এছাড়া, 'প্রবোধচন্দ্রোদয়নাটকম্'[১] এবং অন্য একটি নাটক 'মহাভারত'[২]-ও এঁর পৃষ্ঠপোষকতায় লেখা।

জগজ্জ্যোতির্মল্লের পুত্র ও উত্তরাধিকারী নরেন্দ্রমল্লের রাজত্বে আমরা কোনো বিশেষ নাটকের রচনা হয়েছে বলে জানি না। তবে তাঁর পৌত্র জগৎপ্রকাশ মল্ল (১৬৪৪-১৬৭২ খ্রি.) ছিলেন ভাতগাঁও-এর প্রধান রাজাদের মধ্যে অন্যতম যিনি নেপালে মৈথিলী সাহিত্যকে এক উচ্চ আসনে উন্নীত করতে পেরেছিলেন। তবে উনি নিজে অবশ্য নাটক রচনা না করে প্রচুর ভক্তিগীতি রচনা করেছেন একক ভাবে।

নেপালের রাজদরবার যে আটটি নাটকের সঙ্গে ওঁর নাম পৃষ্ঠপোষক হিসাবে জড়িয়ে আছে তা হলো : (ক) ভণিতা-সহ জগৎচন্দ্রের 'উদাহরণ', (খ) নলীয় নাটকম্ (১৬৭০ খ্রি.) যা ছিল এই নাটকগুলির মধ্যে দীর্ঘতম, প্রায় ১০৮ পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি— 'চন্দ্রশেখরে'র ভণিতা-সহ, (গ) 'পারিজাত হরণ', (ঘ) বংশমণির ভণিতা-সহ 'প্রভাবতীহরণ', যা সবে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. লেখনাথ ঝা কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে ছেপে বেরিয়েছে, (ঙ) কৃষ্ণদাসের 'মলয়গন্ধিনী' (১৬৬৩ খ্রি.)— ভণিতা-সহ, 'মদনচরিত

১. বীর পাঠাগার, পাণ্ডুলিপি সং ১-১৪৪২।

২. ঐ, সং ১-৪৪৯।

মদননাটক' (১৬৭২ খ্রি.), (ছ) 'মূলদেবশশিদেবাখ্যানম্‌' এবং (জ) 'মাধবমালতী'— শেষের দুটি জগৎচন্দ্রের ভণিতা-সহ। নেপালের রাজগুরু হেমরাজের সংগ্রহে একটি তিন অঙ্কের 'রামায়ণ-নাটক' ছিল কৃষ্ণদাসের (ইনিই সম্ভবত 'মলয়গন্ধিনীর' রচয়িতা) যাতে জগৎপ্রকাশের নাম পাওয়া যায়। এর মধ্যে কিছু কিছু নাটক মনে হয় পরবর্তীকালে পরিমার্জিত ও সংশোধিত হয়েছে জগৎপ্রকাশমল্লের পরের নানান রাজার শাসন-সময়ে।

এইসব নাটকগুলিতে পদ্য ও গদ্য দুইই আছে। গদ্যে লেখা অংশগুলি ছোটো কিন্তু সেগুলি বেশ মধুর ও সুঠাম শৈলীতে রচিত। এর মধ্যে রাজবর্ণনা (যেমন 'মলয়গন্ধিনী'-তে আছে) অবশ্যই থাকবে কারণ তাতে প্রশংসা আছে শ্রীনিবাসমল্লের যিনি পাটনে এই রাজার সমসাময়িক শাসক ছিলেন।

এইসব নাটকগুলির গানগুলি অন্যান্য নাটকগুলির মতোই, তবে মাঝে মাঝেই একেকটা গভীর অর্থবহ গীতের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে।

সুমতি-জিতামৃতমল্লও (১৬৭২-১৬৯৬ খ্রি.) ছিলেন খুবই নাট্যোৎসাহী লেখক। তাঁর লেখা নাটকগুলির মধ্যে রয়েছে : (ক) 'কালিয়মথনোপাখ্যান' (১৬৮৪ খ্রি.), তিন অঙ্কের, (খ) 'মদালসাহরণম্‌' (১৬৮৭ খ্রি.), (গ) 'জৈমিনীয়ভরতনাটকম' (যার দুটি রূপ আছে— একটি মৈথিলীতে এবং অন্যটি সংস্কৃতে— যাতে তার নাম 'অশ্বমেধনাটকম্‌' (১৬৯০ খ্রি.)—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মত অনুসারে), (ঘ) 'গোপীচন্দ্রনাটকম্‌'(১৬৯০ খ্রি.), (ঙ) 'ঊষাহরণ', (চ) 'নবদুর্গানাটকম্‌' (১৬৮৬ খ্রি.), (ছ) 'সতীবিয়োগ' বা কুমারপ্রাদুর্ভাব'— অমিয়কর বা অমৃতকরের ভণিতা-সহ, (জ) জগৎচন্দ্রের ভণিতা-সহ 'মহাভারতনাটকম্‌' (পাণ্ডুলিপিটির লিপিকার হলেন দৈবজ্ঞ গঙ্গাধর), (ঝ) দ্বিজ শিবহরির 'বরুথিনীহরণম্‌'— ভণিতা-সহ, (ঞ) 'রামায়ণনাটক' এবং (ট) একটি অসমাপ্ত নাটক— 'মঙ্গল-মহোৎসব'। তাঁর নাটকের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে এসবগুলিতেই নানান সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিনয়-সূচকতা ও বিভিন্ন শিষ্ট ভাষার ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এইভাবে 'গোপীচন্দ্রনাটক'এবং 'কালিয়মথনোপাখ্যানমে'র ভাষা ছিল বাংলা। তাঁর লেখা প্রায় সব নাটকই আরম্ভ হয় ভগবান শিব বা অর্ধনারীশ্বরের প্রতি বন্দনা দিয়ে।

জিতামৃতমল্লের নাটকে তাঁর পূর্বসূরিদের তুলনায় ভাষার ওপর বেশ দখল দেখা যায় যদিও ওঁর পূর্বের রচয়িতারা বিভিন্ন সুপরিচিত কাহিনীর নাট্যরূপায়ণের ক্ষেত্রে পুরাকথাগুলির ওপরে যে দখল আছে তার অনেক প্রমাণ দেন।

জিতামৃতমল্লের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ভূপতীন্দ্রমল্ল (১৬৯৬-১৭৭২ খ্রি.) সিংহাসনে আরোহণ করলেন। ইনি ছিলেন মল্লদের মধ্যে সবচেয়ে সৃষ্টিশীল এবং প্রতিভাশালী লেখক। আমরা জানি যে ওঁর সময়ে এইসব নাটকগুলি লেখেন এবং প্রযোজনার ব্যবস্থাও করেন : (১) 'মাধবানল' (১৭০ খ্রি.), (২) ' গৌরীবিবাহ নাটক', সাত খণ্ডে বিভক্ত, (৩) 'মূলদেব-শশীদেবাশীপাখ্যানম্‌' (১৭০৬ খ্রি.), (৪) 'পশুপতিপ্রাদুর্ভাব'

(১৭১১ খ্রি.), (৫) 'গোপীচন্দ্র' (১৭১২ খ্রি.), (৬) 'উষাহরণ' (১৭১৩ খ্রি.) (৭) 'রুক্মিণীপরিণয়', (৮) 'বিদ্যাবিলাপ', (৯) 'মহাভারত' এবং (১০)-(১১) আরো দুটি অনামা নাট্যাংশ— যার মধ্যে একটি বোধ হয় রচিত হয়েছিল ১৬৯৫ খ্রিষ্টাব্দে যখন ওঁর পিতা জীবিত ছিলেন। কারণ এর রাজবর্ণনায় এঁর পিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা রয়েছে; এছাড়াও আছে আরো কতকগুলি নাটক যেমন, (১২) 'কংসবধকৃষ্ণচরিত', (১৩) 'কোলাসুরবধোপাখ্যান', (১৬) জৈমিনীযভবতনাটক', (অথবা, 'অশ্বমেধনাটক'), (১৭) 'মনোরঞ্জননাটক', (১৮) 'ভাষানাটকম্' (১৯)'রামায়ণানাটক'— ১৫ অঙ্কে বিভক্ত, (২০) 'মুদাবতীহরণনাটক', (২১) সম্বরাসুরোপাখ্যান'।

এইসব নাটকগুলির মধ্যে (যেমন 'গৌরীবিবাহে'র) কয়েকটি মঞ্চায়নের বিস্তারিত বর্ণনা এবং নাট্য ও নৃত্যনাথের বন্দনা ও পূজা— যা ছিল নৃত্যারম্ভবিধির অংশবিশেষ— সে বিষয়ে বর্ণনা পাওয়া যায়।

এই নাটকগুললির মধ্যে কোনো কোনোটির ভাষা ছিল নেওয়ারী আর কতকগুলির ছিল বাংলা।

'উষাহরণ'— যার মধ্যে কিছু অনামা অংশ রয়েছে 'যড়দর্শনম্', 'বিক্রমচরিত্রনাটকম্' এবং 'পদ্মামবতীনাটকম্'— এসব বিষয়ে, নেওয়ারীতে লেখা নাটকের একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। (এমনি পশুপতিপ্রাদুর্ভাব' এবং 'গোপীচন্দ্রোপাখ্যাননাটকম্' হলো বাংলাতে লেখা নাটকের উদাহরণ।)

এঁর নাটকে গানের সংখ্যা হতো অসংখ্য এবং এতো বৈচিত্র্যময় যা এঁর পূর্বেকার নাট্যকারদের রচনায় দেখা যেতো না।

এঁর সংরক্ষণে রচিত 'মহাভারত' এবং 'বিদ্যাবিলাপ' নাটকদুটি নিয়ে কিছুটা বিস্তারে আলোচনা করা যায়। এদুটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এগুলির মধ্যে দিয়ে নেপালের 'অনিয়মিত' মৈথিলী নাটকগুলির বৈশিষ্ট্য জানা যায়— যেমন জগজ্জ্যোতির্মল্লের 'হরগৌরীনাটক'।

'মহাভারত' (১৭০২ খ্রি.) (যার সঙ্গে কবি কৃষ্ণদেবের নাম জড়িত আছে) প্রায় তেইশ অঙ্কের নাটক ছিল যাতে মহাকাব্য বর্ণিত অনেকগুলি উপাখ্যানই আছে। ব্যাস ও সঞ্জয়কেও মঞ্চে উপস্থিত করা হয় আখ্যায়িকার বর্ণনার জন্য। এইসব গানগুলিতে অনেক ঘটনাই বর্ণিত হয়েছে বা উল্লিখিত হয়েছে যা মঞ্চে দেখানো হয় না। মহাভারতের শেষে দেখা যায় ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ করছেন অন্তর্ঘাতী যুদ্ধের নিষ্ফলতা নিয়ে।

মধ্যযুগীয় ভারতে 'বিদ্যাবিলাপে'র (১৭২০ খৃ.) কাহিনী ছিল খুবই জনপ্রিয়। কুমার গঙ্গানন্দ সিংহ এর সংক্ষিপ্তসার বিষয়ক বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে : "উজ্জয়িনীতে বীর সিংহ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর এক কন্যা ছিল বিদ্যাবতী। সে ছিল খুবই প্রতিভাশালী নারী এবং সে স্থির করেছিল যে সে তাকেই বিবাহ করবে যে তাকে তর্কে হারাতে পারবে। অনেক রাজপুত্র বিফল হয়ে ফেরত গেলো। মেয়েটির পিতা খুবই দুশ্চিন্তায় পড়লেন

এবং স্থির করলেন উনি চেষ্টা করবেন সুন্দরকে আনার — যার বিষয়ে, শোনা গেছে যে খুবই বিদ্বান রাজকুমার। তাই উনি রাজকবিকে পাঠালেন রাজা গুণসিন্ধুর কাছে কাঞ্চীতে— রাজপুত্র সুন্দরের পিতার কাছে, যাতে সুন্দরকে নিজের রাজসভায় আনা যায়। রাজপুত্র সুন্দরও এদিকে বিদ্যাবতীর সৌন্দর্য ও জ্ঞানবুদ্ধির বিষয়েও শুনেছিলো ও গোপনে, মনে মনে সেও এই কন্যার পাণি-গ্রহণ করতে চেয়েছিল। অতএব সুন্দর কাউকে না জানিয়ে উজ্জয়িনীতে এল এবং রাজার পুষ্প-মালিকা যে মহিলা তৈরি করে তার পাশেই একটি গৃহকে নিজের আবাস করল। সেই মালিনীর সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হওয়ার পর সে নিজের মনের গোপন ইচ্ছা তাকে বলে এবং তার সাহায্য চায়। সেই মালিনী তখন প্রতিশ্রুতি দেয় বিদ্যাবতী ও সুন্দরকে এক স্থানে নিয়ে আসার— যা হওয়া মাত্রই দুজনেই দুজনার প্রেমে পড়ে। কিন্তু তারা নিজেদের প্রেমের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয় তা বুঝতে পারে। উজ্জয়িনীর রাজা ও রানী এই গোপন প্রেমাভিসারের কথা জানতে পারেন এবং প্রেমিকযুগল একদিন ধরাও পড়ে হাতে-নাতে। সুন্দরকে রাজার দরবারে আনা হয় এবং সেখানে সাধারণ চোরের মতো শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু ততদিনে রাজ-কবি, যিনি আগে কাঞ্চীতে গেছিলেন, ফিরে আসেন এবং রাজাকে বলেন যে এই বন্দী অন্য কেউ নয়— রাজকুমার সুন্দর নিজেই, যিনি রাজা গুণসিন্ধুরই পুত্র। একথা জানতে পেরে রাজা তৎক্ষণাৎ রাজপুত্র সুন্দরকে মুক্তি দেন এবং নিজের কন্যার সঙ্গে তার বিবাহর ব্যবস্থা করে মিলন ঘটান।"

নাটকটি সাত অঙ্কে বিভক্ত, যার ফলে এখানে বর্ণিত পাত্র-পাত্রীর চরিত্র-চিত্রণের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। তবে এখানে কাল ও স্থানের সমতার দিকে ততটা ধ্যান দেওয়া হয় না। সূত্রধার এখানে মঞ্চের ওপর দেখা দেন না। আর মঞ্চ-নির্দেশন সমেত গানগুলি খুবই সহজলভ্য এই নাটকে।

অন্যান্য 'নিয়মিত' নাটকের তুলনায় এই নাটকে গদ্যাংশ প্রায় নেই বললেই চলে; মনে হয় অভিনেতাদের উপর শূন্যস্থান পূরণার্থ সেগুলি বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

এই নাটকে এমন কিছু অংশ আছে যার সৌন্দর্য প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনা থেকে পাওয়া যায়; যেমন, চতুর্থ অঙ্কে ধোপানীদের বর্ণনার প্রসঙ্গটি নেওয়া যেতে পারে।

নাটকটির গানগুলি অতি-সংক্ষিপ্ত এবং রহস্যজনকও বটে— যা এই সাহিত্যকর্মের পাঠে সহজগ্রাহ্যতা এবং বোধগম্যতা— দুই দিক থেকেই সাহায্য করে। এখানে সেখানে এগুলির মাঝে মাঝে রয়েছে দীর্ঘ অনুচ্ছেদের মতন যার মাধ্যমে চিন্তা ও ঘটনার বিকাশ দর্শানো যায় এবং গানগুলিকেও বেশ মনোরঞ্জক করা যায় (উদাহরণস্বরূপ, মালিনীর সঙ্গে নায়কের বার্তালাপকে নেওয়া যায়)।

বেশ কিছু গান— যেমন মহেশবাণীগুলি এবং অন্যান্য গীতিকাব্য নির্ভর গান একেবারে নতুন আস্বাদের ও মৌলিক। বিয়ের সময়ে মিথিলায় যেমন হয় তেমনি 'কোহবরে'র গান গাওয়া হয়। এভাবে বেশ কিছু মিথিলায় প্রচলিত আধুনিক সামাজিব

রীতিনীতির ছাপ এই নাটকে দেখা যায়।

নেপালের মৈথিলী নাটকের চূড়ান্ত রূপ সম্ভবত দেখতে পাওয়া যায় মল্লবংশের শেষ রাজা রণজিতমল্লের (১৭২৭-১৭৭২ খ্রি.) দীর্ঘ রাজত্বকালে। ওঁর সংরক্ষণে প্রচুর নাটকের রচনা হয়েছিল বলে আমরা জানতে পারি; উদাহরণ-স্বরূপ, (১) 'রামচরিত'(১৭২৫ খ্রি.), (২) 'কৃষ্ণচরিত' (১৭৩৮ খ্রি.), (৩) 'কৃষ্ণকৈলাসযাত্রোপাখ্যান' (১৭৪৭ খ্রি), (৪) 'উষাহরণ' (১৭৫৪ খ্রি.)— নয় অঙ্কে সমাপ্ত, (৫) ইন্দ্রজয়- নাটকম্' — চিত্রকেতূপাখ্যানম্-এর ওপর ভিত্তি করে রচিত, (৬) 'মান্ধাত্রোপাখ্যান' (১৭৬৪ খ্রি.), (৭) 'কোলাসুরভোপাখ্যান' (১৭৬৬ খ্রি.), (৮) 'খট্টাসুরবধোপাখ্যান' (১৭৬৭ খ্রি.), (৯) 'অন্ধকাসুরবধোপাখ্যান' (১৭৬৮ খ্রি.), (১০) 'কৃষ্ণ-চরিত্রোপাখ্যান', (১১) 'মদনচরিত্র', (১২) 'রামায়ণনাটক', যা প্রায় ২০০ পৃষ্ঠার নাটক, (১৩) 'মাধবানলকামকান্দলা' যাতে ধনপতির ভণিতা আছে, (১৪) 'নলচরিত'— যার মধ্যে প্রথমোক্ত পাঠের মতই জনৈক গণেশের ভণিতা আছে, (১৫) 'রুক্মিণীপরিণয়'— পাঁচ অঙ্কের, (১৬) 'রুক্মিণীহরণ' (১৭) 'জলশায়ীবিষ্ণুবাদিসৃষ্ট্যুপাখ্যান', (১৮) ত্রিপুরাসুরবধোপাখ্যাননাটকম্' (১৯) 'পৃথুপাখ্যান', (২০) 'যযাত্যুপাখ্যানম্', (২১) 'বীরবরোপাখ্যান', (২২) 'গোরক্ষপাখ্যানম্', (২৩) 'দিকপালগণেশোপাখ্যানম্', (২৪) 'সুব্রহ্মণ্যেপাখ্যানম্' এবং (২৫) 'হরগৌরীকথা'। 'ষডড়্শনকথা' নামক একটি নামহীন নাট্যকৃতিও এঁরই রচনা বলে কথিত আছে।

এই নাটকগুলির মধ্যে অধিকাংশই 'ইষ্টদেবতা'র আরাধনা-রূপে রচিত হয় : 'উষাহরণের' অভিনয় হয়েছিল এই দেবীর মন্দির-পুনর্নির্মাণের সময়ে, 'অন্ধকাসুরবধোপাখ্যান'-ও তাঁকেই সন্তুষ্ট করতে প্রযোজিত হয়, 'কৃষ্ণচরিতনাটক' অভিনীত হয়েছিল মন্দিরে একটা বৃহত্তর ঘণ্টা প্রতিষ্ঠিত করার সময়ে এবং 'কোলাসুরবধোপাখ্যান' নাটকের অভিনয় হলো নীলপদ্ম দিয়ে দেবীর মন্দির সাজানোর সময়ে। অন্যান্য নাটকগুলিও পরিবারের বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে লেখা হয়েছিল।

এর মধ্যে অনেকগুলি নাটকেই বাংলার মিশ্রণ আছে। উদাহরণস্বরূপ, 'কৃষ্ণকৈলাসযাত্রোপাখ্যান', 'রামায়ণ' এবং 'রামচরিত' নাটকগুলিতে বেশি বাংলা ভাষাতেই রয়েছে।

এই নাটকগুলির বৈশিষ্ট্য হলো গদ্যের প্রভূত ব্যবহার।

'মাধবানল-কামকন্দলা'র ছকের অনেকটা 'বিদ্যাবিলাপ' নাটকের গল্পের সঙ্গে মিল আছে। এটিও একটি খুবই জনপ্রিয় লোককথার উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। এর গল্পে কুমার গঙ্গানন্দ সিংহ এভাবে সংক্ষেপে বলেছেন :

"পুষ্পাবতী নগরের রাজা গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্বে মাধবানল নামে একটি ব্রাহ্মণযুবক ওঁর অধীনে কর্মরত ছিল। মাধবানল ছিল অতীব সুদর্শন, শিল্পে ও সঙ্গীতে

দক্ষ, এবং সবার প্রিয় পাত্র। এর ফলে অন্য সব সভাসদদের মনে ঈর্ষা জাগলো যাঁরা সবাই মিলে রাজাকে অভিমত দিলেন ওঁকে এই রাজত্ব থেকে বিতাড়িত করার। কিন্তু রাজা সেইসব মতামত মেনে নিলেন কিন্তু ওকে নানান সম্মানে আভূষিতও করলেন। মাধবানল তখন কামবতী শহরে গেলো। সেই শহরের প্রাসাদের দ্বারে পৌঁছে সে এক অপূর্ব সুন্দর গীতনাদ শুনতে পেলো যা রাজনর্তকী কামকন্দলার নৃত্যগীত-সঙ্গিনীরা তাঁর নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে গাইছিল। এটা শুনে মাধবানল লক্ষ করলো যে এই রাজসভায় প্রচুর অজ্ঞানী মানুষ রয়েছে কারণ তারা মৃদঙ্গবাদক এমন রেখেছে যে তার ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে সে তালে তালে চাপড় দিয়ে সময়ের হিসাবও রাখতে পারছে না। দ্বারপাল তার একথা রাজাকে গিয়ে জানায়। এ নিয়ে অনুসন্ধিৎসা জাগায় রাজা খোঁজ করে জানলেন যে, যা বলা হয়েছে তা সত্যিই। তখন সে দেশের রাজা তাকে রাজসভায় ডাকলেন এবং সম্মানিত করলেন। ইতিমধ্যে নৃত্য চলতে থাকলো ও তা দর্শকদের মোহিত করলো। এই নৃত্যের মধ্যে অসময়ে একটি ভীমরুল কামকন্দলার বুকে কামড়ালো। কিন্তু নাচের ছন্দ নষ্ট হয়ে যাবে এই ভয়ে সে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে তাকে তাড়িয়ে দিলো কোনো রকমে কিন্তু কাউকে বুঝতে দিলো না। এটা মাধবানল ছাড়া অন্য কেউ লক্ষ করলো না। এতে মাধবানল এতো আনন্দিত হলো যে নাচের শেষে এক মুহূর্তও নষ্ট না করে রাজার দেওয়া সমস্ত উপহার সে নর্তকীকে উপহার দিয়ে দিলো রাজসভার সবার সামনেই। কিন্তু রাজা এটাকে নিজের অপমান বলে বিবেচনা করলেন এবং ব্রাহ্মণকে তৎক্ষণাৎ রাজ্য থেকে বিতাড়িত করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু কামকন্দলার নজরে তার স্থান অত্যন্ত উচ্চে উঠে গেছিল বলে শহর ছাড়বার আগে পর্যন্ত কিছু কাল সে তাকে নিজের গৃহে আশ্রয় দিয়েছিল। এখানেই দুজনে দুজনের প্রেমে পড়ে। বিদায় নেবার সময় প্রায় ভগ্নহৃদয়ে পরস্পরের প্রতি প্রেম ও বিশ্বস্ততার শপথ নিয়ে বিচ্ছিন্ন হলো। এর পর; মাধবানলের প্রথমে স্থির ছিল না কোন পথে যাবে। পথে ওর একজন মানুষের সঙ্গে দেখা হলো যে উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের থেকে একটি সমস্যা নিয়ে কামবতীর দিকে যাচ্ছিল। মাধবানল সেই সমস্যার সমাধান করে উজ্জয়িনীর দিকে রওনা হলো। সেখানে পৌঁছে সে কামকন্দলার প্রতি একটি প্রেমপত্র লিখলো এবং একটা সুন্দর উত্তরও পেলো। মাধবানলের মন এতে ভীষণ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লো এবং সত্যিকারের পঞ্চশর বিদ্ধ হৃদয় নিয়ে সে সেই চিঠিটা বহু দুঃখে পাঠ করলো। তারপর মহাকালের মন্দিরে গিয়ে সে সেখানে রাত্রিযাপন করলো। নিজের মনকে ভোলানোর জন্য প্রথমে সে কয়েকটি কবিতার স্তবক লিখলো একটি কাগজের টুকরোর ওপরে যাতে স্পষ্টরূপে তাঁর হৃদয়ের বেদনা বিধৃত হলো। পরের দিন যখন রাজা বিক্রমাদিত্য এই মন্দিরে দেবদর্শনে এলেন, তার নজরে স্তবকগুলি পড়লো এবং তিনি তখন এগুলির রচয়িতাকে খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু এই সন্ধান সফল হলো না। পরের দিনও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো। কিন্তু এইবার নিজের সভাসদদের সহায়তায় উনি মাধবানলকে

খুঁজে বের করতে সমর্থ হলেন। তার প্রেমের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য রাজা বিক্রমাদিত্য তাকে একথা বোঝালেন যে কামকন্দলা মারা গেছে। এতে মাধবানল দুঃখে মারা গেলো। তখন রাজা গোপনে কামকন্দলার কাছে গেলেন এবং তাকে মাধবানলের মৃত্যুসংবাদ দিলেন। সেকথা শুনে তারও তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হলো। দুজনেরই মনোভাবের সত্যিকারের পরিচয় পেয়ে রাজা তখন একজন প্রেতিনীকে বললেন এই দুজনকে বাঁচিয়ে দিতে এবং তাদের মিলনের ব্যবস্থা করতে। এইভাবে প্রেমিকযুগলের মিলন হলো।"

এরপর গঙ্গানন্দ সিংহ বলেন,

> বিদ্যাবিলাপের মতোই এই কাহিনীও বেশ জনপ্রিয় ছিল। আমরা জানি এই অধুনা অবলুপ্তপ্রায় পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি নেপাল, মিথিলা ও বঙ্গদেশে— সর্বত্র পাওয়া যায় এবং সংস্কৃত ও হিন্দি নাট্যকারেরাও এই কাহিনী নিয়ে গ্রন্থরচনা করেন।

এই নাটকে কোথাও কোথাও আশ্চর্যজনক মোড় দেখা দিয়েছে কিন্তু মোটামুটিভাবে এর শৈলী ছিল অন্য নাটকগুলিরই মতন।

কাঠমাণ্ডুতে

কাঠমাণ্ডুর গোড়াপত্তন করেন রত্নমল্ল, যক্ষমল্লের (১৪৭৪ খ্রি.) কনিষ্ঠতম পুত্র। তাঁরও পুত্র, অমরমল্ল সৃষ্টি করলেন সাত ধরনের নৃত্যের এবং নেপালে প্রথম নিয়ে এলেন অন্য নানা শিল্প। পৌত্র নরেন্দ্রমল্ল (১৫৫১ খ্রি.) বারো-অঙ্কের 'রামায়ণনাটক' লিখলেন এবং 'মহাভারতনাটক'-ও। কিন্তু তাঁর উত্তরসূরিগণ— মহেন্দ্রমল্ল (১৫৬৬ খ্রি.) এবং সদাশিবমল্ল (১৫৭৫ খ্রি.) কোনো নাট্যকারকে উৎপ্রাণিত করেন নি বা সংরক্ষণ প্রদান করেন নি। সদাশিবমল্লের মৃত্যুর পর থেকেই এই বংশের বিষয়ে আমরা আরো বেশি প্রমাণপত্র পাই। সদাশিবমল্লের (আরেক নাম ছিল শিবসিংহ) একটি কনিষ্ঠ পুত্র ছিল, হরিহরসিংহমল্লদেব। এঁর শাসনকালেই এই রাজ্য দুটি ভাগে বিভক্ত হয় : (ক) কান্তিপুরের রাজ্য অথবা কাঠমাণ্ডু এবং (খ) ললিতপুরের রাজ্য বা পাটন।

(ক) কান্তিপুরের (অথবা কাঠমাণ্ডুর) রাজারা

যে শাখাটি মূল কাঠমাণ্ডুতেই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে তার নেতা ছিলেন লক্ষ্মীনরসিংহমল্ল (অথবা লক্ষ্মীনৃসিংহমল্ল)। তাঁর পরবর্তী রাজা প্রতাপমল্লদেব (১৬৩৯-১৬৮৯ খ্রি.) ছিলেন একজন গুরুত্বপূর্ণ শাসক। ইনি পাটন রাজবংশের রাজা সিদ্ধিনরসিংহমল্লকে যুদ্ধে হারিয়েছিলেন। এঁর দুই রানী ছিলেন মিথিলার মেয়ে— রূপমতী (রাজপুত্র নারায়ণের পৌত্র ও লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র বীরনারায়ণের কন্যা ছিলেন ইনি— যাঁর ভাই ছিলেন প্রাণনারায়ণ এবং বিচারনগরী (?) ছিল যাঁদের রাজধানী) এবং রাজমতী। ইনি বহু মৈথিল বিদ্বানকে নিজের রাজসভায় আমন্ত্রিত করেছিলেন এবং তাঁদের কাছ থেকে নানান

ধরনের শিক্ষা পেয়েছিলেন :

> ইনি নেপালের বিভিন্ন পীঠ-দেবতার উদ্দেশে প্রার্থনা-গীতির রচনা করেন এবং সেগুলিকে পাথরের ওপর খোদাই করে বিভিন্ন পবিত্র স্থানে পাথরগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করেন, যেমন পশুপতিনাথ, প্রভৃতি . . . ইনি নৃত্যনাথের অপূর্ব মূর্তিরও সৃষ্টি করেন . . . ইনি অনেক কবিতা লিখে সেগুলিকে সঙ্গীত-সহ গীতিবদ্ধ করেন . . . নিজের নাম নিজস্ব মুদ্রায় 'কবীন্দ্র'— এভাবে অভিহিত হয়ে মুদ্রিত করান খুব ধুমধামের সঙ্গে। এই রাজারই রাজত্বে ছিলেন একজন তিরহুতিয়া ব্রাহ্মণ যিনি তিন বছর নরসিংহ-মন্ত্রের জপ করে যখন যা চাই তাই পাওয়ার ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন, এবং শেষমেষ কান্তিপুরে এসেছিলেন . . . রাজা তাঁকে রাজগুরুর উপাধি দেন।

এঁরই রাজসভায় বংশমণি ঝা বিকশিত হয়েছিলেন। বেলোচে-মূল পরিবারের ও ভরদ্বাজ গোত্রের রামচন্দ্র ঝা-র সন্তান ছিলেন ইনি। ভক্তপুরের জগজ্জ্যোতির্মল্লের সভায় ইনি বেশ কিছু কৃতি ও গীতির সৃষ্টি করেন— যেমন 'সঙ্গীতভাস্কর' (১৬৩১ খ্রি.)। আমরা আজ এর লেখা দুটি মৈথিলী নাটকের কথা জানতে পারি— 'গীতদিগম্বর' (১৬৫৫ খ্রি.) যার প্রতিলিপি বীর পাঠাগারে রক্ষিত আছে এবং 'মুদিতমদালসা'— যা নেপালের জাতীয় পাঠাগারে রয়েছে।

রাজা প্রতাপমল্লের 'মহাতুলাদানের' উৎসব উপলক্ষে রচিত হয়েছিল 'গীতদিগম্বর'। এটি একটি 'নিয়মিত' ধরনের নাটক যা চার অঙ্কে বিভক্ত ছিল। গল্পটি — পার্বতী কর্তৃক শিবের মনোহরণ— খুবই পরিচিত কাহিনীই ছিল এবং এই নাটকের মুখ্য আকর্ষণ ছিল এতে প্রযুক্ত দেশীয় ও তৎকালীন ভাষায় রচিত গানগুলির ব্যবহার। বেশ কটি শিব বন্দনা ছিল নাটকের গোড়ায় দেওয়া যেগুলি ছিল খুবই সহজ, সরল অথচ গাম্ভীর্যপূর্ণ।

প্রতাপমল্লের পর রাজা হন মহীন্দ্র অথবা ভুপালেন্দ্রমল্ল (১৬৮৯-১৬৯৪ খ্রি.) যাঁর সময়ে শুধু 'নলচরিতনাটক' (১৬৮২ খ্রি.) নামের একটি নাটকই রচিত হয় বলে উল্লিখিত আছে।

এছাড়া জনৈক কৃষ্ণানন্দ ওঁরই সংরক্ষণে লিখেছিলেন 'ধর্মদত্তচরিতনাটক' যাঁকে আমরা পেয়েছি সম্ভবত সেই কৃষ্ণানন্দ-রূপেই যিনি রচনা করেছিলেন 'সঙ্গীতসারার্ণবে'র— যা ভূপালেন্দ্রমল্লের অধীনে সঙ্গীত বিষয়কএকটি রচনা ছিল— সংস্কৃতে লেখা।এই রচনাতে উনি জগজ্জয়মল্লের (১৭০২-১৭৩২ খ্রি.) মেয়ের ছেলে— জনৈক পূর্ণ সিংহের কথা উল্লেখ করেন, যিনি ছিলেন অনন্ত সিংহের সন্তান।

তাঁরও পরের রাজা শ্রীভাস্কর-মল্লদেব (১৬৯৪-১৭০২ খ্রি.) নাট্যরূপে তিনটি গীতিকাব্য লিখেছিলেন (১৭০২ খ্রিষ্টাব্দে) বলে কথিত আছে (দ্র. বীর পাঠাগার, পাণ্ডুলিপি সং খ-২৪৩)। তারপর এলেন পৌত্র জগজ্জয়মল্ল (১৭০২-১৭৩২ খ্রি.) যিনি নিজেও মৈথিলী ভাষাকে যথেষ্ট সংরক্ষণ প্রদান করেছিলেন নিজের সভায় কিন্তু সেইসময় যে

'অভিনয়প্রবোধচন্দ্রোদয়' রচিত হয়েছিল তা সম্ভবত সুপরিচিত সংস্কৃত নাটক 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ের'ই একটি পরিবর্তিত রূপ ছিল যাতে বাংলার মিশ্রণ ছিল। এই বংশের শেষ শাসক ছিলেন জয়প্রকাশমল্ল (১৭৩৯-১৭৭৮ খ্রি.), কিন্তু ওঁর অধীনে কোনো মৈথিলী নাটক রচিত হয়েছে বলে জানা যায়নি।

(খ) পাটন বা ললিতপুরের রাজারা

এই বংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন হরিহরসিংহদেবের কনিষ্ঠ পুত্র। মৈথিলীর বিকাশের দিক থেকে দেখলে মনে হবে এটি কান্তিপুরের রাজবংশের চেয়ে অনেক বেশি উৎসাহ প্রদান করেছিল মৈথিলী ভাষা ও সাহিত্যকে। হরিহরসিংহমল্লের কনিষ্ঠ পুত্র, যাঁর জন্য এই বংশ বিখ্যাত হয়েছিল, তিনি হলেন সিদ্ধিনরসিংহদেব (১৬২০-১৬৫৭ খ্রি.)। তাঁর অধীনে ১৬৫১ সালে রচিত হয়েছিল বিখ্যাত নাটক 'হরিশচন্দ্রনৃত্যম্'[১]। "নাটকটির কথাবস্তু 'চণ্ডকৌশিকের' থেকে ভিন্ন কিছু নয় . . . এতে সংস্কৃতের ব্যবহার ছিল খুবই সীমিত, কয়েকটি স্তবকে মাত্র— বিশেষত যেখানে কোনো অভিজাত বংশীয় পাত্র-পাত্রীর প্রবেশ ঘটেছে— তবে এখানে যে গানগুলি রয়েছে সেগুলির সুর ও গঠনশৈলীতে তার ছাপ রয়েছে . . .।" অগাস্টাস কনরাডি এটির ভাষার বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে এটি মূলত মৈথিলীই, তবে কখনো কখনো বাংলা এবং হিন্দির মিশ্রণ রয়েছে; তবে "আধুনিক নেপালী ভাষার সঙ্গে এর কোনো সম্বন্ধই নেই"। এই নাটকের পাত্রপাত্রীর মধ্যে মুখ্য বলতে সত্যবাদী নায়ক হরিশচন্দ্র তাঁর স্ত্রী মদনাবতী ও পুত্র রোহিদাস। এতে নাটকীয়তা প্রচুর মাত্রাতে ছিল। নাটকটি শেষ হচ্ছে একটি আশীর্বচন দিয়ে যা সিদ্ধিনরসিংহের প্রতি উদ্দিষ্ট ছিল।

সিদ্ধিনরসিংহদেবের পর রাজসিংহাসনে আরোহণ করলেন (১৬৫৭-১৭০১ খ্রিষ্টাব্দে) শ্রীনিবাসমল্ল। ইনি নৃত্যের কালে বৃদ্ধি ঘটালেন— ওঁর সংরক্ষণে একটা মৈথিলী নাটক রচিত হয় বলে আমরা জানি যার নাম ছিল 'ললিতকুবলয়াশ্ব'।

তাঁর পরাপৌত্র বিষ্ণুসিংহমল্লই (১৭৩৭ খ্রি.) ছিলেন একটি 'উষাহরণ-নাটক' এবং এক দীর্ঘ একাঙ্ক নাটক 'কৃষ্ণচরিত্র'র রচয়িতা যা নেপালের রাজদরবারে পাঠাগারে রক্ষিত রয়েছে। এটির সঙ্গে প্রায় পুরোটারই মিল রয়েছে বীর পাঠাগারে রক্ষিত (পাণ্ডুলিপি সং. ১-৩৬০) অন্য একটি কৃতির যাতে বিদ্যাপতি, কংসনারায়ণ এবং গোবিন্দের গানও অন্তর্ভুক্ত আছে— এবং যা ওঁরই সংরক্ষণে রচিত হয়েছিল।

এরপর হতে এই রাজত্ব হয় কান্তিপুর নয় ভক্তপুরের রাজাদের হাতে চলে গেলো। তাই পাটনে পৃথক্‌ভাবে এরপর আর কোনো মৈথিলী নাটকের রচনা হয়নি।

১. অগাস্টাস কনরাডি কর্তৃক ১৮৯১ সালে সম্পাদিত ও প্রকাশিত। নাটকটির শেষ স্তবক থেকে বোঝা যায় যে জনৈক কবি দামোদর এই রচনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

বণিকপুর (বনেপা বা বনপট)

আরেকটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা সমান্তরালভাবে করেছিলেন যক্ষমল্লের দ্বিতীয় পুত্র জয়রণমল্ল (১৪৭৪ খ্রি.)। ইনি প্রায় ২১ বছর রাজত্ব করেন এবং চারজন মৈথিল ব্রাহ্মণকে নিজের সভাসদ রূপে নিমন্ত্রিত করেছিলেন। মনে হয় জগৎপ্রকাশমল্ল ও জিতামৃতমল্লের কালে এসে এই বংশটির গুরুত্ব গেছিল নিঃশেষিত প্রায় হয়ে। আমরা শুধু একজন লেখকের কথাই জানি— জয়রামদত্ত (বনেপার) যিনি ১৪৯৬ খ্রিষ্টাব্দে একটি মৈথিলী নাটক লিখেছিলেন 'পাণ্ডববিজয়' (বা 'সভাপর্বনাটক') নামে।

৫
উপসংহার

মধ্যযুগীয় মৈথিলী সাহিত্যের এই অতীব সৃষ্টিময় কালটি শেষ হয় ১৭৬৮ খ্রিষ্টাব্দে, যদিও ড. উমেশ মিশ্র বলেন যে তখনও মৈথিলীর প্রতি উৎসাহ পুরোপুরি কমেনি নেপাল থেকে। এই স্রোত শুকিয়ে যাওয়ার মূল কারণ হলো গোর্খা রাজা পৃথ্বীনারায়ণ শাহের (১৭৬৮-১৭৮৫ খ্রি.) একটা রাজনৈতিক গোলমালের মধ্যে দিয়ে সিংহাসনে আরোহণ। গোর্খা রাজাদের বংশ স্থাপনের ফলে শুরু হলো রাজসভায় গোর্খা-ভাষার প্রধানতা এবং মৈথিলী ভাষার ক্রমবিলোপ। তবে প্রথম প্রথম বেশ কিছু বছর গোর্খা রাজারা নিজেদের রাজত্বের ভিত শক্তভাবে কায়েম করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন— শিল্প সাহিত্যের সংস্করণের দিক থেকে নজর ফিরিয়েও যার ফলে মৈথিলী সাহিত্যের চর্চা আরো বেশ কিছুদিন চলেছিলো।

এই সময়ে তিন ধরনের প্রভাব কাজ করতো— প্রথমত, সংস্কৃত নাটক একটা ছকের মতো কাজ করতো মৈথিলী নাট্যরচনার ক্ষেত্রে; দ্বিতীয়ত, মিথিলার কীর্তনিয়া নাটকগুলি জীবন্ত ও সচল ছিল; এবং তৃতীয়ত, মিথিলার সাংগীতিক ঐতিহ্য সেই সময়ের বিভিন্ন সংগীত বিষয়ক গ্রন্থে উজ্জ্বল তারকার মতো ছিলো চমকিত— বিশেষ করে বংশমণি ঝা প্রমুখ বিশেষজ্ঞের কৃতিগুলির জন্য, যার পরিচয় রয়েছে 'রাগমালা'য় এবং যার ফলে নব্য ভাষার নাটকগুলি অনুপ্রেরণা পেয়েছিল। এর পরিণাম ছিল তিনটি :— এক, 'নিয়মিত' মৈথিলী নাটক যেখানে সংস্কৃত নাটকের আকরণ বজায় রাখা হলো কিন্তু ভাষা হলো মোটামুটিভাবে মৈথিলী; দুই, কিছু কিছু 'অনিয়মিত' মৈথিলী নাটকের জন্ম হলো যেখানে কৃষ্ণের জীবনের কিছু কিছু ঘটনা অথবা অন্য কোনো জনপ্রিয় নাটকের কথা স্বতঃস্ফূর্ত সংলাপ হয়ে স্থান পেলো সুপরিচিত সুগ্রাহ্য গানের মধ্যে মধ্যে; তিন, আরেক ধরনের মৈথিলী নাটকের সৃষ্টি হলো, স্বতন্ত্র অপেরার শৈলীতে লেখা নাটক যাতে মূলত স্থান পেলো ধর্মনিরপেক্ষ গান। এই শেষ দুই ধরনের নাটকের মুখ্য আকর্ষণ ছিল সেইসব নাটকের সংগীত; ফলে তাদের সাহিত্যিক ও কাব্যিক গুরুত্ব তেমন উচ্চাঙ্গের ছিল না।

নেপালের নাটকগুলি ছিল প্রকৃতপক্ষে সুকৌশলী নাট্যাভিনেতা-মণ্ডলীর প্রযোজনার ফল যাতে প্রায়শই প্রাচীন ও জনপ্রিয় কাহিনীগুলি ঘুরে ফিরে এসেছে। অভিনেতারা নাট্যকারের সাহায্য নিয়ে তাদের কাছ থেকে একটা জনপ্রিয় বিষয় ও গীত পেতেন যার মধ্যে দিয়ে নৃত্য ও সংগীতের প্রতিভার প্রদর্শনীর সুযোগ পাওয়া যেতো। একজন সাধারণ অভিনেতার শিক্ষার জন্য ছিল 'হস্তপ্রকারণীরূপম্', 'শ্রীহস্তমুক্তাবলী', 'খিসমবাদ্য-শিক্ষা', 'শিরসঞ্চালনশাস্ত্রম্' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি এবং অন্যান্য কিছু গীতাভিনয়-বিষয়ক শিক্ষাগ্রন্থের মাধ্যমে। এসব বিষয়ে ভূপতীন্দ্রমল্লের 'নৃত্যারম্ভবিধি' বা 'গৌরীবিবাহ নৃত্যব্যয়নির্দেশ' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকেও বিস্তারে জানা যায়।

এমন কালে যখন মুসলমান শাসকেরা প্রায় সারা ভারতের ওপরেই অধিকার বিস্তার করেছিল, শুধু নেপাল ও মিথিলার নিরালা রাজসভাতেই দেশীয় জ্ঞান ও প্রতিভার উন্মেষ রূপে নাট্যসাহিত্যের চর্চা সম্ভব ছিল। নেওয়ারী লিপিকরদের ধন্যবাদ যে আজও আমরা সেযুগের সৃজনশীল নাট্যচর্চার আন্দোলন বিষয়ে বুঝতে পারি। আশা করা যায় নেপালে যদি আরো ভালোভাবে পাণ্ডুলিপির খোঁজ করা যায় এবং পাণ্ডুলিপিগুলির যদি প্রকাশনের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে সে যুগের নব্যভাষার নাট্যসাহিত্যের একটা সম্যক পরিচয় পাওয়া যেতে পারে।

একাদশ অধ্যায়

মিথিলার কীর্তনিয়া নাটক

ভূমিকা

মূল মিথিলায় জ্যোতিরীশ্বর ও বিদ্যাপতির পর দেশীয় ভাষায় মহান নাট্যরচনার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না— অন্তত ১৫৫৭ সালের খণ্ডবলাকুলের ক্ষমতায় আসীন হওয়ার আগে পর্যন্ত। মহারাজ শুভঙ্কর ঠাকুর (১৫৮৩/৪ - ১৬১৯/২১খ্রি), যিনি মহারাজা মহেশ ঠাকুরের (? ১৫৫৭ - ৭০/১ খ্রি) পুত্র ছিলেন— উনি অনেকগুলি নাট্য ও নৃত্য-কৃতির রচয়িতা ছিলেন। এই সময়ের অন্যান্য বিদ্বানেরা নিশ্চয়ই এই ধরনের আরো অনেক গ্রন্থের রচনা করেন, কিন্তু আজ সেগুলি পাওয়া যায় না।

এটা সম্ভব যে রাজসভা ছাড়াও গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলেও নৃত্য ও অভিনয় ছড়িয়ে পড়েছিল যার একটা সুন্দর বর্ণনা আমরা পাই জ্যোতিরীশ্বরে (১৩২৪ সালে)। কিন্তু নিশ্চিত রূপেই সাহিত্যিক এবং নাট্যচর্চার কেন্দ্র নেপালের শান্ত ও সুদূর রাজসভায় চলে গেছিল, বিশেষ করে ওইনিবার রাজবংশের (১৫২৭ খ্রি) নিঃশেষপর্বের পরে।

এই নাটকগুলির বা যে নির্দিষ্ট রূপে এগুলির মঞ্চায়ন হয় তার প্রকৃত আলোচনায় আসার আগে আমাদের তৎকালীন মিথিলার অভিনয়-মঞ্চ বিষয়ে কয়েকটা কথা বলা দরকার। অবশ্যই এখানে এবিষয়ে সবিস্তার আলোচনা সম্ভব নয়, কারণ বিভিন্ন কেন্দ্রের পেশাদার অভিনয়ের বিষয়ে কোনো ইতিহাস বা স্মৃতিকথা আজ পাওয়া যায় না। আমরা যা করতে পারি তা হলো কিছু তথ্য এবং ঐতিহ্য নিয়ে কথা বলতে পারি বিভিন্ন কেন্দ্রের, যেমন বাবুজন নায়কের নেতৃত্বে হাতি-র মঞ্চ নিয়ে, বা লগমায় অজবল ঝা-এর নেতৃত্বে যে দল ছিল তাদের নিয়ে, খুশীদাসের আলাপুরের দল নিয়ে কিংবা সরিসও, গন্‌হবারী বা শেরপুরায় উমাকান্ত ঝা-এর নেতৃত্বে যে গোষ্ঠী ছিল সে বিষয়ে।

মিথিলায় একদল অভিনেতা ছিলেন যাঁদের বলা হতো 'জমাতি'। এদের প্রধানকে বলা হতো নায়ক যিনি সূত্রধারের ভূমিকায় অভিনয় করতেন এবং মুখ্যপাত্রের (সাধারণত কৃষ্ণ বা হর) ভূমিকাতেও। এইসব দলে কোনো অভিনেত্রী ছিল না কিন্তু পুরুষেরাই স্ত্রীপাত্রের ভূমিকায় অভিনয় করতো। অভিনেতাদের জাতি ও উপজাতি নিয়ে এইসব কেন্দ্রে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হতো না। প্রকৃতপক্ষে, এইসব দলে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, চামার ও দুসাধের সমান স্থান ছিল।

নায়ক আহ্বায়ক রূপেও কাজ করতেন। যদিও অভিনেতারা তাঁদের অভিনয়ের জন্য মানদেয় গ্রহণ করতেন, তবু তাঁরা কখনোই তাঁদের জীবিকার জন্য শুধু অভিনয়ের ওপর নির্ভর করতেন না। বিবাহ, উপনয়ন, দুর্গোৎসব ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক এবং ধর্মীয় আচারে-অনুষ্ঠানে নায়কেরা বায়না পেতেন কীর্তনিয়া নাটকের অভিনয়ের জন্য। কখনো নায়কেরা দল নিয়ে রাজসভাতেও যেতেন— দুর্ভাগ্যবশত রাজদরবারে ঠিক

কিভাবে এবং কোন শৈলীতে এই নাটকগুলির অভিনয় হতো সে বিষয়ে লিখিত কিছু পাওয়া যায় না।

একজন অভিনেতার প্রধান গুণ ছিল 'মান', 'নচারী' কিংবা 'তিরহুতি' প্রভৃতি গাইতে পারা এবং নানান অঙ্গভঙ্গি ও মুদ্রায় পারদর্শিতা। কোনো চরিত্র বিশেষকে যখন তারা অনুকরণ করতো তখন যে তা খুব বাস্তবোচিত হতো তা নয়। মঞ্চসজ্জা বলতে প্রায় কিছুই ছিল না — তাই বেশির ভাগ বস্তু বা বর্ণনাকে ধরেই নেওয়া হতো সত্যি বলে অথবা কোনো গৃহীত ঐতিহ্য অনুসারে সেসব দর্শানো হতো।

মিথিলায় অনেক ধরনের অভিনেতা সে যুগে ছিলেন যাঁদের মধ্যে কীর্তনিয়া অভিনেতারা ছিলেন মাত্র অন্যতম গোষ্ঠী। এঁদের 'কীর্তনিয়া' বলা হতো কারণ এঁরা এঁদের নাট্যাভিনয়ের মধ্যে দিয়ে ভগবানের (কৃষ্ণের) কীর্তন করতেন। এই নামটির জনপ্রিয়তা নিশ্চয়ই অনেক পরের যুগে হয়েছিল; কারণ 'বর্ণরত্নাকরে' এর উল্লেখ করা হয়নি। মনে হয় 'উষাহরণ', 'পারিজাতহরণ', 'রুক্মিণীহরণ' এবং 'গৌরীস্বয়ম্বর' প্রভৃতি নাটকে যে কৃষ্ণ বা শিব-কাহিনীর ব্যবহার হতো তা থেকেই এই নামের সূত্রপাত। কেউ কেউ মনে করেন যে উমাপতি উপাধ্যায়ই মিথিলায় 'কীর্তনিয়া নাটকে'র প্রতিষ্ঠাতা এবং উনি কৃষ্ণের মূর্তির সামনে নিজেই গাইতেন ও নাচতেন। বাংলা ও অসমের 'যাত্রা' ও 'কীর্তন'-এর উদাহরণও হয়তো মধ্যযুগীন মিথিলায় নাটকের এই নামকরণের জন্য দায়ী ছিল।

কীর্তনিয়া নাটকগুলি রাত্রেও অভিনীত হতো। সূত্রধারেরা নান্দী পাঠের পরই মঞ্চে অবতীর্ণ হতেন। তাঁদের প্রচলিত পরিধেয় ছিল 'জামা', 'নীমা' এবং 'পায়জামা'। 'পাদুকা' নামক চটিজুতো পরে এঁরা মঞ্চে উঠতেন। সাধারণত একটা দোশালায় গা ঢেকে মাথায় পরতেন পুরানো আমলের 'ষাঠা পাগ' (যা ছিল মিথিলার জাতীয় পাগড়ির মতো — ষাট হাত লম্বা, যাতে মান বাড়ে)। হাতে থাকতো একটা ছড়ি যার নাম ছিল 'ফুলহথা' — সাধারণত সঙ্গে থাকতেন তাঁর স্ত্রী 'নটী'। আর এটা ছিল তাঁর দায়িত্ব এই নাটক, নাট্যকার এবং যে অনুষ্ঠান তার উপলক্ষ — সেসব বিষয়ে দর্শকদের পরিচয় দান করা। সাধারণত সূত্রধারেরা নিজের পাণ্ডিত্য ও নানা বিষয়ে অর্জিত জ্ঞানের প্রদর্শনের এই সুযোগ ছাড়তেন না।

কোনো কোনো দলের অভিনেতাদের সংখ্যা ছিল সীমিত। নাটকের পাত্রকে সাধারণত নাটকের গোড়াতেই একটা 'প্রবেশ গীত' দেওয়া হতো। নায়ক, নায়িকা, দু-তিনটে সখী ও নারদ (ঘটক বা মধ্যস্থ রূপে) এবং বিপটা (বা বিদূষক) — এই নিয়েই যে-কোনো কীর্তনিয়া দল গড়ে উঠতো। সংস্কৃত এবং (কখনো কখনো) প্রাকৃতই ব্যবহৃত হতো কোনো কোনো সংলাপে এবং মঞ্চ-নির্দেশে। এছাড়া বাকি সবকিছু দেশীয় ভাষার গান ও দোহার মাধ্যমে বলা হতো। এইসব নাটকে খুব কম দেশীয় ভাষার গদ্য ব্যবহৃত হতো। যদি এমন কেনো ঘটনা মঞ্চে দেখানোর দরকার হতো যার জন্য বিস্তৃত অভিনয় প্রদর্শনের প্রয়োজন ছিল— যেমন পার্বতীর তপস্যা, বা কোনো যুদ্ধের অংশবিশেষ— সাধারণত তার একটা বর্ণনা দিয়ে মঞ্চে একটা গান গাওয়া হতো।

নাটকের অভিনয়ার্থ কিছু মঞ্চ-প্রতিলিপি থাকতো অভিনেতারা যা কণ্ঠস্থ করে ফেলতেন। আমরা জানি না অতীতেও এখনকার মতোই রিহার্সাল হতো কিনা, কিন্তু আমরা এমন প্রমাণ পাচ্ছি যে বিদ্বজ্জনদের সামনে অভিনয়ের আগে কিছু জ্ঞানীজনদের সহায়তা নিয়ে অভিনেতাদের বিশেষ ভাবে তৈরি করা হতো। উদাহরণস্বরূপ, পরবর্তীকালে দেখছি হর্ষনাথ ঝা, গণনাথ ঝা, রঘুনন্দন দাস, যদুনন্দন ঝা ও কপিলেশ্বর ঝা কীর্তনিয়া নাটকের অভিনেতাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। যে বাজনদারেরা বাজাবেন তাঁদের কীর্তনের নারদীয় শৈলীতে বিশেষ তালিম দেওয়া হতো।

দর্শকদের মধ্যে অধিকাংশ থাকতেন শিক্ষিতজন, কিছু নিরক্ষর মানুষও থাকতেন। দু দলেরই সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল আনন্দলাভ করা। কণ্ঠসঙ্গীত এবং যন্ত্রসঙ্গীত ছাড়াও ছিল বিপটার (ভাঁড়) মজা, নায়িকার সুললিত গায়ন, গরুড়, ময়ূর তথা ঐরাবত প্রভৃতির জন্য যন্ত্র মঞ্চে নিয়ে আসা এবং দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য অভিনেতাদের 'প্রতীকী' মূকাভিনয়।

নাট্যকারগণ

এই ধরনের পরিবেশে অনেকগুলি মৈথিলী নাটক লিখিত ও অভিনীত হয়েছিল। এ বিষয়ে কোনো কালের সীমা বেঁধে দিলে এ নিয়ে আলোচনা করা কঠিন হবে। অতএব বর্তমান শতক পর্যন্ত লিখিত নাটক নিয়ে এখানে আলোচনা করা হলো।

১. গোবিন্দ

'নলচরিতনাট (ক)'[১] -রচয়িতা গোবিন্দ যিনি ওইনিবার-রাজ কংসনারায়ণের (১৫২৭ খ্রি) সভাকবি গোবিন্দ (ঠাকুর) এবং খাড়োরের রাজা সুন্দর ঠাকুরের সমসময়ের গোবিন্দদাস ঝা-এর থেকে পৃথক ব্যক্তি ছিলেন, ওঁর বংশলতিকার পরিচয় সম্পূর্ণ অন্য ধরনের ছিল। ওঁর তিনজন ভাই হলেন মহাদেব, বাসুদেব ও গোপাল এবং শ্রীকরের পৌত্র কবি রবিকরের পুত্র ছিলেন তিনি। এঁর প্রপিতামহ ছিলেন লক্ষ্মণদত্ত এবং তাঁর পিতামহ ছিলেন স্থিতিদত্ত যাঁর নিজের পিতামহ ছিলেন জীবদত্ত। এই বংশলতিকা পঞ্জীকারদের পাঁজিতে পাওয়া যায়। আমরা একথাও জানতে পারি যে ওঁর আরেকটি নাম ছিল কবি হোরয়ী। প্রপিতামহ লক্ষ্মণদত্তের বিবাহ হয়েছিল মহারাজা গণেশ্বরসিংহের (১৩৭০/১ খ্রি) কন্যার সঙ্গে— এই গণেশ্বরসিংহই ছিলেন মহারাজা কীর্তিসিংহের পিতা, যিনি বিদ্যাপতির সংরক্ষক ছিলেন। উনি সন্দহপুরের দীর্ঘঘোষ পরিবারের মানুষ ছিলেন এবং নিশ্চিতরূপে বিদ্যাপতি ঠাকুরের একজন কনিষ্ঠ উত্তরাধিকারী ছিলেন।

তাঁর গানের ভণিতা থেকে বোঝা যায় যে তাঁর সংরক্ষক ছিলেন জনৈক যাদব রায়,

১. এখনও অপ্রকাশিত।

রুক্মিণীদেবীর স্বামী। তবে ওঁর লেখা থেকে একথা স্পষ্ট বোঝা যায় না যে উনি নিজের পৃষ্ঠপোষকের কথা বলতে চাইছিলেন না ভগবান নারায়ণ বা কৃষ্ণের কথা। যাই হোক, এঁর পৃষ্ঠপোষকের বিষয়ে বর্তমানে বেশি কিছু জানা যায় না।

নাটকটির কথাবস্তু রাজা নলের আত্মগোপন বিষয়ক পরিচিত কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেছে। সংলাপ সংস্কৃত ও প্রাকৃতে লেখা কিন্তু বিদ্যাপতির মতোই গানগুলি সম্পূর্ণ মৈথিলীতে লেখা।

নাটকটিতে এমন কিছু হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য রয়েছে যেমন নল কর্তৃক পরিত্যক্তা দময়ন্তী অরণ্যে দুঃখে-ভয়ে ক্রন্দনরতা এবং রাজা নল যখন নিজের দ্যূত ক্রীড়ার দোষ নিয়ে অনুতাপ করছেন।

নাটকের শেষে এসে দেখা যাচ্ছে রাজা ও রানী নিজেদের গৃহে ফিরে এসেছেন।

২. রামদাস ঝা

আমরা 'আনন্দবিজয়নাটকে'র' লেখক রামদাস ঝা-কে ভালোভাবেই জানি। উনি কুজৌলীরার মখরৌনী নামক ব্রাহ্মণ পরিবারের সদস্য ছিলেন এবং বিদ্যাপতির বিখ্যাত উত্তরসূরি গোবিন্দদাস ঝা-র (যিনি মহারাজা সুন্দর ঠাকুরের সমসাময়িক ছিলেন— ১৬৪৪-৭১ -এর মধ্যে) চতুর্থ এবং কনিষ্ঠতম ভ্রাতা।

নাটকটির কাহিনী খুবই সহজ-সরল এবং এটি চার অঙ্কে বিভক্ত। প্রথম অঙ্কে দেখা যাচ্ছে নায়ক মাধব নিজের প্রেমিকার জন্য অধীর হয়ে উঠছেন। উনি নিজের বন্ধু আনন্দকন্দের কাছে রাধার সৌন্দর্য নিয়ে অনেক কথা শুনছেন।

মাধব এরপর ওঁর বন্ধুকে অনুরোধ করছেন রাধাকে দেখার জন্য ওঁকে সহায়তা করতে। দ্বিতীয় অঙ্কে রাধা নিজের দুই বান্ধবী বিচক্ষণা ও বিচলার সঙ্গে আনন্দকন্দের সঙ্গে দেখা করছেন। আনন্দকন্দ ওঁদের ফাঁকি দিচ্ছেন গুণনিধান নামক এক জ্যোতিষীর ভেক ধরে এবং ওঁদের বলছেন ভগবান শিবের পূজার জন্য পুষ্পচয়ন করতে। যখন মেয়েরা উদ্যানে পুষ্প-চয়নে রত মাধব ও আনন্দকন্দ সেখানে উপস্থিত হলেন এমন ভাবে যাতে কালিদাসের 'শকুন্তলম্' নাটকের ভ্রমর-কাহিনীর প্রসঙ্গের কথা মনে পড়ে। কিন্তু তাঁরা কোনো কথা বলার আগেই মাধব চলে যাচ্ছেন। এই অঙ্কে দেখা যাচ্ছে রাধার হৃদয়ে প্রেমের জন্ম হলো।

এরপর দেখা যাচ্ছে রাধা ভগবান শিবের আরাধনা করছেন সেইসব ফুলপাতা দিয়ে যা তারা দ্বিতীয় অঙ্কে উদ্যানের থেকে সংগ্রহ করেছেন। ভগবানের এই পূজায় সাড়া দেওয়ার কথা। এর পরই রাধাকে প্রেম-বিহ্বল অবস্থায় দেখা যাচ্ছে।

শেষ পর্বে দেখা যাচ্ছে একজন কাপালিক রাধাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন এবং তার প্রেমিকের জন্য বৃন্দাবনে অপেক্ষা করতে বলছেন।

---

১. এই নাটকটির দুটি একেবারে ভিন্ন পাঠ পাওয়া যায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত রূপে।

শেষ অঙ্কে নায়কেরও একই অবস্থার বর্ণনা রয়েছে।

অবশেষে বান্ধবীদের সাহায্যে রাধা মাধবের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সফল হয় এবং তারা পরস্পরের সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত হয়।

এই নাটকে কাহিনীর গ্রন্থনে বা মনঃস্থিতির বর্ণনায় কোথাও কোনো উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। কাহিনীতে অনেক শিথিলতা রয়েছে এবং তা খুবই সহজ-সরল ও সংক্ষিপ্ত। মনে হয় সম্পূর্ণ কাহিনীই নানান প্রেম-গীতির অবতারণার জন্য রচিত। আর যা খুবই দুর্ভাগ্যজনক তা হলো, বেশ কিছু গানেই বিদ্যাপতির ব্যর্থ অনুকরণের ছাপ রয়ে গেছে।

এই নাটকটির দুটি পাঠ আমরা পাই— রাজ প্রেস সংস্করণ এবং বৈশালী প্রেসের প্রকাশন [১]। প্রথমটিই মনে হয় মূল পাঠ, কিন্তু দ্বিতীয়টি দেখে মনে হয় এটি একটি মঞ্চায়ন-যোগ্য প্রতিলিপি মাত্র — সম্ভবত মূল লিখিত পাঠের সেইমাত্র অংশ যা কীর্তনিয়া নাটকের অভিনেতারা অভিনয়ের জন্য ব্যবহার করেছেন।

৩. দেবানন্দ

দেবানন্দ দক্ষিণ মিথিলার পর্বতপুরের অধিবাসী ছিলেন এবং সকরাঢ়ী পরিবারভুক্ত ছিলেন। ওঁর পিতা, রঘুনাথ, নিজের ভাইদের মধ্যে ছিলেন কনিষ্ঠতম (অন্যরা হলেন ভবানন্দ ও যদুনাথ) এবং ওঁর মা ছিলেন গুণবতী দেবী। রঘুনাথ মনে হয় নিজেও ছিলেন একজন কবি, কেন না ওঁর উপাধি ছিল 'কবীন্দ্র'। মহারাজা মহীনাথ ঠাকুর (১৬৭১-১৬৯৩ খ্রি.) এবং মহারাজা নরপতি ঠাকুর (১৬৯৩-১৭০৩/০৪ খ্রি.) দুজনেই এই পরিবারেই বিবাহ করেছিলেন। তাই এঁর সন-তারিখ সঠিক ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব ছিল। উনি লোচনের সমসাময়িক ছিলেন এবং সপ্তদশ শতকের শেষ ও অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে ওঁর জন্মকর্ম হয়।

ওঁর একমাত্র নাটক 'উষাহরণের' পাণ্ডুলিপিটি খুবই বিনষ্ট অবস্থায় পাওয়া যায়। এর প্রথম তিনটি পৃষ্ঠা ও শেষের কয়েকটি পৃষ্ঠা পাওয়া যায় না। যে অংশটি পাওয়া যায় তাতে দেখা যাচ্ছে সেই প্রক্রিয়ার প্রয়োগ যা প্রাচীন কীর্তনিয়া নাট্যকারেরা প্রায়ই করতেন — সংস্কৃত কাব্যপংক্তির পরই তার দেশীয় ভাষায় অনুকথন।

'উষাহরণের' গল্পটি খুবই পরিচিত এবং এই কাহিনীটি অনেক নাট্যকারই ব্যবহার করেছেন।

নাটকটির শেষে এসে অনিরুদ্ধ ও উষার মতো সুখী দম্পতির মধ্যে দিয়ে মনে হয় শেক্সপিয়রের 'টেম্পেস্ট' নাটকের মিরান্ডা ও ফার্ডিনান্ডকে খুঁজে পাচ্ছি। এই নাটকের শেষ ও এতে ব্যবহৃত প্রতীক খুবই সুখকর এবং চিত্তাকর্ষক।

১. রাজপ্রেস, দ্বারভাঙার সংস্করণটি মহেশ ঝা-র দ্বারা সম্পাদিত এবং বৈশালী প্রেস, কমলালয়, মুজফ্ফরপুরেরটি ভুবনেশ্বর সিংহ 'ভুবন' দ্বারা।

৪. উমাপতি উপাধ্যায়

মধ্যযুগের কীর্তনিয়া নাট্যকারদের মধ্যে সবচেয়ে প্রধান উমাপতি উপাধ্যায় মনে হয় তাঁর নাটকগুলির রচনা করেছিলেন অ-মৈথিলীভাষী কোনো রাজার সংরক্ষণে।

সাহিত্যের ইতিহাসের সম্পূর্ণ দুটি ভিন্ন পর্বে ওঁকে রাখা হয়েছে। তাই আমাদের জানতে হবে সঠিক কোন সময়ে ওঁর উদ্ভব হয়েছিল। ওঁর কাল নির্ধারণের আগে আমাদের কবি উমাপতির সঠিক পরিচয় জানতে হবে কারণ এই সময়ে একাধিক মানুষ ছিলেন এই একই নামের। সাবধানী মন নিয়ে সমস্ত প্রমাণ বিচার করে দেখলে দেখা যাবে যে উমাপতি উপাধ্যায়ের সঙ্গে শুধুমাত্র মৈথিলী নাটক 'পারিজাত-হরণে'র লেখক উমাপতিকে একাত্ম করে দেখা যায়, তিনি হলেন রত্নপতি উপাধ্যায় ও রত্নাবতীর সন্তান উমাপতি উপাধ্যায়, যিনি 'পদার্থীয় দিব্যচক্ষু' গ্রন্থের রচনা করেন। অন্যান্য প্রমাণ থেকে বোঝা যায় যে 'স্মৃতি-সারসংগ্রহ' এবং 'স্মৃতিদীপিকা'র লেখক উমাপতিও নিজের শেষনাম উপাধ্যায়ই লিখতেন সে সময়ের অন্য অনেক মৈথিলদের মতো। এগুলির পাণ্ডুলিপি লেখা হয় মিথিলাক্ষরে এবং মিথিলাতেই তা পাওয়া যায় এবং পরম্পরাগতভাবে এগুলিকে মৈথিলী গ্রন্থ বলেই নিঃসন্দেহে মেনে নেওয়া হয়। এও হতে পারে যে এই সবগুলির রচয়িতা একই উমাপতি উপাধ্যায়, যিনি নাট্যকার উমাপতি। কারণ এও জানা যায় যে কবি উমাপতি নিজের সময়ের বিখ্যাত ধর্মশাস্ত্রীও ছিলেন। এই ধারণার আরো সমর্থন পাওয়া যায় ওঁর নাটকে যেখানে কবিকে বলা হচ্ছে 'মহামহোপাধ্যায় কবি-পণ্ডিত-মুখ্য'।

উমাপতি নিজের সংরক্ষকের নাম দিয়েছেন 'হরিহরদেব হিন্দুপতি-যবনজয়ী' বলে নিজের নাটক 'পারিজাতহরণে'। গ্রিয়ারসন হরিহরদেব হিন্দুপতিকে মহান মৈথিল রাজা হরসিংহদেবের (১৩২৪ খ্রি.) সঙ্গে এক করে দেখেন — যিনি কর্ণাট বংশের রাজা ছিলেন। শ্রীযুক্ত বি. কে. চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিদ্যাপতির ওপর লেখা নিবন্ধে এই অভিমতকে সমর্থন করেন কারণ উনি বলেন যে রাজা হরসিংহদেবকেই 'হিন্দু পতি' বলা সম্ভব কারণ উনি হিন্দু সমাজের পুনর্গঠনের জন্য অনেক কাজ করেন এবং সত্যি মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হয়েছিলেন। ড. উমেশ মিশ্র একাধিক ভাষাতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন যে উমাপতি বিদ্যাপতির থেকে পূর্বের কবি। ড. মিশ্র উমাপতি ও বিদ্যাপতির মধ্যে ভাষা প্রয়োগ এবং চিন্তাধারাতেও মিল খুঁজে পাচ্ছেন। তবে এসবেরই অন্যরকম ও সহজতর ব্যাখ্যাও সম্ভব। এই তুলনায় শুধু একথাই প্রমাণিত হয় যে বিদ্যাপতি ছিলেন উমাপতির প্রিয় কবি এবং জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বহু পংক্তিতে তাঁর প্রিয় কবির ছাপ রয়ে গেছে আর বহুক্ষেত্রে তা বিদ্যাপতির থেকে সুন্দরতরও হয়েছে। 'পারিজাত-হরণে'র মধ্যে যে ভাষার প্রাচীনতা পরিলক্ষিত হয় তা থেকেও ঠিক কোনো তর্কের সমর্থনেই যুক্তি পাওয়া যায় না, কারণ এও সম্ভব যে কবি-মনীষী উমাপতি তা জ্ঞাতসারেই ইচ্ছা করেই করেছেন।

অন্যপক্ষে চেতনাথ ঝা এক দেশীয় পরম্পরা থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করে বলেছেন, উমাপতি ছিলেন মহামহোপাধ্যায় গোকুলনাথ উপাধ্যায়ের (১৬৮৫-১৭১৬ খ্রি.) বয়স্কতর সমসাময়িক বিদ্বান যিনি ওঁর শিক্ষকও ছিলেন। গোকুলনাথ ছিলেন মহারাজ রাঘবসিংহের (১৭০৪-১৭৪০ খ্রি.) সমকালীন মানুষ। এই ঐতিহ্য যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে বলা যায় যে উমাপতি ছিলেন জনৈক হরিহরদেব হিন্দুপতির সভা-কবি, এবং এই হরিহরদেব ছিলেন নেপালের সপ্তরী পরগনার মকমানী নামক স্থানের ছোট-খাটো রাজা (এটি হলো প্রাচীন ভপটিয়াহী নামক নর্থ-ইস্টার্ন রেলের স্টেশনের কাছে)। অতএব, এ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে উমাপতি জীবিত ছিলেন মহারাজ নরপতি ঠাকুরের (১৬৯২/৩-১৭০৩/৪ খ্রি.) ও মহারাজা রাঘবসিংহের আমলের। এই সংরক্ষক রাজার লেখা একটা পুরাতন কবিতা 'মিথিলা-মিহিরের' মিথিলাঙ্কে উদ্ধৃত হয়েছিল। পণ্ডিত রমানাথ ঝা-ও এই অভিমতের সমর্থন করেন। উনি এও দেখান যে এই নাটকে দুটি প্রশংসাসূচক পদ্য রয়েছে — একটি হরিহরদেব হিন্দুপতির উদ্দেশে এবং অন্যটি মিথিলার রাজার প্রতি।

গ্রিয়ারসন এই দ্বিতীয়োক্ত অভিমতকে নাকচ করে দেন। ওঁর মূল যুক্তি হলো :

> মিথিলার একজন কবি কিভাবে এই ক্ষুদ্র রাজ্যর অধিশাসীকে 'অন্য সমস্ত রাজার অধিরাজ' কিংবা 'মিথিলার রাজা' বলে অভিহিত করতে পারেন? এই ধরনের বর্ণনার সঙ্গে নরপতি বা রাঘবেরই বেশি মিল পাওয়া যায়। এবং গোকুলনাথ বিষয়ক পংক্তিগুলি থেকেও প্রমাণিত হয় যে উমাপতি নিশ্চিত রূপেই দ্বারভাঙার রাজাকে চিনতেন। প্রকৃতপক্ষে, দেখা যাচ্ছে উনি পণ্ডিতদের একটা মহাসভায় দ্বারভাঙায় যাচ্ছিলেন এমন সময়ে বন্যা এসে ওঁর বাধা হয়ে দাঁড়ায়।
>
> আবার এই রাজা কী করেই বা মুসলমান-বিজয়ী হতে পারেন? যদি কখনো মুসলমান শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ হয়েই থাকে তো তা নরপতি বা রাঘবসিংহের সঙ্গেই হওয়া সম্ভব, নেপালের কোনো স্থানীয় শাসকের সঙ্গে নয়। অথচ রাঘবসিংহের বিষয়ে আমরা জানি যে উনি তিরহুত সরকারের কুর্কররী-পাট্টা গ্রহণ করেছিলেন বাৎসরিক এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে আলীবর্দী খানের থেকে যিনি তখন রাজমহলের ফৌজদার ছিলেন।

মনে হয় গ্রিয়ারসন সেইসব পংক্তিগুলিকে গুলিয়ে ফেলেছিলেন একে অন্যের সঙ্গে যেখানে উমাপতি 'মিথিলার রাজা' এবং 'হরিহরদেব, অন্য সব রাজাদের অধিরাজ' কথাগুলি ব্যবহার করেছিলেন তদুপরি এটা ভুলে যাওয়া হচ্ছে যে ১৩২৪ খ্রিষ্টাব্দে হরসিংহদেব হয়তো মুসলিম আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছিলেন কোনো কোনো বর্ণনায়, কিন্তু একথারও প্রমাণ রয়েছে যে ওঁকে শেষ পর্যন্ত মিথিলা ছেড়ে নেপালে চলে যেতে হয়েছিল মুসলমানদের হাতে পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে! অতএব ওঁক 'যবন-বিজয়ী' আদৌ বলা যেতে পারে না। তবে গ্রিয়ারসনের এই যুক্তি অত্যন্ত বলশালী যে মকমনীর একজন রাজড়া সেইসব বর্ণনার উপযুক্ত হতেই পারেন না যা উমাপতি কর্তৃক

হরহরদেব হিন্দুপতির উদ্দেশে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া আমরা এও জানি যে ঐ সময়ে মকমনীর রাজপদে আসীন ছিলেন ভূপসিংহ, হিন্দুপতি নয়।

এই সমস্যার সমাধান তখনই পাওয়া যাবে যখন আমরা হিন্দুপতি নামক একজন রাজাকে পাবো যিনি বিদ্বান ও কবিদের সংরক্ষক ছিলেন, আর যাঁর বিষয়ে এইসব বিশেষণ প্রযোজ্য।

প্রকৃতপক্ষে মধ্যভারতে গার্‌হা মণ্ডলের (বুন্দেলখণ্ড) রাজা হিন্দুপতি ছিলেন মহারাজা নরপতি ঠাকুর এবং মহারাজা রাঘবসিংহের প্রায় সমসাময়িক। এই হিন্দুপতি ছিলেন সুবিখ্যাত হিন্দু রাজা ছত্রশালের সমুচিত খ্যাতনামা পুত্র হৃদয়শাহের প্রপৌত্র। মধ্যযুগে বেশ কিছু মৈথিল বিদ্বান ও কবিরা বুন্দেলখণ্ডের দরবারে যেতেন। এই প্রসঙ্গে 'পারিজাতহরণে'র ভণিতায় উমাপতির নামের আগে 'গুরু' কথাটির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য কারণ উনি নিশ্চয়ই হিন্দুপতির রাজগুরু ছিলেন। এছাড়া আমরা লং সংবত ৫৭৭-এ (১৬৯৬ খ্রি.) অনুলিখিত উমাপতির দ্বারা নকল করা একটি হেমাঙ্গদ ঠাকুরের পাণ্ডুলিপি পাই যা এই প্রসঙ্গে এইজন্য গুরুত্বপূর্ণ যে এর থেকে প্রমাণিত হচ্ছে মহারাজা মহেশ ঠাকুর, হেমাঙ্গদ ঠাকুর ও অন্যান্যদের সঙ্গে উমাপতি বুন্দেলখণ্ডে গিয়েছিলেন। উমাপতির সংরক্ষকের এই নতুন শনাক্তকরণকে সমর্থন করে এই প্রমাণও যে উমাপতির কবিতায় লোচনের 'রাগতরঙ্গিণী'র কোনো উল্লেখও পাওয়া যায় না — অথচ উমাপতি লোচনের পরবর্তীকালের কবি ছিলেন কিন্তু তিনি দূর দেশে বসে জীবনের প্রারম্ভে নাট্যরচনা করেছিলেন।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, উমাপতি ছিলেন ম. ম. গোকুলনাথ উপাধ্যায়ের চেয়ে বেশি প্রাচীন অথচ সমসাময়িক কবি যিনি মহারাজ নরপতি ঠাকুর এবং মহারাজ রাঘবসিংহের রাজত্বের কালে জীবিত ছিলেন ও বুন্দেলখণ্ডের রাজা হিন্দুপতির সংরক্ষণে নাটক রচনা করেন।

'পারিজাতহরণ'[১] হলো কবির একমাত্র প্রমাণিত নাট্যরচনা। নাটকটির বিষয় নেওয়া হয়েছে 'হরিবংশে'র ১২৪-১৩৫ তম অধ্যায়ের ওপর, যদিও 'বিষ্ণুপুরাণ' (অধ্যায় ৫, কাব্য পংক্তি ৩০-৩১) এবং 'শ্রীমদ্ভাগবত' (অধ্যায় ১০, কাব্য পংক্তি ৫৯) থেকেও কিছু কিছু নেওয়া হয়েছে। কবি 'হরিবংশ'-র গল্পে যেটুকু পরিবর্তন করেছেন তা হলো কৃষ্ণ প্রদ্যুম্নের বদলে অর্জুনকে সঙ্গে নিয়েছেন ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

এর কাহিনী এইরকম : নারদ কৃষ্ণকে একটা পারিজাত ফুল উপহার দিলেন যা উনি দিয়ে দিলেন রুক্মিণীকে — যিনি ছিলেন বড়োরানী ও যুবরাজ প্রদ্যুম্নের মা। তাঁর অন্য রানী সত্যভামা এতে খুবই অপ্রসন্ন হলেন এবং ততক্ষণ অবধি তাঁর মানভঞ্জন হলো না যতক্ষণ না কৃষ্ণ প্রতিশ্রুতি দিলেন যে একটি পারিজাত ফুলই নয়, ইন্দ্রের উদ্যান থেকে আস্ত পারিজাত গাছই নিয়ে এসে ওঁকে দেবেন। প্রথমে কৃষ্ণ এজন্য স্বর্গে দূত পাঠালেন

১. 'জার্নাল অফ বিহার অ্যান্ড ওড়িশা রিসার্চ সোসাইটি' খণ্ড ৩-এ প্রকাশিত।

কিন্তু সেই দূত ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো। তারপর উনি ইন্দ্রকে আক্রমণ করে গাছটি এনে সত্যভামাকে উপহার দিলেন যা উনি নিজের আঙিনায় রোপণ করলেন। এবার নারদ আবির্ভূত হয়ে বললেন যে যদি নিজের প্রিয়তম সম্পত্তি দান করে দেওয়া যায় তো এই বৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়িয়ে এতে একটা অমৃত ফল পাওয়া যাবে। তখন সত্যভামা কৃষ্ণকে দিয়ে দিলেন ও সুভদ্রা অর্জুনকে নিজেদের প্রিয়তম বস্তু রূপে। এভাবে কৃষ্ণ ও অর্জুন হয়ে গেলেন নারদের দাস এবং নারদ তখন দুজন দাসকে বিক্রয়ের জন্য নিয়ে গেলেন। তখন সত্যভামা ও সুভদ্রা তাঁদের পতিদেবতাদের পুনরায় ক্রয় করলেন একটি করে গাভীর বিনিময়ে এবং এভাবে হাস্য পরিহাসের মধ্যে দিয়ে নাটকটি শেষ হলো।

মৈথিলীর এই নাটকটি 'নিয়মিত' নাট্যকৃতিগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সাহিত্যিক গুণ এবং পাঠযোগ্যতা — দুই দিক থেকেই এটি উল্লেখযোগ্য। নাটকটির পরিকল্পনা বেশ সুচিন্তিত; প্রত্যেকটি ঘটনা অন্যটির সঙ্গে সুগ্রথিত — একটার থেকে অন্যটা বেরিয়ে আসছে। চরিত্রচিত্রণে বেশ দক্ষতা দেখা যায় — যার সঙ্গে নাটকটির কাঠামো রয়েছে জড়িত। সত্যভামা ও রুক্মিণীর মধ্যের বৈপরীত্য বেশ সুচারু রূপে দেখানো হয়েছে; আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে এদের মধ্যে কোনজন কৃষ্ণের অধিকতর প্রিয়, যদিও অন্য জনের কৃষ্ণের উপর অধিকতর অধিকার থাকার কথা। অর্জুনের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই নাটকের প্রাণ হলো নারদ-চরিত্র। যা কিছু ঘটনা ঘটছে তার মূলেও নারদ এবং পরিণতির পেছনেও রয়েছে নারদেরই হাত। অথচ নারদের উপস্থিতির জন্যই ইন্দ্র ও কৃষ্ণের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় এবং নারদের হস্তক্ষেপেব ফলেই সত্যভামা ও রুক্মিণীর মধ্যে ঝগড়ার সৃষ্টি হয়। এই বর্ণনা আমাদের কল্পনাকে আরো উজ্জীবিত করে এবং এর ফলে দর্শকদের পারিপার্শ্বিব দৃশ্যাবলীর অভাব অনুভূত হয় না।

এই নাটকে স্পষ্টতই ছক ও চরিত্র-চিত্রণের ওপরেই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। নেপালে রচিত নাটক ও সে যুগের অন্যান্য মৈথিলী নাটকগুলির দুর্বল কাঠামোর তুলনায় এই নাটকটি তাই ছিল অনেক এগিয়ে। বিষয়বস্তুর সঙ্গে কৃষ্ণের যোগ রয়েছে তবে সেই এক চিরাচরিত কৃষ্ণ ও গোপীগণের কাহিনী এতে স্থান পায়নি। এতে অন্যগুলির তুলনায় দেখার উৎসাহকে বেশ সুন্দরভাবে জিইয়ে রাখা হয়েছে এবং গঠনেও রয়েছে বিরল সুঠামতা।

হাস্যরসই নাটকটির প্রধান রস। কাহিনীর মূল অংশেও এটা স্পষ্ট এবং অন্যত্রও তা বোঝা যায়। বিশেষ করে প্রথম অঙ্কে নারদের কলহময় চরিত্র এবং সুমুখীর দুর্বল ভীরু চরিত্র থাকার ফলে বেশ কিছু মজার সংলাপ এখানে পাওয়া গেছে।

এই নাটকের গানগুলি পুরোপুরি মৈথিলীতে লেখা, কিন্তু সংস্কৃত কবিতা ও প্রাকৃত গদ্যাংশও এখানে রয়েছে। সংস্কৃত কাব্যাংশগুলিকে আরো বিস্তারে এনে ও অনুবাদ করে গানের মাধ্যমে দেশীয় ভাষায় (অর্থাৎ, মৈথিলীতে) ধরে রাখা হয়েছে। নাটকটিতে বীররসেরও প্রাধান্য আছে যা বুন্দেলরাজের রাজসভার জন্য রচিত নাটিকার পক্ষে খুবই

উপযুক্ত। প্রথমাংশে আশীর্বচনের পংক্তি কটি থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে এখানে শক্তির আরাধনা করা হয়েছে — যা থেকে দেখা যাচ্ছে এখানে একটা বীররসাত্মক বাগ্‌ব্যবহার করা হয়েছে।

এখানে উপমাগুলি খুবই সুন্দরভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং অনেকাংশে এগুলি একেবারে তরতাজা ও নতুন এবং ঘটনার সংঘটনেও এগুলি খুব সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ নেওয়া যেতে পারে দ্বিতীয় গানে শিবের বিবাহ প্রসঙ্গটি যা অত্যন্ত মার্জিত ও সুরুচিপূর্ণ শৈলীতে বর্ণিত হয়েছে। তবে বহু অংশেই ইনি বিদ্যাপতির অনুগমন করছেন বা অনুরণন করছেন বলেই মনে হচ্ছে, যদিও তাতে উনি অন্য কবি-নাট্যকারদের তুলনায় অনেক এগিয়ে আছেন। খুবই চিত্তাকর্ষক এবং আভিজাত্যপূর্ণ ভঙ্গিতে এই নাটকটির কাব্যছন্দ শুধু বিদ্যাপতির সঙ্গে তুলনাতেই কিছুটা খাটো, কিন্তু এইসব দিক দিয়ে ইনি গোবিন্দদাসের থেকে অনেকটা ওপরে।

উমাপতির মান-গীতি গাইতে গেলে অত্যন্ত উচ্চমানের দক্ষতা দরকার এবং তাঁদের পক্ষেই মৈথিলী নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে উমাপতির স্থানকে সঠিক ভাবে বোঝা সম্ভব।

৫. রমাপতি উপাধ্যায়

উমাপতির মতোই রমাপতিরও "নিয়মিত" মৈথিলী কীর্তনিয়া নাটকের একটা শৈলী নির্মাণে প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। এঁর বিষয়ে উমাপতির কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি তথ্য পাওয়া যায়। উনি বৎসগোত্রের পালবার-মহিষীর পরিবারস্থ ছিলেন। ওঁর বাবা ছিলেন কবি কৃষ্ণপতি ঝা। মা ছিলেন সোদরপুরের সরসবপাহীর বিখ্যাত বিদ্বান অযাচী মিশ্রের পরিবারে জাত। ওঁর বিবাহ হয় ঠাকুরসিংহের কন্যার সঙ্গে— যিনি নিজে মহারাজ নরপতি ঠাকুরের পুত্র ছিলেন।

এঁরও একটিই নাটক 'রুক্মিণীপরিণয়' [১] (যা 'রুক্মিণীহরণ' অথবা 'রুক্মিণীস্বয়ম্বর' নামেও প্রসিদ্ধ) রচিত ও অভিনীত হয়েছিল মহারাজ নরেন্দ্র সিংহের (১৭৪৪-১৭৬১) পৃষ্ঠপোষকতায়। প্রথমে এটি গোপন ও পবিত্র নদী কমলায় মহারাজা নরেন্দ্রসিংহের স্থান-অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপস্থিত পণ্ডিত-মণ্ডলীকে পড়ে শোনানো হয়েছিল। গল্পটি 'হরিবংশে'র ৪৭ ও ৬৯ পর্ব এবং শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার (স্কন্ধ দশ, অধ্যায় ৫২-৫৪) থেকে নেওয়া, তবে লেখক মূলত প্রথম সূত্রটিকেই বেশি জোর দিয়েছেন।

নাটকটি ছয় অঙ্কেবিভক্ত এবং সংস্কৃতনাটকের নাট্য শৈলী অনুযায়ী 'নিয়মিত' কীর্তনিয়া নাটক-রূপেই লেখা। এর মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতের ব্যবহারও। 'প্রবেশ-গীতি', 'সংলাপ-গীতি', কীর্তনের ভাব (ঈশ্বরের বন্দনা রূপে) — এইসবও কীর্তনিয়া নাটকের মতোই। প্রথম অঙ্কেই রাজা ভীষ্মককে দেখা যাচ্ছে রানীর সঙ্গে আলোচনা করতে যে ওঁদের কন্যা

১. অখিল ভারতীয় মৈথিলী সাহিত্য সমিতি, ১ স্যার পি. সি. ব্যানার্জী রোড, এলাহাবাদ ২ থেকে প্রকাশিত।

রুক্মিণীকে কার সঙ্গে পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ করা যায় এবং শেষে ঠিক করছেন একটি স্বয়ম্বর-সভার আয়োজন করবেন। পরবর্তী অঙ্কে দেখা যাচ্ছে যুবরাজ রুক্মি ভগ্নীর বিবাহের যোগ্য পাত্র-রূপে চেদীরাজ শিশুপালকে সমর্থন করছেন। এর পর রাজা ঘটকদের ডেকে পাঠান যাঁরা শিশুপালের যোগ্যতা নিয়েই কথা বলল বিশেষ করে কৃষ্ণের তুলনায় এবং সব শেষে রাজা সিদ্ধান্ত নেন স্বয়ম্বর সভা না করেই কন্যার বিবাহ স্থির করে ফেলতে।

রাজা তখন রুক্মিণীর সম্ভাব্য পতিরূপে কৃষ্ণের দোষ-গুণ নিয়ে বিচার শুরু করেন। রুক্মী কৃষ্ণকে গোপিনীদের সঙ্গে অবৈধ সম্বন্ধ স্থাপনের দোষে দোষী ঠাওরায় এবং নিজের মামা কংসের হত্যার জন্য ওকেই দায়ী মনে করে। রাজা একথার সঙ্গে সম্মত হন না এবং উনি সেইসব যুক্তি দেন কৃষ্ণের স্বপক্ষে যা নাটকে বলা সম্ভব।

এই স্থানে এসে কবি দার্শনিক দৃষ্টি থেকে কৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক প্রচলিত ভুল ধারণাগুলিকে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন।

এদিকে যুবরাজ রুক্মী রাজপ্রাসাদ ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি দিয়েছেন যেহেতু রাজা কৃষ্ণকে নিজের জামাতা রূপে মেনে নিতে চান। অতএব স্বয়ম্বরই হবে বলে স্থির হয়। যখন দূতকে নির্দেশ দেওয়া হয় সমস্ত প্রদেশের রাজকুমারদের স্বয়ম্বরে আসার জন্য তখন আমরা মিথিলার উল্লেখও পাই যাতে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে ভারতের ভূগোলের একটা আন্দাজ পাওয়া যায়।

তৃতীয় অঙ্কে দর্শকদের সামনে সর্বপ্রথম কৃষ্ণকে আনা হয়। ভীষ্মকের দূত এসে রুক্মিণীর স্বয়ম্বরের জন্য তাঁর প্রতি নিমন্ত্রণ-পত্র প্রদান করেন এবং রুক্মিণীর সৌন্দর্যেরও একটা পরিচয় তাঁকে দেন।

রমাপতি নিশ্চিত বুঝতে পেরেছিলেন যে এর পর সসৈন্য কৃষ্ণের রুক্মিণীর স্বয়ম্বরে যোগদানের জন্য প্রস্থানের সঙ্গে তাঁর পৃষ্ঠপোষক মহারাজ নরেন্দ্রসিংহের মতো বীর যোদ্ধার সাহসিকতার মিল আছে।

কৃষ্ণ ভীষ্মককে এই স্বয়ম্বর সভার আয়োজনের অনুপযোগিতা বিষয়ে বোঝাতে সমর্থ হন এবং নিজের দৈবী শক্তির বিষয়ে ওঁকে বোঝাতে সমর্থ হন।

পঞ্চম অঙ্কে কৃষ্ণকে দেখানো হচ্ছে নানান কূট চাল চালছেন। উনি ভীষ্মককে বলছেন রুক্মিণীকে শিশুপালের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিতে। যখন একথা রুক্মিণীর কানে যায় তিনি অসম্ভব অসুখী হয়ে পড়েন। এই সময়ে নারদ দেখা দেন এবং দেখা যাচ্ছে উনি তাঁকে কৃষ্ণের প্রেমের সন্দেশ দেওয়ার কাজ করছেন। উনি কৃষ্ণের আগের সিদ্ধান্তকে অযৌক্তিক বলে বোঝান এবং বলেন যখন রুক্মিণী গৌরীপূজা করতে যাবেন তখনি যেন কৃষ্ণ তাঁকে নিয়ে পালিয়ে যান। এখানে ষষ্ঠ অঙ্ক শেষ হয়।

এই নাটকের চূড়ান্ত পরিণতিতে দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণ নারদের উপদেশ শুনছেন এবং রুক্মিণী-হরণ করছেন।

যুবরাজ রুক্মী এটা সহ্য করতে না পেরে কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। সংস্কৃত

নাট্যশৈলীর মতো এই যুদ্ধ মঞ্চে দেখানো হয় না, কিন্তু শুধুমাত্র বর্ণিত হয়। নারদ এই সময়ে কোরাসে যোগ দেন এবং যুদ্ধের দৃশ্যের সুষ্ঠু বর্ণনা দেন।

শেষে কৃষ্ণকে দেখানো হচ্ছে যে উনি রুক্মিণীকে স্বগৃহে নিয়ে যেতে পেরেছেন এবং শাস্ত্রমতে বিবাহ করেছেন। রমাপতি উপাধ্যায় নিজের কবি-শক্তির সম্যক পরিচয় এখানে দিতে পেরেছেন যার ফলে 'চুমাওন'(আশীর্বাদ), 'কোহবর' (মধুচন্দ্রিমা), 'বটগমনী', 'মান' প্রভৃতি সব কিছুই এই নাটকে দেখানো সম্ভব হয়।

সম্পূর্ণ নাটক থেকেই, মনে হয় একটা ধারণা হয় যে একজন ভক্ত কীর্তনের রচনা করছেন। এটা এই নাটকের ভণিতা থেকেই বোঝা যাচ্ছে এবং ভীষ্ককের দ্বারিকাধীশের প্রতি নিঃশব্দ অথচ ক্রমাগত ভক্তি থেকেও বোঝা যাচ্ছে। এখানেও সমানে কৃষ্ণের অতিমানব চরিত্র বিষয়ে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

এই নাটকে কাল ও স্থানের সমিতির বিষয়ে আদৌ চিন্তা করা হয়নি। দৃশ্যগুলি খুব তীব্র বেগে শুরু ও শেষ হয়ে যায়; দ্বারিকা থেকে কুণ্ডিনাপুর ও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রাজপ্রাসাদে দৃশ্যান্তর ঘটতে থাকে খুব শিগগিরি। অনেকগুলি পাত্র মঞ্চে আসে কিন্তু মাত্র তিনটি চরিত্রই প্রাধান্য পায়: শান্ত ও বৃদ্ধ রাজা ভীষ্মক যিনি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না ; অদম্য ও সমানরূপে প্রাণবন্ত রুক্মী যিনি পরাজয়কেও বীরের মতোই স্বীকার করেন তাঁর কাছে যাঁর প্রতি তাঁর মনে কোনো শ্রদ্ধা নেই ; এবং নারদ যিনি দূত রূপে মধ্যস্থতা করেন, বিদূষকের ভূমিকায় অভিনয় করেন এবং 'ঝগড়ার দেবতা' রূপেও দেখা দেন। মৈথিলী গানগুলি সবই বিদ্যাপতির ঐতিহ্যে লেখা— সব কটিই পরম্পরাগত ও সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন।

সব মিলিয়ে রমাপতির নাটকটি কীর্তনিয়া নাট্য-ঐতিহ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

৬. লাল কবি

লালকবি নিজের নাটক 'গৌরীস্বয়ম্বরে'[১] নিজের বিষয়ে কিছুই বলেন না। কথিত আছে উনি মহারাজা নরেন্দ্রসিংহের (১৭৪৪-১৭৬১ খ্রি.) রাজসভায় ছিলেন। আমরা একজন লালকবিকে জানি যিনি মহারাজা নরেন্দ্রসিংহের বিজয় নিয়ে সুন্দর গীতিকাব্য রচনা করেছিলেন হিন্দিতে। এটা স্পষ্ট নয় যে দুজনই একই লোক কি না। কিন্তু যাতে আশ্চর্য লাগে তা হলো এই যে এই নাটকের ভণিতায় কোথাও নাট্যকার সংরক্ষকের নামও দেন নি। হতে পারে শুধুমাত্র ভগবান শিবের আরাধনার জন্য উনি এই কীর্তন ভক্তিভাবনা থেকে রচনা করেন — যা উনি নিজের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেন — উনি কোনো রাজা রাজড়ার আনন্দ বিধানের জন্য এই কৃতি লেখেন নি।

এই নাটকে লাল কবি সংস্কৃত নাটকের কাঠামোকে বাদ দিয়েছেন— সংস্কৃত ও প্রাকৃতের ব্যবহারও হয়েছে খুব অল্প। শুধু মঞ্চসজ্জা-বিষয়ক নির্দেশ এবং অভিনয় নির্দেশের জন্যই

১. অখিল ভারতীয় মৈথিলী সাহিত্য সমিতি, এলাহাবাদ ২ কর্তৃক প্রকাশিত।

এদুটি ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এ থেকে মনে হয় এই সময়ে এসে দেশীয় ভাষার কীর্তনিয়া নাটক সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয়েছিল। এটাকে হয় 'মঞ্চায়ন-যোগ্য প্রতিলিপি' রূপে মেনে নিতে হয় অথবা স্বাভাবিক পূর্ণাঙ্গ কীর্তনিয়া নাটক বা অনিয়মিত কীর্তনিয়ার উদাহরণ হিসেবে মেনে নিতে হয়। গদ্য অবশ্য দেশীয় ভাষায় দেখা যায় না এই নাটকে— কারণ সম্ভবত গদ্যভাষা সামান্যজনের ভাষার এতো কাছাকাছি ছিল যে কোনো সাহিত্যিক বা ভক্তিমূলক রচনায় তার পক্ষে স্থান করে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তদুপরি ঈশ্বরের কীর্তনের (আরাধনার) ভাষাকে হতে হবে সঙ্গীতময়— কোনো না কোনো রাগ-রাগিণীর সঙ্গে যুক্ত— এমন মনে করা হতো।

'গৌরীস্বয়ম্বর' ঠিক অঙ্কে বিভক্ত নাটক নয়, এটা ছিল প্রায় একাঙ্ক নাটকের মতো

যাতে মূল কাহিনী ছিল ভগবান শিবের সঙ্গে গৌরীর বিবাহ। এখানেও এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে মিথিলার কীর্তনিয়া নাটক শুধুমাত্র কৃষ্ণভক্তিতেই আবদ্ধ ছিল না। এই দিক থেকে এই নাটকটির তুলনা সহজেই করা যেতে পারে অসমের অঙ্কিয়া নাট ও বাংলার যাত্রার সঙ্গে।

এই নাটকে শিবের পার্বতীকে বিবাহের কাহিনী দর্শিত হয় ধাপে ধাপে। এটা মৈথিলী নাটকগুলির মধ্যে সংক্ষিপ্ততম এবং সরলতম। মনে হয় কৃষ্ণ-বিষয়ক উমাপতির নাটক এবং শিব-বিষয়ক এই নাটকটিই জনপ্রিয় কীর্তনিয়া নাটকের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে।

৭. নন্দীপতি

উমাপতি ও লালদাস ছাড়া ত্রয়ীর অন্যতম হলেন নন্দীপতি ; এই ত্রয়ীই কীর্তনিয়া নাটককে মহান ও জনপ্রিয় করে তুলতে পেরেছিলেন। আমরা সঠিক সন-তারিখ জানতে পারি না যে নন্দীপতি কোন সময়ে জীবিত ছিলেন। কিন্তু আমরা ওঁর কালের একটা আন্দাজ পাই উনি নিজের পরিবার ও পূর্বজদের বিষয়ে ওঁর একমাত্র নাটকে— 'শ্রীকৃষ্ণকেলিমালা'য় [১] যা বলেন তা থেকে। বড়িয়ামের পুঙ্গোলী পরিবারে ওঁর জন্ম হয়। ওঁর প্রাচীনতম পূর্বপুরুষ — ওঁর যতটুকু জানা ছিল সেই অনুসারে— ছিলেন সিদ্ধ শিবদত্ত ঝা। সুধাপতি ঝা-র পুত্র রঘুপতি ঝা-র ছিল চার পুত্র — গঙ্গাধর, জয়রাম, হরিপতি এবং সুকবি কৃষ্ণপতি। এঁদের মধ্যে একজন, হরিপতি, ছিলেন যেন হরিরই এক অবতার বিশেষ এবং তিনি সেই 'শ্রদ্ধেয় ঠাকুরের'ই শিষ্য ছিলেন যাঁর শিষ্য পণ্ডিত গোকুলনাথ ঝা-ও (উপাধ্যায়) ছিলেন। এ থেকে ওঁর সময় নির্ণয় করা এবং ওঁর পরিচিতি দেওয়া সম্ভব। ম. ম. গোকুলনাথ উপাধ্যায় (১৬৮০-১৭১৬ খ্রি.) ছিলেন ম. ম. পীতাম্বর শর্মা 'বিদ্যানিধি'র (১৬৮০ খ্রি.) তৃতীয় পুত্রও বটে, শিষ্যও বটে। বিদ্যানিধিকে

১. অখিল ভারতীয় মৈথিলী সাহিত্য সমিতি, এলাহাবাদ দ্বারা প্রকাশিত। এছাড়াও ড. রামদেব ঝা-র 'নন্দীপতি গীতমালা' দ্রষ্টব্য, যা দ্বারভাঙা থেকে প্রকাশিত।

অবশ্য কখনো 'ঠাকুর' বলে অভিহিত করা হয়নি কিন্তু উনি ছিলেন একজন মহান শিক্ষক ও মাধ্যন্দিনদের গুরু।

নন্দীপতি হলেন কৃষ্ণপতির তৃতীয় সন্তান যিনি নিজেও ছিলেন কবি। কৃষ্ণপতিকে আমরা কোনো পরিচিত কবিরূপে জানি না। তবে একথা নিশ্চিত যে বাবার কাব্য-প্রতিভা ছেলেকে অনুপ্রেরিত করে। এখানে এও উল্লেখযোগ্য যে ওঁর কনিষ্ঠতম ভাই লক্ষ্মীপতি ঝা ছিলেন শিবের একজন গুরুত্বপূর্ণ ভক্ত।

নন্দীপতি এই নাটকের প্রতিটি অঙ্কের শেষে বলেন যে তাঁর বারোটা নাম ছিল। আমরা জানি না এই বারোটি নাম কী। 'বাদরি' ও 'কলানিধি' পঞ্জী থেকে দেখা যাচ্ছে যে 'বাদরি' ছিল ওঁর ছদ্মনাম।

নন্দীপতিও নিজের সংরক্ষকের নাম নেন না নিজের কোনো গানে। কিন্তু অন্যান্য প্রমাণ থেকে জানা যায়, বিশেষ করে ঐতিহ্য থেকে, যে মহারাজ মাধবসিংহের (১৭৭৬-১৮০৮ খ্রি.) সমসাময়িক ছিলেন। তাঁর ভাষা ও শৈলী থেকে আমরা মনবোধের 'কৃষ্ণজন্মের' প্রভাব দেখতে পাই ; মনবোধের মৃত্যু হয়েছিল ১৭৮৮ সনে।

'শ্রীকৃষ্ণকেলিমালা' নাটক আরম্ভ হচ্ছে ভগবান কৃষ্ণের বন্দনা-গীতি দিয়ে যা দীর্ঘ গদ্যে লেখা। এই কৃষ্ণ-ভক্তির উচ্ছ্বাসই নাটকটির প্রধান উপজীব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নন্দীপতিই মনে হয় শুরু করেছিলেন নাটকের গোড়াতেই সমস্ত পাত্র-পাত্রীর নাম একটি গীতের মাধ্যমে দর্শকবৃন্দকে জানিয়ে দেওয়ার প্রথা। এই প্রথা হয়তো অন্যান্য প্রাচীনতর নাট্যকারদের রচনাতেও পাওয়া যাবে কিয়দংশে, কিন্তু নন্দীপতির থেকেই 'অনিয়মিত' কীর্তনিয়া নাটকের আবশ্যিক অংশরূপে এই প্রথাটির ব্যবহার আমরা পাই।

'শ্রীকৃষ্ণকেলিমালা' সম্ভবত মিথিলার সবচেয়ে প্রভাবশালী দেশীয় ভাষার নাটক। এতে সংস্কৃত ও প্রাকৃত খুব কমই ব্যবহৃত হয়েছে এবং সংগীতই এই নাটকের মুখ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শৈলী, ঘটনাক্রম বা চরিত্র-চিত্রণের কোনো জটিলতা এই নাটকে নেই। কোনো সক্রিয় ঘটনাই মঞ্চে দেখানো হয় নি, শুধু সংগীত ও কবিতার মধ্যে দিয়েই সেগুলি বোঝানো হয়েছে। ফলে নাটকের গতি গেছে বেড়ে। কবি কৃষ্ণ-লীলার একটা মোটামুটি ধারণার ছবি এঁকেই সন্তুষ্ট থাকছেন এখানে। অবশ্য মঞ্চে কিছু কিছু ঘটনা প্রদর্শিত হচ্ছে ঠিকই। এক জায়গায় যেখানে দেখা যাচ্ছে নারদ কংসের সঙ্গে কথা বলছেন. সেখানে যে অভিনয়-প্রণালীর বর্ণনা রয়েছে তা থেকে বোঝা যায় যে সে যুগে কীর্তনিয়া নাটকে অভিনয় ঠিক কেমন হতো। সূত্রধার ও নটীদের মধ্যেও সংলাপ দিয়ে আমাদের অঙ্কিয়া নাটের মতই কীর্তনিয়া নাটকেও পুরোটা সময় সূত্রধারের মঞ্চে উপস্থিতির কথাটা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

এই নাটকে মিথিলার সব রীতি-নীতি পালা-পার্বণের ছাপ দিয়ে নাটকে মৈথিলীর ছাপটাকে বজায় রাখা হয়েছে। কৃষ্ণের জন্মের আনন্দোৎসব পালনে, কৃষ্ণ যখন কিছুটা বড়ো হয়েছেন তখনকার বর্ণনায় বা ইন্দ্রপূজার দিনে যখন গোপেরা রান্না করছেন তখনকার

প্রসঙ্গের মাধ্যমে এই ছাপটিই ফুটে উঠছে।

কৃষ্ণের অতিমানবীয় চরিত্রের ওপর প্রায়ই এখানে ওখানে জোর দেওয়া হচ্ছে। এই নাটকে কৃষ্ণের শংসায় যে গদ্যাংশ স্থান পেয়েছে তা থেকে জ্যোতিরীশ্বরের 'বর্ণরত্নাকরে' যেভাবে গদ্য লেখা হয়েছিল তার সঙ্গে মিল পাওয়া যাচ্ছে। এ থেকেও নাটকটির 'কীর্তন' বা প্রার্থনার চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। কবি নিজেকে 'ভাখাকবি'-র (দেশীয় ভাষার কবি) থেকে আর বড়ো কিছু বলে প্রমাণিত করতে চান না এখানে এবং উনি নিজেই এখানে দেশীয় ভাষায় এই বিশেষ সাহিত্য-কৃতির বিধাবিশেষের জন্ম নিয়ে ঘোষণা করছেন — যা কীর্তনিয়া নাটকের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ।

অন্যান্য নাট্যকারেরা

কীর্তনিয়া নাটক বিংশ শতক অবধি লেখা হয়েছে মৈথিলীতে। শেষ পর্বে এসে এগুলি বিশুদ্ধ দেশীয় ভাষার সাহিত্যকর্ম রূপে রচিত হয়েছিল যাতে সংস্কৃত নাটকের কাঠামোও ছিল না, না ছিল সংস্কৃত বা প্রাকৃতের ব্যবহারও। এই বিকাশকে বলা যায় 'অনিয়মিত' মৈথিলী নাট্যরচনা। যদিও একথা এখানে মেনে নেওয়া ভালো যে কিছু কিছু নাট্যকার সংস্কৃত নাটকের কাঠামোকে জিইয়ে রাখার দুর্বল চেষ্টা করেছিলেন, ধীরে ধীরে (সত্যিকারের অভিনয়ের ক্ষেত্রে) সংস্কৃত নাট্য-গঠন বা সংস্কৃত ও প্রাকৃতে লেখা সংলাপের বেশিরভাগই বাদ পড়েছিল। যার ফলে 'নিয়মিত' বা নিয়মসম্মত সংস্কৃত নাটকের শৈলীকে বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল। যেমন শ্রীকান্ত গণকের 'শ্রীকৃষ্ণজন্মরহস্য' যা লেখা হয়েছিল মহারাজা নরেন্দ্রসিংহের (১৭৪৪-১৭৬০ খ্রি.) কিছুকাল পরে, কিংবা ভানুনাথ ঝা-র 'প্রভাবতী-হরণ'— মহারাজ মহেশ্বরসিংহের (১৮৫০-১৮৬০ খ্রি.) এবং মহারাজ লক্ষ্মীশ্বরসিংহের (১৮৮০-১৮৯৮ খ্রি.) সংরক্ষণে লেখা হয়েছিল, বা দ্বিতীয়োক্তের সংরক্ষণেই লেখা হর্ষনাথ ঝা-র 'উষাহরণ' ও 'মাধবানন্দ' এবং চন্দা ঝা-র 'অহল্যাচরিত' (১৯১২ খ্রি.) এসবই ছিল 'নিয়মিত' কীর্তনিয়া নাটক।

তবে নিশ্চিতরূপেই অধিকতর আকর্ষক ও খ্যাতিপ্রাপ্ত ছিল 'অনিয়মিত' কীর্তনিয়া নাটকগুলি যাতে মোটামুটিভাবে সংস্কৃত নাটকের কাঠামোকে বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল; এইসব 'অনিয়মিত' নাটকের মধ্যে রয়েছে মহারাজ মাধবসিংহের (১৭৭৬-১৮০৮ খ্রি.) তত্ত্বাবধানে লেখা গোকুলানন্দের 'মানচরিতনাটক', শিবদত্তের 'পারিজাত-হরণ' ও গৌরীপরিণয়', করণ জয়ানন্দের 'রুক্মাঙ্গদনাটক' এবং কাহ্নারামের 'গৌরীস্বয়ম্বর' (১৮৪২ খ্রি.) ; এছাড়া ছত্রসিংহ (১৮০৮-৩৯ খ্রি.) ও রুদ্রসিংহের (১৮৩৯-৫০ খ্রি.) সংরক্ষণে রত্নপাণির মতো নাট্যকারের কৃতি 'উষাহরণ' (১৮৫০ খ্রি.)। মহারাজ লক্ষ্মীশ্বরসিংহের (১৮৮০-৯৮ খ্রি.) সংরক্ষণেও এমন সব নাটক রচিত হচ্ছিল চন্দা ঝা ('অহল্যাচরিত'), হর্ষনাথ উপাধ্যায় ('উষাহরণ' ও 'মাধবানন্দ'), ভানুনাথ ঝা ('প্রভাবতীহরণ') ও বিশ্বনাথ ঝা 'বালাজী' ('নাটিকা') প্রভৃতি নাট্যকারের দ্বারা। তেমনি রামেশ্বরসিংহের

(১৮৩৯ খ্রি.) সময়ে ছিলেন বলদেব মিশ্র ('রাজেশ্বরী নাটক'—১৯২০ এবং 'রমেশোদয় নাটিকা'—১৯২২ খ্রি.)। এইসমস্ত পূর্ণস্ফুট কীর্তনিয়া নাটকগুলিতে দেখা যাচ্ছে অনেক নাট্যকারই অন্য কবিদের জনপ্রিয় গানগুলি নিঃসংকোচে নিজেদের নাটকে ব্যবহার করছেন। এঁরা সবাই মনবোধ ও নন্দীপতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিশেষ করে বাচনভঙ্গি ও শৈলীতে — আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে শৈলীর সরলীকরণ ও স্বচ্ছন্দ গতিতে। এখানে না আছে পরম্পবাগত শৈলীর ছাপ, না আছে অলঙ্কার-ব্যবহারের প্রাচুর্য বা পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রতীকের প্রয়োগ। সর্বত্র সরলতা ও প্রত্যক্ষতা দেখা যাচ্ছে। তবে দেখা যাচ্ছে এই নাটকগুলিতে প্রেমরসের থেকে ভক্তির প্রাধান্যই বেশি। সব শেষে, এও বলা দরকার যে এইসব নাটকগুলিতে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব খুবই কম। পৌরাণিক কাহিনীগুলি, এমনকি কৃষ্ণ ও রাধার গল্পটিকেও এখানে খুবই সরল করে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত

কিছুদিন আগে পণ্ডিত রমানাথ ঝা কীর্তনিয়া নাটককে একটা স্বতন্ত্র রীতির আখ্যা দেওয়ার বিরুদ্ধে খুব বিস্তারিত যুক্তি দেখিয়েছেন এবং বলেছেন যে এইসব নাটকগুলিতে কোনো কাঠামোই নেই বা এইগুলির কোনো আকরণই নেই — এগুলিতে শুধুমাত্র রয়েছে অনেকগুলি গান বা গীতিহার। খুব বেশি হলে এগুলিকে দীর্ঘ 'কথা কাব্য' বলা যায়, নাটক নয় [১]— এই ওঁর বক্তব্য। ওঁর আলোচনা থেকে মনে হয় পণ্ডিত ঝা সম্ভবত শুধু পরবর্তী কালের কীর্তনিয়া নাটকগুলি নিয়েই কথা বলছিলেন। কিন্তু এই নাটকগুলিই শুধুমাত্র 'গীত' বা 'নৃত্য' নয়। এগুলি নাটকই। বাংলার যাত্রা ও অসমিয়ার অঙ্কিয়া নাটের মতো এগুলি অন্য ধরনের সাহিত্য রচনা ঠিকই। এগুলিকে মাত্র 'দীর্ঘ কথা কাব্য' বা 'গীত-নৃত্যের শৃঙ্খলাবিশেষ' বলে বাতিল করে দিতে পারে না। বিশেষ করে শিবদত্তের নাটকের দুটি পৃথক সংস্করণ থেকে একথা আরো বেশি সমর্থন পায় — ওঁর 'গৌরীপরিণয়'-কে বলা হয়েছে 'নাটিকা' তার একটি সংস্করণের নিরিখে, অথচ অন্য কৃতি 'গীতগৌরীস্বয়ম্বর'-কে বলা হয়েছে 'সম্মর' অথবা 'দীর্ঘ কবিতা'। অর্থাৎ, কীর্তনিয়া নাটকনিশ্চিতরূপেই একটা পৃথক সাহিত্যিক বিধা— দীর্ঘ কথা কাব্যও নয় ও নৃত্যগীতের শৃঙ্খলা মাত্র নয়। অবশ্য শিবদত্তের আবির্ভাব তখন হয় যখন দেশীয় নাটক ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে আসছিল এবং নাটক প্রায় মিশে যাচ্ছিল দীর্ঘ কাব্যে। কিন্তু কাহ্নারামের 'গৌরীস্বয়ম্বর' এবং বিশেষ করে রত্নপাণির 'উষাহরণ' অনিয়মিত দেশীয় কীর্তনিয়া নাটকের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে গণ্য হবে।

কীর্তনিয়া নাটকের বিষয়ে সঠিক ভাবে বুঝতে গেলে রত্নপাণির 'উষাহরণের' মতো

১. এ প্রসঙ্গে আমার 'কীর্তনিয়া নাটক' দ্রষ্টব্য আরো বিস্তারে আলোচনার জন্য যা অখিল ভারতীয় মৈথিলী সাহিত্য সমিতির প্রকাশনা।

নাটিকার বিস্তারিত অধ্যয়ন করলে ভালো হয়। যদিও এতে সংস্কৃত নাটকের কাঠামোকে একেবারেই জলাঞ্জলি দেওয়া হয়, এটি নাটক না হয়ে অন্য কিছু হয়ে দাঁড়ায়নি। এটা একটি নাচ বা আবৃত্তি আদৌ নয়।

'উষাহরণ-নাটিকা'-র মধ্যে দেশীয় ভাষার কীর্তনিয়া নাটকের একটা বিদ্বতাপূর্ণ ও সম্ভ্রান্ত উদাহরণ পাওয়া যায়। এখানে-সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে এতে কিছু সংস্কৃত গীতি ও সংলাপ ঠিকই স্থান পেয়েছে মৈথিলীর পাশাপাশি। তবে এতে সম্পূর্ণ নাটকটির স্বর ও দর্শন সৌন্দর্যে একটা 'শাস্ত্রীয়' ছাপ পড়েছে, কিন্তু এ থেকে সংস্কৃত নাট্যশৈলীর সঙ্গে শুধু মিলের চেহারাটাই ফুটে উঠছে। নাট্যকার গল্পের বিস্তারের ক্ষেত্রে খুবই সাবধান ছিলেন যা বোঝা যাচ্ছে তাঁর বর্ণনার সৌন্দর্য থেকে এবং তাঁর 'শান্তি' ও 'ভক্তি' রসাদির ওপর জোর দেওয়া থেকে।

নাটকটিকে চারটি অসমান ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অংশটিতে দেখানো হচ্ছে (বাণাসুর কন্যা, শোণিতপুরের) উষাকে গৌরী আশীর্বাদ দিচ্ছেন যে সে কোনো এক বিশেষ দিনে স্বপ্নে নিজের কাম্য ও ভাবী পতিকে দেখতে পারবে। এই আশীর্বাদই সমগ্র নাটকের পরবর্তী ঘটনাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করছে।

একটি বিশেষ দিনে উষা স্বপ্নে কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্নের ছেলে অনিরুদ্ধকে স্বপ্নে দেখে এবং তার সঙ্গে আনন্দলাভ করে। পরে সে অনিরুদ্ধের পরিচয় বের করে নিজের বান্ধবী চিত্রলেখার সাহায্যে যে নানান রাজপুত্রের ছবি এঁকে উষাকে জিজ্ঞেস করে যে এর মধ্যে কোনজনের সঙ্গে সে স্বপ্নে সুন্দর সময় ব্যয় করেছিল। এরপর চিত্রলেখা অনিরুদ্ধর কাছে উষার বার্তা নিয়ে যেতে রাজি হয় এবং মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা করে যাতে নিজের এই কাজে সে সফলতা লাভ করতে পারে।

এখানে দেখা যাচ্ছে শক্তির ভক্ত রত্নপাণি একটা সুযোগ পেয়ে যাচ্ছেন কৃষ্ণভক্তি-বিষয়ক এই নাটকেও মা দুর্গার প্রতি ভক্তির সার্থক প্রকাশে।

পথে নারদের সঙ্গে চিত্রলেখার দেখা হয়। নারদ অনিরুদ্ধর সঙ্গে যোগাযোগের সমস্যা নিয়ে চিত্রলেখাকে সাবধান করেন। তবে নারদ তাকে সাহায্যেও করেন জাদুমন্ত্রে নায়ককে চুপিচুপি একস্থানে নিয়ে আসতে।

এরপর দেখছি অনিরুদ্ধ গান্ধর্ব-মতে উষাকে বিয়ে করছে এবং তার সঙ্গে প্রেমকেলিতে মত্ত হয়ে উঠছে, এখানে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এই যে কতো সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে নায়ক-নায়িকার মিলনের চিত্রণ করা হয়েছে। বিদ্যাপতি হলে এই বাহানায় শৃঙ্গার বর্ণনার চরমে চলে যেতেন। কিন্তু এখানে এই রতিবর্ণনাকে রাখা হয়েছে সামলে যার থেকে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে রত্নপাণি ছিলেন মূলত একজন 'ভক্তকবি'। এর সঙ্গে তুলনীয় উমাপতির নাটকের 'মান'-ভঞ্জন গীতগুলি, যদিও ওটিও কীর্তনিয়া ঐতিহ্যেই লেখা।

ইতিমধ্যে বাণাসুর, উষার পিতা, তাঁর দ্বাররক্ষীদের মাধ্যমে জানতে পারেন যে অনিরুদ্ধ

উষার সঙ্গে মিলিত হতে আসে। তাই তিনি তাদের হুকুম দেন অনিরুদ্ধকে মেরে ফেলতে।

এর ফলে উষা সমস্ত সাহস হারিয়ে ফেলে এবং নিজের প্রেমিকের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়ে। কিন্তু অনিরুদ্ধ স্থির করে সে দ্বাররক্ষীদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। ভীষণ যুদ্ধের একটা বর্ণনা পাচ্ছি। শেষে দেখা যাচ্ছে সে সবাইকে হারিয়ে দিতে পারছে।

এরপর বাণাসুরের দেওয়ান তাঁকে উপদেশ দিচ্ছে 'মায়াযুদ্ধে' প্রবৃত্ত হতে। বাণাসুরের একথা উপযুক্ত মনে হয় এবং তিনি এক ঝাঁক সাপের বন্ধনে অনিরুদ্ধকে বেঁধে ফেলতে পারেন মায়াযুদ্ধ করে এবং শুধু এ থেকে তখনি বিরত হন যখন তাঁর দেওয়ান প্রাণে মেরে ফেলতে বারণ করেন। বাণাসুর এরপর স্থির করেন যে আপাতত অনিরুদ্ধকে কারারুদ্ধ করা হোক।

উষার মানসিক অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। সে তখন তার প্রিয়তমের চিন্তায় অসম্ভব কষ্ট পাচ্ছে। তার এসময়ে যে শীর্ণ ও দুর্বল শরীর হয়ে পড়ে তার সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয়েছে "একটি বিদ্যুল্লতার যা কোনো রকমে রয়েছে উজ্জীবিত"।

নারদ এই সব দৃশ্য অদৃশ্য থেকে দেখতে পান এবং তিনি কৃষ্ণকে খবর দিতে যান যে অনিরুদ্ধর কী দুর্ভাগ্য ঘনিয়েছে।

এদিকে দ্বারিকায় তখন সবাই ক্রুদ্ধ অনিরুদ্ধের অকস্মাৎ অন্তর্ধানে। কৃষ্ণ তাকে রক্ষা করতে গিয়ে কারাগারের সব কটি রক্ষীকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করতে পারলেন। বাণাসুর ঘোষণা করলেন যে উনি খুবই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী কারুর সঙ্গেই লড়তে ভালোবাসবেন— কৃষ্ণের সঙ্গে নয়। কৃষ্ণ ওঁকে আশ্বস্ত করলেন যে উনিই তাঁর পক্ষেই যথেষ্ট। বাণাসুর পরাস্ত হয়ে ভগবান শিবের কাছে চলে যান যিনি তাঁর সমস্ত ভক্তদের ইচ্ছা পূরণ করতেই ভালোবাসেন। তাই তিনি নিজেই কারাগারে বাণাসুরের সহায়তা করতে আবির্ভূত হন। কৃষ্ণ তখন বেশ মানসিক অসুবিধায় পড়েন স্বয়ং শিবের সঙ্গে লড়তে হতে পারে ভেবে। অথচ শিব তাঁকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে একবার কোনো ভক্তকে কথা দিলে শিবের পক্ষে তা ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

এখন শিব ও কৃষ্ণের নেতৃত্বে দুই দলের মধ্যে শুরু হলো এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। এই যুদ্ধের অঙ্গ রূপে 'জ্বরাক্রমণ'- শুরু হলো। কৃষ্ণের দলের প্রায় সবারই শিবের প্রকোপে জ্বর হয়ে গেলো। কৃষ্ণও একই ভাবে এই আক্রমণের জবাব দিলেন।

তারপর শুরু হলো কৃষ্ণের সঙ্গে শিবের সম্মুখ দ্বৈত যুদ্ধ, যার ভীষণতা ছিল অবর্ণনীয়। সমস্ত দেবতারা এই দৃশ্য দেখে ভয়ে কাঁপতে থাকলেন এবং দুজনকেই এমন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে বারণ করলেন। শেষে শিবও বুঝতে পারলেন যে ওঁর সঙ্গে কৃষ্ণের তো কোনো প্রভেদ নেই — তবে কেন কলহ?

যদিও তারপর শিব নিজে বাণাসুরকে আর সক্রিয় সাহায্য করতে পারলেন না, ওঁর ছেলে কার্তিকেয় এলেন বাণাসুরের কাছে। উনিও নিবৃত্ত হলেন গৌরীর মধ্যস্থতায়। তারপর বাণাসুর বুঝতে পারলেন কৃষ্ণের শক্তি ও নিজের পরাজয়কে মেনে নিলেন। কৃষ্ণও ওঁকে

ক্ষমা করে দিয়ে ফিরে গেলেন।

নাটকটির দ্বিতীয় ভাগে দেখা যাচ্ছে বাণাসুর শিবের আরাধনা করছেন। মহেশবাণীর মাধ্যমে তিনি শিবের কাছে নিজের সংকটের কথা ব্যক্ত করছেন এবং প্রার্থনা করছেন তাঁর সহায়তার।

অন্যপক্ষে দেখছি বাণাসুরের রানী ও দেওয়ান — দুজনেই কৃষ্ণের পূজা করছেন এবং কৃষ্ণ ওঁদের আশীর্বাদ করছেন ও অনিরুদ্ধ এবং উষার বিবাহের ব্যবস্থা করছেন। বিবাহ মৈথিল পদ্ধতি অনুসারেই হচ্ছে। শেষে নারদ পুনরাবির্ভূত হয়ে কৃষ্ণকে এর পরের করণীয়-বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছেন।

তৃতীয় ভাগে দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণ সমস্ত মানুষজনকে সাধারণ 'মাফীনামা' দিচ্ছেন এবং বাণাসুরের রাজত্ব সামান্য জনগণের মধ্যে বিলিয়ে দিচ্ছেন। এই সময়ে উষার দুটি বান্ধবী-সমোদা ও রামা এসে কৃষ্ণের বন্দনায় দুটি ভক্তি-গীতি শোনাচ্ছে। উনি তখন রাজি হচ্ছেন উষার সঙ্গে ওদেরও দ্বারিকায় নিয়ে যেতে।

চতুর্থ ভাগে দেখছি কৃষ্ণ সদলবলে দ্বারিকায় পৌঁছচ্ছেন। সবাই বহুদিন বাদে কৃষ্ণকে দেখে খুবই আনন্দিত হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করছেন। উষা ও অনিরুদ্ধকে সবাই অভিনন্দন জানালেন এবং ওঁদের বিবাহের বাকি যা কিছু রীতি সবই এখানে পালিত হচ্ছে ঐ সময়ে।

রমপাণির 'উষাহরণ' নাটকটি খুবই সুলিখিত এবং এখানে 'হরিবংশের' (১১৫-১২৮ তম অধ্যায়) থেকে গল্প নেওয়া হয়েছে। অবশ্য উনি তাতে প্রয়োজনানুসারে পরিবর্তন করেছেন যাতে নাটকীয়ভাবে ও বাস্তবোচিত রূপে নাটকের দৃশ্যগুলিকে বর্ণিত করা যায়। এর বিশেষ গুণ হলো উচ্চমানের শৈলী, গীতিময়তা এবং সর্বত্র ব্যবহৃত বর্ণনাত্মক গদ্যাংশগুলি। বাণাসুরের যে দুর্ভাগা, তার যে ট্র্যাজিক চরিত্র, এবং কৃষ্ণের যে গৌরবময় কৃতিত্ব— তা সবই এই নাটকে সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছিল। কোনো কোনো অংশে খুব বিস্তার থাকলেও এতে পুনরাবৃত্তি বা অতিরিক্ততা নেই। ছোট থেকে বড়ো বর্ণনাত্মক কাব্যাংশের মধ্যে দিয়ে উপযুক্ত প্রকারভেদ আনা এবং তার মধ্যে দিয়ে সঠিক ভাবের উদ্রেক করতে পারা — সংস্কৃত সংলাপ থেকে সংস্কৃত গানে — এসবই এটির বিশিষ্টতা। যদিও নারদের ভূমিকাকে এখানে হাস্যরসাত্মক করার কোনো সুযোগ নেই, আমরা এখানে নারদকে দেখছি বিভিন্ন দলের মধ্যে সংযোগসূত্র হিসেবে এবং বিশেষ করে কৃষ্ণের উপদেষ্টা রূপে।

এই নাটকটির একটি বিশেষ গুণ হলো 'তটস্থ' (যিনি নিরপেক্ষ দর্শক) মানুষের বক্তব্য যার দ্বারা ঘটনার ও নাটকের প্রগতির বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে। এ থেকে মনে হচ্ছে নাটকের প্রমুখ অভিনেতাদের ছাড়াও এঁদের সঙ্গেই আরো কিছু মানুষ ছিলেন (যাঁদেরকে ঠিক অভিনেতা বল্লা যাবে না) যাঁরা নাটকের মঞ্চায়নের কাজে ঠিক যেন গ্রীক কোরাসের মতোই সাহায্য করতেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন দলের ব্যবস্থাপক অথবা সূত্রধার— যেমন অঙ্কিয়া নাটে পাওয়া যায়।

মনে হয় কীর্তনীয়া নাটকের ইতিহাসকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায় — (ক) প্রথম পর্ব (১৩২৪-১৬০০ খ্রি.), (খ) পরিণত পর্ব (১৬০০-১৮৬০ খ্রি.) এবং (গ) অবক্ষয় পর্ব (১৮৬০-১৯২০ খ্রি.)। আধুনিক যুগ পর্যন্ত এই ঐতিহ্য বেঁচে ছিল অতীতের স্মৃতিমাত্র হয়েই, যা আধুনিক যুগের প্রয়োজন, চরিত্রায়ণ, জটিলতা ও সংঘাতের নিরিখে ছিল অনুপযুক্ত। অবশ্য এ থেকে মৈথিলীর কাব্য নাটকের একটা মহান ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল যার সার্থক প্রযোজনাও ছিল একটা শিল্পবিশেষ। এও স্পষ্ট যে যদিও প্রথমে সংস্কৃত নাটকের গঠন এবং সংস্কৃত ভাষাকেও এইসব নাটকে ধরে রাখার চেষ্টা করা হতো কারণ মিথিলায় সংস্কৃত-চর্চার ঐতিহ্য ছিল প্রাচীনকাল থেকে, এটি আরো বেশি না হয়ে বরং আরো সরল হলো এবং প্রায় একটি নতুন ঐতিহ্যের জন্ম দিলো নাট্যগঠন এবং রীতির দিক থেকে — বিশেষ করে এদেশীয় ভাষা মৈথিলীতে, যেখানে দৃশ্যকাব্যকে গীতিকাব্য বা প্রবন্ধকাব্য (দীর্ঘ কবিতার গায়ন বা আবৃত্তি) থেকে পৃথক করে দেখা সম্ভব হলো।

কীর্তনিয়া নাটক মৈথিলী সাহিত্যের ইতিহাসের বিচারে মিথিলার একটা গৌরবময় অবদান। এ থেকে বিদ্যাপতির কবিতা-রচনার ঐতিহ্য সরলতর হলো, জন্ম হলো অনেক পর্বের বহু মৈথিলী লেখকদের যাঁরা এই সার্থক সৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো এ থেকে মৈথিলী ভাষার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেলো ও মৈথিলী ভাষা এবং সাহিত্য ঐ সব শতকে অত্যন্ত সফলভাবে বিকশিত হতে পারলো।[১]

১. প্রকৃতপক্ষে কীর্তনিয়া নাটকগুলির সুনাম ক্ষুণ্ন হয়েছিল 'প্রবন্ধ প্রকাশে' (দ্বারভাঙা) প্রকাশিত রমানাথ ঝা-র নিবন্ধ এবং ড. প্রতাপনারায়ণ ঝা-র ('মৈথিলী নাটক কা উদ্ভব অওর বিকাশ'— বরোদা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত) গ্রন্থের জন্য। ইদানীংকালে ড. লেখনাথ মিশ্র এবং জগদীশচন্দ্র মাথুরের গবেষণা থেকে বরং এই ঐতিহ্যের বিষয়ে আরো অনেক কিছু জানা গেছে।

দ্বাদশ অধ্যায়

অসম-এর মৈথিলী নাটক
(১৫৫০-১৭৫০ খ্রি.)

ভূমিকা : উদ্ভব

অসম-এর কিছু বিদগ্ধ মানুষের সফল গবেষণার ফলে আজ আমাদের পক্ষে অসমে মৈথিলী নাটকের উদ্ভব ও বিকাশের ধারার পুনর্নির্মাণ করা সম্ভব। পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে অহোম শক্তির উত্থান পরিলক্ষিত হলো। অহোমরা বহুবার মুসলমানদের আক্রমণকে প্রতিহত করেছিলেন এবং একটা আভ্যন্তরীণ শান্তি বজায় রেখেছিলেন। এইসব গোলমালের ফলে অবশ্য কামরূপের রাজত্ব ভেঙে গিয়ে অসংখ্য ছোট ছোট রাজ্যে পরিণত হলো এবং বিশ্ব সিংহের (১৫১৫ খ্রি.) নেতৃত্বে এক নতুন কচ রাজবংশের উদ্ভব হলো। রাজসিংহাসনে আরোহণের ঠিক পরেই বিশ্ব সিংহ নিজের রাজধানী সরিয়ে নিয়ে গেলেন কোচবিহারে। আমরা 'রাজমালা' [১] থেকে জানতে পারি ত্রিপুরা এবং কোচবিহারের সঙ্গে মিথিলার সম্বন্ধ কতো ঘনিষ্ঠ ছিল।

বিশ্ব সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নরনারায়ণ যখন ১৫৪০ সালে সিংহাসনে বসলেন তখন থেকে অসমে জ্ঞান ও সংস্কৃতির চর্চা খুবই সমৃদ্ধি লাভ করে। ঐ সময়ের সমস্ত মহান কবি ও বিদ্বানেরা ওঁর রাজসভায় কখনো না কখনো গেছেন। এই সময়েই প্রাচীন কামরূপেই যে মহান বৈষ্ণব আন্দোলনের সূত্রপাত হয় বলে কিছু কিছু অসমিয়া বিদ্বানেরা মনে করেন এবং যে আন্দোলন "ব্রাহ্মণ্য দর্শনের শীতল বৌদ্ধিকতা এবং নির্জীব নিয়মানুবর্তিতা ও আনুষ্ঠানিকতার" প্রতিক্রিয়া রূপে দেখা দিয়েছিল, তার প্রভাবে অন্য সমস্ত ধর্ম এবং বিশেষ করে শক্তিপ্রথা প্রায় ধুয়ে-মুছে গেলো। শঙ্করদেব ছিলেন ভক্তি বা কৃষ্ণভক্তিবাদের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা যিনি দেশীয় ভাষায় প্রভূত জনপ্রিয় সাহিত্যের মাধ্যমে অন্য সমস্ত দেবতার উর্ধ্বে কৃষ্ণকে স্থান দেওয়ার পক্ষে যথাসাধ্য প্রচার করেছিলেন।

অসমিয়া ভক্তেরা নাটককে সাধারণ মানুষজনকে প্রভাবিত করার সবচেয়ে সহজ এবং সার্থক উপায় বলে গ্রহণ করলেন। আজও তাই যে-কোনো অসমিয়া বৈষ্ণব মঠের সত্রাধিকারীকে ধর্মাধ্যক্ষ হওয়ার জন্য একটা নাটক রচনা করে তাঁদের জ্ঞানের পরীক্ষা দিতে হয়। এর পরিণাম-স্বরূপ একটা সময়ের পরে অসমে এক বিশাল সংখ্যক নাট্য-সাহিত্য গড়ে উঠলো।

এইসব বৈষ্ণব নাট্যকারেরা ষোড়শ শতকে এসে তাঁদের নাটকের মাধ্যম-রূপে মৈথিলীকে গ্রহণ করলেন। কথিত আছে এটা সম্ভব হয়েছিল এজন্য যে, এঁদের আন্দোলনের মুখ্য হোতা শঙ্করদেব তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে নিজেই প্রত্যক্ষ করেন কিভাবে বিদ্যাপতি নিজের

১. ত্রিপুরা সরকার, আগরতলার (১৯৬১) শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত।

মাতৃভাষায় অপূর্ব সৃষ্টি করে চলেছেন। অন্যেরা বলেন মৈথিলী ভাষাকে গ্রহণ করার ফলে এঁদের রচনায় একটা চরিত্রগত পার্থক্য এসে গেলো। শ্রী বি. কে. বরুয়া এই প্রসঙ্গে বলেন :

> এমনটা কি এইজন্য হলো যে এই ভাষায় রয়েছে একটা বিরল আভিজাত্য এবং অধিকতর বোধগম্যতা? এখানেও তিনি প্রাচীন ঐতিহ্যের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিলেন। সংস্কৃত নাটকে মুখ্য পাত্রদের সংলাপ-রূপে সংস্কৃতই ব্যবহৃত হতো, যদিও স্ত্রী-পাত্রের মুখে মাগধী অথবা শৌরসেনী প্রাকৃতই স্থান পেতো। এই একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল দ্বাদশ শতকের প্রাচীনতম চমৎকারী নাটকেও যেখানে মুখ্য পাত্রেরা কথা বলতেন ফরাসী ও লাতিন ভাষায় এবং গৌণ পাত্র বা ভাঁড়েরা ব্যবহার করে ইংরেজি ভাষা। শঙ্করদেব কিন্তু একটা ভিন্ন ও মহান সিদ্ধান্ত নিলেন যাকে মধ্যপন্থা বলা যায়; তাঁর সব কটা নাটকে ব্যবহৃত হলো একটা মিশ্র ভাষা — মৈথিলীর সঙ্গে অসমিয়ার সংমিশ্রণে জাত— যাতে নাটকের পাত্রগুলির আভিজাত্য বজায় রইলো। সম্ভবত এর থেকেও কোনো গভীরতর কারণ ছিল এই চয়নের পেছনে। খ্রিষ্ট জন্মের পর প্রথম শতকের মধ্যেই সংস্কৃতের জনপ্রিয় ভাষা-রূপে ব্যবহারের স্রোত গেল শুকিয়ে। দ্বাদশ শতকে এসে জনপ্রিয় ভাষাগুলির সঙ্গে দেশীয় ভাষাগুলির ব্যবধান একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে দেখা দিয়েছিল। ধর্মে ও সভ্যতায় প্রতিটি প্রগতিমুখী পরিবর্তন সম্ভব শুধুমাত্র কোনো না কোনো মহান চলৎশক্তির তীব্র প্রভাবেই। উত্তর ভারতের নব্য-বৈষ্ণব আন্দোলনের পুনরুজ্জীবনও ছিল এমনই একটা ঘটনা; এই আন্দোলন সামনে যা কিছু পেলো সব ভাসিয়ে নিয়ে গেলো এবং এর ফলে রেখে গেলো একটা বিধ্বস্ত ভূমি যেখানে যুধ্যমান দেশীয় ভাষাগুলি নিজেদের স্থান করে নিলো এবং প্রগতির পথে এগোলো। সর্বপ্রথম মিথিলায় একটা সাধারণ ভাষার জন্ম হলো, যেখানে নব্য-বৈষ্ণববাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ (?) কেন্দ্র ছিলই। মিথিলার ভাষা মৈথিলীর খুব শিগগিরি একটা নির্দিষ্ট সাহিত্যিক ভাষা-রূপে উত্তরণ ঘটলো। বিদ্যাপতি তাঁর মর্মস্পর্শী এবং ছন্দোময় গীতির মধ্যে দিয়ে . . . এই ভাষাকে গড়ে তুললেন তাঁর সবসময়ের বৈষ্ণব কবিদের ব্যবহারের একমাত্র ও অদ্বিতীয় বাক্-বাহন রূপে . . . সারা ভারতের খ্যাতনামা কবি, দার্শনিক ও প্রচারকেরা বিদ্যাপতির চারিধারে (?) এসে জুটলেন। এঁরা এলেন নেপাল থেকে; কামরূপও পিছনে পড়ে রইলো না। এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিক প্রমাণ (?) পাওয়া যায় যে কামরূপ থেকেও অনেক বিদ্বান-পণ্ডিত মিথিলা-ভ্রমণ করেছিলেন . . . এবং এই ভাষা শিখেছিলেন।

প্রধান নাট্যকারেরা[১]

১. শঙ্করদেব

শঙ্করদেব (১৪৪৯-১৫৫৮ খ্রি.) সম্ভবত ছিলেন এইসব নাট্যকারদের মধ্যে মহত্তম ও প্রাচীনতম। উনি বেশ কিছু মৈথিলী নাটক রচনা করেন যার মধ্যে মাত্র ছটি এখন পাওয়া যায়। এগুলির কালক্রম-বিষয়ে ঐক্যমত নেই কিন্তু ইদানীং এগুলি এই ক্রমে ছাপা হয়েছে: কালীয়-দমন, রাম-বিজয় (বা 'সীতা-স্বয়ম্বর'), রুক্মিণী-হরণ, কেলি-গোপাল, পত্নী-প্রসাদ এবং পারিজাত-হরণ। এইগুলিই অসমে রচিত মৈথিলী নাটকগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও দীর্ঘতম।

'কালীয়-দমন' শঙ্করদেবের ভাই রামরায়ের অনুরোধে রচিত হয়। বাংলায় লেখা যাত্রায় এই নাটকের কথাবস্তু বহুবার এসেছে। এর প্রধান উপজীব্য হলো কৃষ্ণের কালীয়-নাগ দমন।

'রাম-বিজয়' নামটি সঠিক হয়নি কারণ এতে না আছে রামের বিজয় অথবা রামের দ্বারা অন্য কারুর বিজয় — বরং এতে দেখা যাচ্ছে মূল উপজীব্য রূপে সীতার স্বয়ম্বরের কাহিনী। রাজকুমার শুক্লধ্বজ বা চীলরায়ের অনুরোধে এই নাটক রচিত হয়, যিনি (শঙ্করদেবের সংরক্ষক) নরনারায়ণের ভাই ছিলেন।

শ্রীঅম্বিকানাথ বোরান দেখিয়েছেন যে অসমের মৈথিলী নাটকগুলির মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় নাটক ছিল 'রুক্মিণী-হরণ নাটক':

> রুক্মিণীর হরণ একটা সর্বভারতীয় বিষয়বস্তু, কারণ তিনি ছিলেন রাজা ভীষ্মকের কন্যা যিনি অসমিয়া ঐতিহ্য অনুসারে কুণ্ডিল অথবা সদিয়ার রাজা ছিলেন। এই বাস্তব বিষয়ে যেহেতু শঙ্করদেবের সূক্ষ্ম এবং স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান ছিল, তাই বৈষ্ণবধর্মের প্রচার করতে গিয়ে উনি যে অদ্ভুত সৃষ্টি করেন তাতে রুক্মিণীর কাহিনীকে ব্যবহার করে একটা সর্বগ্রাহ্যতা ও জাতীয়তাবোধের জাগরণের কাজ করেন। এই একই কাহিনী উনি 'রুক্মিণী-হরণ' নামক এক অসমিয়া বিখ্যাত নাটকে ব্যবহার করেন যাতে মূলত অসমিয়া ভাব রয়েছে।

অদ্যাবধি মুদ্রিত সবকটি নাটকের মধ্যে এই নাটকটি সম্ভবত সর্ববৃহৎ। এই গল্পটি খুবই পরিচিত এবং এখানে এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে নাটকের প্রধান কথাবস্তু — কৃষ্ণ ও রুক্মিণীর প্রেমকে কিভাবে সংক্ষেপে দেখিয়ে দ্রুত এগিয়ে যাওয়া হয়েছে, যাতে প্রেমের মতো স্পর্শকাতর বিষয়কে বেশি প্রধানতা দেওয়া হয়নি।

'কেলি-গোপাল' কৃষ্ণ ও গোপীদের রাসলীলা বিষয়ক নাটক, যার মূল স্রোত হলো 'ভাগবতে'র দশম্ সর্গ।

শঙ্করদেবের 'পারিজাত-হরণ' হলো এমন একটি নাটক যা উমাপতির 'পারিজাত-

১. দ্র. 'অঙ্কিয়া নাট' (অসমিয়া নাটকাবলীর সংকলন); বি. কে. বরুয়া সম্পাদিত। এই নাটকগুলির একটি নবীন বিশ্লেষণাত্মক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে এলাহাবাদের হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনের থেকে।

হরণে'র থেকে একেবারে অন্য ধরনের কৃতি। নারদের ভূমিকাটি এখানে খুব সুন্দরভাবে দর্শানো হয়েছে যদিও এটিতে উমাপতির নাটকের মতো রসবোধ নেই। মনে হয় নাট্যকারের উদ্দেশ্য ছিল এটা দেখানো যে নরকাসুরের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দেবতারা কিভাবে কৃষ্ণকে কামনা করেন যাতে তাঁকে প্রাগ্‌জ্যোতিষে যেতে হয়। এতে কামরূপ বা অসমের রাজারূপে নরকাসুরকে দেখানো হয়েছে এবং সত্যভামা চরিত্রটিকে এখানে ঠিকমতো ব্যবহার করা হয়নি, এখানে তিনি কৃষ্ণের সহচারিণী রানী, ফিরে আসার সময় তিনি কৃষ্ণকে অনুরোধ করছেন পারিজাত ফুলের জন্য—এই জন্যেই যেন এই চরিত্রটির অবতারণা। আসলে এইসবের মধ্যে দিয়ে সাধারণ অসমিয়া দর্শকের মধ্যে বোধগম্য ও উপভোগ্য বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত সম্ভব করা হয়। এই নাটকে শচী চরিত্রটিকে যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে তা উমাপতির নাটকটিতে নেই। এই দুটি নাটকের মধ্যে রয়েছে আরো অনেক পার্থক্য — বিশেষ করে পরিণতিতে। শঙ্করদেবের নাটকে উপজীব্যকে যেভাবে দেখানো হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে ভগবান কৃষ্ণের সেইসব কৃতিত্বের কথা যা উনি তদ্‌গতপ্রাণ গোপিনীদের জন্য দেখিয়েছিলেন। সেই তুলনায় উমাপতির নাটকে জোর দেওয়া হয়েছে পতিরূপে কৃষ্ণ এবং অন্যতমা স্ত্রীরূপে সত্যভামার মধ্যে এক উপভোগ্য বিসম্বাদ এবং প্রেমিক যুগলের পরস্পরের মধ্যে 'মান'-ভঞ্জনের পালাকে। এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে এই দ্বিতীয় নাটকটি প্রথমোক্ত নাটকটির চেয়ে অধিকতর সফল নাটক, কিন্তু প্রাচীনতম কালের বিশুদ্ধ মৈথিলীতে রচিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক রূপে তার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

'পত্নী-প্রসাদ' নাটকটি মনে হয় না পূর্বতন কোনো কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল:

> এই নাটকের কথাবস্তু রূপে আছে ব্রাহ্মণপত্নীদের ভগবান কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি — তাদের পতিদেবতাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও — এখানে দেখানো হয়েছে উচ্চতম ঐশ্বরিক প্রাপ্তির জন্যও বলিদানের প্রথার দুর্বলতাকে। . . . এইসব পত্নীদের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে কৃষ্ণ তাঁদের ঈশ্বর-দর্শনের কামনাকে মেনে নিলেন, যা কিনা বিভিন্ন ধার্মিক যাগ-যজ্ঞের মধ্যে দিয়ে ব্রাহ্মণেরাই একমাত্র তাঁদের নিজস্ব প্রাপ্তির অধিকার বলে মনে করেন। এই নাটকের মধ্যে দিয়ে এই বিশেষ অবধারণাকেই উচ্চে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছ যে যাগ-যজ্ঞ ও বলিদানের মধ্যে দিয়ে নয়, ভক্তি দিয়েই ভগবানের কাছে পৌঁছনো যায়।

২. মাধবদেব

শঙ্করদেবের পর তাঁরই প্রধান শিষ্য মাধবদেবই (১৪৮৯-১৫৯৬ খ্রি.) গুরুর উচ্চাসনে উপনীত হলেন। কাব্যরচনায় তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান বলতে 'নামঘোষ' এবং 'ভক্তিরত্নাবলী' এই দুটিকেই বোঝানো হয়— যে দুটি বৈষ্ণব দর্শনের কৃতি বলেও ধরা হয় (যার মধ্যে

দ্বিতীয়টি হলো তৈরভুক্ত বিষ্ণুপুরীর বিখ্যাত কৃতির অনুবাদ মাত্র)। তাঁর লেখা বিলুপ্ত নাটকগুলি হলো 'অর্জুন-ভঞ্জন', 'ভোজন-ব্যবহার', 'ভূমি-লেটোয়া', 'ভূষণ-হেরোয়া', 'রাস-ঝুমর', 'কটোরা-খেল', 'গোয়ালপাড়া', 'চোর-ধরা' এবং 'পিম্পর-গুচুয়া'। এগুলিতে কৃষ্ণকে শিশু রূপেই দেখানো হয়েছে।

'অর্জুন ভঞ্জন' নাটকে কৃষ্ণকে দেখানো হয়েছে উদূখলের হাত থেকে মুক্তি পেতে যখন বাল-কৃষ্ণ দইয়ের ভাণ্ড নিয়ে পালাচ্ছিলেন, এবং সেই সঙ্গে দুটি অর্জুন বৃক্ষের উৎপাটনের কাহিনীও দেখানো হয়েছে (এই বৃক্ষদ্বয় ছিলেন দুই কুবেরপুত্র যাঁরা মুক্ত হওয়ার জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন)। এই নাটকটিতে প্রায় সম্পূর্ণাংশেই রয়েছে দীর্ঘ গদ্য।

'চোর-ধরা' নাটকটি ছিল খুবই উপভোগ্য। এখানে দেখানো হয়েছে কিভাবে কৃষ্ণ নিজের বিরুদ্ধে মাখন-চুরির অভিযোগকে বেমালুম চাপিয়ে যান গোপীদের উপরেই।

'ভূমি-লেটোয়া'তে দেখতে পাচ্ছি কৃষ্ণ নিজের দেহের সর্বত্র মাটি-কাদা মেখে নিচ্ছেন অপূর্ব সুন্দরভাবে— যশোদা মা-র দৃষ্টি আকর্ষণ করতে।

'ভোজন-ব্যবহার' একটি ক্ষুদ্র নাটিকা যাতে দেখানো হয়েছে কিভাবে একদা যখন কৃষ্ণ অন্য সব রাখাল বালকদের সঙ্গে মহা উৎসাহের সঙ্গে খেতে বসেছিলেন, তখন ব্রহ্মা প্রথমে সমস্ত গোরুমোষ ও পরে তাঁরই সঙ্গী সব রাখাল বালকদের অদৃশ্য করে দেন। নাটিকাটির নামকরণ ঠিক হয়নি এবং এই অংশটি এভাবেই অসম্পূর্ণ রেখে দেওয়া হয়েছে এটা না দেখিয়েই যে কিভাবে শেষমেষ কৃষ্ণ সমস্ত গবাদি পশু ও রাখালদের পুনরুদ্ধার করেন। অবশ্য এমনিতে নামটি ভুল কিছু নয়।

মাধবদের 'রাস-ঝুমর' নাটকটি অন্য নাটকগুলির থেকে একেবারে আলাদা। এটি রাস-লীলার রাতে রাধার মুখে কৃষ্ণের বন্দনা গীতি — শুধু পার্থক্য হলো এতে সূত্রধার ও তার সঙ্গী অঙ্গীর দ্বারা সেইসব কিছু কথা নেই যা সাধারণত সূত্রধারেরা করে থাকে।

৩. গোপালদেব

মাধবদেবের পর ভবানীপুরের গোপালদেব হয়ে গেলেন অসমিয়া বৈষ্ণবদের সম্প্রদায়-প্রধান। ওঁর একমাত্র নাটক হলো 'জন্ম যাত্রা' যাতে কৃষ্ণজন্ম ও তারপর কৃষ্ণের নন্দগৃহে গমন পর্যন্ত ঘটনা দেখানো হয়েছে।

৪. রাম চরণ ঠাকুর

জনৈক রামদাসের পুত্র রামচরণ ঠাকুর যিনি মাধবদেবের ভগ্নীকে বিবাহ করেন এবং যাঁর প্রয়াসে মাধবদেব শঙ্করদেবের শিষ্য হয়েছিলেন, 'কংস-বধ' নামক নাটকের রচনা করেন। এতে কিভাবে কৃষ্ণ এবং বলরাম কুস্তিগিরদের হত্যা করে তাদের প্রভু কংসকে মুখোমুখি যুদ্ধে পরাস্ত করেন এবং নিজেদের পিতামাতাকে মুক্ত করেন তা দেখানো হয়েছে।

গৌণ নাট্যকারেরা

শঙ্করদেবের একজন অখ্যাত শিষ্য 'স্যমন্ত হরণ' নামের একটি নাটক লেখেন যাতে দেখানো হয় কিভাবে কৃষ্ণ স্যমন্ত মণি নামক একটি মূল্যবান পাথর ছিনিয়ে নিচ্ছেন জাম্বুবানকে পরাস্ত করে এবং শেষমেষ জাম্বুবতীকে বিবাহ করে।

এই ধরনের শৈলীতে লেখার ঐতিহ্য বহুযুগ পরও প্রচলিত রইলো। উদাহরণস্বরূপ, (অদ্যাবধি অপ্রকাশিত) 'শ্রীকৃষ্ণপ্রয়াণনামনাটকম' যা রাজা প্রমত্ত সিংহের সময়ে (১৭৪৫-১৭৫১ খ্রি.) রচিত হয়েছিল, সেটিকে নেওয়া যেতে পারে। এতে সংস্কৃতে রয়েছে সংলাপ, কিন্তু গানগুলি হয় ব্রজবুলি না হয় অসমিয়াতে রচিত হয়েছিল। আরেকটি সমসাময়িক নাটক হলো 'কুমারহরণ'।

অসমে প্রাপ্ত প্রাচীন মৈথিলী নাটকের বৈশিষ্ট্য

১. নাম

যদিও অসমে প্রাপ্ত মধ্যযুগীয় মৈথিলী নাটকগুলিকে 'অঙ্কিয়া নাট' বলা হয় আর যদিও এগুলি একাঙ্ক নাটক যার মধ্যে কোনো অঙ্ক বা দৃশ্য-বিভাজন নেই এবং যার সবগুলিই কখনো না কখনো মঞ্চায়িত হয়েছে। তবু তাদের সঙ্গে সংস্কৃততে রচিত 'অঙ্কিয়া' শ্রেণীর নাটকের মিল রয়েছে। শ্রীবরুয়া বলেছেন যে সম্ভবত 'অঙ্কিয়া' শব্দটি 'আঙ্গিক অভিনয়' কথা থেকে এসেছে।

২. সাধারণ

এইসব 'নাট'-গুলির উদ্ভব হয় কাব্য-পাঠ হতে। নাটের আগের পর্বের ওজা পালির দলের প্রধান ছিলেন ওজা (ওঝা? ঝা? উপাধ্যায়? শিক্ষক অথবা মৈথিল ব্রাহ্মণ?) যিনি আশু পাঠ বা আবৃত্তি করতেন ঐসব গান যেগুলির সঙ্গে পালিরা ঝাল-করতাল বাজাতেন। শঙ্করদেব এর সঙ্গে তান্ত্রিক পদ্ধতির প্রথার বিরুদ্ধে জনগণকে জাগিয়ে তোলার জন্য যোগ করলেন আরো কিছু অঙ্গভঙ্গি। এইভাবে মহাকাব্য ও সংগীতের সঙ্গে যোগ দিলো নাটক ও তার অঙ্গভঙ্গি।

এইসব নাটকগুলিতে বাস্তবোচিত কোনো কথা থাকতো না। অসমিয়া নাট্যকারেরা ছিলেন তাঁদের মৈথিলীভাষী সমসাময়িক সাহিত্যিকদের মতোই যাঁরা বেশি মাত্রায় কবি ও সংগীতজ্ঞ ছিলেন — অথবা গদ্যলেখক ছিলেন — অভিনেতা ও নাট্যকার কম। তাই নাটকগুলিতে সব রাগ-রাগিণীর উল্লেখও থাকতো এবং সবগুলি আবৃত্তিকারের কথা মাথায় রেখে লেখা হতো।

এগুলি প্রধানত গদ্যে লেখা হতো কিন্তু এর মধ্যে মধ্যে গীতিকবিতা অথবা গান থাকতো যোগ করা। সংস্কৃত শ্লোকও থাকতো, বিশষ করে নান্দীতে অথবা কোনো না

কোনো পরিবর্তনের দ্যোতক রূপে। এইসব নাটকগুলিতে মৈথিলী ভাষার সঙ্গে প্রায়শই অসমিয়া ভাষার মিশ্রণ করা হতো সংগীতাংশে, তবে গদ্যের ভাষা ছিল অবশ্যই মৈথিলী মাত্র। এই নাটকগুলিতে ভাষারও এমন ব্যবহারের ওপর প্রয়োজনাতিরিক্ত জোর দেওয়া যায় না; কারণ কিছু কিছু লিপিজাত ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন ছাড়া ভাষার শুদ্ধতা তেমন ভাবে বজায় রাখা যায় নি, এবং এতে অচেতনভাবে ব্রজভাষা ও অসমিয়ার সংমিশ্রণ ঘটেছে, তবে লিপিকরেরা (অবশ্য যে সব পাঠ আজ পাওয়া যায় যা খুব বেশিদিন আগে নকল করা হয়নি) স্বাভাবিকভাবেই পাঠগুলির ভাষা শুদ্ধ মৈথিলীতে বদলে নিয়ে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

৩. গঠন

এইসব নাটকের বিষয়বস্তু সাধারণত মহাকাব্যদ্বয় ('রামায়ণ' ও 'মহাভারত') এবং 'পুরাণ'গুলি থেকে (অর্থাৎ যেখানে কৃষ্ণের কাহিনী পাওয়া যায়, বিশেষ করে 'ভাগবত' থেকে) নেওয়া হয়েছিল।

নাট্যকারেরা সাধারণত কাহিনীর সংক্ষেপ করে, অথবা কাহিনীর অংশবিশেষকে নাট্য-চিত্রণ করতে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। কোনো একটি অঙ্কে দেখা যেতো ধর্মীয় প্রচারের জন্য যা কিছু বলা দরকার সবই সঠিকভাবে বলা হচ্ছে। অসমিয়া নাট্যকারদের পক্ষে

> খুব কমই সুযোগ ছিল কোনো নতুন ঘটনার সৃষ্টি করবেন বা কোনো চরিত্র বিশেষের বহুদিক হতে বর্ণনা দেবেন; তবে তাঁরা একথা ভালো করেই জানতেন যে নাটকীয়তার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ঘটনা ও বর্ণনা দিয়ে কোনো মহৎ নাট্যকর্মের সৃষ্টি করা যায় না . . . (অতএব) সামান্য কিছু দক্ষ আঁচড়েই তারা এমন সব চরিত্রের চিত্রণ করতেন যে ছায়াছবির পর্দায় যেমন মানুষকে দেখানো হয় ঠিক যেন সেইভাবে মঞ্চে উপস্থাপিত করা হয়।

এই নাটকগুলি সাধারণত সংস্কৃত বা মৈথিলীতে 'নান্দী' দিয়ে শুরু হতো যা মূলত ব্যক্তি বিশেষের লাভার্থ প্রার্থনা বিশেষ। কখনো কখনো শুধুমাত্র 'নান্দ্যন্তে সূত্রধার' এই কথার উল্লেখ রয়েছে। সূত্রধার বা দলের ব্যবস্থাপক মহাশয় তাঁর সঙ্গীকে সাধারণত ডেকে নিতেন যিনি উত্তর দিতেন। এরপর সূত্রধার নিজেই সবটা আবৃত্তি করতেন। (অবশ্য, নান্দী ও সূত্রধারই গেয়ে শোনাতেন।) মধ্যযুগে এইসব নাটকের কোনো চরিত্র মঞ্চে আজকের মতো অবতীর্ণ হতেন কিনা এতে সন্দেহ আছে; যেভাবে সূত্রধার সবকিছুর বর্ণনা করে যেতেন তাতে শুধু মনে হয় এক ধরনের মূকাভিনয় হতো, যে বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। এইসব শিষ্য সম্প্রদায়ের কাজ ছিল সূত্রধারের গদ্য আবৃত্তির মধ্যে মধ্যে যে সব গান আসে সেগুলি গেয়ে শোনানো।

"এইসব নাটকগুলিতে সংলাপের কাজ ছিল মূলত সেইসব কথা গদ্যতে বলা যেগুলি

কবিতার মাধ্যমে ইতিমধ্যে বলা হয়ে গেছে। সূত্রধারেরা ঘটনার পরিস্থিতি বোঝানোর জন্যই গদ্যের ব্যবহার করতেন। এতে সত্যকথা বর্ণিত করতে আর নাটকের সংলাপের মধ্যে ফাঁককে পূরণ করতেও এঁরা চেষ্টা করতেন যাতে দর্শকেরা নাটকের ঘটনাক্রম ঠিকমতো বুঝতে পারতেন।" একথা যদি সত্যি হয় তাহলে এগুলির মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সংলাপ বলে ঠিক কিছু পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে 'অঙ্কিয়া নাট' প্রায় বর্ণনাত্মক 'কাব্যে'র মতো হয়ে পড়ে — পার্থক্য এই যে এর সঙ্গে থাকতো সঙ্গীত এবং অভিনয়োচিত অঙ্গভঙ্গি। কবিতায় কোনো কোনো অনুচ্ছেদে কোনো ঘটনার ব্যাখ্যা থাকে বা খুব সাবধানে সেগুলি নিয়ে আলোচনা থাকে — বিশেষ করে তার নৈতিক এবং ধর্মীয় দিকগুলিকে পরিষ্কার করে বোঝানোর জন্যেও। ফলে গদ্যে যা থাকে তার সবটা বা অধিকাংশ কবিতা-খণ্ডে পাওয়া সম্ভব নয়।

৪. নাটকগুলির অবদান

অঙ্কিয়া নাটকগুলি মূলত ধর্মীয় প্রচারের উদ্দেশ্যে লেখা হতো। ফলে এগুলির ভাষা ছিল প্রত্যক্ষ, গতিশীল এবং নিরলঙ্কার। এগুলিতে খুবই উপমা, বিরোধিতা অথবা কোনো অলঙ্কারের দেখা পাওয়া যেতো। এগুলির মুখ্য অভিপ্রায় ছিল কৃষ্ণভক্তির প্রচার। "অনেক রকম ভাবে ভক্তি সেই যুগে সাধারণ জনতার জীবনে বন্যার মতো এসেছিল এবং জনপ্রিয় সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল . . . কিন্তু উত্তর ভারতের মুখ্য বৈষ্ণব চিন্তাধারার থেকে সরে এসে অসমিয়া কবিরা প্রচার করলেন দাস্যভাবের এবং কৃষ্ণ ও তাঁর ভক্তবৃন্দের মধ্যে বাৎসল্যরসের সম্পর্ককে।

এই বিশ্বাস যে কলিযুগে কৃষ্ণভক্তিই মুক্তির একমাত্র উপায়— সর্বত্র পরিলক্ষিত হতো। সুযোগ পেয়েও শৃঙ্গার-রসের বর্ণনাকে প্রশ্রয় দেওয়া হতো না। এই নাটকগুলিতে একটা অদ্ভুত নিষেধকে মানা হতো ও নারীচরিত্রগুলির মধ্যে মাতৃত্বকেই বেশি ফুটিয়ে তোলা হতো। রাধা কৃষ্ণের বন্দনা-গীত গাইছেন, এই অবধারণাই এই বাধানিষেধের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এঁদের তুলনায়, মৈথিল নাট্যকারেরা একেবারে বিপরীত মেরুর মানুষ ছিলেন। সবচেয়ে বড়ো কথা এই নাটগুলিতে প্রতিটি সংলাপের বা বক্তৃতার মাঝে রয়েছে ছন্দে কৃষ্ণভক্তি-বিষয়ক গীত ও গদ্য এবং সর্বত্র এখানে 'নিরন্তরে হরি বোল হরি বোল' কথাটির পুনরাবৃত্তি করা হতো।

৫. শেষ বিচার

শ্রী বি. কে. বরুয়া এভাবে নিজের বক্তব্যের উপসংহার করেছেন :

> সংস্কৃত (এবং আমরা যোগ করতে পারি, 'সাধারণ' মৈথিলী) নাটকের মধ্যে যেখানে আমরা দেখছি এক সুচেষ্ট, সুরসিক ও (বিশেষত রাজসভার) অভিজ্ঞ দর্শকবৃন্দের উপস্থিতিকে অবশ্যম্ভাবী বলে মেনে নেওয়া হয়েছে, যেখানে বর্বর,

অজ্ঞ এবং প্রচলিত ধর্মমত বিরোধী ও সমাজের নিচুতলার মানুষদের প্রবেশ নিষেধ, সেই তুলনায় অসমিয়া 'ভবন'-শৈলী যেন একেবারে পৃথক এবং সম্পূর্ণরূপে জনপ্রিয় ব্যাপার যাতে সমস্ত সামাজিক ভেদাভেদকে ভেঙে দেওয়া হয় এবং যা সমস্ত গ্রামের সমাজকে অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে কখনো হাল্কা রসের ছোঁয়া, কখনো বা সাময়িক প্রসঙ্গান্তরের মাধ্যমে একটা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের আস্বাদ দেয় — বিশেষ করে মহাকাব্য ও পুরাণের নানান ঘটনাবলীর চিত্রণের মধ্যে দিয়ে। এভাবে সেইযুগে, যখন পাঠক্ষমতা সীমিত ছিল সমাজের কিছু ভাগ্যবান ব্যক্তির মধ্যেই, এই 'ভবন' নাটিকাগুলির জ্ঞান-প্রসার এবং সাধারণ মানুষের কাছে সাহিত্য, শিল্প, নৈতিকতা, ধর্ম ও দর্শনের প্রসারের একটা শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছিল যা অসমিয়া নাট্যকারদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান বলা যায়।

উপসংহার

অনেক সময়েই মৈথিলী সাহিত্যের ইতিহাসে এই সমস্ত অসমিয়া নাটকের স্থান কী—তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। এই নাটকগুলিতে শুধু যে মৈথিলী ভাষার ব্যবহার হয়েছে তা-ই নয়, এগুলির মধ্যে দিয়ে সুদূর অসমেও মৈথিলী ভাষা ও সাহিত্য কিভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। নিঃসন্দেহে বিদ্যাপতির পরবর্তী পর্বে সমস্ত উত্তর-পূর্ব ভারতে এগুলিকে মৈথিলী ভাষার একটা চরম প্রগতির উদাহরণ রূপে নেওয়া যায়— বিশেষ করে পারিপার্শ্বিক প্রদেশগুলিতে মৈথিলী সংগীতের প্রভাবের প্রতীক রূপে গ্রহণ করা যায়। কিছু কিছু পাঠের সংগীত (যেমন 'সংগীতদামোদর' কিংবা 'শ্রীহস্ত মুক্তাবলী' [১]) অসমিয়া নাট্যকারদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল যা নিঃসন্দেহে মৈথিলী কৃতিরই প্রভাব। এর থেকেও সেই পর্বে অসমে মৈথিলীর নিশ্চিত প্রভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়।

১. এই কৃতিগুলিও মিথিলার মহারাজা শুভঙ্কর ঠাকুরের (১৫৮৩-১৬১৯ খ্রি.) রচনা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মধ্যযুগের মৈথিলী গদ্য

মৈথিলী গদ্যের উদ্ভব হয় চতুর্দশ খ্রিষ্টাব্দের পরেই। জ্যোতিরীশ্বরের 'বর্ণরত্নাকর', বিদ্যাপতির অবহট্‌ঠের রচনাগুলি খুবই উঁচু দরের সাহিত্যিক গদ্যের নিদর্শন। বিদ্যাপতির পরে অবশ্য গদ্যচর্চায় মনোনিবেশের উদাহরণ বেশি পাওয়া যায় না।

যাই হোক, আমরা গদ্যের ক্রমোন্নতির নিদর্শন পাই বিভিন্ন নথিপত্রে এবং মধ্যযুগীয় মৈথিলী নাটকে। এই ক্রমবিকাশ অব্যাহত আছে বর্তমান কাল পর্যন্ত যখন দেখছি গদ্যভাষা ভাবপ্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম রূপে স্বীকৃত হয়েছে।

১
নথিপত্রের গদ্য

নথিপত্রের গদ্য বলতে বোঝায় নানা ধরনের সরকারি কাগজপত্র, বিচারের রায়, অনুদানপত্র, ক্রীতদাসপত্র এবং বিভিন্ন চুক্তিপত্র [১]। এগুলির মধ্যে খুব অল্প কটিরই উদাহরণ এখন পাওয়া যায়।

এগুলি মৈথিলী জীবনধারার বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করে। এইখানেই এদের গুরুত্ব। এছাড়াও মৈথিলী ভাষার ক্রমবিকাশের ধারা এদেরই মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়। যদিও সমকালীন মৈথিলী সাহিত্যে এদের কোনো প্রভাব পড়েনি, তবু যেহেতু এগুলি মধ্যযুগে ব্যবহৃত ভাষার ছাপ বহন করে, তাই এগুলি গুরুত্বপূর্ণ। মধ্যযুগের মৈথিলী গদ্যের এই সব নিদর্শনে ব্যবহৃত কিছু বিতর্কিত মৈথিলী শব্দের বা নামের অনুপুঙ্খ আলোচনা আমাদের মনের থেকে সঠিক বানানেব ধারা-সংক্রান্ত অনেক অহেতুক সন্দেহের নিরসন ঘটাবে।

দলিল, পাট্টা ও চুক্তি

এই সমস্ত নথিপত্রের মধ্যে প্রাচীনতম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নথিগুলি হলো ব্যবসা, উপহার এবং ক্রীতদাস-দের মুক্তি-সংক্রান্ত নথিগুলি। এই চুক্তিপত্রগুলি মিথিলার সামাজিক ইতিহাস-চর্চার পক্ষে অত্যন্ত জরুরি। মধ্যযুগের আগে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল কি না জানা যায় না; তবে সপ্তদশ শতকের গোড়ায় এই প্রথা প্রচলিত ছিল।

চাকরি সংক্রান্ত নানান দস্তাবেজ আজ পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় 'বহিখত', ক্রীতদাসদের ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত চুক্তি, তাদের মুক্তিপত্র ···

১. দ্র. রমানাথ ঝা-র নিবন্ধ 'পুরাণ লিখা', স্বদেশ মাসিকে প্রকাশিত।

যেগুলিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বলা হতো 'গৌরীব-বা (চা?) টিকাপত্র', 'অজাতপত্র' ও 'চাটিল'। এগুলির সাধারণত নির্দিষ্ট গৎ থাকতো। এর মধ্যে কোনো কোনোটি ছিল বিশুদ্ধ সংস্কৃতে, আবার কতকগুলি ছিল চুক্তিপত্রের ধাঁচে লেখা যেগুলিতে সংশ্লিষ্ট পক্ষের সইও পাওয়া যায়। এছাড়া অন্যগুলি ছিল একপক্ষের অন্যদলকে লেখা চিঠির আকারে। এর মধ্যে অনেকগুলিতেই একথা বলা আছে যে এই চুক্তিপত্রগুলি কোনো তৃতীয় ব্যক্তি দ্বারা লেখা হতো। সাধারণত তিনি কায়স্থ (করণিক?) হতেন এবং এই কাজের জন্য তিনি একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের পারিশ্রমিক পেতেন।

সংস্কৃত ভাষায় লেখা নথিগুলিই সবচেয়ে বিশদ এবং নিয়মানুগ। এগুলি আকারেও বড়ো এবং এগুলিতে নানান বিবরণ দেওয়া থাকতো— বিধি এবং ধর্ম-বিষয়ক— যাতে বোঝা যায় যে এগুলি ঠিক ঠিক ভাবে বিধিবদ্ধ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের কাছে এমন প্রমাণও আছে যে পরবর্তীকালে — ব্রিটিশ আমলে এগুলির মধ্যে অনেকগুলিই কোর্টের স্ট্যাম্প পেপারে নথিভুক্ত করা হয়েছে দেশের নতুন আইন অনুযায়ী। এগুলিতে সাধারণত লেখা থাকে — (ক) ল. সং, শকাব্দ, বিক্রমাব্দ বা ফসলি সালের সনতারিখ, (খ) মোগল সম্রাট (ভারতের সম্রাটও বলা চলে আনুষ্ঠানিক ভাবে), না ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি না তাদের প্রতিনিধি— কে তখনকার শাসনকর্তা, (গ) ক্রেতা, বিক্রেতা ও ক্রীতদাসের অধিকর্তার— নাম, (ঘ) ক্রীতদাসের জাত, বয়স, মূল্য ও শরীরের বিশেষ চিহ্ন, (ঙ) চুক্তিপত্রের সময়সীমা ও ক্রীতদাসের দাসত্বের সময়কাল, এবং (চ) সংশ্লিষ্ট দাসের দস্তখত এবং সম্মতি ও সাক্ষীদের সইসাবুদ।

এইগুলির দেশীয় ভাষার খসড়া আকারে ছোটো এবং গঠনের দিক থেকেও সরল। সেগুলিতে সব অব্দে তারিখের উল্লেখ পাওয়া যায় না; দেশের শাসককুলের নামও তাতে মুদ্রিত থাকে না। এগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য মনে হয় ছিল প্রকৃত তথ্য ও কাজের শর্তাবলীর প্রকাশ। যদিও সাক্ষীদের ও কখনো কখনো করণিকদের দস্তখতের ব্যাপারটি এখনো অব্যাহত আছে।

১ গৌরীব-চাটিকা

গৌরীব-চাটিকা দেশীয় ভাষায় চুক্তিপত্রের সবচেয়ে পুরনো নিদর্শন। এগুলি প্রথম সর্বসমক্ষে প্রকাশ করেন প্রয়াত ড. স্যর গঙ্গানাথ ঝা সংস্কৃতে লেখা ম. ম. সচল মিশ্রের একটি রায়ের টীকায়। তিনি মনে করেন, 'গৌরীব-চাটিকা' দাসত্ব বা সেবা-বিষয়ক একটি তকনীকী শব্দবিশেষ। সমস্ত নথিপত্রের আনুপুঙ্খিক বিশ্লেষণ থেকে মনে হয় এটি কারো 'বহিয়া'র (= চাকর) মেয়ের মুক্তিদানের কাজকে বোঝাতে বিশেষত যখন এই মেয়েটির কোনো অন্য পুরুষের সঙ্গে বিবাহ হতো।

ড. ঝা প্রথম 'গৌরব-চাটিকা' ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে পাওয়া যায়— একথা দেখান।

এই 'গৌরব-চাটিকা'গুলির চল ছিল ম. ম. সচল মিশ্রের (১৭৯৪ খ্রি.) সময় পর্যন্ত

— এটাই বোঝা যায়। তাঁর সময়েও কারো ক্রীতদাসের কন্যাকে গৌরব-চাটিকা প্রদানের অধিকার বলবৎ ছিল।

২ বহিখত

'বহিখত' বা 'ক্রীতদাস-বিক্রয় চুক্তি' ছিল এক ধরনের চুক্তি যেখানে কিছু অর্থের বিনিময়ে কোনো বিশেষ দাসকে একজন প্রভুর অধীনেই থাকতে হতো। এগুলির বেশির ভাগ বিশুদ্ধ সংস্কৃতে রচিত। প্রাচীনতম 'বহিখত' যা অদ্যাবধি পাওয়া যায় তা হলো ৫০৯ ল. সং-এর বা ১৬২৭ খ্রিষ্টাব্দের।

এমন অন্যান্য নথিগুলি ১৭৪৬, ১৭৫৫, ১৮১২/১৩, ১৮৩৬ ও ১৮৩৮-এর। মনে হয় ১৯ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই ক্রীতদাসের প্রথা আদালতের আনুগত্য পায়নি এবং সে কারণে, প্রচলিত প্রথায় এগুলি তৈরি হতে থাকে।

এগুলির দেশীয় সংস্করণ বিরল। যেগুলি পাওয়া যায় যেগুলি সাধারণত একজন প্রভুর অন্যজনকে ক্রীতদাস উপহার দেওয়া বা ক্রীতদাস হস্তান্তরের নিদর্শন। সবচেয়ে পুরনো মৈথিলী বহিখত যেটি পাওয়া যায় তার তারিখ ১১৭৭ ফসলি (১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দ)।

৩ অজাতপত্র

মুক্তি সংক্রান্ত নথিপত্রগুলিকে বলা হয় অজাতপত্র। প্রাচীনতম অজাতপত্রের তারিখ ১২৩৬ ফসলি (১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দ)।

৪ অকরার পত্র

উনিশ শতকের শুরু থেকে, ক্রীতদাসক্রয় এবং বিক্রয়ের পাশাপাশি, শ্রমসংক্রান্ত পার্শ্বীয় চুক্তির জনপ্রিয়তা পরিলক্ষিত হয়। এগুলিই 'অকরারপত্র' এবং 'জনৌটি' (অথবা জনৌটি বা জনৌডি)। বহিখত-এর সঙ্গে এগুলির পার্থক্য হল এই যে এতে ক্রীতদাসকে সর্বতোভাবে প্রভুর আনুগত্য স্বীকার করতে হয় না। এক্ষেত্রে ক্রীতদাসের নিজের জীবন নির্বাহের পথ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা থাকে যতক্ষণ সে 'অকরার পত্র' বা জনৌটির শর্তাবলী মেনে চলছে। এই নথিগুলি কুমোর, ধোপা এবং শ্রমিকদের একজন বা বহুজনের ব্যাপারে প্রয়োগ করতে দেখা যায়।

৫ জনৌটি

'জন' বা শ্রমিক জনৌটিতে বহুজনের না, একজনের কাজ করে দিতে চুক্তিবদ্ধ হয় কিছু অর্থের বিনিময়ে। মনে হয় ক্রীতদাস ('বহিআ') এবং এই ধরনের শ্রমিকের ('জন') মধ্যে পার্থক্য ছিল। শেষোক্ত জনকে নিয়মিত পারিশ্রমিক দিতে হত এবং তার শ্রমও

ছিল শর্তাধীন, কিন্তু প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে প্রভুর কাজ করতে হত কোনো নিয়মিত পারিশ্রমিক ছাড়াই। অবশ্য, বহিআ পরিবারের একজন সদস্যের মতোই থাকত এবং তার সমস্ত রকম প্রয়োজনের ব্যাপারে প্রভুই ব্যবস্থা নিতেন। সবচেয়ে পুরনো দেশীয় ভাষার জনৌটি পাওয়া যায় ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দের।

৬ নিস্তারপত্র

আর এক ধরনের চুক্তিপত্র পাওয়া যায়, যেমন— অগ্রিমধার নেওয়ার (করার) এবং তার পরিশোধ সংক্রান্ত চুক্তি (নিস্তারপত্র)।

অনুদান

অনুদান চুক্তিগুলিকে বলা হয় 'বৃত্তিপত্র'। এগুলি মুখ্যত অনুদানের উদ্দেশ্য এবং দেয় জমির অঞ্চল ও এলাকার বিস্তারিত বিবরণ দেয়। জমির প্রাপক এবং তার অনুবর্তী কারা তাদের জন্য শর্তাবলীও এতে থাকে। এগুলির বেশির ভাগই নির্দিষ্ট কাঠামোয় লেখা, তবে কতগুলি তা নয়। এ ধরনের নথিপত্রের দেশীয় ভাষার প্রাচীনতম সংস্করণটির তারিখ ১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দ।

এই জাতীয় সমস্ত চুক্তিপত্রের ধারাই পারসিক এবং আরবীয় ভাষা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। পারসিক ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের পবিত্র ভাষা এবং মনে করা হতো আইনের সত্যতা যোগ হবে যদি এই নথিসমূহের পারসিকিকরণ হয়। সংস্কৃতের অনুদান পত্রের মতো এখানে কোনো সাহিত্যিক বা বর্ণনাত্মক সৌন্দর্য নেই। এগুলি সরল এবং তথ্যানুগ। গদ্যের নিদর্শন হিসাবে এগুলি শুধু প্রকাশ করে কোনো কোনো শব্দের গঠনের পরিবর্তন এবং অ-সংস্কৃত উপাদানের আধিপত্যের পরিবর্তন।

কিছু কিছু এমন নথিও পাওয়া যায় যেখানে অনুদান প্রত্যাহৃত হয়েছে।

বিচার এবং অন্যান্য সরকারি কাগজপত্র ?

শ্রীযুক্ত কে. পি. জয়সওয়ালের ১৭৯৪ এবং মৈথিলী আদালতের স্মরণীয় সংস্কৃত বিচার প্রকাশের পর থেকে এই বিষয়টি পরিষ্কার যে শুধু মিথিলাই হিন্দু আইনের প্রয়োগ বাঁচিয়ে রেখেছিল আধুনিক যুগ পর্যন্ত। এই সব নথিগুলি যাদের বলা হত ব্যবস্থাপত্র, সম্ভবত দেশীয় ভাষায় পরবর্তী সময়ে লেখা হয়।

আমরা কিছু নথি পাই যেগুলি বেশিরভাগই দেশীয় বিচার বিধির শৈলীতে লেখা যা সংস্কৃত বিচারবিধি থেকে ভিন্ন। এদের মধ্যে সবচেয়ে পুরনোটি সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত এবং এর তারিখ ১১৫০ ফসলি (১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দ)।

অন্যান্য যে সরকারি কাগজপত্র পাওয়া যায় সেগুলি হল 'পরওয়ানা' (১৭৯৬ এবং ১৮০০ খ্রি.), নিয়োগপত্র, যেমন মহারাজা মাধবসিংহের কাছ থেকে

(১৭৭৬-১৮০৮ খ্রি.), শাসন এবং ব্যবসাসংক্রান্ত চিঠি (১৭৪৪, ১৮৪০, ১৮৪৫, ইত্যাদি) , এবং শাস্তি সংক্রান্ত নির্দেশাবলী। এগুলি সাধারণত সম্ভ্রান্ত ও উঁচুদরের পারসিকের ধাঁচে লেখা।

চিঠিপত্র

এই যুগের শেষার্ধের বহু চিঠিপত্র পাওয়া যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এদের কোনো সাহিত্যিক মূল্য নেই, এগুলি শুধু পরিষেবা বা কোনো কাজের অনুরোধ বিষয়ক সংক্ষিপ্ত সংবাদ প্রেরণের জন্য লেখা হয়েছিল।

পরিশিষ্ট

ক্বচিৎ আমরা এই সমস্ত নথিতে কোনো সাহিত্যিক সৌন্দর্যের সন্ধান পাই। এখানে কল্পনার কোনো অবকাশ নেই; এগুলি নীরস তথ্য পরিবেশন মাত্র। উল্লিখিত উদাহরণে নথিপত্রের গদ্যের যে বৈশিষ্ট্যগুলি চোখে পড়ে সেগুলি হল — বক্তব্যের সংক্ষিপ্ততা, শব্দের পরিমিত ব্যবহার, সরলতা এবং সহজবোধ্যতা। এগুলি সাহিত্য নয় কারণ, এদের কাজই হল সম্বন্ধহীন থাকা এবং ব্যক্তিগত না হওয়া। এদের মধ্যে আইনের গদ্যের প্রায় সবগুলি গুণই পাওয়া যায়। এখানে সুপরিস্ফুট বক্তব্য, শব্দের সঠিক ব্যবহার এবং নির্দেশাত্মক সুর পাওয়া যায়। এছাড়াও এখানে অবশ্যই সাধারণ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে দুর্বোধ্য শব্দ এবং সাংকেতিক শব্দাবলীর জায়গা লক্ষিত হয়।

মৈথিলী ভাষার সাহিত্যে এদের গুরুত্ব এ কারণে যে গদ্যভাষার ক্রমোন্নয়নে একটি শূন্যস্থান এরা পূরণ করে। কিছু শব্দ এবং বাক্যবিন্যাসের ধারার আদি গঠন থেকে আধুনিক স্তরে পৌঁছনোর ধাপগুলি এখানে খুঁজে পাওয়া যায় এবং এছাড়াও মিথিলার সামাজিক ইতিহাসের ঝলক আমরা পাই। এগুলি সেদিক থেকে ঐতিহাসিক নথিরও কাজ করে।

২
নাটকে ব্যবহৃত গদ্য

কীর্তনিয়া নাটকে দেশীয় গদ্যের জায়গা বিশেষ নেই। তবে এদের কোনো কোনোটিতে গদ্য ব্যবহৃত হয়েছিল জ্যোতিরীশ্বরের 'বর্ণরত্নাকরে'র আদলে। এর অনেক বেশি উদাহরণ আছে নেপালী নাটকে। অন্য বেশ কিছু নেপালী নাটক আছে যেখানে গদ্যে ছোটো ছোটো বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে গানের মধ্যে ভিন্ন স্বাদ এবং একঘেয়ে গান এবং বাজনা থেকে ভিন্নতা আনার উদ্দেশ্যে। জগজ্জ্যোতির্মল্লের 'হরগৌরীবিবাহে' গদ্যের ব্যবহার অনবদ্য— ধন্যাত্মক ও গীতিময় গদ্য সেখানে পাই যার আবৃত্তি সুন্দর আবহ তৈরি করে। এটি, যদিও জ্যোতিরীশ্বরের চেয়ে কম পরিচিত।

অগাস্টাস কনরাডি সিদ্ধি-নরসিংহের 'হরিশচন্দ্রনৃত্যমে' ব্যবহৃত গদ্যানুচ্ছেদের দুটি স্তরভেদ করেন। প্রথমটি তাঁর মতে উঁচু শ্রেণীর মানুষের মধ্যে কথোপকথনের জন্য ব্যবহৃত এবং দ্বিতীয়টি নীচুতলার মানুষের মুখের ভাষা।

এরও পরে অপেরাধর্মী নেপালী নাটকে গদ্যের বিশেষ ব্যবহার নেই। ড. পি. সি. বাগচীর মতে সম্ভবত সেখানে মৌখিক গদ্য-অনুচ্ছেদ ব্যবহার হতো স্বতঃস্ফূর্তভাবে যেমন কীর্তনিয়া নাটকে করা হত।

যাই হোক, 'অঙ্কিয়া নাটে' প্রথম গদ্যের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। বস্তুত এখানে সমস্ত অংশের তিন-চতুর্থাংশই গদ্যে লেখা। শুধু যে গদ্যানুচ্ছেদের বহুল ব্যবহার আছে তাই নয়, এগুলি মধ্যযুগের ধর্মীয় গদ্যেরও সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। এই নাটকগুলিতে ব্যবহৃত গদ্যে বর্ণনামূলক গদ্যভাষার সব গুণই চোখে পড়ে। দর্শকের কাছে এরা 'ঘটনার গতি ও সঠিক বিষয়' পৌঁছে দেয় 'বিষয়ানুগত্য, পরিমিতি এবং গতি'-র মাধ্যমে। নেপালী বা কীর্তনিয়া নাটকে গদ্য অবশ্য বেশি গীতিময়, বেশি সাহিত্যধর্মী এবং বেশি সুন্দর।

অসমিয়া নাট্যকারেরা তাদের বর্ণনাকে বিস্তারিত বা অলংকৃত করেন না। সেখানে লেখক বা বর্ণনাকারীর ব্যক্তিত্ব এবং বর্ণিত বিষয়কে মেলাবার কোনো উপায় নেই। শব্দ সেখানে অল্প এবং তা গতিকে রুদ্ধ হতে দেয় না। নগ্ন সরলতা সেখানে পাই — কোনো অলঙ্কার, প্রবচন বা গঠনে কোনো জটিলতা বা অনুচ্ছেদের সহজবোধ্যতায় বাধা দেবার মতো কোনো কিছুই সেখানে নেই। কিন্তু, এর অর্থ এই নয় যে অঙ্কিয়া নাটের গদ্যশৈলী উচুঁদরের নয় বা গীতিময় নয়। তারা, যদিও, কীর্তনিয়া বা নেপালী নাটকের মতো অত সুরচিত নয় শৈলীর দিক থেকে।

সমস্ত অসমিয়া গদ্যে বিভিন্ন অনুভূতির প্রকাশ দর্শককে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করে তোলার চিন্তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে, মিথিলায় এই নাটকগুলি সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না, এবং সেকারণে এগুলি মিথিলার লেখকদের কোনোভাবে প্রভাবিত করতে পারে নি বা এজাতীয় গদ্য প্রয়োগে তাদের উদ্বুদ্ধও করতে পারে নি।

চতুর্দশ অধ্যায়

মধ্যযুগে মৈথিলী কবিতা

১

ভূমিকা

খণ্ডবলাকুলের ক্রমবিলুপ্তি

আমরা আগেই মৈথিলী কবিতার ইতিহাসের সূত্র নির্ণয় করেছি এবং তাতে দেখা গেছে যে মৈথিলী কবিতা নাটকের থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীন রূপ নিয়েছিল এবং তা অব্যাহত ছিল মহারাজ নরপতি ঠাকুরের (১৬৯০-১৭০৪ খ্রি.) রাজত্ব পর্যন্ত। মহারাজ নরপতি ঠাকুরের সময় থেকে মহারাজ মহেশ্বরসিংহের (১৮৫০-১৪৬০ খ্রি.) সময় পর্যন্ত মিথিলায় লক্ষণীয় পরিবর্তন আসে। এ রাজ্যের ভাগ্যের উপর ইউরোপীয় বণিকদের আবির্ভাব বিশেষ প্রভাব ফেলে। মৈথিল রাজারা তাঁদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য শক্তি সঞ্চয় করেন। কিন্তু বাংলার রাজনীতি সে সময় দুর্বল হয়ে পড়ায় এদের কোনো শক্তিশালী সেনাবাহিনীর সাহায্য মেলেনি। মহারাজ নরপতি ঠাকুরের উত্তরসূরি মহারাজ রাঘবসিংহ (১৭০৪-১৭৪০ খ্রি.) মিথিলার সেনাবাহিনীকে আবার শৃঙ্খলাবদ্ধ করে শাসনতন্ত্রকে শক্তিশালী করে তোলেন। তিনি তাঁর পারিবারিক পদবী 'ঠাকুর'-এর জায়গায় বীরোচিত উপাধি 'সিংহ' ব্যবহার করেন। তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তরের কোনো এক বিরু কুরমির বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হন এবং এ কাজের জন্য বাংলার নবাব আলিবর্দী খাঁ তাঁকে সম্মানিত করেন। যাই হোক, এই রাজত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন মহারাজ নরেন্দ্রসিংহ (১৭৪৪-১৭৬১ খ্রি.)। তিনটি বিখ্যাত যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেন যা তাঁকে বিশ্বখ্যাতি এনে দেয়। এদের মধ্যে একটি, কন্দর্পির যুদ্ধ (ঝঞ্ঝরপুরের কাছে) ছিল একটি স্মরণীয় ঘটনা।

দুর্ভাগ্যবশত, মহারাজ নরেন্দ্রসিংহের পরে যিনি রাজা হন, অর্থাৎ মহারাজ প্রতাপসিংহ (১৭৬১-১৭৭৬ খ্রি.), তিনি ছিলেন অত্যন্ত অকর্মণ্য এবং অখ্যাত। এঁর উত্তরসূরি মহারাজ মাধবসিংহ (১৭৭৬-১৮০৮ খ্রি.) স্বাধীনতার এই প্রচেষ্টার সমাপ্তি ঘটান। বাংলা ও বিহারের দেওয়ানি ব্রিটিশদের কাছে হস্তান্তরের পালা এঁর রাজত্বে শেষ হয়। মিথিলা (বা তিরহুত) রাজ্যের স্বাধীন রাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি লাভের দাবি স্বীকৃত হয় নি, এবং এটি একটি সামান্য জমিদারিতে পর্যবসিত হয় লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রয়োগে।

এরপরে মিথিলা রাজ্যের গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে কমে যায় যা এখানকার সাহিত্যের ক্রমাবনতির জন্য দায়ী। পরবর্তী প্রজন্মে এখানে ক্রমশই প্রতিবেশী অঞ্চলের ভাষা 'মধ্যদেশভাষা'-র বহুল ব্যবহার হতে থাকে। একসময় শৌরসেনী মধ্যদেশে যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল এখন তাঁর পরবর্তী অনুসারী 'ব্রজভাষা' সে গৌরব অর্জন করে।

শৌরসেনীর মতো এই ভাষাও বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এর আর একটা সুবিধা ছিল এই যে এটি ব্রজের সঙ্গে যুক্ত ছিল যা ছিল ভগবান কৃষ্ণের জন্মভূমি; কৃষ্ণের গল্পগুলি মধ্যযুগের ভারতে অভূতপূর্ব খ্যাতিলাভ করেছিল। এইসময় এগুলি ক্রমেই যে পূর্ব ভারতকে, অর্থাৎ মিথিলা, অসম, বাংলা এবং ওড়িশাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল তার প্রমাণ আমরা পাই।

মিথিলার ব্রজভাষার উন্নতি মৈথিলী সাহিত্যের উপরে আঘাত হানে। লোচন নিজেই এ ব্যাপারে উৎসাহিত এবং আনন্দিত হন এবং প্রায় কুড়ি পাতার মতো কবিতা তিনি মধ্য-দেশ-ভাষার প্রতি উৎসর্গ করেন। মহারাজ রাঘবসিংহের রাজত্বের পরে এর ব্যবহার আরও ছড়িয়ে পড়ে। মিথিলার বেশ কিছু সংখ্যক কবি ব্রজভাষার কাব্যরচনায় নিজেদের উৎসর্গ করেন।

যাই হোক না কেন, এই সময় জুড়ে মৈথিলী কবিদেরও ধারাবাহিক এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ আমরা দেখি।

মধ্যযুগের মৈথিলী কবিতা

প্রকৃতপক্ষে ওইনিবার রাজত্বের পতনের পরে যে সব কবি খ্যাতিলাভ করেন তাঁদের সবার বিষয়েই এখানে আলোচনা করা উচিত। কিন্তু আমরা আগেই বর্তমান কাজের সুবিধার্থে এঁদের সম্পর্কে আলোচনা করেছি। লোচন এবং গোবিন্দদাসের পরে মহারাজ নরেন্দ্রসিংহের (১৭৪৪-১৭৬১ খ্রি.) সময় পর্যন্ত তুলনামূলকভাবে কম কাজ হয়। বিদ্যাপতির প্রভাবও কম আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে থাকে; এসময় একটি বিশেষ স্পন্দন দেখা দেয় এবং তাঁর ও তাঁর উত্তরসূরি মাধবসিংহ, ছত্রসিংহ, রুদ্র সিংহ এবং মহেশ্বর সিংহের অধীনে বেশ কিছু কবির আবির্ভাব হয়। ১৮৬০ সালে মহারাজ মহেশ্বর সিংহের মৃত্যুর পরে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত বিচার বিভাগের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্যের কাজকর্ম চলেছিল। এইসময়ে সরকারি ভাষা হিসেবে উর্দু প্রচলিত হয় এবং মৈথিলী ভাষা পরিত্যক্ত হয়। যে কারণে মৈথিলী সাহিত্যের মধ্যযুগের পরিসমাপ্তি ঘটে ১৮৬০ সালে। নতুন রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং সাহিত্যিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয় এবং মৈথিলীর নতুন যুগ শুরু হয়। যাই হোক, অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো মধ্যযুগের মৈথিলী কবিতার ক্ষেত্রেও সময় বিভাগ সঠিকভাবে মেনে চলা সম্ভব নয়।

এ যুগের কবিতা নিম্নলিখিত কাব্যসংগ্রহে পাওয়া যায় :

অ. প্রকাশিত রচনা

১। মৈথিলী ক্রেস্টোম্যাথি (১৮৮২), স্যার জর্জ এ. গ্রিয়ারসন সম্পাদিত; ২। স্যার জর্জ এ. গ্রিয়ারসন সংকলিত '২১টি বৈষ্ণব স্তোত্র' (১৮৮৪) — কৃষ্ণ বিষয়ক উপকথা নিয়ে লেখা অতি পরিচিত কিছু মধ্যযুগের কবিতার সংকলন; ৩। ভোলা ঝা কর্তৃক সংকলিত

মিথিলার প্রায় দুশো গানের সংকলন; 'মিথিলা-গীত-সংগ্রহ (১৯১৭; চার খণ্ডে); ৪। বাবু ললিতেশ্বর সিংহ দ্বারা সংকলিত ভক্তিমূলক মৈথিলী এবং সংস্কৃত গানের একটি সংকলন 'মৈথিল ভক্ত প্রকাশ' (১৯২০); ৫। গীতিরত্নাবলী— পণ্ডিত বদ্রীনাথ ঝা সম্পাদিত; এটি শ্রীজিতেন্দ্র নারায়ণ ঝা-এর কাছে রক্ষিত পাণ্ডুলিপির উপর ভিত্তি করে লেখা; ৬। স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বা আলাদাভাবে প্রকাশিত কবিতা, যেমন, রামেশ্বরের কবিতা, মনবোধের 'কৃষ্ণজন্ম', সাহেবরামের 'পদাবলী' ইত্যাদি।

আ. অপ্রকাশিত রচনা

১। মঙ্গরৌনী পাণ্ডুলিপি : এতে আছে রতিপতির গীতগোবিন্দের অনুবাদ, আনন্দ কবির ব্রজভাষার কাজ 'কোকসার', মনবোধের 'কৃষ্ণজন্ম', সুরদাসের 'গীতদশাবতার', ব্রজভাষার 'দানলীলা', অজ্ঞাতনামা কারো 'সুদামাচরিত্র','তীর্থাবলী' এবং 'রুক্মিণীপ্রশংসা' এবং অন্যান্য কিছু কবিতা। পাণ্ডুলিপির প্রচ্ছদ জীর্ণ, ছেঁড়া, এমনকি পুড়ে যাওয়া। এটি অন্তত ৯০ বছরের পুরনো, কারণ আনন্দ কবির 'কোকসার'-এর অনুলিপি করেন রামপট্টির কোনো এক মোতীলালদাস ১৮৮৪-৮৫- তে। শুধু প্রথম দুটি কাজই তিরহুতায়। বাকি সবই নাগরী লিপিতে লেখা। পাণ্ডুলিপিটি আবিষ্কার করেন মহামহোপাধ্যায় ড. উমেশ মিশ্র মঙ্গরৌনীর শ্রীধর ঝা-র পারিবারিক পাণ্ডুলিপির সংগ্রহ থেকে।

২। গজহারা পাণ্ডুলিপি : এটি প্রায় ১০০ দুষ্প্রাপ্য গীতিকবিতা এবং অজ্ঞাতনামা কারো 'রুক্মিণীস্বয়ম্বর' এবং চক্রপাণি- র 'উষাহরণ'-এর একটি সংকলন। এতে এছাড়াও আছে ব্রজভাষার কবিতা, যেমন,'কদম্বলীলা','চৌতীসাস' 'কবিত্ত' এবং কিছু 'দোহা'। শেষে গজহরার দামোদর মিশ্র কৃত বিদ্যাপতির কিছু কবিতার টীকা এবং চন্দা ঝা থেকে কিছু অংশ যুক্ত হয়েছে। পাণ্ডুলিপির প্রচ্ছদে চানপুরার শ্রীবিশ্বনাথ চৌধুরী-র নাম থাকলেও প্রকৃতপক্ষে, মনে হয় এটি ছিল সোতিপুরার কায়স্থদের। এটি লেখা হয় নাগরী ও দেবনাগরী লিপিতে এবং মনে হয় বিভিন্ন অনুকার এটি লেখেন। এর আবিষ্কর্তা বর্তমান গ্রন্থের লেখক। তিনি এটি খুঁজে পান পাণ্ডুলিপির পারিবারিক সংগ্রহে। তুলনামূলকভাবে এটি ভালো অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে এবং মনে হয় এটি একশো বছরের বেশি পুরনো নয়।

৩। বিক্ষিপ্ত রচনাবলী : মৈথিলী সাহিত্য পরিষদে (মুখ্যত পচহীর গঙ্গাপতি সিংহ কর্তৃক সংকলিত) এবং সখবার-এর মুনশি রঘুনন্দনদাস, মধেপুরার লক্ষ্মীপতিসিংহ প্রমুখর পারিবারিক গ্রন্থাগারে। এতে আছে শিবদত্তের সীতাস্বয়ম্বর, কর্ণ শ্যামের পদাবলী, ভঞ্জনের পদাবলী (বিশ্বনাথ কবির হাতে লেখা 'বালাজী'), বিশ্বনাথ কবির পাণ্ডুলিপি, লক্ষ্মীনাথের পদাবলী এবং অন্যান্য পাণ্ডুলিপি সমূহ।

একথা জোর দিয়ে বলা যায় না যে এ যুগের কবিতা শব্দাদি নির্বাচনে এবং শৈলীতে আগের অধ্যায়ে আলোচিত কবিতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বলা যায়, এগুলি কম প্রাচীন, বেশি আধুনিক: এদের পটভূমিকা অধিক বিস্তৃত এবং বক্তব্যবিষয় বেশি।

২
গীতিকবিতা

লোচন এবং গোবিন্দদাসের যুগের পরে যাঁদের কবিতা প্রসিদ্ধি লাভ করে তাঁদের মধ্যে কবিশেখর ভঞ্জন, বুদ্ধিলাল এবং রামেশ্বর (সবাই মহারাজ রাঘবসিংহ [১৭০৪-১৭৪০ খ্রি.]-এর সমসাময়িক),-এর নাম উল্লেখ্য। মহারাজ নরেন্দ্রসিংহ (১৭৪১-৬১ খ্রি.) -এর অনুগ্রহভাজন নিরঞ্জন ঝা 'নিধি', লাল কবি এবং রমাপতি উপাধ্যায়; মহারাজ প্রতাপসিংহ (১৭৬১-৭৬ খ্রি.)-এর অনুগ্রহভাজন কেশব, মোদনারায়ণ, নন্দীপতি 'বাদরি' এবং হরিনাথ; মহারাজ মাধবসিংহ (১৭৭৬-১৮০৮ খ্রি.)-এর অনুগ্রহভাজন মঙ্গনীরাম ঝা (১৬৮৭-১৭৯৫ খ্রি.), মনবোধ (মৃত্যু আনুমানিক ১৭৮৮ খ্রি.), বেণীদত্ত ঝা, জয়ানন্দ এবং তাঁর পুত্র গুণানন্দ, কুলপতি, সুকবি গণক, কৃষ্ণপতি এবং কৃষ্ণদত্ত; মহারাজ ছত্রসিংহ (১৮০৮-৩৯ খ্রি.) এবং মহারাজ রুদ্রসিংহের সমসাময়িক করণ শ্যাম ও রত্নপাণি; মহারাজ মহেশ্বরসিংহের (১৮৫০-৬০ খ্রি.) সমসাময়িক ববুজুন ঝা, তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভানুনাথ ঝা এবং আদিনাথ (দামোদর); মহারাজ লক্ষ্মীশ্বরসিংহের (১৮৭৮-৯৮ খ্রি.) সমসাময়িক হর্ষনাথ ঝা, কার্নাট, বিশ্বনাথ, রঘুনন্দন, ভীমদত্ত ঝা 'ভীম' এবং মোদনাথ— এঁরা সবাই প্রকৃতপক্ষে মৈথিলী সাহিত্যের আধুনিক যুগের অন্তর্গত, কিন্তু এঁদের এই পর্যায়ে ফেলার কারণ হল এই যে এঁরা ভাব এবং শৈলীর বিচারে এ যুগের পথিক; আধুনিক যুগের কোনো লক্ষণই এঁদের মধ্যে দেখা যায় না।

এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন স্বনামধন্য কবি ছিলেন যাঁরা গীতিকবিতার বিশেষ বিশেষ গঠন নিয়ে কাজ করেছেন। যেমন, 'নিধি' তাঁর 'লগনী', রমাপতি উপাধ্যায়, নন্দীপতি, ভানুনাথ ঝা, ববুজুন ঝা এবং হর্ষনাথ ঝা তাঁদের বিভিন্ন ধরনের প্রেমময় গীতকবিতা ও অন্যান্য নানা ধরনের প্রচলিত ধারার গীতিকবিতা, মনবোধ, কবি লাল, সুকবি গণক এবং মঙ্গনীরাম তাঁদের সোহরের জন্য স্মরণীয়। করণ শ্যাম লিখেছেন অসাধারণ সুন্দর কিছু মহেশবাণী ও নচারী। এঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে কৃতী ছিলেন নন্দীপতি ও মনবোধ। এঁরা এ যুগের সব ধরনের কবিতার প্রচলন করেন। বস্তুত এঁরা মৈথিলী কবিতাকে ভিন্ন চেহারা দেন — তাকে বিদ্যাপতির ঐতিহ্যের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেন। অন্যান্য কবিরা বিদ্যাপতি বা মনবোধকে অনুসরণ করেন। মনবোধ কবিতায় সহজতা ও স্বতঃস্ফূর্ত শৈলী নিয়ে আসেন; জ্ঞানগর্ভ এবং পরিশীলিত কল্পনা বর্জন করে নতুন কবিতার জন্ম দেন। তিনি এভাবে কবিতায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনেন। সুশিক্ষিত পণ্ডিতদের দেশ থেকে বিদ্যাপতির কবিতার ধারা সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি ঠিকই, তবে কবিতায় সহজতা এবং সুস্পষ্ট বক্তব্যের ব্যবহারকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেন। মনবোধ এতটাই করতে পেরেছিলেন যে পরবর্তী সময়ে এ যুগের নতুন গীতিকবির দল প্রায়ই সহজ লোকধারা গ্রহণ করে তাদের অসাধারণ সাহিত্যিক মর্যাদা দেন। এমনই একজন হলেন ফতুর কবি যিনি ১৮৮০ সালের দুর্ভিক্ষ নিয়ে লেখেন।

এখানে এ যুগের একটি ছবি আমরা পাই। কিন্তু একথাও বলা দরকার যে বেশ কিছু সংখ্যক কবির পরিচয় পাওয়া যায়নি এবং তাঁদের সম্পর্কে কোনো বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়; কারণ এদের জীবন বা কাজ সম্বন্ধে খুব সামান্যই আমরা জানতে পারি। এসব কবিদের মধ্যে তুলনায় অধিক খ্যাতিলাভ করেছিলেন রামেশ্বর, কেশব, হরিনাথ, মাধব, শ্রীপতি, মহীপতি, চতুর্ভুজ (পূর্বোল্লিখিত 'চতুর' চতুর্ভুজ থেকে আলাদা), চক্রপাণি, জয়কৃষ্ণ, জীবনাথ, দুর্মিল এবং গোবিন্দ। সমকালীন কাব্যে এঁদের কবিতা বিশেষ স্থান অধিকার করে; যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভণিতায় বিদ্যাপতির নামের পরিবর্তে এঁদের নাম পাওয়া যায় বা এঁদের কবিতার সঙ্গে বিদ্যাপতির নাম যুক্ত হতে দেখা যায়।

যাই হোক, এমন অনেক কবি আছেন যাঁদের কাজ কোনো খ্যাতিই পায়নি এবং যাঁদের সম্পর্কে আমরা কোনো তথ্যই পাইনি। এমন হতে পারে যে এঁদের কাজের আরও ব্যাপক সন্ধান হলে আমরা আরও বেশি তথ্য পাবো বা এঁদের কাজের যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারবো। এ সব কবিদের অনেকেই অজ্ঞাতনামা; তবে কারো কারো নামের উল্লেখ কাব্যসংগ্রহে উল্লিখিত কবিতায় পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে নিম্নলিখিত কবিদের নাম উল্লেখের দাবি রাখে: অনিরুদ্ধ, আনন্দকবি, একরদেশ্বর-সিংহ, গৌরীপতি, করণ গোপালদাস, গোপীশ্বর সিংহ, চতুরানন (পূর্বের রাগতরঙ্গিণীতে উল্লিখিত চতুরানন থেকে ভিন্ন), জয়নাথ, জলধর, তুলারাম দত্ত, গণক দত্ত কবি, দাস (আশা), দীনবন্ধু, দেবনাথ, দ্বিজ, দুঃখহরণ, দুর্গাদত্ত দীননাথ, ধৈরজপতি, ধনপতি, ধর্মেশ্বর, নন্দলাল, বংশীধর, নেবালাল, প্রেমলাল, ব্রহ্মদাস, ববন, বাগীশ্বর, বলভদ্র, বালাজী, বাসুকি, বাসুদেব, ভোরানাথ, মুকুন্দ, মধুকর, মিত্রনাথ, মোতীলাল, মুক্তিরাম, যদুনাথ, যদুবরদাস, রামনাথ, রুদ্রনাথ, লোকনাথ, শঙ্কর কবি, শঙ্খরত্ন, শোভনাথ, সুবংশলাল, সত্যনারায়ণ, সুকবি মিত্র, সেবকজন, সুকবিদাস, সুরদাস, সূরশ্যাম, শ্যামসখা, সুজনদাস, শম্ভুদাস, শম্ভুদত্ত, সনাথ কবি, হেমকর, নবহেমত, হৃদয়দাস, তুলসীদাস, তেজনাথ, কাহ্নারাম (গৌরীস্বয়ম্বরের রচয়িতা হতে পারেন?), মধোদাস এবং নন্দীদাস।

মোটামুটিভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে মৈথিলী গীতি কবিতার ভাবধারায় আমূল পরিবর্তন আসে। প্রেমময় গীতিকবিতা এবং ব্যবহারিক (আনুষ্ঠানিক) গীতিকবিতা লেখা চলতে থাকে, কিন্তু বেশি মনোযোগ দেওয়া হয় ভক্তিমূলক ও আপাত-দার্শনিক বিষয়ের উপর। এই প্রবণতা পূর্বে আলোচিত কিছু কবির মধ্যেও দেখা যায় : রত্নপাণি, গোপীশ্বর, শঙ্কর, রামনাথ, আদিনাথ (দামোদর), রঘুনন্দন প্রমুখ স্তোত্র রচনা করেন। পরে বিষ্ণুপদ মৈথিলী কবিদের কল্পনাকে আশ্রয় করে। সুরদাস ও তুলসীদাসের নাম ছড়িয়ে পড়ে এবং ভণিতায় এঁদের নামসহ সমস্ত রকমের ভজন — হয় সুরদাস বা তুলসীদাস প্রমুখ হিন্দি কবিদের অনুকরণে বিষ্ণুপদ অথবা স্বাধীন কবিতা — সে যুগে প্রচলিত হয়।

এই প্রবণতার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন একদল কবি যাঁরা সবাই সাধু মোহান্ত শ্রেণী থেকে

উদ্ভূত ; এঁরা ছিলেন বিষ্ণুর উপাসক। বিখ্যাত বৌদ্ধ আচার্যরা যেমন 'চর্যাপদে' মৈথিলী কবিতার গোড়াপত্তন করেন তেমনি এ যুগে গোঁসাইরা (সাধু) সমস্ত মিথিলায় বৈষ্ণবত্বে বিশ্বাস প্রচলনের চেষ্টার সুবাদে দেশীয় ভাষার সাহিত্যকে নতুন জীবন দেন। এঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হলেন মহাত্মা-সাহেবরামদাস এবং লক্ষ্মীনাথ গোঁসাই। এ দেশের কাব্যে তাঁদের দান অসাধারণ।

এই সব সাধুদের কালানুক্রমিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে এঁদের মধ্যে বেশি পরিচিত ছিলেন মহাত্মা গণপতি গোঁসাই (১৭০৩ খ্রি.),মহাত্মা সাহেবরামদাস (আ.১৭৪৬ খ্রি.), মহাত্মা রোহিণীদত্ত গোঁসাই (মহারাজ রুদ্রসিংহ [১৮৩৯-১৮৫০ খ্রি.]-এর সমসাময়িক), মহাত্মা তারাদত্ত গোঁসাই, মহাত্মা হরিকিঙ্করদাস, মহাত্মা হকরু গোঁসাই, মহাত্মা পরমানন্দদাস, মহাত্মা রঘুবর গোঁসাই এবং মহাত্মা কমলাদত্ত গোঁসাই। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ সমাজের উচ্চশ্রেণীর হলেও সমস্তরকম পার্থিব আসক্তি কাটিয়ে উঠে ঈশ্বরের সেবায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে সাধারণ সাধুদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে যে সব গোঁসাই মৈথিলীতে কাব্যরচনা করেছেন তাঁদের সম্পর্কে নীচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

১. সাহেবরামদাস

সমস্ত কবিদের মধ্যে সাহিত্যের নিরিখে নিঃসন্দেহে সাহেবরামদাস সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি আসলে ছিলেন কুসুমৌলী গ্রামের এক ব্রাহ্মণ। বলা হয় তিনি নিজের প্রিয় পুত্র প্রিয়তমর মৃত্যুতে সংসারজীবন ত্যাগ করেন। কেওটির যোগীরাজ বলিরামদাস-এর অধীনে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং পচাটী মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কৃষ্ণের একজন ভক্ত ছিলেন মনে হয়। পরম্পরাগতভাবে কথিত আছে যে তিনি অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। শোনা যায় নবাবের কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায়ও তিনি গঙ্গাস্নান করে আসেন। তাঁর পদাবলীর মুদ্রিত সংস্করণ থেকে মনে হয় তিনি মহারাজ নরেন্দ্রসিংহ (১৭৪৪-৬১ খ্রি.)-এর সমসাময়িক ছিলেন কারণ তাঁর পদাবলীর কাল ১১৫৩ ফসলি (১৭৪৬ খ্রি.)।

সাহেবরামদাসের পদাবলীর খ্যাতির মুখ্য কারণ তাঁর 'বিষ্ণুপদ' এবং 'রাস'। তবে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎস্য এবং মধুর রসাত্মক সমস্ত ধরনের কবিতাই এতে স্থান পেয়েছে। সব কবিতাই ঈশ্বরের সঙ্গে এই সাধক-কবির আবেগঘন সংযোগের সাক্ষ্য বহন করে। তিনি কৃষ্ণ এবং শিব— উভয়ের উদ্দেশেই গান লেখেন। মিথিলার প্রতি তাঁর ছিল অগাধ দেশপ্রেম।

যাই হোক, তিনি বিশেষ মনোযোগ দেন কৃষ্ণের জন্ম (একটি সোহরায়), পূতনা-বধ-লীলা (একটি দীর্ঘ কবিতায়) এবং তাঁর শৈশব ক্রীড়া এবং যৌবনের (বহু কবিতায়) প্রতি। তাঁর রাসের গানে তিনি মনে মনে ঈশ্বরের সঙ্গে নিজের নৃত্যলীলার কথা এবং তাঁর উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করেছেন।

এই কবি বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতার এবং অলৌকিক লীলা-বিষয়েও সচেতন। পরোক্ষভাবে তিনি প্রহ্লাদ, অজামিল, গণিকা, কুবুজা, ব্যাধা প্রভৃতি সংক্রান্ত গল্পের উল্লেখ করেন যেখানে ভগবান পাপীদের দমন করেছেন।

একটি বিখ্যাত গানে তিনি রামের দুঃখ বর্ণনা করেছেন যখন রাম মারীচ বধ করে ফিরে এসে দেখছেন সীতা নেই।

সাহেবরাম ছদ্ম-বৈদান্তিক বিষয়েও উৎসাহ দেখান যা ছিল অধিকাংশ সাধক-কবির কবিতার বিষয়। তবে এ ধরনের কবিতায় সাহেবরাম অনেকক্ষেত্রেই দুর্বোধ্য।

ভজন বা সোহরা বা রাস — সব ধরনের গানেই সাহেবরামের রচনাশৈলী সহজ, স্বচ্ছন্দ, বিশেষভাবে উপভোগ্য তাঁর ছন্দের প্রয়োগ। প্রায়শই মনে হয় এই কবির পক্ষে ঈশ্বরের নামোল্লেখই যথেষ্ট। নিজেকে তিনি তাঁর ভাবনায় হারিয়ে ফেলেন। এ ব্যাপারে তাঁর সুস্পষ্টতা অদ্ভুত সাঙ্গীতিক আবেদন বিশেষ সহায়ক। চন্দা ঝা এই কবির সঙ্গীত অনুকরণ করে তাঁর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা দেখান।

২. বেণীদত্ত গোঁসাই

মহারাজ মাধব সিংহ (১৭৪৪-৬১ খ্রি.)-এর সমসাময়িক এই কবি ছিলেন সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত। তিনি মৈথিলীতে কিছু প্রেমমূলক কবিতা লেখেন যা ছিল সাধক ভাবের পরিপন্থী।

৩. লক্ষ্মীনাথ গোঁসাই

লক্ষ্মীনাথ গোঁসাই উনিশ শতকের মধ্যভাগে ভাগলপুর জেলার উত্তরে সুখপুর-পরসরমা গ্রামের এক গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন বচ্চা ঝা। ছেলেবেলা থেকে তাঁর মনে ধর্মের প্রতি অনুরাগ ছিল এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তিনি বেদান্ত-দর্শন আয়ত্ত করেন। সংসারে তাঁর মন ফেরাবার জন্য তাঁর বিবাহ দেওয়া হয় দ্বারভাঙা জেলার কহুআ গ্রামের কোনো এক সোখাদত্ত ঝা-এর কন্যার সঙ্গে। কিন্তু পারিবারিক জীবনে তাঁকে বেঁধে রাখা যায় নি; বিবাহের পরেই তিনি গৃহত্যাগ করে শিবের বিখ্যাত তীর্থ সিংহেশ্বর স্থানের উদ্দেশে যাত্রা করেন। দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করে তরাই-এর জঙ্গলে তিনি নিজের গুরু লম্বনাথ স্বামীর সন্ধান পান। নয় বছর কঠোর প্রায়শ্চিত্তের পরে তাঁর গুরু তাঁকে মুক্তি দেন।

লক্ষ্মীনাথ ফিরে আসেন ঈশ্বরভক্তি প্রচারের উদ্দেশ্যে। স্তোত্রের ভণিতায় তিনি 'লক্ষ্মীপতি' ছদ্মনাম ব্যবহার করেন। হিন্দি এবং মৈথিলী দুই ভাষাতেই তিনি কাব্যরচনা করেন। মৈথিলী কবিতাগুলি বিভিন্ন ধরনের—চৌমাসা, তিরহুতি, প্রাতী (স্তোত্র ইত্যাদি), বিষ্ণুপদ এবং মহেশবাণী। বিষ্ণুপদগুলি ('লক্ষ্মীনাথী বিষ্ণুপদ' হিসেবেও পরিচিত) অবশ্যই তাঁর শ্রেষ্ঠ কাজ। এমন হতে পারে যে প্রেমের গানগুলি অন্য কোনো কবির রচনা যিনি ভণিতায় নিজেকে 'লক্ষ্মীপতি' হিসেবে পরিচয় দেন।

কবি হিসেবে লক্ষ্মীনাথের সৃজনমূলক কল্পনাশক্তি সাহেবরামের চেয়ে অনেক বেশি, কিন্তু একজন ভক্তকবি হিসেবে মহাত্মা সাহেবরাম অনেক বড়, যদিও এখনো তাঁর নিজের জেলায় তিনি স্মরণীয় অলৌকিক শক্তির অধিকারী একজন প্রসিদ্ধ সাধক হিসেবে।

৪. রামরূপদাস

রামরূপদাস ছিলেন সমস্তিপুরের মরি-মঠের প্রতিষ্ঠাতা। বলা হয় তিনি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে খ্যাতিলাভ করেন। মিথিলায় তাঁর ভজনগুলি বহুল প্রচলিত।

৫. হরিকিঙ্করদাস

হরিকিঙ্করদাস উনিশ শতকের মধ্যভাগে কোইলখের এক যোগ্য মৈথিল ব্রাহ্মণ পরিবারের অন্তর্গত। তিনি ব্রজের উদ্দেশে যাত্রা করেন এবং তিনি ছিলেন শ্রীমদভাগবতের বিশেষ অনুরাগী। মৈথিলীতে তিনি বহু ভজন রচনা করেন।

৬. পরমানন্দদাস

মকরন্দা মঠের অধ্যক্ষ পরমানন্দদাস ছিলেন আসলে হরিনগর গ্রামের অধিবাসী। একমাত্র প্রাপ্ত কবিতা যেটি তাঁর লেখা বলে মনে হয় সেটি হল শিবের উপাসনা বিষয়ক একটি কবিতা।

৭. জয়দেব স্বামী

এই কবির কাল বা জীবন সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। তাঁর লেখা একটি চৌমাসা আছে যেখানে গোপীরা বর্ষায় কৃষ্ণের আগমনের জন্য উদগ্রীব।

এই কবিরা মৈথিলী কবিতাকে সাধারণ মানুষের কাছাকাছি পৌঁছে দেন এবং কিছু লোকধারাকে সাহিত্যিক মর্যাদা দেন।

৩
দীর্ঘ কবিতা

পরবর্তীকালের মধ্যযুগের কাব্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন এক ধরনের দীর্ঘ কবিতা। কীর্তনিয়া নাটকের ধারা ক্রমশ অবলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছিল যখন এজাতীয় কবিতা আত্মপ্রকাশ করে। এগুলিকে মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়—(অ) সংস্কৃত ভাষার মহাকাব্য এবং দীর্ঘ কবিতার অনুবাদ; (আ) সম্মর ও চরিত; (ই) অন্যান্য কবিতা।

অনুবাদ

অনুবাদগুলি প্রকৃতই মূলের অনুসরণে লেখা এবং মূল রচনার সমস্ত রকম পরিবর্তন

এতে স্থান পেয়েছে। এদের মধ্যে প্রাচীনতম হল রতিপতি ভগতের 'গীত-গোবিন্দ'। এটি এখন প্রকাশ করেছেন ড. পরমানন্দ ঝা 'Journal of Bihar Research Society' (১৯৫৮)-তে। রতিপতি ঠিক কোন সময়ে খ্যাতিমান হন আমরা জানি না, তবে তিনি উল্লেখ করেছেন যে কোনো এক রুক্মিণীর স্বামীর তিনি অনুগ্রহলাভ করেন।

লোচনও তাঁর একটি কবিতায় রুক্মিণীর স্বামীর উল্লেখ করেছেন। আমরা জানি এক যাদব রায়ের রানীর নাম ছিল রুক্মিণীদেবী। যাই হোক, রতিপতি যে লোচন বা মহারাজ পুরুষোত্তম ঠাকুরের (১৬১৯-১৬২৫ খ্রি.) সমসাময়িক, তা জোর দিয়ে বলা যায় না। কারণ এই উল্লেখ হয়তো ভগবান কৃষ্ণের উল্লেখ, যিনি ছিলেন যাদবরাজ এবং রুক্মিণীদেবীর স্বামী। এছাড়া তাঁর ভাষাও ব্রজভাষার দ্বারা প্রভাবিত। মহারাজ পুরুষোত্তম ঠাকুরের মৃত্যুর অনেক পরে এ ঘটে থাকা সম্ভব। তাঁকে, সে কারণে, হয়তো অষ্টাদশ শতকের শেষ বা ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের কবি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

এই কবি নিজের কাজের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন এবং জয়দেবের সমস্ত বড় কবিতা (প্রবন্ধ) সহজ এবং স্বতঃস্ফূর্ত ভাষায় অনুবাদ করেন। এই কবিতা মূলত দক্ষিণ মিথিলায় প্রসিদ্ধিলাভ করে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রতিপতি এই কাজকে বারোটি কাণ্ডে বিভক্ত 'মহাকাব্য' বলে মনে করেন।

এ পর্যায়ের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কাজ হল মনবোধের 'কৃষ্ণজন্ম'। রতিপতির মতো নয়; তাঁর কাজের খ্যাতি ছিল বিশ্বময় এবং আজ পর্যন্ত এ কাজ আমরা মনে রেখেছি। বিদ্যাপতির সঙ্গে মনবোধের পার্থক্য এখানেই যে তাঁর রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের গান ভক্তির সঙ্গে আবৃত্তি করা হয়। গ্রিয়ারসন প্রথম এর দশটি অধ্যায় সম্পাদনা করেন এবং তাদের ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। ১৯৩৪ সালে মম. উমেশ মিশ্র সম্পূর্ণ কাজ সম্পাদনা করেন আঠারোটি অধ্যায়ে।

ড. মিশ্র মনবোধের জীবনের দুটি বৃত্তান্তের উল্লেখ করেন। মঙ্গরৌনীতে রক্ষিত একটি ঐতিহ্য অনুযায়ী— তিনি মঙ্গরৌনীর অধিবাসী ছিলেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল জমদৌলী মূলের যোগ্য শ্রেণীর মৈথিলী ব্রাহ্মণ কোনো এক জ্যোতির্বেত্তা সোনামণি ঝা -এর পরিবারে। তাঁর আরও দুই ছোট ভাই ছিলেন জ্যোতিষী ভইয়ন ঝা এবং কবি লাল ওরফে ঝটুলা ঝা (ঝড়ুলা ঝা?)। এই কবি লালই যদি গৌরীস্বয়ম্বর এবং হিন্দি কবিতা কন্দর্প ঘাটী-র বিখ্যাত রচয়িতা হন, তাহলে মনবোধকে মহারাজ নরেন্দ্রসিংহের সমসাময়িক মনে করা যেতে পারে। মনবোধ নিজেও ছিলেন একজন ভালো জ্যোতিষী। তিনি রাটী-র সাহেব ঝা-র কন্যাকে বিবাহ করেন।

অন্য বৃত্তান্তটিতে বলা হয়েছে, তিনি ভোলন ঝা বলে খ্যাত ছিলেন। তিনি ছিলেন জমসম গ্রামের পগুলবাড়মূলক চান ঝা-র পুত্র। বীজীপুরুষের দিক থেকে তিনি ছিলেন চতুর্দশতম এবং তাঁর বিবাহ হয় কোনো এক ভিখারী ঝা-র কন্যার সঙ্গে। তাঁর একমাত্র

পুত্র দয়ানাথ ঝা শোনা যায় নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। মধুবনীর বর্তমান জমিদারকুল (বাবু শ্রীঅমৃতধারীসিংহ এবং শ্রীচন্দ্রধারীসিংহ প্রমুখ) দাবি করেন যে তাঁরা এই ভোলন ঝা-র কন্যার বংশধর। গ্রিয়ারসন বলেন— "তাঁর মৃত্যু হয় ১১৯৫ ফসলিতে (আ. ১৭৮৮ খ্রি.)। এ তারিখ যে তথ্য থেকে পাওয়া যায় তা হল এই যে — এই ভিখারী ঝা-র এক নাতি অত্যন্ত বৃদ্ধ অবস্থায় মারা যান মাত্র চার বছর আগে (অর্থাৎ ১৮৭৮ খ্রি.)।"

দুই ক্ষেত্রে তাঁর সময়কাল অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়। প্রচলিত বৃত্তান্ত অনুযায়ী "তিনি সমস্ত 'হরি বংশ' মৈথিল পদ্যে অনুবাদ করেন এবং এই অনুবাদের অংশ এখনো সমস্ত উত্তর মিথিলায় প্রচলিত এবং অত্যন্ত বিখ্যাত"।

মনবোধের 'কৃষ্ণজন্ম'-এর ভাষাতাত্ত্বিক গুরুত্ব বিষয়ে গ্রিয়ারসন বলেন—

"এই কবিতা গত শতকের মৈথিলীর নিদর্শন হিসেবে বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে, কারণ বিদ্যাপতির প্রাচীন মৈথিলী এবং বর্তমান কালের হর্ষনাথ ও অন্যান্য লেখকদের আধুনিক মৈথিলীর মধ্যে এটি একটি যোগসূত্রের মতো। এতে এমন কিছু গঠন-বিন্যাস আছে যা বিদ্যাপতিরও আগের সময়ের। এগুলি সে কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।"

আপাতভাবে কবিতার শিরোনাম ভ্রান্তিকর। কবিতার নাম 'কৃষ্ণজন্ম'— কৃষ্ণের জন্ম; কিন্তু কবিতার বিষয় শুধুমাত্র কৃষ্ণের জন্মেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি জরাসন্ধ, কংসের পরাজয়ও বর্ণনা করে এবং কৃষ্ণের শৈশবের কথাও এতে আছে। এ নামের সার্থকতা তখনি থাকে যদি আমরা এই পৃথিবীতে ভগবানের কৃষ্ণরূপে জন্মের কারণ বিবেচনা কবি। তিনি পাপীদের অত্যাচার থেকে পৃথিবীকে উদ্ধারের জন্য মর্ত্যে আসেন। যখন তিনি পাপীদের — কংস ও তাঁর অনুচরদের ধ্বংস করেন, তখনই তাঁর জন্মের সার্থকতা থাকে। যাই হোক, এটি কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে 'হরিচরিত' হিসেবে উল্লিখিত।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে 'ভাগবৎ' এবং 'হরিবংশ' থেকে সাহায্য নেবার সময় এই কবি বিচক্ষণতার সঙ্গে প্রেমভাব এবং শব্দাদি বর্জন করেন। যখন 'শৃঙ্গার' সংক্রান্ত কোনো বিষয় আসে, সেখানে ইন্দ্রিয়জাত বিষয়ের উল্লেখ প্রায় নেই।

কৃষ্ণের ক্রমশ বড় হয়ে ওঠার সম্পূর্ণ বর্ণনা মিথিলায় অত্যন্ত জনপ্রিয়।

এই কবিতা, সব মিলিয়ে কবির বর্ণনা কাজে পারদর্শিতার পরিচয় দেয়। সেখানে কবির কোনো অলীক কল্পনা বা পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাবের স্থান নেই — আছে এক সহজ স্পষ্ট বর্ণনা।

মৈথিলী সাহিত্যের ইতিহাসে মনবোধ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। যদিও নন্দীপতির কাজ এর নাটকীয় গঠনবিহীনতায় অনেকটাই বর্ণনামূলক কাব্যের মতো; তবে মনবোধের কাজ গুরুত্বের দিক থেকে প্রথম যা মৈথিলী কবিতার প্রসারকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। রাগ-রাগিণী বা বিদ্যাপতির অন্যান্য রীতির কঠিন বন্ধন থেকে এটি

মুক্ত হতে পেরেছিল।

আমরা জানি না ঠিক কোন সময়ে 'ভাষাচমৎকারের' লেখক বৈদ্যনাথ খ্যাতির আলোয় আসেন। মনে হয় তিনি এই বিশাল কাজটি করেছিলেন উনবিংশ শতকে। লেখকের নিজের হাতের লেখায়ই এই কাজটি পাওয়া যায়, কিন্তু তা অসমাপ্ত। এ কাজের উদ্দেশ্য ছিল মহাভারত এবং পুরাণের গল্পগুচ্ছ সহজ দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করা। প্রত্যেক গল্প একটি 'প্রপঞ্চ'-এর অন্তর্গত। এগুলি অনুদিত হয় 'দোহা'-য় এবং অন্যান্য ছোট ছোট ছন্দে, গানের আকারে নয়। দুঃখের বিষয়, এই কাজগুলি বর্তমান লেখকের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও লোকসমক্ষে আসেনি।

কোনো এক গঙ্গাদাস মহাভারতের 'বিরাটপর্ব' অনুবাদ করেছিলেন শোনা যায়। কিন্তু সে কাজ এখনো পর্যন্ত মুদ্রিত হয়নি। একই ঘটনা ঘটেছে দুর্গাদত্ত মিশ্রের 'দুর্গাসপ্তশতী'র অনুবাদের ক্ষেত্রে।

সম্মর ও চরিত

এ যুগের চারটি উল্লেখযোগ্য দীর্ঘ কবিতা আছে যাদের 'সম্মর' (=স্বয়ম্বর) বলে চিহ্নিত করা যায়: চক্রপাণির 'উষাহরণ', অজ্ঞাতনামা কারো 'রুক্মিণীস্বয়ম্বর' ও 'পারিজাতসম্মর' এবং শিবদত্তের 'সীতারামবিবাহ'।

অজ্ঞাতনামা কবির 'রুক্মিণীস্বয়ম্বর'-এর ভাষা কিছুটা নানা প্রভাবদুষ্ট। কৃষ্ণের সঙ্গে রুক্মিণীর বিবাহের গল্পটি পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যদিও এতে বিশেষ চরিত্র বর্ণনা নেই যেমন আমরা পাই রমাপতির নাটক 'রুক্মিণীপরিণয়'-এ। কাব্য হিসেবে কবিতাটি বিশেষ সফল নয়।

'পারিজাতসম্মর'-এর যে পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় তা অসমাপ্ত। এটি উমাপতির বিখ্যাত নাটক 'পারিজাতহরণ' - এর গল্পটি বর্ণিত করে।

মনে এইসব সম্মরের লেখকরা পরবর্তীকালের কীর্তনিয়া নাট্যকারদের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল সংক্ষিপ্ত সরল কাব্যের বক্তব্য দ্বারা মানুষকে আনন্দ দেওয়া।

শিবদত্তের 'সীতাহরণ' অত্যন্ত অশুদ্ধ মৈথিলীতে লেখা। এই কবিতার কাহিনী শুরু হয় সীতার স্বয়ম্বর উপলক্ষে জনকরাজার নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণের সময় থেকে। রাম, লক্ষ্মণ তাঁদের গুরু বিশ্বামিত্রের সঙ্গে সেখানে এসে পৌছন। সীতা রামকে দেখেন এবং প্রথম দর্শনেই ভালোবাসেন তাঁকে। এরপর তরুণ রাম বিখ্যাত হরধনু ভঙ্গ করেন এবং সমস্ত জগৎ বিস্ময়ে কেঁপে ওঠে।

পরশুরাম ও রামের উপাখ্যানের সামান্য উল্লেখ আছে। রাম অযোধ্যায় ফিরে আসেন এবং তাঁদের প্রথামতো বিবাহ হয়। একটি দল তাঁদের মিথিলা পর্যন্ত নিয়ে যায়। সমস্ত অনুষ্ঠানটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

শিবদত্ত 'গীতগৌরীস্বয়ম্বর'-এরও রচয়িতা; কিন্তু এটি মোটামুটিভাবে তাঁর নাটক 'গৌরী- প্রণয়'(পরিণয় ?) নাটকের সংক্ষিপ্ত রূপ।

অজ্ঞাতনামা কারো 'সুদামাচরিত' নামে একটি দীর্ঘ অসমাপ্ত কবিতাও এযুগে পাওয়া যায়। লেখকের নাম জানা যায় না কারণ এর ভণিতাটি পাওয়া যায় নি। সুদামার গল্পটি সুপরিচিত। গরিব ব্রাহ্মণ সুদামাকে তাঁর স্ত্রী অনুরোধ করেন বন্ধু কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করার জন্য। উপহার হিসেবে তিনি নিয়ে যান কিছু পোড়া যবের দানা। কৃষ্ণ তাঁর আসার খবর পেয়ে তাঁকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানান। সুদামা তাঁর দারিদ্র্যের খবর দেন কৃষ্ণকে। কৃষ্ণ শেষ পর্যন্ত সুদামার বগলের নীচে লুকনো পুঁটুলির সন্ধান পেয়ে তার থেকে দু মুঠো গ্রহণ করেন এবং তাঁকে দুই পৃথিবীর সমস্ত ধন দান করেন। রুক্মিণী তাঁকে তৃতীয় মুষ্ঠি গ্রহণ থেকে নিবৃত্ত করেন। সুদামা এ সবের কিছুই না জেনে বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নেন। তিনি হতাশ হয়ে ফিরে আসেন, কারণ কিছুই তিনি চাইতে পারেন নি এবং আপাতভাবে কৃষ্ণও তাঁকে কিছু দেন নি। কিন্তু বাড়ি ফিরে এসে তিনি বুঝলেন কিতিনি কৃষ্ণের কাছে পেয়েছেন। তিনি তবু সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারেন নি তাঁর ভাগ্যে কি বিরাট পরিবর্তন এসেছে।

ভগবানের দশাবতারের বর্ণনা পাওয়া যায় এক সুরদাস(?)-এর লেখা 'গীতদশাবতারে'।

পদ্যের অন্যান্য কাজ

এ যুগের অনেক কাজই নানা ধরনের বিষয় নির্ভর :

(১) গুরু জ্ঞানীর অঙ্কবিলাস (পাটীগণিত), (২) বুটী প্রকাশ (ভেষজ), (৩) ভেষজের নানা ভাগ, (৪) জয়স্থিতিমল্লরাজ-অভিষেক বর্ণনম (ইতিহাস), (৫) নেপাল-রাজবংশাবলী ভাষা (?) (ইতিহাস), (৬) তন্ত্রাখ্যানভাষা (নীতিগল্প), (৭) ভাষানীতি (নীতিগল্প), (৮) হিতোপদেশভাষা, সহিতম (নীতিগল্প), (৯) নাগরকামশাস্ত্র, জগজ্জ্যোতির্মল্ল রচিত (প্রেমোপাখ্যান), (১০) অনঙ্গভাষাসহিতম (প্রেমোপাখ্যান), (১১) অমরকোষভাষানামসহিত (অভিধান) এবং (১২) কাব্যমঞ্জরী(কাব্যসমালোচনাবিদ্যা)।

এই কাজগুলি এতাবৎ প্রকাশিত হয়নি।

৪

উপসংহার

মধ্যযুগের কবিতা তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে উত্তীর্ণ হয়। প্রথম পর্বের কবিরা ছিলেন বিদ্যাপতি দ্বারা প্রভাবিত। তিনি ছিলেন তাঁদের কাছে আদর্শস্বরূপ। এর পরের পর্ব আসে যখন কীর্তনিয়া নাটক এবং মনবোধের কবিতার যৌথ প্রভাবে দীর্ঘ কবিতার পত্তন হয়। তৃতীয় পর্বে ভজন-ভাবের উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটে।

এই তিন পর্ব ছিল তিন ধরনের সুনির্দিষ্ট পাঠের ফল। প্রথম ক্ষেত্রে সংস্কৃত উদ্ভট কাব্য, বিদ্যাপতির গীতিকবিতা এবং সঙ্গীতশাস্ত্র, সংস্কৃত কাব্য-সমালোচনাবিদ্যা এবং প্রেমোপাখ্যান ছিল সূত্র। এসব থেকে জন্ম হয় নানা পরোক্ষ কল্পনা, প্রেম সংক্রান্ত পরিমার্জিতভাবনা এবং বর্ণনামূলক শৈলীর। পুরুষ, নারী, ঋতু, মানুষের নানা ভাব এবং কুশলী কাব্যসৃজনক্ষমতা— এসব এসমস্ত সূত্র দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত।

মধ্যযুগের কবিদের উপর দ্বিতীয়বার শক্তিশালী প্রভাব ফেলে হরিবংশ ও ভাগবত এবং অন্যান্য বৈষ্ণব পুরাণ। এই 'মহাকাব্য'গুলি মৈথিলী কবিদের দীর্ঘ বর্ণনাত্মক কাব্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। পরবর্তী সময়ের কীর্তনিয়া নাটক এরকম দীর্ঘ বর্ণনামূলক রচনার আকার নেয় এবং তাতে মানুষের বিশ্বাস আসে যে নাটকীয়তা বা সাঙ্গীতিক গঠনের আড়াল ছাড়াও দীর্ঘ মৈথিলী কবিতা রচনা সম্ভব।

তৃতীয় শক্তিশালী প্রভাব ফেলে ব্রজভাষার কবিতা। দানলীলা, নাগলীলা, চৌতীসা ও তীর্থাবলী, সুরদাস ও তুলসীদাসের ভজনের লোকপ্রিয়তা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরবর্তীকালের এমন কোনো মধ্যযুগীয় দেশীয় ভাষার পাণ্ডুলিপি পাওয়া দুষ্কর যেখানে এ কাজগুলির উল্লেখ নেই। এর ফল হল বিষ্ণুপদ, রাস এবং সোহরার বহুল প্রচলন। ব্রজভাষার প্রভাব সম্মর এবং চরিতেও পাওয়া যায়। এ যুগের কিছু লেখকের ভাষার বিশুদ্ধতা বেশ খানিকটা নষ্ট হওয়ার কারণ হিসেবেও একে দায়ী করা যায়।

এমন মনে করার সঙ্গত কারণ আছে যে মৈথিলী সাহিত্যের পূর্ণ এবং স্বাধীন বিকাশে ব্রজভাষা অন্তরায় হিসেবে আসে। সেই সঙ্গে আমাদের একথাও জানতে হবে যে ভক্তিভাব (ভজন), বিশেষ করে কৃষ্ণবিষয়ক, মৈথিলী সাহিত্যে প্রবেশ করে ব্রজভাষার মাধ্যমেই। যে অশুদ্ধতা এর ফলে আসে তা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। চন্দা ঝা এবং অন্যান্যরা মৈথিলী ভাষার বিশুদ্ধ রূপ ফিরিয়ে আনেন।

মধ্যযুগে মৈথিলী কাব্যে অন্তত আট থেকে নয় জন বড় কবির সন্ধান পাওয়া যায় — লোচন, ভূপতীন্দ্র, গোবিন্দদাস, নন্দীপতি, মনবোধ, রত্নপাণি, সাহেবরাম, করণ শ্যাম এবং হর্ষনাথ (অথবা হর্খনাথ)।

এ যুগের শেষের সঙ্গে সঙ্গে আমরা আধুনিক যুগে উপনীত হই — শব্দবিন্যাস, বাগ্‌ধারা, ভাবনা, বিন্যাস প্রণালী এবং ছন্দ ভিন্ন হয়ে আসে; যদিও মধ্যযুগের কিছু কিছু উপাদান বর্তমান কালেও বর্তমান, তবে মোটামুটিভাবে ঊনবিংশ শতকের শেষে সেগুলি অপ্রচলিত হয়ে পড়ে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

আধুনিক মৈথিলী সাহিত্য
(১৮৬০-১৯৭০)

এক : ভূমিকা

প্রাচীন মিথিলা রাজ্যকে শুধুমাত্র জমিদারিতে বদলে দেওয়ার অর্থ হলো মৈথিলী ভাষার স্থানকে অত্যন্ত নীচে নামিয়ে দেওয়া। এমনটা কেন হলো তা এখন ঠিক বোঝা যায় না, কিন্তু একথা ঠিক যে এই ঘটনারই প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ ভারতকে মহান করে তোলার পেছনে একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান না হয়ে ওঠা বা গর্বের সঙ্গে মাথা উঁচু করে একটা স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে দাঁড়াতে না পারা কিংবা আত্মবিশ্বাসের অভাব বা হীনমন্যতা দেখা গেলো। এছাড়াও ১৯ শতকে নবজাগরণের যে নতুন ধারায় সারা ভারতই প্রায় প্লাবিত হয়েছিল তা মিথিলায় বহুদিন অবধি পৌঁছয়নি কারণ ইংরেজি শিক্ষা এবং পশ্চিমের ধ্যানধারণা মিথিলায় বহুদিন পরে পৌঁছেছিল। এটা শুধুমাত্র এইজন্যেই হয়নি যে মিথিলার মানুষের সঙ্গে সংস্কৃতনিষ্ঠ শিক্ষা-ব্যবস্থার একটা আত্মিক যোগ ছিল এবং তারা দেশজ ভাষাকে শিক্ষা-ব্যবস্থার একটা অপরিহার্য অঙ্গ রূপে গ্রহণ করার পেছনে যে আধুনিক সময়োচিত চিন্তা কাজ করছে তা মেনে নিতে রাজি ছিলেন না; এর কারণ এও ছিল যে এদেশের নতুন শাসককুল এই নতুন ব্যবস্থায় দেশজ ভাষাকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়ার বিষয়ে মানসিক ভাবে প্রস্তুত ছিলেন না।

১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে 'তিরহুতের মহারাজা' মহেশ্বরসিংহের দেহাবসান হয় এবং তিনি দুটি অল্পবয়স্ক সন্তান রেখে মারা যান যাঁদের মধ্যে লক্ষ্মীশ্বরসিংহের বয়স ছিল বেশি। ব্রিটিশ সরকার তখন এই প্রান্তের শাসন-ভার "বিচার বিভাগের হাতে তুলে দেন যার দ্বারা পরবর্তী প্রায় ১৯ বছরে এই নবীন শাসকের পড়াশোনার ব্যবস্থা করা হয় . . ."। এই সময়েই পশ্চিমের সঙ্গে মিথিলার একটা প্রত্যক্ষ পরিচয়ের প্রমাণ পাওয়া গেলো। দুর্ভাগ্যবশত, এই বিচার বিভাগ মৈথিলী ভাষার এবং লিপির ব্যবহার ও চর্চা তুলে দিয়ে জনজীবনে উর্দু ও ফারসি চালু করলেন। যখন নবীন মহারাজা লক্ষ্মীশ্বরসিংহ সিংহাসনে আসীন হন, ওঁকে প্রথমেই উর্দু ও ফারসির পরিবর্তে হিন্দি ভাষাকে শাসকীয় কাজে প্রতিষ্ঠিত করার উপদেশ দেওয়া হয় যদিও কিছুদিন আগে পযর্ন্ত আইন-আদালতের ভাষারূপে উর্দু ও ফারসিই দ্বারভাঙা-রাজের শাসন-কর্মে ব্যবহৃত হতো। এর পরিণামস্বরূপ মৈথিলী ভাষার প্রগতি অন্তত পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে গেলো।

এই নবীন শাসকের অবশ্যই এজন্য প্রশংসা করতে হয় যে উনিই —

> সর্বপ্রথম মিথিলায় ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন করেন। ওঁর শাসনকালেই সাধারণ মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক জীবনে নতুন উৎসাহের জোয়ার

আসে। ওঁর আকর্ষক ব্যক্তিত্ব, দয়ালু স্বভাব, বিদ্যাচর্চার প্রতি ভালোবাসা, বাঁধাহীন দেশপ্রেম ও উদারতার কারণেই বিদগ্ধ মানুষজন এবং সাহিত্যিক রুচিসম্পন্ন লোকেরা দূর দূর থেকে এখানে আসেন। মিথিলার যেন একটা সর্বাঙ্গীন জাগরণ হয় তখন। রাজসভার এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাতাবরণ যেন এই ক্ষেত্রের সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করলো। মানুষের সুপ্ত সৃষ্টিশীল প্রতিভা এর ফলে জেগে উঠলো এবং নানান মানুষের সাহিত্যিক অবদানের ফলে মৈথিলী সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা হয়ে উঠলো সমৃদ্ধ। বিংশ শতকের কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিকেরা, যেমন চন্দা ঝা, রঘুনন্দনদাস, মহামহোপাধ্যায় ড. স্যর গঙ্গানাথ ঝা এবং তাঁর ভাইয়েরা— বিদ্যানাথ ঝা ও গণনাথ ঝা এঁরই শাসনকালে নিজেদের সাহিত্যিক জীবন শুরু করেন। এর পর থেকেই নবীন সাহিত্যের উদ্ভব হয় প্রায় প্রতিটি বিষয়েই— যেমন, দর্শন ও নীতিশাস্ত্র, ইতিহাস ও ভূগোল, ভ্রমণ, গণিত, ব্যকরণ, ছন্দশাস্ত্র ও অলঙ্কার প্রভৃতি। উপন্যাস, ছোট গল্প এবং গাথাকাহিনীও অনেক লেখা হয় এই সময়ে। পৃথক শিশুসাহিত্য ও নারীসাহিত্যও এই সময়ে উদ্ভূত হয়। মিথিলার বিদগ্ধজনও এইবার নিজেদের মাতৃভাষার প্রগতির জন্য সচেষ্ট হন।

ইতিমধ্যে ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দের শিক্ষাবিষয়ক নথিপত্র থেকে দেখা যাচ্ছে, ভারত সরকারও "ইংরেজি" শিক্ষা-ব্যবস্থাকে প্রোৎসাহিত করছেন। ১৮৬০-এ এই প্রদেশে অনেকগুলি বিদ্যালয়ের স্থাপনা করা হয়। দ্বারভাঙার মহারাজা ১৮৮০-তে দ্বারভাঙাতেই একটি বিদ্যাল্যয়ের স্থাপনা করেন এবং যাঁরা উচ্চশিক্ষার জন্য বেনারস বা অন্যত্র যেতে চান তাঁদের জন্য ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা করেন। ১৯১০ সালে স্থাপনার পর থেকেই 'মৈথিল মহাসভা'-ও সমস্ত ক্ষেত্রেই শিক্ষার জন্য মিথিলার যোগ্য ছাত্রদের এই পারিতোষিক দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এমন কি, মহামহোপাধ্যায় মুরলীধর ঝা এবং খুদ্দী ঝা-র মতো সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বিদ্বানেরাও ইংরেজি শিক্ষার সপক্ষে এগিয়ে আসেন। এর ফলস্বরূপ এই নতুন শিক্ষার প্রসার হলো খুবই দ্রুত: ১৮৯৫ সালের মধ্যে দ্বারভাঙা জেলায় ৫টি হাই স্কুল, ৪টি মিড্‌ল স্কুল, ৯টি দেশীয় ভাষা-মাধ্যমের মিড্‌ল স্কুল, এবং ৫০৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্থাপনা হয়; মুজফ্‌ফরপুর জেলায় ইংরেজি মাধ্যমের ৪টি হাই স্কুল এবং ৭টি মিড্‌ল স্কুল ছাড়াও দেশীয় ভাষা-মাধ্যমের ৮টি বিদ্যালয় আর ৮৯৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে ওঠে; ১৯০৭ সালের আগেই দেখা যাচ্ছে চম্পারন জেলায় দুটি হাই স্কুল, ৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ইংরেজি মাধ্যমের ও ২টি দেশীয় মাধ্যমের স্কুল এবং ১৮৯১ হতেই পূর্ণিয়ায় আছে একটি ইংরেজি ইস্কুল— উচ্চ পর্যায়ের, ৬টি ইংরেজি ইস্কুল মধ্যস্তরের, ৪টে দেশীয় ভাষামাধ্যমের মিড্‌ল স্কুল এবং ৫৯৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রভৃতি। মিথিলার ছাত্রেরা কলকাতা, বেনারস এবং এলাহাবাদেও গিয়ে বিদ্যাশিক্ষা গ্রহণ করতে লাগলেন। ১৯১৪ সালের পূর্বেই ম্যাট্রিক এবং অন্যান্য উচ্চতর শিক্ষা-প্রাপ্ত হয়েছেন এমন প্রায় ৩০০ মৈথিল ব্রাহ্মণ ছাত্রের নাম পাওয়া যায় যোগানন্দ কুমারের নথিপত্রে।

দুর্ভাগ্যবশত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে মৈথিলী ভাষাকে পঠন-পাঠনের জন্য সর্বস্তরের স্বীকৃতি দেয়, ঠিক একই সময়ে ১৯১৭-তেই পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনা হয়ে যাওয়ায় এবং মিথিলার সমস্ত বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়গুলি এই নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চলে যাওয়ায় মৈথিলীকে আরও ২০ বছর অপেক্ষা করতে হয় তার নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতির জন্যে।

আরো একটি ঘটনা যা মিথিলায় সাহিত্যে নবজাগরণ নিয়ে এলো, তা হলো বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা ও সংঘের গঠন। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো 'মৈথিল মহাসভা'-র (বা যা আগে 'মৈথিল কন্‌ফারেন্স' নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল) স্থাপনা যা ১৯১০ সালে হয়েছিল 'মিথিলা-মোদ' পত্রিকার প্রচারাত্মক কার্যকলাপের পরিণতি-স্বরূপ। আজকে আমরা এই সংস্থার যে অসাধারণ প্রভাব ছিল তার মূল্য পুরোপুরি বুঝতে পারি না। এর ফলে সর্বত্র একটা আলোচনার সূত্রপাত হলো— মৈথিলদের মধ্যে শিক্ষার প্রচার ও প্রসার ঠিক কীভাবে হওয়া উচিত, কেমন করে মৈথিল সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও সম্বর্ধনের জন্য অধিক থেকে অধিকতর উৎসাহ দেওয়া উচিত এবং কীভাবে মানুষের আর্থিক অবস্থা এবং শিল্পের উন্নতি সাধন সম্ভব— এইসব বিষয়ে। মহাসভা শতশত ছাত্রকে প্রতি বছর ছাত্রবৃত্তি দেওয়া আরম্ভ করলো যার ফলে মিথিলার বিভিন্ন প্রান্ত হতে শিক্ষার্থীরা একটা জায়গায় সময়ে-সময়ে একত্রিত হয়ে সাধারণ সমস্যাগুলি নিয়ে আলাপ-আলোচনাও করতে পারতো। সর্বোপরি, এই সংস্থা প্রথম থেকেই মৈথিলী ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি সাধনের জন্য সচেষ্ট হয়। এর মূল কেন্দ্রের কাজের তুলনায় সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল মহাসভার বিভিন্ন জেলা শাখার।

এইভাবেই অন্য সব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলি ঐ সময়ে মিথিলায় একটা জাগৃতি এনে দিয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো — 'মৈথিল শিক্ষিত সমাজ' (কলকাতা, ১৯১৯), 'মৈথিল সম্মেলন' (কলকাতা ১৯২৩; পাটনা ১৯২৪), 'সুবোধিনী সভা' (পূর্ণিয়া), 'মৈথিল ছাত্র সম্মেলন' (ভাগলপুর ১৯১০, বেনারস ১৯২০, মুজফ্‌ফরপুর ১৯২৪, পাটনা ১৯৩৪ প্রভৃতি), 'মৈথিল যুবক সংঘ' (পূর্ণিয়া ১৯৩০ এবং আরাগেণ্ডা (দিনাজপুর জেলা) ও বেনারস), 'মৈথিল তরুণ সংঘ' এবং বিভিন্ন প্রবাসী মৈথিল সংগঠনগুলি। এইসব সংস্থাগুলি নানান ধরনের কার্যক্রম হাতে নিয়েছিলেন এবং বিশেষ করে তাঁরা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সভার আয়োজন করতেন যাতে ড. স্যর গঙ্গানাথ ঝা, কুমার গঙ্গানাথ সিন্‌হা, রামভদ্র ঝা, ভুবনেশ্বর সিংহ 'ভুবন' এবং অন্যান্য বিখ্যাত মানুষ অংশগ্রহণ করতেন এবং মৈথিলী ভাষা ও সাহিত্যের সমূহ উন্নয়নের নানান উপায় ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হতো।

এইসব সংস্থাগুলি ছাড়াও, এই সময়ে মিথিলায় ও মিথিলার বাইরেও বেশ কটি গবেষণা পর্ষদ স্থাপিত হয়, যার প্রভাবেও মৈথিলীর উন্নতি ত্বরান্বিত হয়েছিল, যেমন : 'মিথিলা পাব্‌লিশিং কোম্পানি', 'মৈথিল সাহিত্য সভা', 'মৈথিল বিদ্বৎ সমিতি' (বেনারস

ও দ্বারভাঙা), 'মৈথিল প্রিন্টিং ওয়ার্কস' (মধুবনী), 'মিথিলা গ্রন্থমালা' (দ্বারভাঙা এবং বেনারস), 'মৈথিল সাহিত্য পরিষদ' (দ্বারভাঙা), 'মৈথিল সাহিত্য ভবন' (পূর্ণিয়া), 'মিথিলা রিসার্চ সোসাইটি' অথবা 'মুর্দা ক্লাব', ইত্যাদি।

এইসব বিভিন্ন প্রয়াসের সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মিথিলার অধিবাসীদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ একতা ও প্রাচীন গরিমা নিয়ে চেতনাকে জাগিয়ে তোলাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। খুব শিগ্‌গিরি এঁরা বুঝতে পারলেন যে নতুন মিথিলার উত্থান নির্ভর করছে এঁদের মাতৃভাষার প্রগতির ওপর। এঁরা তাই নিজেদের ধ্যান ফেরালেন মৈথিলীর প্রাচীন মহান সাহিত্য কর্মগুলির অধ্যয়ন এবং প্রকাশনার দিকে। এই পুনর্জাগরণের পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক হলো স্যর জর্জ গ্রিয়ারসন এবং অন্যান্য বিদ্বজ্জনের গবেষণা। কিন্তু মৈথিলদের মধ্যে এই ধরনের অধ্যয়ন চললো চারটি পৃথক কেন্দ্রে : (১) বারাণসী, (২) দ্বারভাঙা-মধুবনী, (৩) জয়পুর-মথুরা এবং (৪) কলকাতা।

অনেক দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে বর্তমান শতকের প্রথম দশকে বেনারসেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়েছিল মহামহোপাধ্যায় মুরলীধর ঝা-এর মতো খ্যাতনামা বিদ্বানের নেতৃত্বে। সপ্তদশ শতকের গোড়া থেকেই বেনারস মিথিলার সংস্কৃত বিদ্বানদের আকৃষ্ট করতো। বিশ শতকের গোড়ার দিকে এঁরা মৈথিল বিদ্বজ্জন সমিতি নামক একটি সংস্থার স্থাপনা করেন এবং ১৯০৬ থেকেই এর মুখপত্র মাসিক পত্রিকা রূপে 'মিথিলা-মোদ' নামক সাময়িকপত্রের প্রকাশনা শুরু করেন যা একটা নিজস্ব ঐতিহ্য তৈরি করে। দীননাথ মিশ্র, জীবন ঝা, চক্রধর ঝা, কালীপ্রসাদ সিংহ-চৌধুরী এবং অন্য অনেকে এতে প্রচুর সাহায্য করেন। মৈথিলীকে অধিকতর জনপ্রিয় করার কাজে 'মিথিলা-মোদ'-এর ভূমিকাকে খুব বেশি বাড়িয়ে বলার প্রয়োজন নেই। এঁদের একমাত্র ভুল হলো, অবশ্য যদি তাকে ভুল বলা যায়, ছাপার জন্য মৈথিলীর নিজস্ব লিপির ব্যবহার না কবে দেবনাগরী লিপির ব্যবহার করা।

মিথিলার দ্বারভাঙার মহারাজাধিরাজ লক্ষ্মীশ্বর সিংহের থেকেই পাওয়া যেতো সর্বাধিক উৎসাহ। ওঁর প্রেরণাতেই মহামহোপাধ্যায় পরমেশ্বর ঝা, চন্দা ঝা, বিন্ধ্যনাথ ঝা, চেতনাথ ঝা, স্যর গঙ্গানাথ ঝা এবং অন্যেরা উৎফুল্লভাবে মৈথিলীর অধ্যয়নে নিজেদেরকে উৎসর্গীকৃত করেন। প্রাচীন মৈথিলীর পুঁথিগুলির সম্পাদনা করা হয়— যেমন, উমাপতির 'পারিজাতহরণ', রামদাসের 'আনন্দবিজয়' এবং ভানুনাথ ঝা-র 'প্রভাবতীহরণ' এবং রচিত হয় কিছু নতুন গ্রন্থ, যেমন চন্দা ঝা-র 'রামায়ণ'। জানুয়ারি, ১৯০৮ সালে দ্বারভাঙার মহারাজাধিরাজ একটি মাসিক পত্রিকার প্রকাশনের জন্য আর্থিক অনুদান দেওয়া স্থির করেন— যার নাম ছিল বেশ উল্লেখযোগ্য— 'মিথিলা-মিহির' (অর্থাৎ, 'মিথিলার সূর্য') , যা পরে সাপ্তাহিক পত্রিকায় পরিণত হয় এবং এই ভাষার উন্নয়নে যার অবদান আজও রয়েছে অপরিসীম।

মধুবনীতে ১৯০৫ সালে বনৈলীর রাজার সহায়তায় রামানন্দ ঠাকুর স্থাপনা করলেন

মৈথিল প্রিন্টিং ওয়ার্কস-এর। উনি যে নিজেই মৈথিলীতে বই লিখলেন তা নয়, অন্যদেরকে দিয়েও উনি প্রাচীন গ্রন্থের মুদ্রণ-প্রকাশন এবং নবীন গ্রন্থের লেখনের কাজ করালেন।

সুদূর জয়পুর শহরে পণ্ডিত রামভদ্র ঝা (একদা আলোয়ার রাজ্যের আইন-বিষয়ক মন্ত্রী) এবং বিদ্যাবাচস্পতি মধুসূদন ঝা-র নির্দেশে অন্য একদল শিক্ষাবিদ একত্রিত হলেন। এঁরাও খুবই উল্লেখনীয় নামের একটি পত্রিকার প্রকাশন শুরু করলেন ১৯০৫-এ— 'মৈথিল-হিতসাধন'। যদিও এই কেন্দ্রে কাজ খুব বেশিদিন হয়নি ও যদ্যপি আজ তা অবলুপ্ত, তবু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে মৈথিলীর উন্নয়নে এঁদের অবদান ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

বঙ্গদেশে মহানগর ছাড়াও এই ক্ষেত্রের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ও ছিল অবস্থিত। এইজন্য মৈথিল বিদ্বানেরা এই কেন্দ্রের প্রতিও যথেষ্ট আকৃষ্ট বোধ করতেন। বিখ্যাত বাঙালি বিদ্বানেরা— যেমন, স্বর্গীয় জাস্টিস সারদাচরণ মিত্র, বাবু নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং অন্যেরা মৈথিলীর অধ্যয়নের ক্ষেত্রে নিজেদের রচনা ও বক্তব্যের মাধ্যমে প্রভূত সহায়তা করেন। "স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে কলকাতায় মৈথিলীর একজন প্রধান সংরক্ষক বলা যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯১৭ সালে মূলত কুমার গঙ্গানন্দ সিন্‌হা, বাবু গণপতি সিংহ, পণ্ডিত ব্রজমোহন ঠাকুর, বিদ্যানন্দ ঠাকুর এবং অন্যদের প্রয়াসের ফলে ও পূর্ণিয়ার দুর্গাগঞ্জের রাজা টঙ্কনাথ চৌধুরীর সহৃদয়তার ফলেই একটি মৈথিলীর আসনের স্থাপনা করা সম্ভব হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ১৯১৯ থেকে মৈথিলীকে এম. এ.-এর একটি বিষয় রূপে এক পৃথক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

"গত কয়েক বছরে এই সবকটি কেন্দ্রে অনেক পরিবর্তন হয়েছে দেখা যায়। ১৯২৯ সালে মহামহোপাধ্যায় মুরলীধর ঝা-এর মৃত্যুর পরেই সমস্ত গতিবিধির কেন্দ্র সরে আসে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে যা মূলত কাঞ্চীনাথ ঝা ও প্রবোধনারায়ণ চৌধুরী প্রমুখ স্থানীয় মৈথিলদের চেষ্টায় মৈথিলীকে একটা পৃথক বিষয়রূপে স্বীকার করে নেয়। ওঁরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে মহামহোপাধ্যায় বালকৃষ্ণ মিশ্রকে সভাপতি করে (এবং পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যকে সংরক্ষক করে) মৈথিলী সাহিত্য সমিতি নামক একটি সংস্থার স্থাপনা করেন, অনেক শ্রেষ্ঠ পুস্তকের প্রকাশন করেন, বিদ্যাপতির বহু কবিতার সঠিক পাঠও প্রস্তুত করেন। এখনও এই সংস্থা কাজ করে চলেছে যদিও এখন আর সংস্কৃতজ্ঞদের সমর্থন এঁরা পান না প্রশ্নাতীত ভাবে এবং সংস্কৃতজ্ঞরা শহরেই অন্যত্র একই ধরনের কাজকর্মের জন্য একটি পৃথক্ সংস্থা তৈরি করেছেন।"

মিথিলাতেও প্রচুর কাজ হয়েছে একেবারে হাল আমলে। শশীনাথ চৌধুরী, নরেন্দ্রনাথ দাস, ভোলানাথ দাস এবং অন্যদের প্রয়াসে ১৯৩১-এ এসে মৈথিলী সাহিত্য পরিষদের স্থাপনা হয়। স্বর্গীয় মহারাজাধিরাজ কামেশ্বর সিংহ বাহাদুরও ওঁর পরিবারের ঐতিহ্য অনুসারে মৈথিলীর প্রতি সমান উৎসাহ দেখান এবং পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক লাখ টাকা দান করে একটি মৈথিলী উন্নয়ন তহবিলের স্থাপনা করেন মৈথিলী সাহিত্যের

উন্নয়নের জন্য। অসংখ্য পত্র-পত্রিকার প্রকাশন এই সময়ে আরম্ভ হয় এবং মৈথিলী বানানের প্রবিধিও তখনি নির্ধারিত হয়। শ্রীনাথ মিশ্র, জীবনাথ রায় ও অন্যান্যদের নির্দেশে পরিচালিত 'মৈথিলাক্ষরাকরণ-সমিতি'র মাধ্যমে ত্রিহুতা টাইপ তৈরির কাজও এই সময়ে করা হয়। বিহারের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এই সময়ে এই ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া আরম্ভ করে— সর্বপ্রথম পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় তা দেয় ১৯৩৭-এ দ্বারভাঙা মহারাজাধিরাজের ব্যক্তিগত প্রভাবে। এরপর থেকে ধীরে ধীরে হাওয়া মৈথিলীর পক্ষে অনুকূলই হতে থাকে। এইসময়ে কর্মিবৃন্দ সমগ্র ক্ষেত্রে আছেন ছড়িয়ে যাঁরা মধুবনী, মুজফ্‌ফরপুর, পাটনা, পূর্ণিয়া, ভাগলপুর, বেগুসরাই এবং বিভিন্ন গ্রাম ও শহরে চর্চা চালিয়ে যাচ্ছেন।

১৯৪১ সালে বিহার প্রাথমিক শিক্ষা পুনর্গঠন সমিতি তাঁদের আগের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেন যাতে মৈথিলীভাষী ছাত্রছাত্রীদের তাদের মাতৃভাষাতেই শিক্ষাদান করা হবে বলে নির্ণয় করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৯- এ এসে সরকার শেষমেষ মৈথিলীকে শিক্ষার মাধ্যম রূপে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানোর কথা মেনে নেন, যদিও সিদ্ধান্তের বাস্তব রূপায়ণের কাজ আজও সম্ভব হয়নি। ১৯৪৭-এ লেখকদের আন্তর্জাতিক সংঘ পি. ই. এন. মৈথিলীকে হিন্দি ও গুজরাতীর সমকক্ষ ভাষা-রূপে মেনে নিলো এবং সমস্ত ধরনের রাষ্ট্রীয় স্তরের লেখকীয় সম্মেলনে এই ভাষাভাষী লেখকদের অংশগ্রহণ করার অধিকারও মেনে নিলো। এর পরই নেপালের ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়ও মৈথিলীকে নেপাল রাজ্যের একটি দেশীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং প্রকৃতপক্ষে উচ্চতম স্তর অবধি এই ভাষার পঠন-পাঠনের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আকাশবাণীর তরফেও মৈথিলীতে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়, যদিও মৈথিলীতে আজও সংবাদ প্রসারিত হয় না, কারণ সংবাদ প্রসারণের মাধ্যম রূপে তা আজও স্বীকৃত হয়নি। ১৯৬৩ সালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু নতুন দিল্লিতে মৈথিলী বই ও সাময়িকপত্রের একটি জাতীয় প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন এবং ১৯৬৫ সালে রাষ্ট্রীয় সাহিত্য অকাদেমি এই ভাষাকে জাতীয় পুরস্কার এবং অন্যান্য কাজকর্মের জন্য স্বীকৃতি দেন। সম্প্রতি বিহার সরকার এটিকে নিজের উচ্চপদস্থ কর্মচারীর নিযুক্তির পরীক্ষায় একটি অন্যতম বিষয় রূপে মেনে নেন এবং পাটনাতে একটি প্রাদেশিক স্তরের মৈথিলী আকাদেমির স্থাপনাও করেন। অবশ্য এখনও মৈথিলীভাষীদের বাধা-নিষেধ রয়েছে অনেক বিষয়েই এবং ইচ্ছা থাকলেও তাদের নিজস্ব প্রতিভা-অনুযায়ী উন্নয়নের সুযোগ সবসময়ে পাওয়া যায় না। এই গতিশীল ও পরিবর্তনশীল যুগে এই ধরনের দীর্ঘসূত্রী দ্বন্দ্ব ও দীর্ঘ উপেক্ষার ফলে যে এই ভাষার প্রগতি অনেকটাই অবরুদ্ধ হচ্ছে তা অনস্বীকার্য। এতো বাধা সত্ত্বেও মৈথিলী ভাষা যদি তার উন্নতির সাথে অগ্রসর হয়ে থাকে, তবে সেই সব সাহিত্যিকদের ধন্যবাদ দিতে হয়— যাঁরা প্রতিনিয়ত এই ভাষায় তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টি করে চলেছেন। যার ফলে মৈথিলী ভাষা আজও একটি জীবন্ত ভাষা, যে আধুনিক সাহিত্যের জন্ম দিতে পারে, যা তার প্রাচীন ও মধ্য যুগীয়

গৌরবময় সহিত্যের যথার্থ উত্তরসূরী।

এইভাবে, পুনরুজ্জীবিত মিথিলাকে মূলত "উন্নততর ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থার অবদান বলা যায় যা সম্ভব হয়েছে পশ্চিমা শিক্ষা-ব্যবস্থা, নানান আন্দোলনের জন্ম হয়েছে যার ফলে, এবং ছাপাখানার স্থাপনের ফলে"। সাহিত্যিক মান এবং শৈলীর ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন এসেছে তার প্রভাব হয়েছে সুদূরপ্রসারী এবং গভীর— যা হয়েছে 'ত্রিহুতের মহারাজা'-র শাসন ব্যবস্থা থেকে বাদ পড়া ও হিন্দি-ভাষা দ্বারা প্রভাবিত পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষা-সংস্থাগুলির তরফ থেকে সাড়া না পাওয়া সত্ত্বেও।

দুই : আধুনিক মৈথিলী গদ্য সাহিত্য

(ক) আধুনিক গদ্যের প্রারম্ভিক-পর্ব

নতুন প্রভাবের সবচেয়ে প্রত্যক্ষ এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে গদ্যের ক্ষেত্রে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের গদ্য আধুনিক যুগের পক্ষে ছিল অনুপযুক্ত। প্রাচীন গদ্য ছিল অত্যন্ত কাব্যিক এবং নানান ধরনের কুরুচিকর রচনায় ভরা; মধ্যযুগীয় গদ্যের আবার এমন জোর ছিল না যা উদ্দেশ্য অনুযায়ী ভাষাটাকে ভাঙতে-গড়তে পারে। আধুনিক জীবনে গদ্য আবার এমনই প্রয়োজনীয় জিনিস যা সবিস্তারে পড়া যায় এবং উপভোগ করা যায় আর যা সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, সিনেমা, উপন্যাস ও বিজ্ঞাপনেই নয়, একই সঙ্গে পাণ্ডিত্যপূর্ণ নিবন্ধ ও বই লেখার কাজেও প্রয়োগ করা যায়।

প্রথম ও শেষ পর্যায়ের আধুনিক গদ্যের মধ্যেকার ফারাক এমনই চোখে পড়ার মতো যে কেউই এ-নিয়ে প্রশ্ন তুলবে না। যে সমস্ত পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে মৈথিলীকে যেতে হয়েছে এই পরিবর্তন আসার আগে তা খুবই কষ্টকর এবং অধিকতর কঠিন। যে মুখ্য ঘটনার ফলে মৈথিলীতে একেবারে নতুন ধরনের গদ্যশৈলীর জন্ম হয় তা হলো সাংবাদিকতার উদ্ভব।

সাংবাদিকতার উদ্ভব

আধুনিক মৈথিলী সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে মৈথিলী পত্রকারিতার ইতিহাস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মৈথিলীতে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকাগুলি জ্ঞান-বর্ধন ছাড়াও মাতৃভাষায় হাল্কা পাঠের একটা ঐতিহ্য সৃষ্টি করলো, জন্ম দিলো মৈথিলীর পাঠক সম্প্রদায়কে এবং অনেকগুলি তরুণ লেখককে আকৃষ্ট তো করলোই, তাদের পক্ষে শিক্ষানবিশির কাজও করলো।

'মৈথিলী-হিত-সাধন'-ই (১৯০৫) ছিল মৈথিলীতে প্রকাশিত প্রথম মাসিক পত্রিকা। এর আয়ু ছিল মাত্র তিন বছর। এটা ছিল অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী একটা পরিকল্পনা কেন না এঁদের উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এমন সব প্রাথমিক কাজ ছাপা যার মূল্য হবে

চিরস্থায়ী; যেমন, স্বাস্থ্য, দর্শন, ব্যাকরণ, পাটীগণিত ও ভূগোল এবং গীত, কবিতা, মিথিলার মানুষের দোষ-গুণ বিষয়ক আলোচনা এবং সাম্প্রতিক কোনো ঘটনা নিয়ে নিবন্ধ প্রভৃতি ছিল এর বিষয়। এই পত্রিকাতে যাঁরা নিয়মিত লিখতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কবীশ্বর চন্দা ঝা, মধুসূদন ঝা, সোনেলাল ঝা, গণেশদত্ত পাঠক, রামভদ্র ঝা, যদুনাথ ঝা 'যদুবর' এবং জীবন ঝা।

পরের বছর (অর্থাৎ, ১৯০৬-এ) বেনারস থেকে আর একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে, যার নাম ছিল 'মিথিলা মোদ'। এর সম্পদনা করেন ম. ম. মুরলীধর ঝা (১৯০৬-১৯২০ খ্রি.), অনূপ মিশ্র ও সীতারাম ঝা (১৯২০-২৭ খ্রি.), উপেন্দ্রনাথ ঝা এবং কাঞ্চীনাথ ঝা 'কিরণ' (বিশেষ করে নতুন আকারে যখন এটির প্রকাশন হতে থাকে, ১৯৩৬ থেকে ১৯৪১-এর পর্যায়ে)। মাঝে এটির প্রকাশন কিছুদিন বন্ধ ছিল এবং এখন এটি নিশ্চিহ্ন, কিন্তু মৈথিলীর মাসিক পত্রিকা-রূপে এই পত্রটির জীবন ছিল বেশ ঈর্ষাজনকভাবে দীর্ঘ। এতে মুখ্যত জোরালো নিবন্ধ ছাপা হতো বিভিন্ন বিষয়ে, তাছাড়া বেরোতো বক্তৃতা, ছোট গল্প, কবিতা, দীর্ঘ অনুবাদগুলি এবং সাম্প্রতিক বিষয়ের ওপর টিপ্পনী। অনেক নতুন লেখকেরা এই পত্রিকার মাধ্যমে উৎসাহ ও প্রেরণা পেলেন লেখার। যেমন, ত্রিলোচন ঝা, রামচন্দ্র মিশ্র, অনূপ মিশ্র, কুশেশ্বর কুমার, সীতারাম ঝা, জ্যোতিষী বলদেব মিশ্র এবং উমেশ মিশ্র। এই 'মোদ' (যা ছিল এই পত্রিকার জনপ্রিয় সংক্ষিপ্ত নাম) ছিল মৈথিলীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রচারক এবং মৈথিলীর পাঠক-সম্প্রদায়ের গঠনের একটা মুখ্য সাধন। এই পত্রিকার স্বর সমস্ত মিথিলাঞ্চলে শুধু শোনা যেতো তাই নয়, বেশ ভীতিরও সঞ্চার করতো। এর রসিক ও তির্যক মন্তব্যগুলির ও টিপ্পনীর প্রভাব ছিল সুদূর-প্রসারী।

আরও দুবছর পর, ১৯০৮ সালে, একটা মাসিক পত্রিকা বেরুতে থাকে 'মিথিলা-মিহির' নামে যা মার্চ ১৯১১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়ে মৈথিলীর দীর্ঘতম সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে তৎকালীন দ্বারভাঙার মহারাজাধিরাজের বদান্যতায়। এর মৈথিলী এবং হিন্দি সংস্করণ ছাড়াও কিছুদিন (১৯৩০-৩১-এ) ইংরেজি সংস্করণও ছিল। খুবই গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ, কবিতা ও অন্যান্য রচনা এতে প্রকাশিত হয় এবং এভাবে এরস্রষ্টার ইচ্ছার পূর্তি করে (যা ছিল "মহান মৈথিল সমাজে একটা জাগরণের নির্মাণ করা")। এর সম্পাদকীয় নীতি ছিল প্রগতির সপক্ষে শান্তিপূর্ণ এবং বিধানসম্মত যুক্তিতর্ক দেয়া। সম্প্রতি বিভিন্ন উপলক্ষে বেশ কটি ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয় এই পত্রিকার। তার মধ্যে ১৯৩৫ সালের ২৯ নম্বর সংখ্যা 'মিথিলাঙ্ক' ছিল মিথিলার এবং তার সংস্কৃতি বিষয়ক বিশেষদক। কিছু কিছু বিদ্বানের কথায় এই পত্রিকা মৈথিলীর আন্দোলনের সপক্ষে মাত্র কিয়দংশে উৎসাহ দেখায় — কারণ বেশ কিছুদিন পত্রিকাটি একটি দ্বিভাষী, এমনকি ত্রিভাষী পত্রিকা ছিল। কিন্তু সব মিলিয়ে দেখতে গেলে, বর্তমান শতকের এইসব প্রারম্ভিক দশকে এই পত্রিকাই মৈথিলীর প্রদীপকে উজ্জ্বল করে রেখেছিল। বর্তমানে এটি শুধুমাত্র

মৈথিলীর সাপ্তাহিক পত্রিকায় পরিণত হয়েছে এবং এর নবীন সংস্করণ ১৯৬০ হতে পাটনা থেকে প্রকাশিত হচ্ছে।

মৈথিলী পত্রকারিতার ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় ১৯১৪ সালের বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই। প্রথম পর্যায়ের মতোই এই পর্বেও প্রবাসী মৈথিলেরাই ছিলেন সর্বপ্রধান উৎসাহী। এঁদের নেতৃত্ব করেন মথুরার রামচন্দ্র মিশ্র যিনি পরপর দুটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা করেন : 'মৈথিল প্রভা' যা প্রথমে আজমীর থেকে প্রকাশিত হয় (আগস্ট ১৯২০ থেকে ডিসেম্বর ১৯২৪) এবং পরে আগ্রা থেকে (জুন ১৯২৫ থেকে জুন ১৯২৬) ও 'মৈথিল-প্রভাকর' যা আলিগড় থেকে প্রকাশিত হয় (অক্টোবর ১৯২৯ থেকে জানুয়ারি ১৯৩০)। এইসব সাময়িকপত্রের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত মৈথিলদের মধ্যে যোগসাধন, বিশেষ করে প্রবাসী মৈথিলদের মধ্যে। পত্রিকাগুলি তাই স্বভাবত সাহিত্যিক পত্রিকা না হয়ে হলো সামাজিক পত্র মাত্র। এগুলি দ্বিভাষীও ছিল (মৈথিলী এবং হিন্দিতে ছাপা) যাতে এঁদের বক্তব্য সেইসব মৈথিলদেরও বোধগম্য হয় যাদের পূর্বপুরুষেরা বহুযুগ আগে দেশত্যাগ করে বিভিন্ন হিন্দি-ভাষী প্রান্তে এসে বসবাস করা শুরু করেন এবং নিজেদের মাতৃভাষা বিস্মৃত হন। যেসব মুখ্য লেখক সাহিত্যিক এইসব পত্রিকাগুলিতে নিয়মিত লিখতেন তাঁরা হলেন পুলকিতলাল দাস 'মধুর', ছেদী ঝা 'মধুপ' এবং যদুনাথ ঝা 'যদুবর'। কখনো সখনো কুমার গঙ্গানন্দ সিংহ, রঘুনন্দন দাস, ভুবনেশ্বর সিংহ 'ভুবন', প্রমথনাথ মিশ্র এবং অন্যান্যরাও এই পত্রিকায় লিখতেন। এর ফলে প্রবাসী মৈথিলদের মধ্যে মাতৃভাষার প্রতি প্রেমকে নতুন করে জাগানো সম্ভব হলো।

এদিকে মিথিলাঞ্চলের দুজন কায়স্থ বিদ্বানের চেষ্টায়— যাঁরা হলেন উদিতনারায়ণ দাস ও নন্দকিশোর লাল—'শ্রীমৈথিলী'(১৯২৫-২৭) নামক একটি পত্রিকা শুরু হয়। এর সম্পাদকেরা দৈনন্দিন ব্যবহারের একটি গদ্যশৈলী নির্মাণের ওপর বেশি জোর দিলেন। এঁরা সাহিত্য সমালোচনাকে জানালেন স্বাগত-বিশেষ করে সাহিত্যের বিষয়ে দীর্ঘ নিবন্ধকে। ভাষার ওপর এর যা প্রভাব দেখা গেলো তার ফলে অ-সাহিত্যিক বিষয়েও রচনার মাধ্যম রূপে ভাষার প্রয়োগে এলো বৃদ্ধি।

'শ্রীমৈথিলী' যে কাজটি আরম্ভ করেছিল তা আরো সফল ভাবে এযুগেরই যে সুচারুরূপে সম্পাদিত পত্রিকাটি এগিয়ে নিয়ে গেলো তার নাম হলো 'মিথিলা' (১৯২৯-৩১)। এর সম্পাদক ছিলেন কুশেশ্বর কুমার এবং ভোলালাল দাস। শুরুতে এটি ছিল মাত্র একটি সাহিত্য-পত্রিকা, কিন্তু পরে তা অন্যান্য সামাজিক বিষয়ের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেয়। ফলে নানা কটু বিতর্কের সূচনাও দেখা দিলো এবং তারই পরিণাম-স্বরূপ পত্রিকাটির প্রকাশন বন্ধ হয়ে যায়। কুশেশ্বর কুমার প্রেরণা লাভ করেছিলেন মহামহোপাধ্যায় মুরলীধর ঝা-র থেকে এবং ভোলালাল দাস অনুপ্রেরিত হলেন মুনশি রঘুনন্দন দাসের দ্বারা। ফলে এঁরা সবসময়েই পত্রিকাটির একটা উচ্চমান বজায় রাখতে সক্ষম হন। এই পত্রিকা নতুন ধরনের গদ্যশৈলী নির্মাণের কাজ যেভাবে কাজ করেছিল

সে বিষয়ে আলোচনা করার দরকার নেই। একথা জোর গলায় বলা যায় যে তিরিশের দশকে মৈথিলী সাহিত্য যে সফলতা লাভ করেছিল তা 'শ্রীমৈথিলী' ও 'মিথিলা'-র জন্যই সম্ভব হয়েছিল। নরেন্দ্রনাথ দাস, হরিমোহন ঝা, কালীকুমার দাস 'মৈথিলী বাচস্পতি', শ্রীমতী শম্ভবী দেবী ও আরো অনেকের সুপ্ত প্রতিভা এই পত্রিকা দুটির মধ্যে দিয়েই জনসমক্ষে আসতে পেরেছিল।

দুর্ভাগ্যবশত এই দুটি পত্রিকার আয়ুই হলো ক্ষীণ। কৃষ্ণগড়-সুলতানগঞ্জের কুমার কৃষ্ণানন্দ সিংহের সংরক্ষণে এইসময় আরেকটি পত্রিকার প্রকাশন শুরু হয় যা এদেরই অনুসরণ হয়। এর নাম হলো 'মিথিলা-মিত্র' (১৯৩১-৩২)। প্রথমে এটি একটি পাক্ষিক পত্রিকা রূপে ছাপা শুরু হয় যার পরপর সম্পাদক হন গৌরীনাথ ঝা, ধনুখধারীলাল দাস, মহেশ ঝা এবং শশীনাথ চৌধুরী। কিন্তু মাস আষ্টেক পরেই এটি একটি মাসিক পত্রিকায় পরিণত হয়। অবশ্য মৈথিলদের সমস্যা নিয়ে এই পত্রিকা খুব বেশি চিন্তিত ছিল না — এসব বিষয়ে যে এর একটা স্বতন্ত্র স্বর ছিল তাও নয়। তবে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ এই পত্রিকার দ্বারা সম্ভব হয় যা ছিল মৈথিলদের মধ্যে 'জানকী-নবমী'কে (সীতার জন্মদিন) নিজেদের জাতীয় দিবস রূপে পালন করতে শেখানো। যবে থেকে 'মিথিলা-মিত্র' একটি বিশেষাঙ্ক বের করে 'জানকী-নবমী-বিশেষাঙ্ক' নামে, সেইদিন থেকেই এটা শুরু হয়। এই পত্রিকার মাধ্যমে যে সব সাহিত্যিক বিখ্যাত হন তাঁরা হলেন মহাবীর ঝা 'বীর', শ্রীবল্লভ ঝা, জীবনাথ ঝা বিদ্যাভূষণ 'জীব' এবং শ্যামানন্দ ঝা।

এই পত্রিকাগুলির কোনো না কোনো সময়ে কম অবধির মধ্যেই বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ হলো এই যে এদের সদস্য সংখ্যা ছিল অতি অল্প। তারও মুখ্য কারণ ছিল পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মৈথিলীর প্রতি বিমাতৃসুলভ ব্যবহার। আগেই একথা বলা হয়েছে যে ১৯১৭-তেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মৈথিলী ভাষাকে স্বীকৃতি দিলেও পৃথক বিহার প্রদেশ তৈরি হয়ে যাওয়ার ফলে এবং পাটনায় একটি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে যাওয়ায় এই স্বীকৃতিকে মৈথিলেরা কোনো কাজেই লাগাতে পারেন নি। সেদিন থেকেই মৈথিলীভাষীরা চেষ্টা করছিলেন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে এবং বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ে মৈথিলীর প্রচলন এবং স্বীকৃতির জন্য। যাঁরা এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্বে ছিলেন তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই এ নিয়ে কিছু করতে রাজি ছিলেন না। ফলে সাধারণ মানুষ মৈথিলীর ভবিষ্যৎ নিয়ে নিরাশ হতে আরম্ভ করলেন এবং মনে মনে মৈথিলীর পত্রপত্রিকার সদস্যতা নেওয়া নিরর্থক বলে ধরে নিলেন। এটার প্রমাণ পাওয়া যায় একই সময়ে মিথিলা প্রান্তে উর্দু, ইংরেজি, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকার সদস্যতা ও সমর্থনে— কারণ এইসব ভাষাগুলি সেযুগে এই প্রদেশের শিক্ষা ও শাসন-ব্যবস্থা দ্বারা স্বীকৃত ভাষা ছিল।

মৈথিলী সাংবাদিকতার তৃতীয় পর্যায় শুরু হলো ১৯৩৫ সালে ভারত সরকার যে সাংবিধানিক পরিবর্তন আনলেন তা থেকে। বিধানসভা ও সমস্ত জনপ্রতিনিধিমূলক সংস্থার নির্বাচন হওয়ায় সাধারণ মানুষের মনে নতুন করে আশা জাগলো প্রাদেশিক স্বতন্ত্রতা

নিয়ে। মিথিলার মানুষের ধারণা হলো — এবার বুঝি তাঁদের মাতৃভাষা উচিত স্থান পাবে।

যথারীতি, প্রথম প্রকাশিত হয় একটি প্রবাসী পত্রিকা— 'মৈথিল-বন্ধু' (১৯৩৫-১৯৪৩; নতুন ক্রম ১৯৪৭ থেকে আজ পর্যন্ত) আজমীর থেকে। এর সম্পাদক ছিলেন রঘুনাথপ্রসাদ মিশ্র এবং লক্ষ্মীপতি সিংহ। ১৯৩৯ থেকে এতে মৈথিলীর স্থান নিয়মিতভাবে নির্ধারিত থাকে এবং কিছু কৌতূহলকর 'স্বনামধন্য মৈথিলদের জীবন' এবং মূল্যবান গবেষণাপত্র এতে প্রকাশিত হয়। প্রবাসী মৈথিলদের মধ্যে মৈথিলীর রচনা ও পাঠে উৎসাহ জাগানোর কাজ ছাড়াও সবচেয়ে বড় যে কাজ এটি করেছে তা হল বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা, বিশেষত 'বিভূতি-অঙ্ক' যার চিরস্থায়ী গুরুত্ব আছে।

প্রবাসী মৈথিলদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত হয় 'মৈথিল যুবক'(১৯৩৮-১৯৪১) আজমীর থেকে চুন্নীলাল ঝা-এর সম্পাদনায় এবং 'জীবন-প্রভা' (১৯৪০-১৯৫০) আগ্রা থেকে (পরে ঝাঁসী) ব্রজমোহন ঝা-র সম্পাদনায়।

প্রথমে এগুলি ছিল পশ্চিমের মৈথিল ব্রাহ্মণদের 'সাম্প্রদায়িক' কাগজ; পরে এগুলি মৈথিলীর বিকাশে নিজেদের উৎসর্গ করে কারণ মিথিলার মানুষের সঙ্গে এরা নিজেদের একাত্ম করতে চায়।

মৈথিলীর জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল নতুন ক্রমের 'মিথিলা-মোদ' (১৯৩৬-১৯৩৮), 'ভারতী'(১৯৩৭) এবং 'বিভূতি'(১৯৩৭-১৯৩৮)। মৈথিলী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে 'ভারতী' ও 'বিভূতি' ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

'ভারতী' প্রকাশ করে মৈথিলী সাহিত্য পরিষদ (দ্বারভাঙা) এবং এর সম্পাদক ছিলেন বাবু ভোলালালদাস। সাহিত্যিক সমালোচনা, ভ্রমণকাহিনী, গদ্যরচনা ইত্যাদিতে গম্ভীর প্রবন্ধাবলী এর অবদান। এটি মৈথিলীর প্রাচীন সাহিত্যও প্রকাশ করতে শুরু করে। যেমন, জ্যোতিরীশ্বরের 'বর্ণ-রত্নাকর'। এর সম্পাদকীয় কলমে সাধারণ জ্ঞান, পরিশীলন এবং দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার লক্ষণীয়।

মজঃফরপুর থেকে প্রকাশিত জনপ্রিয় মাসিক পত্র 'বিভূতি' তার যাত্রা শুরু করে সুন্দরভাবেই। এর বিষয় হত আকর্ষণীয়, যদিও কখনো কখনো উত্তেজক, এবং এর সম্পাদক ছিলেন প্রথিতযশা লেখক ভুবনেশ্বর সিংহ 'ভুবন'। সে তুলনায় এর মূল্য ছিল নিতান্তই সামান্য। এতে প্রকাশিত রচনাগুলি ভাবের দিক থেকে ছিল বৈপ্লবিক এবং এক নতুন ধরনের কাজের এখান থেকে সূত্রপাত হয় — তা ছিল আশুরসবোধ এবং হাস্যরস। এই পত্রিকা বেশিদিন চলেনি কারণ এর বানানের ধারা ছিল মৈথিলী পাঠকের কাছে নতুন, কারণ প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের এটি ভীষণভাবে সমালোচনা করতে থাকে এবং দুর্নাম করার জন্য অপপ্রচারও করছে এমন ধারণার জন্ম দেয়। 'ভারতী' ও 'বিভূতি' না চলার মূল কারণ অবশ্য ছিল এই যে সাধারণ মানুষের মোহভঙ্গ হয় জনপ্রিয় মন্ত্রীদের পদাধিকারলাভের ক্ষেত্রেও যেখানে মৈথিলীর বিকাশের প্রশ্ন জড়িত ছিল। কাজেই এই

পত্রিকাগুলির পক্ষে কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধনই সম্ভব হয়নি।

মৈথিলী গদ্যের বিকাশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল 'মৈথিলী সাহিত্য পত্র' (১৯৩৭-১৯৩৯)-এর প্রকাশ। এই চতুর্মাসিক পত্রিকা স্থায়ী গুরুত্ব আছে এমন কাজ প্রকাশে উৎসাহী হয়। এর প্রকাশ মৈথিলী শব্দের বিজ্ঞানসম্মত ও প্রচলিত বানান ব্যবস্থা মুদ্রণকে জনপ্রিয়তা দেয়। দেবনাগরী লিপির পরিবর্তন যা ছিল হিন্দির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত (যে কারণে বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে মৈথিলীকে আলাদা করা কারণ কিছু লোক একে হিন্দির একটি উপভাষা বলতে শুরু করেন); যা সহজে পাওয়া যায় তাদের ছাপার অক্ষরে প্রকাশ; দেবনাগরীর সংস্কৃতের (দেববাণী) সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ, সর্বভারতীয় লিপি হিসাবে এর স্বীকৃতিলাভ এবং গুজরাতী ও মারাঠীর এই লিপিগ্রহণ — এসব কারণজনিত বিশেষ সম্মানলাভ — এসবই মৈথিলীর জন্য একটি সঠিক 'শৈলী'(এর শৈলী ছিল ভুল; লেখনশৈলী — বানানের পদ্ধতি ছিল না)-সংক্রান্ত সমস্যাকে জটিল করে তোলে। ১৯৩৬ সালে মজঃফরপুরে শৈলী নির্ধারণ সমিতির কর্তাব্যক্তি হিসেবে মহামহোপাধ্যায় ড. উমেশ মিশ্র বিজ্ঞানসম্মত 'শৈলী'র কতগুলি রীতি নির্ধারণ করেন। শৈলী বিষয়ে প্রচলিত সমস্ত ধারণা সতর্কভাবে বিশ্লেষণ করে এবং প্রশ্নাবলী প্রকাশিত করে এই রীতিগুলি পরীক্ষা করা হয় এবং তারপর এই পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত রমানাথ ঝা এগুলি গ্রহণ করেন। তখন থেকে অগ্রগণ্য মৈথিলী বৈয়াকরণ ও আভিধানিক মহাবৈয়াকরণ দীনবন্ধু ঝা এবং ভাষাতাত্ত্বিক সুভদ্র ঝা এই মত গ্রহণ করেন এবং মৈথিলী গদ্যলেখকদের একটি বড় অংশ এখন এই মত গ্রহণ করেছেন।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার সময় থেকে অনেক নতুন উল্লেখযোগ্য পত্রিকা ও সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়। এদের মধ্যে প্রধান ছিল মাসিক পত্র 'স্বদেশ' (কিছুদিনের জন্য প্রাত্যহিক) — দ্বারভাঙা থেকে প্রকাশিত (১৯৪৮); পাটনা থেকে 'মিথিলা জ্যোতি' (১৯৪৮); প্রথমে সীতামাঢ়ি ও পরে দ্বারভাঙা (কিছুদিনের জন্য পাক্ষিক) থেকে 'বৈদেহী' (১৯৫০); কলকাতা থেকে 'মিথিলা দর্শন' (১৯৫৩); সহর্ষ থেকে অভিব্যঞ্জনা (১৯৬৩); কলকাতা থেকে 'আখর' (১৯৬৭) এবং পাটনা থেকে 'সোনামাটি' (১৯৭০)। শিশুদের জন্য বিশেষ পত্রিকা— এলাহাবাদ থেকে 'বটুক' (১৯৪৯) এবং লোহনা থেকে 'ধীয়া-পুতা' (১৯৫৭); কবিতার জন্য কলকাতা থেকে ('মৈথিলী কবিতা') (১৯৭০) এবং নতুন সাপ্তাহিক 'মিথিলা' (১৯৫২;১৯৬০) এবং 'তটকা' এবং 'স্বদেশবাণী' উল্লেখযোগ্য। আরো কিছু স্বল্পায়ু মাসিক পত্র এক বা দু বছরের জন্য প্রকাশিত হয়। এগুলি এখন আর পাওয়া যায় না; তবে এদের গুরুত্ব বিচার করলে এদের প্রভাব স্বীকার করা প্রয়োজন; এগুলি হল—'পল্লব' (১৯৫৩); 'অভিযান' (১৯৬৩); 'মিথিলা সেবক' (১৯৫৩), 'মিথিলা-দূত'; 'মিথিলা ভারতী' (পাটনা) এবং 'মৈথিলী সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'।

সাংবাদিকতার মাধ্যমেই মৈথিলীতে নতুন প্রভাব পড়ে, মানুষ জেগে ওঠে; সৃজনমূলক

সাহিত্যে নতুন ধারার সৃষ্টি হয়; পুরনো ধারার পুনরুদ্ধার বা পরিমার্জনা সাধিত হয়; ছোট ছোট বিষয় যেমন যতিচিহ্নের ব্যবহার, অনুচ্ছেদ ভাগ, বানান ইত্যাদি সংজ্ঞায়িত হয়; অবশ্যই, মৈথিলী সাহিত্যে নতুন ধারার লেখার পদ্ধতি যা ছাপার উপযুক্ত এবং বেশি সংখ্যক পাঠকের পাঠের উপযোগী এবং দেশের সেবার ভাবসম্পন্ন— তার সূচনা হয়। অর্থাৎ, আধুনিক মৈথিলী সাহিত্যের সূচনা হয়।

(খ) মনোরঞ্জনের গদ্য

উপন্যাস

আধুনিক অর্থে যাকে উপন্যাস বলা যায় সে জাতীয় প্রথম কাজ এসেছিল অনেক পরে, যখন পশ্চিমী সাহিত্যের ধারায় গদ্যের বিকাশের মধ্য দিয়ে মৈথিলী সাহিত্যিকরা তাঁদের ভাষাকে উৎকৃষ্ট করে তুলেছিলেন। মিথিলায় সংস্কৃত পণ্ডিতদের যে বিশেষ প্রভাব ছিল, তারই ফলে প্রথমে সংস্কৃত আখ্যায়িকা, আখ্যান এবং উপাখ্যান-এর আদলে গদ্য রচনা হতে থাকে। এদের মধ্যে বেশির ভাগ কাজই প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত মহাকাব্য, পুরাণ নীতিকথা এবং গল্পকথার উপর ভিত্তি করে লেখা। এদের কোনো নিজস্বতা ছিল না। এদের লক্ষ্য ছিল শুধুমাত্র প্রাচীন কাহিনীগুলি জনপ্রিয় কবে তোলা।

প্রাচীনতম দীর্ঘ বর্ণনামূলক রচনা যেগুলি নিজস্ব না হলেও স্বাধীন লেখার মর্যাদা পেতে পারে, সেগুলি হল মম. পরমেশ্বর ঝা-র 'সীমন্তিনী-আখ্যায়িকা' এবং তুলপতি সিংহের 'মদন-রাজ-চরিত উপন্যাস'। এগুলি কখনোই শেষ হয়নি তবে প্রথমটির বেশ কিছু অনুচ্ছেদে অসাধারণ বর্ণনা পাওয়া যায়।

অগ্রগতির পরবর্তী ধাপে আসে ইংরেজি ও বাংলা বিভিন্ন উপন্যাসের অনুবাদ। এদের মধ্যে শিবানন্দ চৌধুরীর 'কপালকুণ্ডলা'র অনুবাদ বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

১৯২০-তে প্রথম স্বতন্ত্র উপন্যাস রচিত হয় মিথিলায় যাতে কোনো সাফল্যের দাবি থাকতে পারে। এতাবৎ উপন্যাসিকদের মৈথিলী উপন্যাসের বিষয়ের ব্যাপারে একটা আবছা ধারণা ছিল; হাস্যরস প্রয়োগের সম্ভাবনা সম্পর্কে এবং মিথিলার সমাজ ও সংস্কৃতির পটভূমিতে চরিত্রসৃজন সম্পর্কে তাঁরা সচেতন ছিলেন; কিন্তু এই সময় থেকে তাঁরা এই শিল্প আয়ত্ত করেন প্রকৃতপক্ষে।

শুরুতে উপন্যাস রচনার ধারা ছিল নীতিমূলক। আমার মনে হয় এর কারণ ছিল মৈথিল সমাবেশের ধ্যানধারণার প্রভাব, এর দশ-দফা কর্মসূচি এবং সমকালীন সমাজের ত্রুটি অপসারণের দেশহিতকর ব্রত। রামবিহারীলালদাসের 'সুমতি' (১৯১৮) এই ধারার একটি উপযুক্ত উদাহরণ। এখানে প্রায় সম্পূর্ণ গল্পেই, (যা একটি পরিচ্ছন্ন রূপক যেখানে দেখানো হচ্ছে কিভাবে সুমতি কুমতির চেয়ে বড়) একটি চরিত্রের প্রাধান্য যার নাম উচিত-বক্তা (যে ব্যক্তি যা হওয়া উচিত বা উচিত নয় তা নির্দেশ করেন)। ভোলা ঝা

এবং পূর্ণানন্দ ঝা-ও এই ধারার লেখক। পণ্ডিত জনার্দন ঝা 'জনসিদন'ও নীতিমূলক উপন্যাস রচনা করেন। তিনি এই সব লেখকের চেয়ে বেশি কৃতিত্ব এবং সৃজনশীলতার পরিচয় দেন কারণ তিনি প্রকৃত সামাজিক সমস্যা তুলে ধরেন তাঁর অসংখ্য উপন্যাসে, যেমন, 'নির্দয়ী সাসু' এবং 'পুনর্বিবাহ।

ত্রিশের দশকের গোড়ায় জনসিদনের পুত্র অধ্যাপক হরিমোহন ঝা উপন্যাস রচনার কাজ হাতে নিলে মৈথিলী উপন্যাসে নতুন দিক সূচিত হয়। তিনি উপন্যাস রচনাকে পেশায় রূপ দেন এবং তাকে অতি উঁচুদরের শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যান, যা ছিল তখন পর্যন্ত মৈথিলী ভাষায় সর্বোচ্চ। অতীতে বিদ্যাপতি গীতিকবিতাকে বা উমাপতি কীর্তনিয়া নাটককে সাহিত্যশিল্পের যে পর্যায়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন, হরিমোহন ঝা মৈথিলী উপন্যাসকে তার রূপ পরিগ্রহণের কালে সেই পর্যায়ে নিয়ে যান।

ঝা ১৯৩০-৩৩- এ তাঁর 'কন্যাদান' প্রকাশের মধ্য দিয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ উপন্যাসের গুরুত্ব এর সামাজিক পুনর্গঠনে— মৈথিলী নারীর শিক্ষায় নয়, যদিও লেখক তার জন্য গর্ববোধ করতেন এবং গোঁড়া ব্যক্তিরা তার জন্য অসন্তুষ্ট হন; এর গুরুত্ব একটি সুন্দর সামাজিক হাস্যরসাত্মক রচনা হিসেবে যা লেখক সৃষ্টি করেছিলেন অসাধারণ প্রতিভা ও অন্তর্দৃষ্টির মিশ্রণে। তাঁর হাস্যরস ব্যাপক কিন্তু তাঁর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ছোট ছোট চরিত্র যেমন বটুক বা ঝাড়খণ্ডী বা ঘটক সবচেয়ে বেশি মনে রাখার মতো এবং বহুল প্রশংসিত। পরবর্তী উপন্যাস 'দ্বিরাগমন'-এ তিনি তাঁর প্রথম উপন্যাসের মতো সফল নন, কারণ গুণগত মান সেখানে তেমন উৎকৃষ্ট নয়। হরিমোহনবাবু তাঁর হাস্যরস সৃজন ক্ষমতা ব্যাপক এবং সুপ্রযুক্তভাবে ব্যবহার করেছেন 'খট্টর ককাক তরঙ্গ' ইত্যাদি বইতে। আমার মনে হয়, হরিমোহনবাবু স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ চরিত্রসৃজনে এবং হাস্যরস পরিবেশনে অন্যসব ঔপন্যাসিককে ছাড়িয়ে যান প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের রীতির সংশোধনের কোনোরকম প্রচেষ্টা ছাড়াই। ভাষায় তাঁর দখল ছিল অসাধারণ যা তাঁর সাফল্যের জন্য অনেকাংশে দায়ী।

এ যুগের অন্য দুই ঔপন্যাসিক হলেন 'কিরন' এবং 'সরোজ', তবে তাঁরা খুব ভাল লেখক নন। কুমার গঙ্গানন্দ সিংহ ১৯৩৫- এ 'অগিলহী' নামে একটি বড় উপন্যাস লিখতে শুরু করেন এবং এর কিছু অধ্যায় বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয়; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এটি এখনো পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়নি; এটি পূর্ণ উপন্যাস নয়, বরং বিশেষ সরস এবং সত্যনিষ্ঠ চরিত্র বর্ণন হিসেবেই রয়ে গেছে।

পরবর্তী দশকে আমরা অনেক ঔপন্যাসিককে পাই। এঁদের মধ্যে আমার মতে যত্রি সর্বশ্রেষ্ঠ। এঁর উপন্যাস নানা কারণে আকর্ষণীয়। এর মধ্যে একটি, 'পারো' (১৯৪৬) শক্তিশালী দুঃখরসাত্মক উপন্যাস। এটি একটি মেয়ের গল্প যে নিজের খুড়তুতো ভাইয়ের কাছে তাঁর নরম অনুভূতিগুলি ব্যক্ত করে। এই ভালোবাসা নিষিদ্ধ সম্পর্কের বিষয়টি সাধারণ প্রেমের কাহিনী নয়, বরং কিছুটা উপদেশাত্মক। তা সত্ত্বেও এই উপন্যাস পাঠক

সমাজে উন্মাদনা জাগায় এবং বলা হয় এই বইটি প্রকাশের চার মাসের মধ্যে সমস্ত বই নিঃশেষিত হয়। বোনের ভালোবাসার মধ্যে বিশেষ অনুভূতির প্রকাশ এতে পাই এবং এই 'প্রগতিশীল' লেখকের নীতিকে পরিহার করার কোনো যুক্তি নেই। গল্পের বিষয়ে যে ইঙ্গিত এবং রস, শৈলীর যে গতিময়তা এবং পারিবারিক বন্ধনের যে মনস্তত্ত্ব যা এখনো মিথিলার গ্রামের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে দেখা যায়— তার জন্য এই উপন্যাস স্বতন্ত্র। তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাস 'নবতুরিআ' (১৯৫৪) বা 'বলচনমা' এর মতো সফল নয়।

যত্রির পরে আরো তিনজন ঔপন্যাসিক জনপ্রিয়তার সাফল্যের চেয়ে বেশি সাফল্য অর্জন করেন। 'কুমার' (১৯৪৬) এবং সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৬৯) 'দু পত্র'-এর লেখক উপেন্দ্র ঝা 'ব্যাস'; 'ভালমানুস' (উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ) (১৯৪৪) এবং 'পবিত্র' (১৯৬৭)-এর লেখক যোগানন্দ ঝা এবং 'মধুশ্রাবণী' (সদ্যবিবাহিতের মধু-ব্রত) (১৯৫৬)-র লেখক শৈলেন্দ্রমোহন ঝা উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক এবং নিঃসন্দেহে তাঁদের কাজ আমাদের সাহিত্যে স্থায়ী কীর্তি হিসেবে বিবেচিত হবে। যোগবাবুর 'ভালমানুস' একটি দুঃখরসাত্মক কাহিনী এবং এর সামাজিক দিক, কুলীন সমাজে বিবাহে জাতের সংস্কার ইত্যাদি মনোযোগ আকর্ষণ করলেও হরিমোহনবাবুর মতো যোগবাবুর কাজেরও ছোট ছোট অসাধারণ টান এবং সামাজিক হাস্যরসাত্মক ভাব আমাকে বেশি টানে; এর সামাজিক বিষয় ততটা টানে না।

গত কুড়ি বছরের ইতিহাসে একজন কৃতী লেখক হলেন 'মণিপদ্ম'। তিনি হলেন বহেড়ার ড. ব্রজকিশোর বর্মা যিনি উপকথার উপর গভীর এবং বিস্তৃত গবেষণা করেছেন এবং এ সবের কাব্য ও বাগ্‌ধারা এমনভাবে আত্মস্থ করেছেন যে অন্য সব লেখকের থেকে তাঁকে আমরা আলাদা করতে পারি। তিনি সাহিত্যের কথা বলেন এবং স্বনামধন্য সাহিত্যিকের সততা নিয়েই লেখেন। তিনি অনেক উপন্যাস, বিশেষ করে ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন— অনলপথ, বিদ্যাপতি (১৯৬০), অর্ধনারীশ্বর (১৯৬৭-৬৮), লোরিকবিজয় (১৯৭০) এবং সর্বোৎকৃষ্ট 'নইকা বনিজারা' (১৯৭৩); তবে এর মধ্যে শেষ দুটিতেই তিনি নিজের প্রকৃত বিষয় খুঁজে পেয়েছেন। লোরিকবিজয়ের গল্পের বিষয় মৈথিল উপকথার নায়ক লোরিক যে উত্তর-পূর্ব ভারতের সমস্ত উপকথায় বিখ্যাত। ড. বর্মা অসাধারণ গদ্যে লোরিকের নায়কত্বের পরিচয় দিয়েছেন উপজাতিদের গাথার বাগ্‌ধারার স্বাদ বজায় রেখে। আমরা যেন লোরিকের যুগেই ফিরে যাই এবং পাঠক সবকিছুই প্রাচীন কালের নায়কের চোখ দিয়ে দেখতে শুরু করেন। দৃষ্টির এই গভীরতা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খতা তিনি এ পর্যন্ত আয়ত্ত করতে পারেননি, বহুকথিত ঐতিহাসিক উপন্যাস 'বিদ্যাপতিতে'ও নয়। এই গুণ আরও বেশি করে পাই তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাস 'নইকা বনিজারা'য়। আমরা আরও উপন্যাস আশা করবো, কারণ এখন তিনি নিজেকে খুঁজে পেয়েছেন।

আর এক ঔপন্যাসিক যিনি প্রথমে কবি ও ছোটগল্পকার হিসেবে খ্যাতিলাভ করে

পরে উপন্যাস লেখেন, তিনি হলেন মনীন্দ্রনাথ চৌধুরী রাজকমল। দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯৬৭-তে তিনি মারা যান। তাঁর কথা তিনি রাখতে পারেননি তবু তাঁকে বড় লেখকদের দলভুক্ত করা যায়। যৌন বিষয়ে তিনি স্পষ্ট খোলাখুলি আলোচনায় বিশ্বাসী ছিলেন। এক অর্থে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'আন্দোলন' (১৯৬৮-তে মৃত্যুর পরে প্রকাশিত) তাঁর ভিতরের বাসনা ফুটিয়ে তোলে এবং তাঁর এক সুখী এবং সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন দেখাকে রূপ দেয়। এর পরে আসে 'আদিকথা' (১৯৫৮) যাতে নায়িকাচরিত্র ছিল স্পষ্টতই অজাচারী এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ, কিন্তু লেখক তাকে কোনো বিশেষ মাত্রা দিতে পারেন নি; এই চরিত্র কোনো মহিমা বা গুরুত্বই পায়নি। এই ধারায় তাঁর শেষ বড় উপন্যাস 'পাথরফুল' (১৯৬৭) তুলনায় অধিক সফল হতে পারতো; কিন্তু এ সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলা যায় না, কারণ এটি প্রকাশের আগেই লেখক মারা যান।

একইরকম শক্তিশালী, তবে বোধহয় অধিক সফল ছিল ময়ানন্দ মিশ্র, সোমদেব এবং সুধাংশুশেখর চৌধুরীর কাজ। ময়ানন্দের কাজ বেশি প্রভাব ফেলে কারণ মিথিলার জনসাধারণের জীবন সম্পর্কে এগুলি সৎ; এর সবটাই অলীক কল্পনা নয়। তাঁর শ্রেষ্ঠ কাজ 'বিহাড়ী পাত ও পাথর'(১৯৬০)। নায়িকা ত্রিবেণী বিধবা এবং যৌন আবেগতাড়িত; লেখক এই নারীর জীবন এর চেয়ে বেশি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করতে পারতেন না; তবে সে কোনো যৌনক্ষুধার কলুষের অবাস্তব জীবনের দিকে ঝোঁকেনি। অন্য কোনো কম ক্ষমতাশালী লেখকের হাতে এই পরিস্থিতি আধুনিকতাবাদের সূচনার সস্তা পথ হোত, কিন্তু তা হোত প্রকৃতই খারাপ এবং অবাস্তব। তার অন্য কাজ 'খোতা ও চিড়াই' (নীড় ও পাখি) (১৯৬৫) আরও সফল নীচুতলার এক নারীর জীবনে আবেগের তাড়না প্রকাশে যার স্বামী অক্ষম। তার স্বামীর ভালোবাসার নরম ব্যাপারগুলো তাকে এতটাই স্পর্শ করে যে এই নারী এক দুঃখময় কিন্তু মহৎ উচ্চতায় উত্তীর্ণ হয়।

সোমদেবও তাঁর উপন্যাস 'চানো দাই' (১৯৫৯)-এ এই সমস্যা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, তবে তিনি বেশি সফল 'ব্রহ্মপিশাচ'(১৯৬৪)-এ, যে উপন্যাসের বিষয় কালোবাজারি। সুধাংশুশেখর 'তর পট্টা উপর পট্টা'(১৯৬১)-তে একই সমস্যা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন; কিন্তু এঁরা দুজনে কেউই ময়ানন্দের মতো শক্তির পরিচয় দিতে পারেন নি। ময়ানন্দের কাজে ছিল বাস্তবতা, মহানুভবতা এবং বিশালত্বের ছোঁয়া। নারী তাঁর কাছে কষ্টিপাথরের মতো যা শুদ্ধ এবং সত্য, ভালো এবং মহানকে চিনিয়ে দেবে। এই বোধই তাঁকে আধুনিক উপন্যাসের যৌনবোধের সস্তা নাটকীয়তা থেকে মুক্ত করেছে।

ময়ানন্দ এছাড়াও নীচুশ্রেণীর জীবনের কবিতা লোকসমক্ষে আনেন এবং এটিই সম্ভবত মৈথিলী উপন্যাসে তাঁর সবচেয়ে বড় দান। সে যুগের অন্য লেখকরা এ বিষয় নিয়ে বক্তব্যকে বিস্তৃত করেন। এঁদের মধ্যে অধ্যাপক 'ধীরেন্দ্র' প্রথমে উল্লেখের দাবি রাখেন। তাঁর উপন্যাস 'ভোরকবা' (ভোরের তারা) (১৯৬৫) গ্রামের নীচুজাতের মানুষের জীবনে ভোরের আলোর আগমন ঘোষণা করে এবং 'কাদো আওর কোয়লা'(কাদা ও কয়লা)

(১৯৬৯-৭০) নীচুতলার মানুষদের সমাজে উত্তরণের পথ দেখায়। ললিতের 'পৃথিবীপুত্র' (১৯৬৫) এই বিষয়কে পরিমার্জিত করে। মিথিলার গ্রামের দরিদ্র শ্রেণীকে তিনি দৃষ্টিশক্তি এবং শক্তি দেন। যদিও চরিত্রগুলির জীবনে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের বর্ণনায় তিনি অপরিণত, তবু সব মিলিয়ে মৈথিলী উপন্যাসে তিনি নীচুতলার নায়ক বা নায়িকার জন্য একটি বিশেষ স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এই ধরনের রচনায় শ্রেষ্ঠ কাজ অবশ্য রামানন্দ রেণুর। তাঁর সাম্প্রতিকতম উপন্যাস 'দুধ-ফূল' (১৯৬৭)-এ তিনি সালকি নামে একটি নিম্নশ্রেণীর এক অল্পবয়সী বিধবার গল্প তুলে ধরেছেন। অল্প বয়সে বিধবা হলেও সে দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে আপত্তি জানায় কারণ তাতে তার সন্তান রমেসরা একলা এবং সহায়হীন মনে করতে পারে নিজেকে। কিন্তু সেই ছেলে মাকে ভুলে গিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যায় এবং এক বড় শহরে কুলির কাজ নেয়। শেষ পর্যন্ত সে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সালকির দুঃখের কাহিনী চরম পরিণতি পায় যখন তার ছেলে ফিরে আসে। যদিও তার আনন্দে ছেদ পড়ে যখন সে জানতে পারে যে যে সন্ন্যাসীকে সে তার নিজের হারানো ছেলে মনে করেছিল সে আসলে অস্পৃশ্য জাতের এক বহিরাগত। এক দুঃখময় পরিণতির আশঙ্কা দূর হয় যখন সে স্থির করে যে নকল ও আসল রমেসরা দুইই তার এবং পৃথিবীর কোনো শক্তিই তাদের তার থেকে পৃথক করতে পারবে না। এ গল্পের অন্তর্নিহিত অর্থ স্পষ্ট। এটি সম্পূর্ণ বাস্তব, মানবিক এবং জীবনের ছন্দে সজ্জিত। কিন্তু এ জাতীয় উপন্যাস প্রচলিত বাগ্‌ধাবা ও গঠন প্রকরণ থেকে ভিন্ন হয়ে যায় এবং ঠাসবুনোট আলগা হয়ে আসে। ঘনবদ্ধ গল্প নতুন গল্প ও উপন্যাস লেখকদের পক্ষে জোরালো বিষয় নয়। এতে মানুষের স্পন্দমান জীবনের সত্য এবং জীবন্ত ছবি তুলে ধরা হয়েছে — যৌনতা এবং সোনার সাহায্য ছাড়া। এই উপন্যাসের মহত্ব যৌনতাকে এর বিষয়বস্তু থেকে বাদ দেওয়ায়। জীবনের বর্ণনার উপর দখল এবং উত্তেজনা সৃষ্টির স্বাভাবিক পদ্ধতি এর দুটি নতুন এবং সার্থক দিক।

এই বছরগুলিতে অনেক ভালো উপন্যাস লেখা হয়েছে। তবে স্থানাভাবে এদের সবার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। চন্দ্রনাথ মিশ্র অমরের 'বীরকন্যা' (১৯৫০) এবং 'বিদাগরী' (১৯৬৩), শৈলেন্দ্রমোহন ঝা-র 'প্রতিমা' (১৯৫১), বদ্রিনারায়ণ দাসের 'চন্দ্রকলা', বিনোদের 'নয়নমণি' (যা সত্যিই কিছু স্থায়ী মানবিক বোধের জন্ম দেয়), বিন্দেশ্বর মণ্ডলের 'বাটক ভেট জিনগীক গেঁঠ' (১৯৬৭), কানওয়ারকান্তর 'সেহেন্তা' (১৯৬৭) এবং আরও অনেক উপন্যাসই কৌতূহলোদ্দীপক এবং অনেক বিষয়েই নিছক মনোরঞ্জনের জন্য সস্তা কাজের চেয়ে অনেক ভালো। এদের অভিজ্ঞতা ও বৈচিত্র্যের সম্ভার, আকর্ষক বিষয় মৈথিলী উপন্যাসকে বেশ জনপ্রিয় করে তোলে। এ ছাড়াও হরিমোহন ঝা-র হাস্যরস এবং সামাজিক ব্যঙ্গকে অনুকরণ করার চেষ্টা যেমন রূপকান্তর 'মোমক নাক' (মোমের নাক) উল্লেখযোগ্য এবং তাদের নিজেদের বৈশিষ্ট্যে গুরুত্বপূর্ণও।

তবে নতুন প্রজন্মের লেখকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীবকান্তি যিনি একজন শক্তিশালী লেখক

হিসেবে দেখা দিয়েছেন। তাঁর দুটি উপন্যাস 'পনিপৎ'(১৯৬৯) এবং 'দু কুহেসক বাট' (১৯৬৮) বোধহয় আজকের সবচেয়ে সফল দুটি উপন্যাস। পনিপতে বলা হয়েছে অসফল এক যুবকের কথা যার চারিদিকে হতাশা। 'দু কুহেসক বাট'-এও আধুনিক তরুণ সমাজের অনিশ্চয়তা ও দ্বিধার কথা বলা হয়েছে যার মধ্যে আমাদের তরুণ যুবক যুবতীরা আজ কাটাচ্ছে। গল্পের বিষয় নতুন কিছু নয়; কিন্তু তাঁর লেখবার ধরন একে অসাধারণত্ব দিয়েছে। নায়কের জীবনের সঙ্কটকাল দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। রচনা-পদ্ধতি মনোবিশ্লেষণমূলক উপন্যাসের মতো যেখানে মনোজগৎ অনেক বেশি জরুরি এবং কৌতূহলোদ্দীপক পার্থিব জগতের চেয়ে যেখানে নরনারীর বিচরণ। এটি বস্তুত হরিমোহন ঝা সৃজিত সুন্দর হাস্যোদ্রেককারী সামাজিক হাস্যরসাত্মক প্রচলিত মৈথিলী উপন্যাসের ধারা থেকে স্পষ্ট সরে আসা। লেখকের বিষয়ে নতুনত্ব আছে; তাঁর শৈলী ঘরোয়া জীবনের স্পন্দনে পূর্ণ এবং মাটির নৈকট্য ঘরোয়া এবং প্রতীকী বাগ্‌ধারায় সর্বত্র ছড়ানো। এমনকি তাঁর শেষ বড় উপন্যাস 'অগ্নিবাণ'ও আগুনের রূপক-বর্ণনা—ক্ষুধা, হতাশা, বেকারত্ব যা আধুনিক মিথিলায় ছড়িয়ে পড়েছে তার বর্ণনা এখানে পাই যা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

বর্তমানে ছোটগল্প উপন্যাসের চেয়ে বেশি জনপ্রিয়। তার কারণ হয়তো পাঠক সমাজের ক্রমশ কমে আসা ক্রয়-ক্ষমতা। লেখক এবং প্রকাশকদের একথা এবং ছাপার খরচের কথা মাথায় রাখতে হবে। কবিতা মনে রাখা যায়, শোনা যায় এবং উপভোগ করা যায়, কিন্তু উপন্যাস পড়া দরকার। মিথিলার মতো রাজ্যে পাঠকসংখ্যাই কম যেখানে সাক্ষরতার হারই খুব কম এবং যেখানে বই কেনার প্রশ্ন যখন ওঠে, অনেকেরই ক্ষমতা থাকে না সে বই কেনার যার দাম দু টাকার বেশি। আমার মনে হয়, মৈথিলী উপন্যাসের ২০০, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ১০০ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার এটাই কারণ। মৈথিলীতে দীর্ঘ কোনো উপন্যাস নেই এবং ছোটগল্প উপন্যাসের চেয়ে বেশি জনপ্রিয় হয়েছে।

একটি গুরুতর সমস্যা হল অপটু লেখকদের তৃতীয়-শ্রেণীর রচনা উপন্যাস হিসেবে প্রকাশ। আমার মনে হয় এগুলি ভালোই বিক্রি হয় এবং ফলে তা প্রকৃতই ভালো উপন্যাসের বিক্রি কমিয়ে দেয়। এমন একজন লেখক (ড. বি. ঝা) আছেন যিনি পেশায় ডাক্তার হয়েও কিছু কিছু সুন্দর মুহূর্ত এবং সুনির্মিত চরিত্র তৈরি করেছেন। তবে সস্তা যৌনতা, অপরাধ এবং অতিনাটকীয়তা তাঁকে বড় লেখক হিসেবে স্বীকৃত হতে দেয়নি। দুঃখের বিষয়, যখন এসব জনপ্রিয় সর্বাধিক বিক্রীত বইগুলির সারহীনতার কথা মানুষ জানতে পারে, এদের জনপ্রিয়তা কমতে সময় লাগে না।

মৈথিলী গদ্যের সবচেয়ে ভালো উদাহরণ উপন্যাসই যদিও কতগুলি প্রবন্ধও আছে যেমন মম. ড. উমেশ মিশ্র-র, রমানাথ ঝা-র এবং আরও কারো কারো। এই মন্তব্যের বিষয়ে আমার মতে ছোটগল্পও যোগ হওয়া দরকার। উপন্যাস সাহিত্য সৃজনে সেই হাতিয়ার যা গণশিক্ষা ও গণসংস্কৃতি বিস্তারে সহায়ক। যদিও কেউ কেউ একে আমূল

পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন, এটি সবচেয়ে সুন্দর ও উপাদেয় উপায়ে ব্যবহৃত হতে পারে। একথা মানতে হবে যে এটি একটি বহুল পঠিত সাহিত্যের ধারা এবং সমাজের বড় সংখ্যক সাহিত্যিক মনের মানুষের জীবন এবং ধ্যানধারণাকে পরিবর্তিত করার ক্ষমতা এর আছে। যাই হোক, একে কোনোরকম প্রচারের কাজে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকাই বাঞ্ছনীয় এবং বিষয় হওয়া উচিত সে সব পরোক্ষ এবং সার্বজনীন সত্যের বিষয় যা নির্দ্বিধায় ভালো এবং সুন্দর। এই উক্তি শিল্পের যে-কোনো শাখাতেই প্রযোজ্য, তবে আমার মতে উপন্যাসের ক্ষেত্রে সর্বাধিক কারণ এই শাখায় সহজ, আকর্ষক ও মিশে যাওয়া ধরন বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছবে অন্য শিল্পমাধ্যমের চেয়ে। যেমন, অন্য কোনো শিল্পের তুলনায় সাধারণ মানুষ এটি বেশি পড়বে এবং উপভোগ করবে। এর জন্য সেই খরচ এবং সময় দরকার নেই যা নাটকের জন্য দরকার। যা দরকার তা হল সাধারণ পাঠের ক্ষমতা এবং গল্পের বোধগম্যতার জন্য স্বাভাবিক বুদ্ধি।

আজকের মৈথিলী সাহিত্যে সাহিত্য মাধ্যম হিসেবে ছোটগল্প একটি একক প্রাপ্তি, যদিও ১৯৫৭ পর্যন্ত এমন ছিল না। মৈথিলী সাংবাদিকতার সূত্রপাত হলে এই ধারারও প্রবর্তন হয়। পুরনো মৈথিলী ঔপন্যাসিকরা ছোটগল্প ও উপন্যাসের শিল্পের পার্থক্য মানতে চাননি। ১৯২০ থেকে এই দুইয়ের মধ্যে স্পষ্ট ভেদের সূত্রপাত হয়।

প্রথম ছোটগল্পকাররা হলেন শ্রীকৃষ্ণ ঠাকুর ('চন্দ্রভাগা' ১৮৮৫), বৈদ্যনাথ মিশ্র 'বিদায়সিন্ধু' (সহজ গল্প সংকলন 'কথাসংগ্রহ' এবং হাস্যরসাত্মক গল্পগুচ্ছ 'গপ্প-সপ্প-ক-খরিহান'), কালিকুমার দাস ('ভীষণ অন্যায়' ১৯২৩, 'কমলা' ১৯২৯, 'গঙ্গাস্নান' ১৯২৯, অদলা-কবদলা ১৯৩০ এবং একটি সংকলন 'কামিনীক জীবন' ১৯২৭), লক্ষ্মীপতিসিংহ, গুণবন্তলাল দাস ও হরিনন্দন ঠাকুর 'সরোজা' (নানা গল্প: 'কর্ণফুল' এবং 'কবিজী-ক-প্লাত' ইত্যাদি)। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দুজন লেখক হলেন কালিকুমার দাস এবং 'সরোজা'। যদিও ক্বচিৎ এঁরা কোনো বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। এঁরা সাধারণত চেষ্টা করতেন সমাজের কোনো ত্রুটি বা বর্ণহীন প্রেমোপাখ্যান বর্ণনা করতে।

১৯৩০-এ বহু গল্পলেখকের আবির্ভাব হয়। তাঁদের কাজে জীবনের নানা সমস্যার বিষয়ে বেশি সচেতনতা ছিল এবং ছোট গল্পের প্রকৃতি সম্পর্কেও তাঁরা বেশি জানতেন। এঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন কে. এন. ঠাকুর, 'পাগল বা বিক্ষিপ্ত', কাঞ্চীনাথ ঝা 'কিরণ', যদুনন্দন ঝা 'প্রলয়ংকর', নন্দকিশোরলাল দাস, পরমানন্দ দত্ত 'পরমার্থী', ভুবনেশ্বরসিংহ 'ভুবন', 'ভারতীয়', কুলানন্দদাস 'নন্দন', অলখনিরঞ্জন, শ্রীবল্লভ ঝা, শশিনাথ চৌধুরী প্রমুখ। এদের মধ্যে 'ভুবন' এবং অলখনিরঞ্জনের গল্প হত বিশেষ শক্তিশালী; যেমন, ভুবনের 'বিসর্জন' ও অলখনিরঞ্জনের 'বিসরল বাত' ও 'ইহো বীতি গেল' দুটিতেই গম্ভীর পরিস্থিতির বিকাশ। তেমনি কে. এন. ঠাকুরের 'দরদে-দিল-ক সৌখ', 'কিরম'-এর 'ইহো চারি খুন কিয়েক' এবং 'ভারতীয়'র 'জাতরাক শুভদিন' গুরুত্বপূর্ণ যেখানে মানব চরিত্রের বিশেষ জ্ঞানসহ এঁরা গম্ভীর কোনো বিষয় ব্যাখ্যা করেন।এ সময় মিহির,

বিভূতি, ভারতী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পগুলি অবশ্য একই গতানুগতিক মানসিক দিক নিয়ে লেখা হত এবং কদাচিৎ এদের সতর্কভাবে নির্বাচন করা বা পরিকল্পনা করা হত।

১৯৪০-এর পরে কিছু বিখ্যাত ছোটগল্প লেখা হয়। উল্লেখযোগ্য নামগুলি হল — প্রবোধনারায়ণ চৌধুরী (সঙ্কলন 'বীদল ফূল ১৯৪০), সুরেন্দ্র ঝা 'সুমন' (সঙ্কলন 'কথামুখী'), হরিমোহন ঝা (সঙ্কলন 'প্রণম্য দেবতা' ১৯৪৫, 'খট্টরককাক তরঙ্গ', 'রঙ্গশালা' 'একাদশী তীর্থযাত্রা' (১৯৫০), চর্চাদি (১৯৬০) ও অন্যান্য গল্প), ভীমেশ্বর সিংহ, নগেন্দ্রকুমার (সঙ্কলন 'সসরফনী' ১৯৪৭), উপেন্দ্রনাথ ঝা 'ব্যাস' (সঙ্কলন 'বিড়মলনা'), 'রমাকর' (সঙ্কলন 'প্রয়াস' ১৯৪৬), যোগানন্দ ঝা (সঙ্কলন 'অমকা জলখরি'), কুমার গঙ্গানন্দ সিংহ, গিরিধর ঝা, 'বিকল বিশারদ', উমানাথ ঝা (সঙ্কলন 'রেখাচিত্র'), মনমোহন ঝা (সঙ্কলন 'অশ্রুকণা' ১৯৪৯) এবং আরো অন্যান্যরা।

প্রবোধনারায়ণ চৌধুরীর গল্প কোনো বিশেষ গুণের জন্য উল্লেখযোগ্য নয়। সেখানে শৈলী ও বিষয় অপরিণত। কিন্তু সুরেন্দ্র ঝা 'সুমন' একজন ভালো গল্পকার। তিনি 'কাশ্যপ', 'মধুকর' ও 'দ্বিরেফ' ছদ্মনামে লেখেন। তাঁর 'কলা-ক পুরস্কার'-এ দেখি স্বার্থপর বুর্জোয়া, খেটে খাওয়া মানুষদের মধ্যে নিজেকে প্রতিভাশালী মনে করে; তাঁর 'মধুশ্রাবণী' বিখ্যাত মধুশ্রাবণী উৎসবের একটি বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখা। ছাপার অক্ষরে তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্প বোধহয় 'বৃহস্পতি-ক শেখ' যেখানে মূল বিষয় হল এক কুসংস্কার যে বৃহস্পতিবারের সন্ধে কোনো মঙ্গল কাজের জন্য ভালো নয়।

হরিমোহন ঝা হলেন বিখ্যাত উপন্যাস 'কন্যাদান'-এর লেখক এবং তাঁর প্রথম গল্প সংগ্রহ 'প্রাণময় দেবতা'র প্রভাব দ্বিতীয় সংগ্রহে দৃঢ় হয়। চর্চরি ঔপন্যাসিকের চেয়ে ছোটগল্পকার হিসেবেই বেশি সফল। এখানেও দেখি তিনি ভারী উজ্জ্বল ভঙ্গিতে হাস্য এবং ব্যঙ্গ পরিবেশন করেছেন। এই গল্পগুলিতে তিনি বর্ণনা করেছেন আধুনিক ছাত্রসমাজে পশ্চিমী সভ্যতার অনুকরণের চেষ্টা, এক কায়দাদুরস্ত স্ত্রীর স্বপ্ন, প্রিয়তমার চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহপ্রবণ মানুষের দুর্বলতা যারা নিজেদের বেলায় যা খুশি করে, অশিক্ষিত স্বামীর শিক্ষিত স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহের দুঃখ, শ্বশুরের বাড়িতে জামাইয়ের বরাবর থাকার বোকামি এবং এজাতীয় অন্যান্য ঘটনা। কিন্তু তাঁর উপন্যাসের মতো নয়, তাঁর গল্পগুলিতে পাই পরিব্যাপ্ত হাস্যরস। জ্যোতিষ ও ধর্মশাস্ত্রকে ব্যঙ্গ করা লেখা তাঁর রচনাগুলিকে মৈথিলীর গোঁড়া পাঠকরা তাঁর রসবোধ ও হাস্যরস পরিবেশনের জন্য অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অপবিত্রকারী পথ হিসেবে মনে করেন। সব মিলিয়ে হরিমোহন ঝা-র গল্পগুলি আমাদের সংস্কৃতির যা মহান, ব্যাপ্ত এবং ভালো দিক তাতেও খুঁত বের করার এক অদ্ভুত বাতিকের মতো। তিনি আমাদের মূল্যবোধের গোড়া ধরে নাড়া দিতে চান, কিন্তু কোনো বিকল্প পথের সন্ধান দেন না। এসব ত্রুটি সত্ত্বেও যে কারণে তিনি পাঠককে আকৃষ্ট করতে পারেন তা হল তাঁর ভাষার উপর দখল। ভাষাকে তিনি ইচ্ছেমতো ছাঁচে ফেলতে পারেন,

সংস্কার করতে পারেন, যেমন খুশি ব্যবহার করতে পারেন। তাঁর পরবর্তী কিছু গল্পে লক্ষ করা যায় মিথিলার জীবন এবং চালচলনের সুস্থ সমালোচনা পরিমিত হাস্যরসের এক জীবন্ত পরিবেশের মধ্য দিয়ে, যদিও এখানেও অতিরঞ্জন, প্রবল হাস্যরস এবং প্রচণ্ড, কখনো দারুণ ব্যঙ্গ আমরা পাই। এমনই একটি গল্প 'রেলক অনুভব' যেখানে মিথিলার জীবনধারার উন্নতির চেষ্টা হয়েছে।

নগেন্দ্র কুমারের প্রথম গল্পগুলি মিথিলার জীবন থেকে একেবারে ভিন্ন। 'সসরফানী'-তে তিনি এই ত্রুটি থেকে মুক্ত হন। সেখানে তাঁর গল্প বাস্তব জীবনের সঙ্গে যুক্ত। এদের মধ্যে কতগুলি অবশ্য স্পষ্টই 'প্রণয় দেবতা'র দ্বারা প্রভাবিত যেমন 'কুমারমক ভোজ'। তাঁর কতগুলি গল্প ভালো হলেও তাঁকে একজন মূল লেখক বলে চিহ্নিত করা যায় না।

কুমার গঙ্গানন্দ সিংহের 'বিহাড়ী' ('ঝড়') যাতে আছে মিথিলার নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বিদ্রোহের প্রসার; উমানাথ ঝা-র 'আধঘণ্টা' (এক তরুণ ছাত্রের আধঘণ্টার মনের অবস্থার এবং অন্যান্য নিজস্বতাপূর্ণ গল্প যার সবগুলিই এক ভিন্ন পদ্ধতিতে রচনা; মনমোহন ঝা-র বিভিন্ন দুঃখের গল্প, বিশেষ করে 'ঝগড়া' (ভালোবাসার ঝগড়া); যোগানন্দ ঝা-র বিভিন্ন গল্প যেমন 'আম খএবা ক মুহ' এবং 'সন্ন্যাসী'; এবং সর্বোপরি, উপেন্দ্র ঝা 'ব্যাসের', 'দেবূ', 'বকরী' (একটি ছাগল দেখে এক তরুণের মনের ভাব), এবং প্রশংসিত 'রূসল জমায়' (রাগী জামাই) — মনমোহন ঝা-র রচনার অসফল অনুকরণের পরে — এসবই বর্তমান কালের ছোটগল্পের কিছু শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ব্যাস একটি নতুন ধারায় গল্প লেখা শুরু করেন এবং বর্তমানে এই পদ্ধতিটিই, হরিমোহন বাবুর নীতিমূলক, অত্যধিক ব্যঙ্গাত্মক ধারা নয়, আধুনিক মৈথিলী সাহিত্যে প্রচলিত। এই ধারায় রচিত বেশ কিছু গল্প আমরা পাই যেগুলি সর্বকালে প্রশংসিত হবার মতো এবং এদের মধ্যে ব্যাসের গল্প অত্যন্ত উচ্চমানের। এগুলির বিষয় জীবনের ছোট ছোট সত্য, যে সত্য মনে হয় সামান্য এবং নগণ্য, কিন্তু যে সত্য সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের বেঁচে থাকায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এদের মধ্যেই জীবনের ছন্দ ধ্বনিত হয় এবং সত্য পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে। এই সমস্ত আত্মপ্রকাশের মুহূর্তে আমরা নানা ধরনের নারী, পুরুষ— নানা বয়সের, নানা শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে জীবন্ত সংযোগ অনুভব করি।

বুদ্ধিধরসিংহ 'রমাকর'-এর 'প্রয়াসে' তাঁর নিজস্ব এবং অনূদিত গল্পে আমরা পরিশীলন এবং ভাষার শুদ্ধতা পাই; কিন্তু অন্য কোনো গুণ তাতে নেই।

ছোট গল্পের ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোথাও লেখিকারা তেমন সাফল্য পাননি। শ্রীমতী শম্ভবি দেবীর 'সোদর স্নেহ' সম্ভবত সবচেয়ে সম্পূর্ণ রচনা। ভাইয়ের জন্য বোনের ভালোবাসা, শৈলীর সৌন্দর্য, পরিবেশ ও ঘটনার মেলবন্ধন এবং বুনটের ধ্রুপদী সৌন্দর্য, এসবই একে সফল করেছে। অন্নপূর্ণা দেবীর 'সাসুক স্নেহ' এবং লক্ষ্মীবতী দেবীর 'লীলা'র 'গহনাক সিহেন্তা' মেয়েলি বিষয় নিয়ে লেখা। গৌরী মিশ্র ('ঠেহিআয়েল মোন : শীতল ছাহরি' তার দুঃখ ও করুণাত্মক গল্প সংকলন) এই ধারায় শ্রেষ্ঠ।

স্বাধীনতার আগের মৈথিলী উপন্যাস সুন্দর যখন তার বিষয় সমাজ, বিশেষ করে মিথিলার বিবাহপ্রথা। কুলীন এবং পঞ্জিকার প্রতিষ্ঠান গল্পকারকে অনেক সুযোগ দেয়। নারীর শিক্ষা, পশ্চিমী (নতুন) এবং পূর্বের (প্রাচীন) সংস্কৃতির মধ্যে বিরোধ (বিশেষ করে পূর্বের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্ম) থাকবে কি থাকবে না তার মধ্যে বিরোধ এবং এ জাতীয় অন্যান্য বিষয় সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার হয়। কিন্তু মৈথিলীর উপন্যাসের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি বোধহয় প্রকৃত হাস্যরসেব চর্চা এবং তার সঙ্গে জীবনের বিবিধ অভিজ্ঞতার যোগ। যদিও যা আমরা পাই তা খুব বেশি নয়, তবু মৈথিলী উপন্যাস নিজেকে একটি স্বতন্ত্র সম্ভাবনাময় সাহিত্য মাধ্যম হিসেবে প্রমাণ করেছে।

স্বাধীনতার সময় থেকে মৈথিলী ছোটগল্প স্বতন্ত্র ধারায় বিকশিত হয়েছে এবং বর্তমান মিথিলায় এটি সম্ভবত সবচেয়ে শক্তিশালী এবং অভিব্যক্তিময় সাহিত্যমাধ্যম। উপন্যাসে ঠিক এই রস পাওয়া যায় না। এটি অনেক বেশি উজ্জ্বল এবং অসাধারণ।

ছোটগল্পকারদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য উপেন্দ্রনাথ ঝা 'ব্যাস' তা আগেই বলা হয়েছে। তাঁর 'রুসল জমায়' মৈথিলী ছোটগল্পের ধারা বদলে দেয় এবং নতুন দিক সূচিত করে। নতুন পদ্ধতিতে সম্পূর্ণভাবে প্রশংসিত না হলেও, ড. শৈলেন্দ্রমোহন ঝা-র রচনা অত্যন্ত সরস এবং কাব্যিক। তাঁর গল্প 'মৃণালক সূত' তাঁর 'ভরত বাক্য'-এর মতোই অভিব্যক্তিময়। বস্তুত ড. ঝা এজাতীয় ব্যঙ্গরচনার একটি সঙ্কলন প্রকাশ করেন যাকে কাব্যিক ভাবে নাম দেওয়া হয় 'পথ হেরথি রাধা'(১৯৬৩)। যদিও এই সঙ্কলন তাঁর শিল্পে বিশেষ মাত্রা যোগ করতে পারেনি; এতে প্রমাণিত হয় যে তাঁর পক্ষে প্রথমোক্ত দুটি বা তিনটি গল্পের চেয়ে বেশি কিছু অর্জন করা সম্ভব ছিল না।

শ্রীরাজমোহন ঝা-র 'এক আদি এক অন্ত' (১৯৬৫) এই রীতিকে শুদ্ধ চেহারা দেয় অনেক গল্পে, কিন্তু তাঁর কাজে একজন প্রতিভাবানের সূক্ষ্ম ছোঁয়াগুলি আমরা পাই না। তাঁর বিষয়ের পরিধি সীমিত (শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী), যদিও সেই সীমার মধ্যেই তিনি প্রশংসাজনক কাজ করেছেন (বিশেষ করে তাঁর সাম্প্রতিকতম সঙ্কলন 'এঝুট সাঁচ'-এ)। ড. রমাদেব ঝা 'এক খীরা ত-না ফাঁক' (১৯৬৪)-এ একই ধরনের বিষয় চিত্রিত করতে চেষ্টা করেছেন, বিশেষ করে নীচুতলার মানুষের জীবন; ছোট ছোট আপাতভাবে গুরুত্বহীন বিষয় যা সুখী এ সকল জীবনে গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে তাঁর রচনা। কিন্তু তিনি পাঠকের কৌতূহল এবং মনোযোগ আকর্ষণে ব্যর্থ হয়েছেন।

অনেক বেশি শক্তিশালী এবং জীবন দ্বারা অনেক বেশি প্রভাবিত অধ্যাপক ময়ানন্দ মিশ্র। তিনি ছোট গল্পকার হিসেবে তাঁর লেখক জীবন শুরু করেন হরিমোহন বাবুর অনুকরণ করে— তাঁর সঙ্কলন 'ভাঙ্গক লোটা' (১৯৫১)-য় একই ধরনের মজার এবং হাস্যকর ব্যঙ্গরচনা পাই, মার্জিত জীবনের ছবি নয়। কিন্তু খুব শীঘ্রই তিনি এই ধারা পরিত্যাগ করেন এতে তিনি হয়তো গুরুকে ছাড়িয়ে যেতে পারছিলেন না। তিনি বাস্তবকে বেছে নেন এবং সাম্প্রতিক কিছু গল্পে (সঙ্কলন 'আগি মোম পাথের'— আগুন,

মোম ও পাথর) কৃতিত্বের সঙ্গে দেখিয়েছেন যা কদর্য, যা নিরানন্দময় আবার দেখিয়েছেন যা একইরকম সুন্দর বাস্তব জীবনে যা বাস্তবিকই নায়কোচিত। অধ্যাপক ময়ানন্দ জীবনের ছোট ছোট বিষয়গুলিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ করেছেন এবং বক্তব্যের পরিবেশন রীতি অল্প সময়ের মধ্যেই পাঠককে আকৃষ্ট করে।

অন্যান্য কৃতী ছোট গল্পকারদের মধ্যে ললিত (সঙ্কলন 'প্রতিনিধি' ১৯৬৪) অনেক আগে আত্মপ্রকাশ করেন এবং বহু পাঠককে আকর্ষণ করেন। তাঁর গল্পের ত্রুটি হল এই যে তারা মনে হয় অগভীর এবং আনুষ্ঠানিক। গল্পের ভিত্তি এত অপ্রশস্ত এত সাধারণ যে তা সাধারণ পাঠককে খুব বেশি আকৃষ্ট করে না। তাঁর মনস্তাত্ত্বিক দিকে দখল, আর কারো না হোক নীচু শ্রেণীর একজন টাঙাওয়ালা বা রিকশাওয়ালার মানসিক দিক প্রকাশে কৃতিত্ব ছিল এবং সে সব ক্ষেত্রে তিনি তাঁর পরিবেশ এবং পটভূমি ভুলে যান নি সামাজিক ত্রুটি প্রকাশের সময়, সেখানে তাঁর ক্ষমতার প্রকৃত পরিচয় আমরা পাই।

রাজকমল ছিলেন প্রকৃতই বড় লেখক, কিন্তু তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ প্রকাশের আগেই মারা যান। তা সত্ত্বেও বলা যায় খুব কম লেখকই আছেন যাঁরা তাঁর দারুণ পর্যবেক্ষণশক্তি, কোনো একটি ঘটনার 'গল্প'-এর রস আত্মীকরণের ক্ষমতার সমকক্ষ। তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত গল্পসঙ্কলন 'লালকা পাগ' (১৯৬৮)- এ আমরা দেখি তিনি তাঁদের কথা বলেছেন যাঁরা অবাধ যৌনতাপূর্ণ ব্যবহার বা প্রচলিত রীতির ও সংস্কারের বাইরে গিয়ে মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সহ্য করতে পারেন না। তিনি ছিলেন স্বাধীন চিন্তাবিদ যিনি নিজেকে প্রতিনিয়ত প্রশ্ন করতেন এবং তার উত্তর দেবার চেষ্টা করতেন তাঁর ছোটগল্পে। তদুপরি, তিনি নিজের চারপাশের জীবনের বিরুদ্ধে স্পষ্ট জেহাদ ঘোষণা করতেন।

রমানন্দ রেনু তাঁর গল্প সঙ্কলন 'কচোট' (১৯৬৯)-এ নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি অসাধারণ ছবি তুলে ধরেছেন। তাঁর সাম্প্রতিকতম গল্পসঙ্কলন 'ত্রিকোণ' (১৯৭৪) ছোটগল্পকার হিসেবে তাঁর গুণাবলীর প্রকাশ। তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্প সম্ভবত সেটি যেখানে তিনি এক অস্পৃশ্য অনাথা বালকের ভালোবাসার কথা বলেছেন যে এক ধর্মগুরুর বিনীত শিষ্যত্ব প্রত্যাখ্যান করে তার পিতামহের নির্দেশে। এভাবে, তাঁর শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের পরিচয় আমরা পাই তাঁর বাস্তবনির্ভর গল্পে যেখানে তিনি 'ঘটনা' এবং 'মনে নাড়া দেওয়া মুহূর্ত' বেছে নেন সাধারণ জীবন থেকে। তিনি তাঁর গল্পে মাঝে মাঝে উপভাষার ব্যবহার করেছেন যাতে তাঁর রচনার বাস্তবতা আরও বাস্তব মনে হয়। অবশ্য, উপভাষার ব্যবহার অত্যন্ত সতর্ক এবং তাঁর শৈলীকে ছাপিয়ে যায় না। তাঁর গল্প পাঠককে সাধারণ সমস্যা নিয়ে ভাবতে বাধ্য করে, যা তিনি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই আমাদের সমক্ষে তুলে ধরেন। কিন্তু হরিমোহনবাবুর মতো কখনোই কাউকে পরিত্যাগ করেন না বা কোনো নীতি তুলে ধরেন না।

হংসরাজের গল্পগুচ্ছ 'সতরঞ্জা'(১৯৭১) সবসময় ভীষণ জোরালো না হলেও প্রায়শই কৌতূহলোদ্দীপক। তাঁর পরবর্তীকালের গল্প প্রথম দিকের গল্পের চেয়ে ভালো, কারণ

সেখানে জীবনের সমালোচনা আরও বেশি তীক্ষ্ণ এবং নিদারুণ। তিনি যখন ইচ্ছে পাঠককে হাসাতে বা কাঁদাতে পারেন এবং সে কারণে মানুষের অস্তিত্বের এক নানা রঙে রাঙানো ছবি আমাদের মধ্যে রেখে যান। তিনি এমন একজন লেখক ভবিষ্যতে যাঁর আরও অনেক খ্যাতি অর্জনের সম্ভাবনা।

প্রভাস কুমার চৌধুরী (সঙ্কলন 'নবঘর উঠয় পুরন ঘর খসয়') এবং গঙ্গেশ গুঞ্জন (সঙ্কলন 'আনহার ইজোত', ১৯৬৪) দেখিয়েছেন কিভাবে স্বাধীনতা মৈথিলী লেখকদের অভাবের দুঃখের বিষয়ে সচেতন করে তোলে। বহুদিনের হতাশায় জীর্ণ পরাজিত সাধারণ মানুষ সুস্পষ্ট মানবিক বোধে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে আর শুধুমাত্র 'সমস্যা' হিসেবে বিবেচিত হবার নয়। তার জীবনে এমন এক অনুকারময়তা আছে যা নিজেই নিজের কথা বলে এবং সেখানে বিস্তৃত বিবরণ বা জীবনদর্শনের কোনো প্রয়োজন নেই। এই সব গল্পকাররা জীবনের ক্ষেত্রে সহজ, মুক্ত এবং প্রশংসাজনক ভাবে তাঁরা সাধারণ নারী-পুরুষের জীবনের ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ সব দিকই তুলে ধরেন। নিঃসন্দেহে প্রভাস ও গুঞ্জন সাম্প্রতিক মৈথিলী ছোটগল্পে সেই দুই স্তম্ভ যাঁরা এই মাধ্যমকে বিশেষ উচ্চতায় উপনীত করেন।

এ পর্যন্ত এই ধারার সবচেয়ে বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন লেখক হলেন জীবকান্ত যাঁর সাম্প্রতিক ছোটগল্প সঙ্কলন 'একসরি ঠারহি কদম তর রে' (১৯৭২) গভীর একাকিত্ব বোধকে উপস্থাপিত করে যা প্রতিদিন একটু একটু করে আধুনিক মানুষকে— কি শহরে কি গ্রামে— একা করে দিচ্ছে এই নতুন যান্ত্রিকতার যুগে। পর্যবেক্ষণের অসাধারণ ক্ষমতা, সূক্ষ্ম কাব্যিক ছোঁয়ায় চরিত্র বর্ণন, নান্দনিক অভিজ্ঞতার সুদূর প্রসারী ফল, কঠিন বাস্তববোধ এবং সর্বোপরি শক্তিশালী রচনাশৈলী জীবকান্তকে সম্ভবত আজকের শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। হরিমোহনবাবুর পরে আধুনিক মৈথিলী গল্প রচনায় যে নতুন ধারা ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছিল তা জীবকান্তের লেখায়ই পূর্ণ পরিণতি পায়।

ছোটগল্পের লেখকদের বিষয়ে কোনো বিশদ বা সুসংবদ্ধ আলোচনা সম্ভব হয়নি। অন্য যাঁদের গল্প উল্লেখের দাবি রাখে তাঁরা হলেনঃ রূপকান্ত ঠাকুব যিনি হরিমোহন বাবুর মতো হাস্যরসাত্মক গল্প লেখেন তাঁর সঙ্কলন 'ধূকল কেরা' (১৯৬৪)-তে; কিন্তু তিনি এই শিল্পীকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন নি; অধ্যাপক ধীরেশ্বর ঝা 'ধীরেন্দ্র' যিনি গ্রাম জীবনের জীবন্ত ছবি পরিবেশন করেন; রাধাকৃষ্ণ 'বহেড়'; সোমদেব 'ধূমকেতু'; মধুকর গঙ্গধর; মার্কণ্ডেয় এবং আরও অনেকে যাঁদের কাজ নিয়ে এখানে আলোচনা করা গেলনা।

আরও অনেক প্রতিষ্ঠিত খ্যাতিমান লেখক যাঁরা অল্প কিছু গল্প প্রকাশ করেন, কিন্তু কোনো সঙ্কলন প্রকাশ করেন নি এবং ছোটগল্পও আর লেখেননি তাঁদের মধ্যে আছেন — চন্দ্রনাথ মিশ্র 'অমর'[১], কাঞ্চিনাথ ঝা 'কিরণ', রামকৃষ্ণ ঝা 'কিসুন', সুধাংশু শেখর

---

১. সম্প্রতি তাঁর 'জতসমাধি' নামে যে ছোটগল্প সংকলন বের হয়েছে, তার সেরা গল্প 'জাডা ফেনো আওতৈকা' ('আবারও শীত আসবে')-য় একজন সোলহাকন (নীচুশ্রেণীর মানুষ) যে এক দুর্ঘটনায় পুত্রহারা, তাঁর দুঃখজনক অবস্থা নিয়ে লেখা : একজন সাধারণ মানুষের জীবনের এব সাধারণ ঘটনা নিয়ে আবেগধর্মী অতিনাটকীয়তায় ভরা এই গল্প।

চৌধুরী, বৈদ্যনাথ মিশ্র যত্রী, ফণীশ্বর রেণু এবং সর্বোপরি বিবিধ প্রতিভার অধিকারী 'মণিপদ্ম'। এঁদের সম্বন্ধে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা যেত, কিন্তু স্থানাভাবে তা করা সম্ভব হল না। এছাড়া বর্তমান কালের অনেক তরুণ লেখক যাঁরা পরবর্তীকালে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতে পারেন, যদি স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে লেখা চালু রাখেন, কিন্তু এখনো পর্যন্ত যথেষ্ট স্বতন্ত্রতার ছাপ রাখতে পারেন নি, তাঁদের কথাও এখানে আলোচনা করা হল না। আশা করি, বর্তমান সংক্ষিপ্ত নিরীক্ষা মুখ্য ধারাগুলি তুলে ধরেছে যতটা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব, শুধুমাত্র নামের তালিকা প্রকাশ করে নি।

প্রবন্ধ

প্রবন্ধ নানা রূপ নিয়েছিল। প্রথমদিকে প্রবন্ধকাররা নীতিমূলক প্রবন্ধ লিখতেন মুখ্যত মৈথিল মহাসভার দশবিধ কর্মসূচিকে জনপ্রিয় করে তোলার উদ্দেশ্যে। প্রথম খ্যাতিমান মৈথিলী প্রাবন্ধিক ছিলেন মহামহোপাধ্যায় মুরলীধর ঝা। পুরনো এবং আধুনিক জীবনধারার প্রভেদ বিষয়ক তাঁর প্রবন্ধগুলি বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গে তীক্ষ্ণ। তাঁর প্রবন্ধে মিথিলা ও তার মানুষের ভবিষ্যতের প্রতিফলন এবং এমনকি সে বিষয়ে মোহভঙ্গেরও স্বাদ পাই। স্পষ্টবাদিতা, সমালোচনার তীক্ষ্ণতা এবং শক্তি ও রচনা বৈশিষ্ট্যে মম. মুরলীধর ঝা-র গদ্য এখনও অদ্বিতীয়।

পরবর্তীকালে যে সব প্রাবন্ধিকরা তাঁকে অনুসরণ করেন তাঁদের রচনার বিষয় ছিল— 'দেশোন্নতি', 'বিদ্যাপ্রচার', 'যুবক-সংগঠন'; সামাজিক সমস্যা যেমন নারীর অধিকার, মৈথিলী বিবাহের মন্দ দিক, এবং মিথিলার সামাজিক কাঠামো ইত্যাদি। তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই বক্তৃতা, সম্পাদকীয় কলম এবং কথোপকথনের ছাঁদে লেখেন।

এদের মধ্যে যাঁদের বক্তৃতা উল্লেখযোগ্য তাঁদের মধ্যে দ্বারভাঙার প্রয়াত মহারাজাধিরাজ রামেশ্বর সিংহ, রামভদ্র ঝা, কুমার গঙ্গানন্দ সিংহ, প্রমথনাথ মিশ্র, রাজপণ্ডিত বলদেব মিশ্র, ভুবনেশ্বর সিংহ 'ভুবন' প্রমুখের নাম করা যেতে পারে। মম. মুরলীধর ঝা, অনূপ মিশ্র, জনার্দন ঝা 'জনসিদন', ভোলালাল দাস, কপিলেশ্বর ঝা শাস্ত্রী, সুরেন্দ্র ঝা 'সুমন', উপেন্দ্রনাথ ঝা এবং ভুবনেশ্বর সিংহ 'ভুবন'-এর সম্পাদকীয় কলম এবং মম. মুরলীধর ঝা, চন্দ্রশেখর ঝা, কেদারনাথ ঝা এবং জীবনাথ রায়ের স্বগোতক্তি এবং কথোপকথন উল্লেখের দাবি রাখে।

এই সব লেখকদের মধ্যে রামভদ্র ঝা সর্বাগ্রগণ্য। তিনি মুরলীধর ঝা-র মতো ব্যঙ্গাত্মক নন। মৈথিল-হিতসাধনে প্রকাশিত জীবনের এবং মানবচরিত্রের ভালো দিক (গুণাদর্শ) এবং মন্দ দিক (দোষাদশ) নিয়ে লেখা তাঁর প্রবন্ধগুচ্ছ আধুনিক গদ্যের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। জ্ঞানগর্ভ ও আনন্দদায়ক, সমালোচনামূলক এবং বর্ণনাত্মক, স্পষ্ট এবং সরল, পরিচিত কিন্তু সাদামাটা নয় এবং সর্বোপরি ছবির মতো স্পষ্ট — এ সবই তাঁর রচনাশৈলীর বিশেষ গুণ।

কুমার গঙ্গানন্দ সিংহ এবং ভুবনেশ্বর সিংহ 'ভুবন' যুব আন্দোলনের পথিকৃৎ ছিলেন এবং তাঁদের কণ্ঠে ছিল সংস্কারক এবং বৈপ্লবিক সুর। তাঁদের রচনায় সে কারণেই আমরা পাই গতি এবং দ্রুতির শক্তি।

অন্যদিকে প্রয়াত মহারাজাধিরাজ এবং রাজপণ্ডিত বলদেব মিশ্র মুখ্যত প্রাচীন সংস্কৃতি এবং আচারের সমর্থক, তবে তঁারা কিছু পরিবর্তন আনতে চান যা মিথিলার জনসাধারণের আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনকে উন্নত করবে। তাঁদের বক্তব্যও পরিমিত এবং তুলনামূলকভাবে পরিমার্জিত ভঙ্গিতে প্রকাশ করা হয়েছে। রাজপণ্ডিতের বাগ্মীতার কোনো তুলনাই এখনো পর্যন্ত মিথিলায় পাওয়া যায় নি।

চন্দ্রশেখর ঝা-র কথোপকথন 'কুলীনপ্রথা' (বিকৌআস), 'কন্যাবিক্রয়' এবং 'বৃদ্ধ-বিবাহ'-এর সমস্ত অন্যায় তুলে ধরে। কেদারনাথ ঝা-র প্রবন্ধগুলিতে জীবনের মূল্যবোধের পুরনো এবং নতুন দিকের নানা সুবিধা ও অসুবিধার কথা আলোচিত হয়েছে। আর জীবনাথ রায়ের প্রবন্ধে সমকালীন জীবনের প্রকৃত চিত্র ('দেশা-দশা') তুলে ধরে।

বাবু ভোলালালদাসের রচনা মিথিলায় যুবসমাজকে জাগিয়ে তোলার কাজে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে।

এই সমস্ত লেখকরাই মৈথিল মহাসভার দশবিধ কর্মসূচির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হন : 'রাজভক্তি', 'সদাচার', 'বিদ্যাপ্রচার', 'কৃষি-বাণিজ্য উন্নতি', 'ব্যর্থ-বিরোধ-পরিহার', 'বিবাহাদি-সামাজিক-দোষ-নিবারণ', 'মিতব্যয়', 'শারীরিক উন্নতি', 'মৈথিল- ক স্বত্ত্ব রক্ষা' এবং 'মিথিলা-মৈথিল-মৈথিলী-হিত-সাধন'। যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে শৈলীর উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, তবে বেশিরভাগ লেখকেরই প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল সংস্কার এবং পুনর্বিন্যাস বিষয়ে তাঁদের উৎসাহ দ্বারা জনগণকে প্রভাবিত করা।

পরবর্তী দলের লেখকরা এই সব লেখকদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন এবং তাঁদের মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল মৈথিলী ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিসাধন যা সবরকম উন্নতির সহায়ক হবে। এদের মধ্যে মম. মুরলীধর ঝা, ত্রিলোচন ঝা, গঙ্গাপতি সিংহ, উমেশ মিশ্র, ভোলালাল দাস, শশিনাথ চৌধুরী, নরেন্দ্রনাথ দাস, রমানাথ ঝা, মহাবৈয়াকরণ দীনবন্ধু ঝা এবং অধ্যাপক সূর্যনারায়ণ সিংহের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁরা প্রাথমিক শিক্ষায় মৈথিলীর ব্যবহার এবং বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসেবে মৈথিলী ব্যবহারের প্রশ্ন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন; কারণ বেসরকারিভাবে টোল এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের মাধ্যম মৈথিলী এবং মৈথিলী সাহিত্যকে ধনী করে তুলতেও এর প্রয়োজন। তাঁরা তরুণ প্রজন্মকে উৎসাহিত করেছেন এবং যে পথে মৈথিলী লেখকরা এগোবেন সেই পথও সূচিত করেছেন।

যে সব প্রাবন্ধিক নিজস্ব রীতিতে ছোট চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রাচীন প্রজন্মের প্রতিনিধি জ্যোতিষী বলদেব মিশ্র উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রবন্ধ নানা বিষয় নিয়ে লেখা, যেমন, 'বিদ্যা', 'ব্রাহ্মণ' এবং 'বিচারি করব উচিত'। কিন্তু শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব হল

প্রাচীন কোনো চরিত্র বা ঘটনাকে ভিত্তি করে কোনো বিশেষ গুণ বা নীতিকে তুলে ধরা। এইগুলি সংকলিত হয়েছে 'সংস্কৃতি', 'শিশুশিক্ষা', 'রামায়ণ-শিক্ষা'(১৯৩৯), 'মহাভারত-শিক্ষা' এবং 'গপ্প সপ্প বিবেক'- এ। সম্প্রতি তিনি তাঁর পরের প্রবন্ধগুলির সঙ্কলন প্রকাশ করেছেন যার নাম 'শ্যামানন্দন সহায় ব্যাখ্যান মালা'।

মম. ড. উমেশ মিশ্র প্রবন্ধ রচনা শুরু করেন ১৯১৭-র আগে নয়। 'চোরি বিদ্যা', 'শাস্ত্রার্থ পদ্ধতি' এবং 'কর্তব্য' এক ধরনের প্রবন্ধ— যুক্তিপূর্ণ এবং বর্ণনামূলক, সারগর্ভ এবং সংক্ষিপ্ত। তাঁর সাম্প্রতিক প্রবন্ধগুলিতে আমরা তাঁর শ্রেষ্ঠ কাজ পাই। সেগুলি বিবরণমূলক; সেখানে হয় মানুষ (যেমন 'দেশ-দশা'য়) এবং প্রকৃতির (প্রভাতবর্ণন-এ) বাহ্যিক বিবরণ অথবা নান্দনিক অভিজ্ঞতা (আনন্দ্ কী থিক) লাভের সময় মনের অভ্যন্তরীণ বর্ণনা পাই। এই সব প্রবন্ধে তিনি জীবন ও সাহিত্যের একজন সৃজনশীল সমালোচক হিসেবে নিজেকে মেলে ধরেন। তাঁর পছন্দ ছিল দীর্ঘ শব্দবহুল বাক্যবিন্যাস; যা একই সঙ্গে হবে পরিচিত এবং দার্শনিকভাবাপন্ন, ব্যাপ্ত এবং সারগর্ভ, উন্নত এবং বাগাড়ম্বরপূর্ণ। নান্দনিক আনন্দের উৎস বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাঁর রচনারীতি কখনো কখনো অনাড়ম্বর। কিন্তু তাঁর মেধাই তাঁর ত্রুটি হয়ে দাঁড়ায় যখন তিনি দৈর্ঘ্যের জন্য ক্লান্তিকর, ভীতিপ্রদ এবং তাঁর রচনাশৈলী একধরনের মুদ্রাদোষের শিকার হয়। খুব কম ক্ষেত্রেই তিনি রসবোধ, ব্যঙ্গ বা হাস্যরসের গুরুত্ব বোঝেন একঘেয়েমি লাঘব করার ক্ষেত্রে।

গম্ভীর দার্শনিক প্রবন্ধের মধ্যে ক্ষেমেধরি সিংহের 'নিবন্ধ-চন্দ্রিকা' (১৯৬৩) এবং অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণ চৌধুরীর অসাধারণ কল্পিত কল্পনা 'শরাস্তিধা' (১৯৬৯) উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী কাজটি কিছুটা অস্পষ্ট হলেও এর আত্মজীবনী ধরনের ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতিতে জীবনের সমস্যা নিয়ে কাজ বেশ নতুন ধরনের। এই কাজে জীবন এবং চিঠিপত্রের উপর বহু মন্তব্য আছে এবং সারা জীবন ধরে সত্যের অনুসন্ধান এতে দেখানো হয়েছে। কুলানন্দদাস 'নন্দন' যাঁর সবচেয়ে ভালো কাজ তাঁর সেই প্রবন্ধগুলি যা 'সকল জীবন' নামে সঙ্কলিত হয়েছে, গিরিধর ঝা 'বিকল বিশারদ' এবং অলখনিরঞ্জন শিল্প এবং জীবন বিষয়ক সমস্যা নিয়ে চিন্তাপ্রসূ প্রবন্ধ লিখেছেন।

কাশীনাথ ঝা, মধুসূদন ঝা (যেমন 'রূঢ়ীবাদ ও বুদ্ধিবাদ'), গৌরীশঙ্কর ঝা, দিবাকর ঝা ('আধুনিকতা') এবং তেজনাথ ঝা-এর প্রবন্ধগুলি গম্ভীর এবং চিন্তাশীল। এঁরা সবাই ভারতীয় চিন্তাধারার কিছু সমস্যার সহজ ও নীতিগর্ভ রীতিতে ব্যাখ্যা করেছেন।

এই লেখকদের সাফল্যের কারণ মূলত ধারণার ঐক্যবদ্ধতা, ভাষার প্রবহমানতা এবং প্রাঞ্জলতাকে একত্রে আনার প্রয়াস, জীবনের প্রতি এক যুক্তিনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিষয়ের প্রতি ব্যক্তিগত মনোভাব।

আধুনিক গদ্যের সবচেয়ে উপভোগ্য অংশ তৈরি হয়েছে হাস্যরসাত্মক প্রবন্ধ, হালকা মেজাজের বর্ণনা এবং ব্যঙ্গাত্মক নাটক দিয়ে। এই শাখায় সবচেয়ে বেশি লিখেছেন অধ্যাপক হরিমোহন ঝা। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজগুলি হল 'খট্টর ককাক তরঙ্গ', 'চৌধরীজীক চিট্ঠী',

'ভোলবাবাক গপ্প' এবং অন্যান্য কাহিনী যেমন 'বিদ্যা-বারিধিজী', 'মনহুসলালদাস', 'কৃপণাচার্য', 'অঙ্গরেজিআ পণ্ডিত', 'ঘূটর মামা', 'মৌসী' এবং 'অলগী'। 'খট্টর ককাক তরঙ্গ'-এর পরিধি অনেক বিস্তৃত। মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে খট্টর ককা মানুষ এবং নানা বিষয় সম্পর্কে অদ্ভুত ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেন। 'দুর্গাপাঠ', 'সত্যনারায়ণ কথা', 'দেবতা-ক চরিত্র', 'পৌরাণিক আদর্শ', 'অহিংসা-ক সিদ্ধান্ত', 'মাদক শাস্ত্রার্থ', 'দহী-চূড়া-চীনী-ক বিজ্ঞান' এবং 'আধুনিক রিসার্চ' প্রভৃতি বিষয়ে তিনি ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপ আরোপ করেন। 'চৌধরীজী-ক চিট্ঠী' হিন্দি 'শিব-শম্ভু কা চিট্ঠা'র মতো প্রবন্ধের সঙ্কলন যার বিষয় সামাজিক সমস্যা। 'ভোলবাবাক গপ্প' প্রবন্ধের একটি সঙ্কলন যাদের অভিপ্রায় গুজব-ছড়ানো এক সংস্থার সংবাদ পরিবেশন যাতে অনুকরণের আতিশয্য পাওয়া যায়। হরিমোহন ঝা এক্ষেত্রে ব্যঙ্গাত্মক অনুকরণে (হাস্যকর, কিন্তু পরিমিত অতিরঞ্জন) কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সবার কাছে গ্রহণযোগ্য নাও মনে হতে পারে। কিন্তু ভাষাকে এই বিশেষ শাখায় ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা সফলভাবে, তার কৃতিত্ব থেকে তাঁকে কেউ বঞ্চিত করতে পারবে না।

এই ধরনের কাজ এর আগে যেখানে পাওয়া যায় সেগুলি হল—বৈদ্যনাথ মিশ্র 'বিদ্যা-সিন্ধু'-র 'ধর্কট-মর্কট-ক কথা', অজ্ঞাতনামা কারো 'বিয়াকর্ণী ? জোতখী', অজ্ঞাতনামা রচিত 'মুহপুরুখ' এবং 'মুহপুরুখক সিফারিস', গোবিন্দ চৌধুরীর 'চুমা ওন' এবং কাশীনাথ ঝা-র 'নরক-নিবারণ-রেলবে কম্পনী'।

হাস্যরসাত্মক চরিত্র-সৃজনের অসাধারণ প্রয়াস দেখা যায় ঈশানাথ ঝা-এর 'তাতাই ঝা' এবং 'ধরখন ঝা-ক নোসিদানী'তে এবং লক্ষ্মীপতি সিংহের 'পরিচয়াবলী'তে। এখানে ব্যঙ্গাত্মক অনুকরণে কোনো শিক্ষা বা সমালোচনা নেই। এদের উদ্দেশ্য আনন্দদান, নির্দেশ দেওয়া নয়।

'হমর ঠেঙ্গ' নামে একটি প্রবন্ধে অধ্যাপক তারানাথ ঝা চার্লস ল্যাম্ব-এর প্রসন্ন হাসি এবং কৌতুকপ্রদ পরিহাসকে মৈথিলী গদ্যে ধরতে চেয়েছেন। শ্যামানন্দ ঝা তাঁর 'বেঙ্গ-ক রাষ্ট্রীয় সভা'য় চসারের 'পার্লামেন্ট অফ ফাউলস'- এর এক অসাধারণ প্রতিরূপ সৃষ্টি করেছেন।

হংসরাজের 'ও জে কহলনি' (১৯৭১) সাহিত্যে এক সাম্প্রতিক সংযোজন যা আত্মজীবনীর ঢঙে প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের সাক্ষাৎকার এক অসামান্য কৌতূহলোদ্দীপক এবং মর্মস্পর্শী রীতিতে প্রকাশ করেছে। অগ্রগণ্য কিছু মৈথিলী লেখক ও সমালোচকদের ব্যক্তিত্ব এইসব সাক্ষাৎকারে এমনভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে মনে হয় অন্য কিছুই সম্ভব ছিল না। আমার মতে এই খণ্ডটি মৈথিলীর ব্যক্তিগত প্রবন্ধ সংগ্রহে একটি সার্থক সংযোজন যা বিশেষ প্রশংসার্হ।

সুপ্রযুক্ত হাস্যরসাত্মক রচনা কোনো কোনো রচনায় ব্যক্তিগত ব্যঙ্গ কবিতার রূপ নেয়; এগুলি 'বিভূতি' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তবে এদের মধ্যে 'ঋাজি-ক পত্রিকা',

'গোনূ ঝা-ক নোসিদানী', 'পরিহাস বিজল্পিতম সখে', 'কনেক-সুনৃ-ত', 'বহিরা নাচয় অপনে তালে', 'যত্র-তত্র-সর্বত্র' এবং 'ভানা ঝাক ভণিতা' প্রভৃতির পাঠযোগ্যতা অসাধারণ। লেখাগুলি বর্তমান সমস্যাবলির উপর সুরুচিপূর্ণ মন্তব্যে পূর্ণ।

মৈথিলী ভ্রমণকাহিনীর চেয়ে মৈথিলী প্রবন্ধ অনেক ধনী। মৈথিলী ভ্রমণকাহিনীর অল্প কিছু নির্দশনই পাওয়া যায় : ড. সুভদ্র ঝা-র 'হমর প্রবাস' (১৯৪৭) এবং ড. জগদীশ ঝা-র 'সাত সমুদ্র পার' (১৯৬৬)। প্রবন্ধের ক্ষেত্রে যদিও খুব বড় মাপের লেখক আমরা পাই না, তবে রচনাশৈলীর দিক দিয়ে নানা ধরনের সন্ধান অবশ্যই পাওয়া যায়। প্রবন্ধের সমস্ত শাখারই সফল উদারহণ আছে, যেমন, গম্ভীর. ব্যঙ্গাত্মক, হাস্যরসাত্মক।

(গ) তথ্য প্রকাশের গদ্য

সাহিত্য সমালোচনা

বর্তমান যুগে সাহিত্য সমালোচনা নানাবিধ বিষয় বোঝানোর উপযুক্ত একটি পথ। এর প্রথম অর্থ হতে পারে 'সাহিত্যের তত্ত্ব', অর্থাৎ সাহিত্য সৃষ্টির নীতি এবং সাহিত্য বোঝা ও বিচার করার নির্দিষ্ট মান নির্ধারণ বিষয়ে আলোচনা। দ্বিতীয়ত, এর দ্বারা এই সমস্ত নীতি প্রয়োগও বোঝায় যাকে বলে 'প্রয়োজনীয় সমালোচনা'। শিল্পগুণসম্পন্ন সাহিত্যের প্রকৃতির, বিশেষ চরিত্র এবং অসাধারণ মূল্যের ব্যাখ্যা, স্বতন্ত্র কবিতা বা উপন্যাসের বা নাটকের অসাধারণ গঠন এবং অর্থের কাঠামো প্রকাশের জন্য নিয়মনিষ্ঠ বিশ্লেষণ এর অন্তর্গত।

সাহিত্য সমালোচনার একটি তৃতীয় দিকও আছে যাকে বলা যায়, 'সাহিত্যের ইতিহাস'। বিভিন্ন কাজ এবং তাদের লেখকদের বিষয়ে আনুপুঙ্খিত তথ্যের একত্রীকরণ এবং রচনার বর্ণনা প্রসঙ্গে তাদের বোঝা এর মধ্যে পড়ে। বর্তমানকালে সাহিত্যের ইতিহাস অবশ্য অনেক কম বর্ণনাত্মক এবং অনেক বেশি নিশ্চিতরূপে ঔচিত্যমূলক হয় এবং আধুনিক আলোচকেরা যেমন একদিকে ভাসা ভাসা সাহিত্যালোচনাকে বাতিল করেছেন কেন না এগুলি সাধারণত পাঠকের মনে 'একটি শিল্পকৃতির আত্মজীবনীমূলক গল্প-কথা' হয়ে দাঁড়ায়। তেমনি ঐতিহাসিক আলোচনাকেও তাঁরা বাদ দিয়েছেন যাতে মূলত 'যা কিছু অতীতে লেখা হয়েছে— তা সে যত গৌণই বা খারাপই হোক না কেন বা যত উপভোগ্য এবং প্রশংসার যোগ্যই হোক না কেন— সবকিছুই সাহিত্যের ইতিহাসে ও সাহিত্যিক আস্বাদনের আলোচনায় কোনো না কোনো পর্বে স্থান পায়'। সে কারণে আধুনিক সাহিত্য সমালোচকরা আধুনিক সাহিত্যের পণ্ডিতদের থেকে ভিন্ন।

এ সমস্ত বিষয় মনে রেখে মৈথিলী সাহিত্য সমালোচনাকে দুটি ভাগে আলোচনা করা যায়— (অ) সাহিত্য তত্ত্ব এবং (আ) সাহিত্যে তাদের প্রয়োগের ইতিহাস।

আমরা প্রথমে মৈথিলীর সাহিত্যের নীতি নিয়ে আলোচনা করবো। একথা প্রথমেই

স্বীকার করা উচিত যে ভারতের বেশির ভাগ ভাষার মতো এক্ষেত্রেও এ বিষয়ে স্বকীয় ভাবনার প্রমাণ খুব কম পাওয়া যায়। বেশির ভাগ পণ্ডিত যাঁরা সাহিত্য সৃষ্টি, এর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরা সবাই অন্যদের মতামত বিস্তারিত করেছেন বা সেগুলি অনুবাদ করেছেন, যেমন কাব্যতত্ত্বের উপর সংস্কৃত লেখকদের কথা বা পশ্চিমী সমালোচকদের বক্তব্য। মৈথিলীতে এ দলের পণ্ডিতদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় — সংস্কৃতবাদী, পশ্চিমীবাদী এবং আর এক দল যাঁবা সংস্কৃত এবং পাশ্চাত্যের মতের সংশ্লেষে বিশ্বাসী। মৈথিলী সংস্কৃত শিক্ষার পীঠস্থান হওয়ায় সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনা স্বাভাবিকভাবেই সবচেয়ে শক্তিশালী। কোনো মৈথিলী সমালোচকই এ বিষয়ক সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবমুক্ত নন; যেমন 'সাহিত্যদর্পণ', 'কাব্যপ্রকাশ' ইত্যাদি। এগুলি সবই অনুবাদে পাওয়া যায়; তবে মৈথিলী পণ্ডিতরা এগুলি বেশির ভাগ মূল সংস্কৃতেই পড়ে থাকেন। অলঙ্কারের উপরেও অনেক ছোট ছোট কাজ আছে যেমন সীতারাম ঝা-র 'অলঙ্কারদর্পণ', দামোদর ঝা-র 'অলঙ্কার কমলাকর' এবং বেদানন্দ ঝা-র 'অলঙ্কৃতিবোধ'। তবে রামচন্দ্র মিশ্রের 'চন্দ্রাভরণ' এবং দীনবন্ধু ঝা-র 'অলঙ্কারসাগর' অলঙ্কারের উপর সবচেয়ে ব্যাপক কাজ; এটি পরিশ্রম এবং পাণ্ডিত্যের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ।

যে লেখক মৈথিলী রচনার মূল্য নির্ধারণে সংস্কৃত নীতির প্রয়োগকে সর্বতোভাবে সমর্থন করেছেন তিনি হলেন পণ্ডিত রিদ্ধিনাথ ঝা। তাঁর 'শব্দ-শক্তি-ত্রিবেণিকা' শীর্ষক প্রকাশিত কাজে তিনি অর্থের অর্থ বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং 'বিশ্বভূষণ'-এ সাহিত্য শিল্পের সর্বোচ্চ পরীক্ষাকে রস-পরিপাক (আবেগজাত অহংবোধের পরিতৃপ্তি)-এর নির্ভরযোগ্য প্রাপ্তি হিসেবে দেখিয়েছেন। ড. কিশোরনাথ ঝা-র এ বিষয়ে সাম্প্রতিক কাজ ('রস নিরূপণ') পাণ্ডিত্যময় এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ।

সম্প্রতি একটি সুস্থবোধ জাগ্রত হয়েছে যে সংস্কৃত নীতি যথেষ্ট নয়। একই কথা লিখেছেন ড. কাঞ্চিনাথ ঝা কিরণ তাঁর কিছুটা কর্কশ প্রবন্ধ 'আলোচনা : এক দৃষ্টিকোণ'-এ (বৈদেহীতে প্রকাশিত, সংখ্যা ৮, পৃ. ১৫২)। তিনি 'ধীরোদাত্ত নায়ক' বিষয়ে আলোচনা করে বলেন যে আধুনিক ভারতে এর অস্তিত্বও ভাবা যায় না। তিনি বলেন, কোনো ক্ষেত্রে যদি সংস্কৃত কাজের সাহায্য নিতেও হয়, তাকে আধুনিক পরিস্থিতির উপযোগী করে পরিবর্তিত করে নিতে হবে। এই কাজের জন্য তিনি সাধারণ জ্ঞান এবং আধুনিক পরিস্থিতি নির্ভর পশ্চিমী নীতি বেশি উপযোগী মনে করেন।

পাশ্চাত্যের নীতির সমর্থকের সংখ্যা প্রচুর এবং তাঁরা বর্তমানে যথেষ্টই সোচ্চার। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অধ্যাপক উমানাথ ঝা ('আলোচনা : সমকালীন প্রবৃত্তি'তে), দুর্গানাথ ঝা 'শ্রীশ'('সাহিত্য-বিমর্শ'-এ), দামোদর ঝা ('প্রগতিবাদ'-এ), এবং ভক্তিনাথ সিংহ ঠাকুর ('কলা এবং কাব্যকলাক উৎকর্ষ'-এ)। এঁরা শুধু পশ্চিমের লেখকদের সাহিত্য বিষয়ক প্রচলিত এবং মার্কসীয় ধারণাকে পুনঃপরিবেশন এবং ব্যাখ্যা কবেছেন।

এঁদের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেই সব সমালোচক যাঁরা এক ধরনের সংশ্লেষ— প্রাচ্য ও

পাশ্চাত্যের ধারণার এক সংমিশ্রণ—তৈরি করার চেষ্টা করছেন। যদিও এ পর্যন্ত তাঁরা এই সংশ্লেষের উপর ভিত্তি করে, কোনো স্বাধীন মত প্রকাশ করতে পারেন নি, তবে আমরা এঁদের কাছে সর্বোৎকৃষ্ট ফল আশা করতে পারি, যদি না তাঁরা যান্ত্রিকভাবে অথবা ভাসা ভাসা ধারণা নিয়ে কাজ করেন। এই ধারায় যাঁরা কাজের চেষ্টা করছেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো মনে হয় অধ্যাপক জয়ধরি সিংহের 'কাব্যমীমাংসা' (দুই খণ্ডে), যদিও এটি উপরিউক্ত ত্রুটিগুলি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়।

নতুন নীতির বাস্তবে প্রয়োগের ফল পরিতোষজনক। এদের সম্বন্ধে কিছু বলার আগে আমাদের মনে রাখা উচিত যে অতীতে মৈথিলীতে কোনো সাহিত্য সমালোচনাই ছিল না একথা মনে করা ভুল। সাহিত্যের একটি ধারা হিসেবে সাহিত্য সমালোচনার অস্তিত্ব অপেক্ষাকৃতভাবে পরের, কারণ সাহিত্য সমালোচনার বিকাশের আগে সৃজনমূলক রচনার একটি বিস্তৃত এবং যথেষ্ট পরিমাণে বিকশিত ধারার অস্তিত্ব থাকা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে এও মনে রাখতে হবে যে কোনো সাহিত্যের ধারাই বিকশিত হতে পারে না যদি নির্ভরযোগ্য এবং প্রগতিশীল কার্যকরী কোনো সমালোচনা না থাকে। যদি ত্রুটিহীনতার কোনো আদর্শ সামনে না থাকে, বিচার বিশ্লেষণের কোনো মানদণ্ড না থাকে এবং অগ্রগতির কোনো দিক না থাকে, সাহিত্য সেক্ষেত্রে হতশ্রী এবং সাধারণ হতে বাধ্য। অন্যভাবে বলতে গেলে সমালোচনার অস্তিত্ব থাক বা না থাক, মহৎ সৃষ্টি উচ্চমানের সমালোচনার অস্তিত্ব আগে থেকেই স্বীকার করে। সৃষ্টি এবং সমালোচনা এই দুটি অবিচ্ছেদ্য।

আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য সমালোচনার বিষয়ে আলোচনা করতে হলেই আমাদের উপরিক্ত নীরস মন্তব্যটি মনে রাখতে হবে। আমাদের সাহিত্যের অতীত যুগে সাহিত্য সমালোচনার উদাহরণ বিশেষ নেই; তবে তারা অসাধারণত্ব অর্জন করেছিল এবং সে কারণেই এমন মনে করার কোনো কারণ নেই যে আমাদের অতীতের লেখকদের পথনির্দেশ করা এবং প্রেরণা দানের জন্য সাহিত্য সমালোচনার কোনো নীতিই ছিল না।

আমরা মৈথিলীকে উদাহরণ হিসেবে নিতে পারি। উত্তরপূর্ব ভারতে এর সাহিত্য প্রাচীনতম এবং উৎকৃষ্টতম সাহিত্যের অন্যতম। সবচেয়ে প্রাচীন মৈথিলী রচনার নিদর্শন পাওয়া যায় অষ্টম খ্রিষ্টাব্দে, কিন্তু সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ক কাজ হয়েছে মূলত বিংশ শতাব্দীতে। এখন ও কথা ভাবার কোনো কারণ নেই যে সাহিত্য সমালোচনার কোনো নীতিই তখন ছিল না বা মৈথিলী সাহিত্য পাঠক দ্বারা প্রশংসিত বা সমালোচিত হয়নি। মৈথিলী লেখকদের লেখা তাঁদের পৃষ্ঠপোষক এবং সামন্তদের সভা বা সাধারণ মানুষ দ্বারা পঠিত, আস্বাদিত এবং সমালোচিত হয়। কখনো তাৎপর্যপূর্ণ উপাধি প্রদান, আবার কখনো লেখকদের এই বিশেষ চারিত্রিক গুণের প্রশংসা করে গদ্য বা পদ্য রচিত হয়। ভারতে বাস্তবে সমালোচনার এই ছিল প্রাচীন পদ্ধতি। এভাবে মিথিলার সবচেয়ে পুরনো বড় লেখক যাঁর বিকাশ হয় ১৩২৪ সালে, সেই জ্যোতিরীশ্বর 'কবিশেখরাচার্য' উপাধি (অর্থাৎ 'যুগের সাহিত্যের সবচেয়ে বড় স্রষ্টা') পান; বিদ্যাপতি (আ. ১৩৬০-১৪৪৮

খ্রি.) 'নতুন জয়দেব' আখ্যা পান এবং অত্যন্ত আকর্ষণীয় প্রেমের কবি হিসেবে বর্ণিত হন যাঁকে 'কবিকণ্ঠহার' ('কবিদের কণ্ঠের হার') এই উপাধিতে ভূষিত করা হয়; এবং উমাপতি (১৬৫০-১৭০০ খ্রি.) 'কবিপণ্ডিতমুখ্য' হিসেবে বর্ণিত হন (অর্থাৎ, সেই পণ্ডিতদের বড় যাঁরা একাধারে কবি ও পণ্ডিত)।

কবিরা প্রায়ই নিজেদের 'সরস কবি' বা 'হরিপদ প্রণত' হিসেবে নিজেদের লেখায় বিবৃত করেছেন এবং এভাবে ধর্মনিরপেক্ষ বা ভক্তিমূলক কাব্যে নিজেদের শ্রেষ্ঠ বিচরণ ক্ষেত্রের পরিচয় দিতেন। কখনো, যেমন গোবিন্দদাসের ক্ষেত্রে (১৬৬০-১৭২৫ খ্রি.) অদ্ভুত রচনাশৈলী এবং লেখকের মর্মস্পর্শিতাও একটি কবিতায় প্রকাশিত হয়।

এ জাতীয় সমালোচনা, অবশ্যই, অপ্রতুল এবং একেবারে গোড়ার দিকের। এ থেকে সে সব নীতির কিছুই জানা যায় না যা মৈথিলী লেখকদের সৃজনশীলতাকে পথ দেখিয়েছিল। বস্তুত দেশীয় ভাষার সাহিত্য অতীতে মৈথিলরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে মানেন নি; তাঁদের কাছে দেশীয় সাহিত্য ছিল সংস্কৃত নীতির উপর ভিত্তি করে সৃষ্ট আনন্দের উৎসমাত্র। কিন্তু আমরা ১৮ শতকে লোচন ঝা-র কাব্য পরীক্ষার জন্য পাই; তাঁর 'রাগতরঙ্গিণী' থেকে প্রমাণ হয়, মৈথিলী গান তাদের নিজস্ব নীতির উপর ভিত্তি করেই লেখা হত। এমনকি পরবর্তীকালের এক লেখক, চন্দা ঝা (১৮৩১-১৯০৭) বলেছেন, মৈথিলী সাহিত্য অতীতে এর নিজস্ব আইনে আবদ্ধ ছিল।

মৈথিলী লেখকরা যে সংস্কৃত সাহিত্যের নীতি থেকে আলাদাভাবে ভাবতে পারতেন তার প্রমাণ আছে নাটকের ক্ষেত্রে তাঁদের সাহসী পরীক্ষা-নিরীক্ষায়। বহু মৈথিলী নাটক সংস্কৃত নাটক থেকে ভিন্নভাবে লেখা এবং কল্পনা করা হয় ১৪শ খ্রিষ্টাব্দ থেকেই এবং সংস্কৃত নাটকের লিখনপদ্ধতি স্পষ্টতই পরিত্যক্ত এবং অবজ্ঞা করা হয়। এভাবে নেপাল, মিথিলা এবং অসমের সভায় মৈথিলী নাটকে নতুন দিগন্ত সূচিত হয়। অতীতের থেকে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাজন এবং নানা ভাবে দেশীয় ভাষার নাটকের ক্ষেত্রে নতুন ঐতিহ্যের সূচনা করে এই ঘটনা। এটি শুধু মৈথিলীকে সাহিত্যে ভাবপ্রকাশের প্রধান মাধ্যম হিসেবেই প্রচলিত করেনি; এক নতুন ধরনের নাটকেরও এতে সূত্রপাত হয় যা ছিল অধিক গীতিময় এবং গঠনে সহজতর ও গতানুগতিক সংস্কৃত নাটকের তুলনায় এই নাটক মঞ্চে অভিনয়ের পক্ষে বেশি উপযোগী হয়। আধুনিক অর্থে সাহিত্য সমালোচনার সূত্রপাত তখনি হয় যখন দেশীয় সাহিত্য পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় নতুন শিক্ষাব্যবস্থায়। যেখানে ইংরেজি সাহিত্য ছিল মধ্যমণি, যেখানে ছাত্ররা সাহিত্য সমালোচনার পশ্চিমী অনুশাসন শিখতে শুরু করতো।

সাহিত্যের প্রতি আমাদের এই নতুন অভিমত প্রকাশিত হয় ১৯৫০-এ 'মৈথিল হিতসাধন'-এর সম্পাদক কর্তৃক (খণ্ড ২), যা ছিল জয়পুর থেকে প্রকাশিত একটি মৈথিলী মাসিক পত্র। তাঁরা ঘোষণা করেছিলেন— যে লেখকরা হালকা ও মনোরঞ্জনধর্মী রচনা ছাড়া অন্য কোনো সাহিত্যে উৎসাহী নন তাঁদের এই পত্রিকা 'হিতসাধন'-এর জন্য লেখার প্রয়োজন নেই।

এর অর্থ এই নয় যে মৈথিলী থেকে হালকা সাহিত্য চিরতরে অদৃশ্য হয়ে যায়; এতে বোঝা যায় কিভাবে সাহিত্য গুরুত্ব পায়, গাম্ভীর্য অর্জন করে। বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে পাঠ্য বিষয় হিসেবে মৈথিলীর ব্যাপক অন্তর্ভুক্তিকরণ এ ভাষাকে আরও গাম্ভীর্য প্রদান করেছে। এই পরিবর্তিত মনোভাবের সঙ্গেই সাহিত্যের সমালোচনাও বিকশিত হয়েছে মৈথিলীতে।

একথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে তখন থেকেই বারবার সমালোচক পাঠকের এই রচনার ধারাকে প্রভাবিত করার সতর্ক প্রয়াস সফলভাবেই করা হয়েছে। এভাবে রঘুনন্দনদাস তাঁর 'মিথিলা নাটক'-এর ভূমিকায় নতুন নাটক এবং যদুনাথ ঝা যদুবর 'মৈথিলী গীতাঞ্জলী'র বিখ্যাত ভূমিকায় এবং ভুবনেশ্বর সিংহ ভুবন 'আষাঢ়'-এর ভূমিকায় নতুন গীতিকবিতার সমর্থনে কৈফিয়ৎ দেন। সম্প্রতি তরুণ গল্পকার ললিত মৈথিলীর ছোট-গল্পকারদের এক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করেছেন এবং আমার মতে লেখক ও সমালোচকের মধ্যে এ জাতীয় সংযোগ সৃজনশীল সাহিত্যের উন্নতি এবং অগ্রগতির জন্য অনেকাংশে দায়ী। অবশ্যই এই সমালোচনাকে হতে হবে প্রতিক্রিয়াশীল এবং দায়িত্বপূর্ণ।

'সমালোচনা তত্ত্বের বাস্তবে প্রয়োগের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিচার এখানে করা যায়। এ পর্যন্ত যে সব কাজ হয়েছে তাদের তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—

(অ) চন্দা ঝা-র কাল (১৮৮০-১৯২০)

(আ) মোদের কাল (১৯২০-১৯৩৭)

(ই) বর্তমান কাল (১৯৩৭-১৯৭৪)।

প্রথম যুগের বিশেষ প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব চন্দা ঝা; ইনি প্রচলিত সংস্কৃত নীতি এবং ঐতিহাসিক সমালোচনার পশ্চিমী নীতিতেও একইরকম পারদর্শী ছিলেন। মৈথিল লেখকদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য তাঁর ব্যবহৃত পদ্ধতিটি আরো ব্যাপকভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন চেতনাথ ঝা উমাপতির 'পারিজাতহরণ' সংস্করণের ভূমিকায়; পরমেশ্বর ঝা 'মিথিলাতত্ত্ববিমর্শ'-য় (দুটি খণ্ড) এবং তারাচারণ ঝা 'প্রাচীন ও অর্বাচীন বিদ্বান'-এ।

দ্বিতীয় পর্যায়ের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব মহামহোপাধ্যায় ড. উমেশ মিশ্র (১৮৯৯-১৯৬৭); ইনি 'মিথিলামোদ'-এর বিখ্যাত সম্পাদক মুরলীধর ঝা-র আনুকূল্যে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সমালোচনামূলক রচনার কাজ শুরু করেন। মহামহোপাধ্যায় 'সাহিত্যদর্পণ' অনুবাদ করেন, বহু কাজ সম্পাদনা করেন এবং মৈথিলীর প্রাচীন সাহিত্য পাঠের বিজ্ঞানসম্মত পথ নির্দেশ করেন। আধুনিক মৈথিলী সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ একক শক্তি যাঁর লেখার দ্বারা বর্তমান যুগের সমালোচকরা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে প্রচলিত এবং আধুনিক নীতির ব্যবহার হতে পারে সর্বোৎকৃষ্ট ফল পাওয়ার জন্য। এ যুগের অন্যান্য স্বনামধন্য সমালোচকদের

মধ্যে আছেন ড. অমরনাথ ঝা, কুমার গঙ্গানন্দ সিংহ, ভোলালালদাস, গঙ্গাপতি সিংহ এবং ভুবনেশ্বর সিংহ 'ভুবন'। প্রাচীন এবং মধ্যযুগের মৈথিলী সাহিত্য পুনর্গঠনের ক্ষেত্রেও তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য।

বর্তমান যুগের সূচনা হয় বহু গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য পত্রের প্রকাশের মধ্য দিয়ে এবং সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশের মাধ্যমে। এদের মধ্যে মৈথিলী সাহিত্য পরিষদের পত্রিকা 'ভারতী' এবং পণ্ডিত রমানাথ ঝা-র 'সাহিত্যপত্র' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রতিককালে এ জাতীয় আরও অনেক পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু করে, যেমন 'ইজোত'; কিন্তু এই সমস্ত দরকারি পত্রিকাগুলির অনেকগুলিরই প্রকাশ জোর করে বন্ধ করে দেওয়া হয়। আনন্দের বিষয় হল, মাসিক 'বৈদেহী' উচ্চমানের সমালোচনামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করে চলেছে প্রতি সংখ্যায় এবং কখনো কখনো সাহিত্যনীতি আলোচনার জন্য লেখক সম্মেলনেরও আয়োজন করে চলেছে। চতুর্মাসিক 'সন্নিপাত', 'মিথিলা ভারতী', 'অভিয়ঞ্জনা' এবং 'আখর' এ জাতীয় সর্বোৎকৃষ্ট সাহিত্য সমালোচনা প্রকাশ করে।

এই সময়ে প্রাচ্য (সংস্কৃত) এবং পাশ্চাত্যের সমালোচনার নীতিগুলির সংশ্লেষ প্রথম শ্রেণীর কিছু সাহিত্য সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। এই কাজে যাঁরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন, বিশেষ করে সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রে, তাঁদের মধ্যে আমার মতে সর্বাগ্রগণ্য অধ্যাপক রমানাথ ঝা। অতীতের মৈথিলী লেখকদের জীবন ও জীবনী নিয়ে তাঁর অসংখ্য কাজ আমাদের জ্ঞান এবং মৈথিলী সাহিত্য উপভোগকে বহু গুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে তাঁর দুটি সাম্প্রতিক কাজ 'প্রবন্ধসংগ্রহ' এবং 'নিবন্ধমালা' বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এখানে আমাদের কিছু প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ে পরিমার্জিত, যুক্তিবাদী, ঐতিহাসিক এবং গ্রহণযোগ্য কাজের মধ্যে দিয়ে মৈথিলী সাহিত্য সমালোচনার সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর কাজের মুখ্য বিষয় চন্দা ঝা, গোবিন্দদাস ঝা এবং তথাকথিত কীর্তনিয়া নাট্যকারেরা।

দ্বিতীয় যে নামটি নানা দিক থেকেই সাহিত্যের ইতিহাস ছাড়াও বিশুদ্ধ সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে অন্যদের উপরে সেটি হল— অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র যিনি গদ্যে হাস্যরসের ক্ষেত্রে হরিমোহন ঝা-র অবদান অত্যন্ত সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন এর চিরন্তন মূল্য বিচার করে। আরও অনেক খ্যাতিমান সমালোচক সাহিত্যের ইতিহাস এবং সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ে পশ্চিমী নীতি প্রয়োগ করে মৈথিলী বা অমৈথিলী প্রাচীন ও বর্তমান লেখকদের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রাধাকৃষ্ণ চৌধুরী, শৈলেন্দ্রমোহন ঝা, জয়ানন্দ মিশ্র এবং আরো অনেকে। এঁরা প্রভাবিত হন তাঁদের পরিবেশে তাঁদের মূল্য নির্ধারণের কাজে প্রয়োজনীয় লেখকের জীবনী এবং লেখকের কালের উপর জাতি, সামাজিক পরিবেশ এবং সময় সংক্রান্ত আইনের তত্ত্বের দ্বারা এবং মার্কসের সাহিত্য নীতি দ্বারা।

এছাড়া 'নিকট থেকে পাঠ'-এর এম্পসোনিয়-পদ্ধতি অনুসরণেরও বিশেষ প্রবণতা দেখা যায়। এর মধ্যে অধ্যাপক নবীনচন্দ্র মিশ্র ('প্রতিপদা এক অধ্যয়ন'-এ) এবং ড. কাঞ্চিনাথ ঝা কিরণ ('শরদকবিতা'-য়) -এর নাম উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান যুগে সাহিত্য সমালোচনার অনুশীলনকারী অন্যান্যরা হলেন সুরেন্দ্র ঝা 'সুমন', জয়দেব মিশ্র, গোপীকৃষ্ণ, শশিনাথ চৌধুরী, বলদেব মিশ্র, প্রেমশঙ্কর সিংহ এবং চন্দ্রনাথ মিশ্র। ড. ব্রজকিশোর বর্মা এবং প্রয়াত জয়গোবিন্দ মিশ্র আদিবাসী সাহিত্যে তাঁদের কাজের জন্য উল্লেখযোগ্য।

যাঁরা আরনল্ডের বড় সাহিত্যে 'টাচস্টোন' পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ দাস ('বিদ্যাপতি কাব্যালোক'-এর লেখক) উল্লেখযোগ্য।

সমালোচনার আরও অনেক পদ্ধতিতেও ভালো ফল পাওয়া গেছে। ছন্দের মূল পাঠ সংক্রান্ত সমালোচনা, বিশেষ, করে বিদ্যাপতি-বিষয়ক, মৈথিলী পণ্ডিতদের মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। তাঁর মূল পদগুলি উদ্ধারের জন্য ড. সুভদ্রা ঝা, শিবনন্দন ঠাকুর এবং শশিনাথ ঝা যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন, তবু এখনো অনেক কাজ বাকি। ড. উমেশ মিশ্র এবং বাবুজি মিশ্র মনবোধ এবং অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্য সতর্কভাবে সম্পাদনা করেছেন। এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত ঐতিহাসিক নীতি বিষয়ক অভিধান এ জাতীয় কাজে বিশেষ সহায়ক হবে আশা করা যায়।

সাহিত্য সমালোচনার আর একটি দিক আছে যা অত্যন্ত অপ্রিয় এবং দুঃখদায়ক। তা হল পুস্তক সমালোচনা যা প্রায়শই পক্ষপাতদুষ্ট এবং নিরপেক্ষতা ও মুক্তমনের সেখানে অভাব। তা এতটাই যে অনেকে ভাবছেন প্রাচীনকালের লোকেরা একথা সত্যিই বলেছিলেন কিনা যে জীবিত লেখকদের বিষয়ে আলোচনা করা উচিত কিনা। অপ্রিয় সমালোচনা প্রকাশেও অসম্ভব দেরি হয়। তেমনি কারো বন্ধুস্থানীয়ের লেখা অত্যন্ত সুন্দর প্রশংসা পায় যেখানে অন্য লেখক যাঁরা সমালোচকদের পরিচিত নন, বা ঘনিষ্ঠ নন তারা তাঁদের প্রাপ্যটুকুও পান না। এই দুঃখজনক ধারার পরিবর্তন দরকার সুস্থ সাহিত্য সমালোচনা এবং সৃজনমূলক সাহিত্যের প্রয়োজনেই।

বর্তমানে আলোচনার বিষয়ের মধ্যে গুরুত্ব পায়— গ্রামে ফিরে যাওয়া, গ্রামের মানুষের বাগ্‌ধারা ব্যবহার এবং শব্দপ্রয়োগে অত্যাধিক সংস্কৃতকরণ এবং রীতিতে অতি পশ্চিমীকরণ এড়িয়ে চলা। 'প্রগতিশীল সাহিত্য জনপ্রিয় হয়েছে এবং গল্পে অজাচার প্রভৃতি ভয়ঙ্কর সত্যনির্ভর বিষয় সাদরে গৃহীত হয়েছে। আঞ্চলিকতা এবং মৈথিলীর বিভিন্ন শাখায় যেমন অঙ্গিকা, বজ্জিকা প্রভৃতিতে জীবনের সত্যের উপরে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। স্বাভাবিকতার জন্য এই আন্দোলনে সুরুচির প্রকাশ ঘটে আমার মতে তখনি যখন উপেন্দ্রনাথ ঝা ব্যাসের একটি ছোটগল্প 'রুসল জমায়' ('রাগী জামাই') বিশ্বনন্দিত হয়। এটি এর শিল্পহীনতা, গ্রাম্য পটভূমি এবং স্মৃতিচারণের সুরের জন্য আদৃত হয়।

মৈথিলী সমালোচনা বিষয়ে আর একটি কথা বলেই আমি বক্তব্য শেষ করবো। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে ভবিষ্যতে সাধারণ মানুষ সাহিত্যের অন্য শাখার মতো সমালোচনার ক্ষেত্রেও নিজেদের মত জাহির করবে। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রে একাংশে নিজেদের প্রভাব বজায় রাখবেন পণ্ডিতেরা, নন্দনতত্ত্ববিদ এবং দার্শনিকেরা। যদিও ব্যুৎপত্তিগত সমালোচনা পণ্ডিত মহলেও আরও কিছুদিন প্রচলিত থাকা সম্ভব, তবে বিশুদ্ধ সাহিত্যিক রসাস্বাদনের ক্ষেত্রে নিজস্বতার অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মনস্তাত্ত্বিক এবং মনোবিশ্লেষণমূলক সমালোচনার কোনো মূল্য মৈথিলী সমালোচকরা দেন নি এ পর্যন্ত, আমার মতে এটি একটি ভালো লক্ষণ। এর অর্থ মৈথিলীতে সাহিত্য সমালোচনা লেখকদের সৃজনপ্রতিভা এবং তাঁদের কাজের বিষয়ে তুলে ধরাতেই বেশি উৎসাহী, অন্য কিছুতে নয়।

অন্যান্য গদ্য

দর্শন বিষয়ে দুর্গাধর ঝা-র 'সাংখ্য শাস্ত্র', সমাজবিজ্ঞানে ভেখনাথ ঝা-র 'ব্যবহার বিজ্ঞান', রমানাথ ঝা-র 'অলয়ীকুলপ্রকাশ', মম. পরমেশ্বর ঝা এবং মম. মুকুন্দ ঝা-র মিথিলার ইতিহাস, দীনবন্ধুর ঝা-র মৈথিলী ব্যকরণ ('মিথিলাভাষা বিদ্যোতন' এবং 'ধাতুপাথ') এবং অভিধান (মিথিলাভাষা 'শব্দকোষ') এবং শেখহরি সিংহের 'মনোবিজ্ঞান' এবং 'নিবন্ধ চন্দ্রিকা' তাদের বিশেষ অবদানের জন্য উল্লেখের দাবি রাখে।

৩. আধুনিক মৈথিলী নাটক

ভূমিকা

একথা মনে রাখা দরকার যে এই শতকের গোড়ার দিকেও মৈথিলীতে পুরনো নাট্যপরম্পরা, বিশেষ করে কীর্তনিয়া নাটকের— যার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম — প্রভাব পুরোপুরি বজায় ছিল। মিথিলা ও নেপালের বিভিন্ন স্থানে এই ধরনের নাট্যাভিনয় হতো— যা করতো কিছু পেশাদার ও কিছু অপেশাদারি নাট্যগোষ্ঠী। এই ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ নাট্যকারেরা হলেন পণ্ডিত হর্ষনাথ ঝা, বিশ্বনাথ ঝা ওরফে বালাজী এবং রাজপণ্ডিত বলদেব মিশ্র। এদের মধ্যে হর্ষনাথই ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী। উনি 'উষাহরণ', 'মাধবানন্দ' ও 'রাধাকৃষ্ণ-মিলন-লীলা'র মতো পালা লিখেছিলেন। এর সবগুলিই পৌরাণিক গল্প নির্ভর নাটক ছিল, তাই এগুলির মুখ্য আকর্ষণ ছিল কবিতার অংশগুলি। এই ধরনের আরো পরবর্তীকালের নাটক লিখেছিলেন কবীশ্বর চন্দা ঝা, কিন্তু ওঁর নাটকগুলি ছিল অনুকরণ নির্ভর— যা আধুনিক যুগের উপযোগী না হয়ে একটা হারিয়ে যাচ্ছে এমন পরম্পরার প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

নেপালের মৈথিলী নাটকের ঐতিহ্যেও এই শতকের গোড়ায় এসে একেবারে ক্ষীণ

ধারায় পরিণত হয়েছিল। তবে অনেকেই জানেন না যে কাঠমান্ডুর কাছে পাটনে মধ্যযুগীয় মৈথিলী নাটকের ঐতিহ্য আজও বজায় আছে কার্তিক নাচের মধ্যে দিয়ে। এখানে উল্লেখ করতে হয় বর্তমান 'কার্তিক নাচ'-এর পরম্পরা প্রতিষ্ঠিত করেন মহারাজ সিদ্ধি নরসিংহদেব নেপালী সংবত ৭৫৭-য় (অর্থাৎ, ১৫৫৭ খ্রিষ্টাব্দে)। প্রথমে এটি পালিত হতো মাত্র পাঁচ দিন—হরিশয়ানী একাদশী ('অবতার লীলা'), তারপরের দিন অর্থাৎ দ্বাদশীতে ('বরাহ লীলা'), তারপর দিন চতুর্দশীতে ('বস্ত্রহরণ লীলা') এবং তারপর আর এক দিন— পূর্ণিমায় ('দধি লীলা')। অভিনেতাদের এই শৈলীতে তামিল দিতে পাঁচ বছর লাগতো। সকাল দশটা থেকে এগারোটা আবার বিকেল দুটো থেকে ছটা উঁচু মঞ্চে এই নাটকগুলির অভিনয় হতো। নাটকের পাত্ররূপে সুদামা, সুরদাস, চিন্তাদেব ও কিছু ভাঁড় ঘুরে ফিরে আসতো। ১৯১৯ সালে দেখা গেল মৈথিলীতে লেখা গদ্যগুলি হিন্দিতে রূপান্তরিত করে অভিনয় করা হচ্ছে, তবে নাটকের মৈথিলী গানগুলি আগের মতোই রয়ে গেছে। কার্তিক নাচ গুরু ও তাঁর শিষ্যরা সংগীতের যেসব বাদ্যাদি ব্যবহার করেন তা হল মাদল, নগারা, পছিমা, মাঁগখিচাঁ, খঞ্জরি, ঝাইল, পোঙ্গা (বা ধু-ধু) এবং করতাল। বস্তুত পক্ষে এখন এই ঐতিহ্যও ডুবে যেতে বসেছে।

প্রকৃতপক্ষে কীর্তনিয়া নাটক বা নেপালের মৈথিলী নাটক বর্তমান যুগে টিকে থাকতে পারার কথা নয়। এগুলি ছিল অপেরা-নাটকের মতন, মনোরঞ্জনের জন্যই সংগীতে ভরা— প্রকৃত নাটকীয় ছক এগুলিতে ছিল না। আধুনিক নাটকের জন্য দরকার আধুনিক মানসিকতা— উন্নততর নাট্যবিষয়বস্তুর পরিকল্পনা ও অধিকতর বস্তুনিষ্ঠা যা দিয়ে দর্শককে মোহিত করে রাখা যায়। তবে অপেরা বা গীতিনাট্যও আধুনিক যুগে টিঁকে থাকতে পারে, কিন্তু তাহলে সেগুলিকে হতে হবে আরো পরিমার্জিত ও পরিশোধিত দর্শনের দিক থেকে যাতে আজকের দর্শকদের তা আকৃষ্ট করতে ও ধরে রাখতে পারে। যেহেতু কীর্তনিয়া নাটকের কখনোই আধুনিকীকরণ হয়নি, এর মৃত্যু হলো স্বাভাবিক মৃত্যু। এখন আর কীর্তনিয়া নাটক লেখা হয় না এবং পুরনো জমানার মতো কীর্তনিয়া নাটুয়াও খুঁজে পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। নাটুয়ারা আজ গেছে হারিয়ে।

নতুন নাটকের উদ্ভব

ইতিমধ্যে নতুন নাটক খুব দ্রুত বেগে এগিয়ে আসছিল তার অস্তিত্বের দাবি নিয়ে। এই কাজে সবচেয়ে বেশি প্রয়াস যাঁর ছিল, তিনি হলেন— পণ্ডিত জীবন ঝা (১৮৪৮-১৯১২)। তিনি ছিলেন দেবী সরস্বতীর বরপুত্র; বেনারসের মৈথিলরাজ-এর (কাশীরাজ) পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর প্রতিভার বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। যে প্রতিভা ছিল প্রধানত মাতৃভাষার প্রতি আত্মনিবেদন। উনি উপলব্ধি করলেন যে একেবারে নতুন গল্প নির্বাচন করার ও নতুন স্বাদের ঘটনা মঞ্চের উপর থেকে দেখানোর প্রয়োজন আছে। এইজন্যই তিনি নিজে লিখলেন বেশ কয়েকটি সট্টক শৈলীর নাটক— 'সুন্দরসংযোগ'

(১৯০৪), 'নর্মদাসাগর সট্টক' (১৯০৬), এবং মৈথিলী সট্টক' (১৯০৮)। উনি খুব শিগ্‌গিরই একথা বুঝতে পারলেন যে আধুনিক নাটকে নব্য কথ্য ভাষার গদ্যের গুরুত্ব কত বেশি— তাই আগে যেভাবে প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃত ও সংস্কৃত ব্যবহৃত হতো নাটকে, উনি তার পরিবর্তে ব্যবহার করা শুরু করলেন মৈথিলী। তদুপরি আধুনিক নাটকের সাহিত্যকারের বৈশিষ্ট্য কী তা নিয়ে উনি অনেক কিছু জানলেন। উনিই প্রথম কিছুটা মনস্তত্ত্ব নিয়ে এলেন নাটকে এবং এমন সব গল্প ও পরিস্থিতির চয়ন করলেন যা মৈথিলী জীবনের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে এবং যা মিথিলায় সম্ভব।

তবে বহু গুণ সত্ত্বেও জীবন ঝা-র নাটকগুলি অনেক দিক থেকে নানাদোষে দুষ্টও ছিল। উনি তখনও নাটকগুলিতে প্রচলিত পরম্পরাগত গানে দিতেন ভরিয়ে। যদিও ব্যবহৃত গানগুলি প্রতীক অনেক নিন্দুকের কাছেও মনে হবে সম্পূর্ণ এবং ত্রুটিমুক্ত। তবে সত্যি কথা বলতে গেলে আজও নাট্যকার জীবন ঝা-র চেয়ে লোকে বেশি মনে রাখে কবি জীবন ঝা- কে । দ্বিতীয়ত, জীবন ঝা-র পশ্চিমা পৃথিবী সম্বন্ধে কোনো ধারণা ছিল না। পশ্চিমের সাহিত্য বা জ্ঞান কোনোটাই না থাকায় উনি সংস্কৃতনিষ্ঠতার আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন ১৯ শতকের— চিন্তা ও টেকনিক, দুই দিকেই। বিংশ শতকে ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে পুনর্জাগরণ এসেছিল তার কোনো প্রভাব এখানে নেই। এর সবচেয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ জীবন ঝা-র শেষ রচনাতে পাওয়া যায়—'সামবতী-পুনর্জন্ম' (১৯১৭ খ্রি.)। এটি আধুনিক সংস্কৃত নাটকেরই একটা রূপান্তর মনে হয়। এর বিষয় খুবই আকর্ষক। এটি একটি পৌরাণিক কাহিনী যাতে প্রাচীনকালে গুরুকুলে এক ছাত্রের লিঙ্গ পরিবর্তনের গল্প কথিত হয়েছে। একজন আধুনিক লেখক যে এই লিঙ্গ পরিবর্তনের কাহিনীটির থেকে কতো সুন্দর নাটক রচনা করতে পারে তা বলাই বাহুল্য। দারুণ মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এবং দৃশ্যাবলী এখানে সংযোজিত হতে পারতো। কিন্তু যদিও নাটকটি এমনিতে মৈথিলী গদ্য ও পদ্যের একটা উৎকৃষ্ট নিদর্শন, এতে এসব কিছুই নেই। অথচ গল্প, চরিত্রচিত্রণ ও এখানে সেখানে বাস্তবতার ছোঁয়া— এসবই এই নাটকে রয়েছে।

তদুপরি, জীবন ঝা-র কোনো নির্দিষ্ট মঞ্চ ছিল না যার কথা ভেবে উনি নাটক লিখবেন। এটা অবশ্য সাখাবরের রঘুনন্দন দাসের বেলায় খাটে না। এই লেখকের বিখ্যাত নাটক যার নাম ছিল 'মিথিলা-নাটক' তার ভূমিকায় একটা অধুনা সুপরিচিত বক্তব্য আছে ম.ম. পণ্ডিত মুরলীধর ঝা-এর যিনি ঘোষণা করছেন যে এই নাটক থেকেই মৈথিলীতে সংস্কৃতনিষ্ঠ নাটক এবং কীর্তনিয়া শৈলী— দুটিকেই বিসর্জন দেওয়া হলো। এই বিশেষ ভূমিকাংশেই বর্তমান নাটকের উদ্দেশ্যও কথিত হয়েছে : বলা হয়েছে যে 'হরিশচন্দ্র' ও 'শকুন্তলা' নিয়ে পারসী থিয়েটার গোষ্ঠী যে সস্তার হিন্দি নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে মিথিলার নাট্যপ্রেমী দর্শকদের রসবোধকে করছেন আহত ও নাট্যাভিনয়ের মানকে করছেন নিম্নগামী, তার বিরুদ্ধে সত্যিকারের নাটক লেখার তাগিদে এটি রচিত হয়েছে। তাছাড়া তখনই মৈথিল মহাসভার সক্রিয়তার সময় ছিল। মিথিলায় স্লোগান ছিল

'দেশোন্নতি'। সমস্ত ধরনের সজনশীল প্রক্রিয়ার সঙ্গেই তখন জুড়ে ছিল দেশপ্রেমের একটা ক্ষীণতর রূপ। ফলে নতুন নাটক শিক্ষামূলক নাটক হয়ে পড়লো স্বাভাবিক কারণেই। 'মিথিলা- নাটকে'র পরপরই এলো শশিনাথ ঝা-এর 'কলিধর্মপ্রকাশিকা' (১৯১১) এবং অন্যান্য রূপক নাটকাবলী।

বর্তমান সময়ে এসে এই রূপকের ব্যবহার নাটক রচনার ক্ষেত্রে বাদ পড়েছে। এই জন্য বেশ কয়েকটি বাস্তবতাবোধসম্পন্ন নাটকের রচনা সম্ভব হয়েছে। আধুনিক নাটকের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো অত্যন্ত কম গানের ব্যবহার। গদ্যই এইসব নাটকের প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়ালো, পদ্যাংশ হলো সীমিত— শুধু বৈচিত্র্যের জন্য ও কখনো কোনো সংলাপকে বেশি জোরালো করার জন্য তার প্রয়োগ দেখা দিলো। কীর্তনিয়ার প্রভাব নির্মূল হওয়াটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তবে তখনো সংস্কৃত নাটকের ছাপ কোথাও কোথাও পাওয়া যাচ্ছে যদিও প্রাচীনকালের নাট্যকুশলতার সবকটি নিয়ম তখন মানা হচ্ছে না। তবে সরাসরি ইংরেজি প্রভাবিত না হওয়ায় আমার মনে হয় খুব বেশি নজরকাড়া নিজস্বতা আসতে পারতো তা এলো না তখনকার মৈথিলী নাটকে।

এই সময়ের নাট্যরচনার মধ্যে কয়েকটি সফল নাটকের উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। রামের জীবন নিয়ে আনন্দ ঝা-র 'সীতাস্বয়ম্বর' ও মহাবীর ঝা-এর 'শম্বুকবধ' রচিত হলো— বেশ প্রভাবশালী ছিল এ দুটি। তবে সেইসব দৃশ্যে যেখানে বাইরের পৃথিবী নাটকে বিধৃত-বর্ণিত হচ্ছিল, আমাদের নাট্যকারেরা দারুণ সফলতা লাভ করলেন। মনে হয় এই নাটকগুলি আরো অনেক ভালো হতো যদি লেখকেরা মঞ্চায়ন নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেন এবং যদি বিশদ বাস্তবতাবোধ থাকে। মুখের ভাষার ও স্বাভাবিক সংলাপের নাটকীয় শক্তি ও ক্ষমতার বিষয়ে তাঁরা অবগত ছিলেন না।

এই ধরনের সাধারণ নাটকগুলির তুলনায় ইশনাথ ঝা-এর 'চীনীক লড্‌ডু' (১৯৪৭) মনে হয় না নিশ্চল ও নির্জীব নাটক— বিশেষ করে নাট্যসাহিত্যের যে কোনো ছাত্রের কাছে। এখন এটির হিন্দি অনুবাদও পাওয়া যায় এবং বহুবার সফল প্রযোজনা হয়েছে এই নাটকটির। গল্পটি মজার এবং গীতিময় এবং দরিদ্র মিথিলার গ্রামদেশের বর্ণনা এতে সুন্দর ফুটে ওঠে। চিনের তৈরি মিষ্টিটা ধনী জমিদারের প্রাণহরণের জন্য তৈরি হয়েছিল, অথচ দেখা যাচ্ছে এই চক্রান্তের মূলে যে দেওয়ান সেই মারা যায় এটার জন্য। এটা অনেকেই বলেন যে এই নাটকে যেখানে ঢোলকিয়া তার ঢোলক নিয়ে মঞ্চে আসছে তা এক অপূর্ব উপভোগ্য দৃশ্য। ছকটি খুবই সুন্দর করে করা— বাঁধন তার টানটান এবং ফলে নাটকটি একটি নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে সুন্দরভাবে এগিয়েছে এবং নাটকীয় গুণগুলিও বজায় আছে।

এই ধরনের অনেকগুলি নাটক আছে সেযুগের যা এখনো মুদ্রিত হয়নি। যেগুলি ছেপে বেরিয়েছে সেগুলির মধ্যে আমি উল্লেখ করতে চাই এই কটা মাত্র এই সংক্ষিপ্ত ইতিকথায় —ত্রৈলোক্যনাথ মিশ্রের 'জীমূতবাহন-নাটক', দামোদর ঝা-এর 'গান্ধর্ববিবাহ',

ঋদ্ধিনাথ ঝা-এর 'সতীপরীক্ষা' এবং গণনাথ ঝা-এর 'ভগবতীভক্ত নাটক'। এগুলি অবশ্য সবই পরম্পরাগত সংস্কৃত নাট্যশৈলীর দ্বারা প্রভাবিত ছিল। পৌরাণিক গল্পগুলির ভিত্তিতে লেখা এই নাটকগুলিকে আধুনিক মিথিলার সঙ্গে জোড়ার কোনো চেষ্টাই এখানে করা হয়নি।

পঞ্চদশ ও ষাটের দশকে এসে যে প্রচুর নাটকের মঞ্চায়ন সম্ভব হয়েছিল তার একটা লক্ষ করার মতো শুভকর ঝোঁক হলো সামাজিক কুপ্রথা ও কুরীতিকে জনসমক্ষে এনে দেখিয়ে সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করা। এই ধরনের সফল নাটকের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা যেতে পারে: তৃপ্তিনারায়ণ লাল-এর 'সপ্নত' (১৯৬৭), গুণনাথ ঝা-এর 'কনিয়াঁ পুতরা' (১৯৬৭), মহেন্দ্র ঝা-র 'লক্ষ্মণ-রেখা-খণ্ডিত' (১৯৭০), এবং বাবু সাহেব চৌধুরীর 'কুহেস' (১৯৭০)। এই নাটকগুলি বেশ কিছু বর্তমান কুসংস্কারের ভিত্তিহীনতা ও সামাজিক কুবিধি নিয়ে লেখা যাতে মানুষ এ থেকে শিক্ষা নেবে উল্টোপাল্টা চিন্তাভাবনাহীন কোনো কাজ করার আগে। এঁদের সবারই মঞ্চের জ্ঞান অত্যন্ত বেশি মাত্রায় ছিল বোঝাই যায়। বিধবা বিবাহ, অসম বিবাহ, পণপ্রথা ও এই ধরনের সমস্যা এসব নাটকে ফুটে ওঠে এবং তাদের সমাধানের কথাও বলা হয়। মনে হয় এইসব বিষয়কে নাট্যরূপ দিতে গেলে লেখকের নাটকের কল্পনা ও গ্রন্থনায় একটা উচ্চস্তরের সাহিত্যিক জ্ঞান থাকা দরকার, যাতে নাটকটি উচ্চতম মানের হয়। গুণনাথ ঝা-র নাটকগুলি যদিও মঞ্চে খুবই সফল হয়েছে এবং যদিও সেগুলি খুবই সুপাঠ্য, এতে খুব একটা বেশি কিছু বলা যায় না, অথবা সেগুলি ইশনাথের 'উগনা' বা 'চীনীক লাড্ডু'র তুলনায় খুবই দরিদ্র। তবে এইসব নাটকগুলি শুধুমাত্র বিশেষ সময়োচিত নাটক যে তা নয়—বেশ কিছু প্রজন্মের পাঠক দর্শককে এগুলি আনন্দ দেবে। এই ধরনের নাটকগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করতে পারি গোবিন্দ ঝা-এর বহু আলোচিত নাটক 'বসাত' (১৯৬৯)। এও হতে পারে যে নাটকগুলি মঞ্চ সফল এজন্যও হয় যে নাটকের ছাঁচেই সংঘাত স্থান পেয়েছে। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে নায়িকা বেশ কিছু ব্যাপারে ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে যাতে মিথিলার আধুনিক নারীর মনে নতুন জাগরণকে আনা যায় নাটকের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে। তবে এই নাটকটির প্রতিক্রিয়া সাধারণ ও বাস্তববিমুখ এবং এটির তেমন সাংঘাতিক কিছু সাহিত্যিক সৌন্দর্যও নেই। এছাড়া আরো বেশ কিছু সাধারণ ও ঘষে মেজে দাঁড় করানো নাটকের উল্লেখও এখানে করা যায় যেগুলি কোনো না কোনো সামাজিক বিষয় নিয়ে রচিত হয়েছে কিন্তু কোনোটাই মহান নাটক বা গুরুত্বপূর্ণ কৃতি হয়ে ওঠেনি, বিশেষ করে কালিনাথ ঝা-এর 'কুসুমা' (১৯৬৫). কমলকান্ত ঝা-এর 'ঘটকৈতী', রামচন্দ্র চৌধুরীর 'সভাগাছিক বরদ' (১৯৬৮) এবং 'পিয়া মোর বালক', গুণনাথ ঝা-র 'পাথেয়' এবং কপিল প্রভাকরের 'খট্টর ককা চীন-মে' (১৯৬৫), প্রভৃতি।

অনুবাদ

আধুনিক মৈথিলী নাটকের একটা ধারা সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ থেকে এসেছে। সংস্কৃতের গুরুত্বপূর্ণ নাটকগুলি— যেমন, কালিদাসের 'মুদ্রারাক্ষস', 'উত্তররামচরিত', 'প্রবোধচন্দ্রোদয়', পার্বতীপরিণয়', 'রত্নাবলী' ও 'স্বপ্নবাসবদত্তা' মৈথিলীতে অদ্ভুত সুন্দর ভাবে অনূদিত হয়েছে। এইসব অনুবাদের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ পেতে গেলে আবার প্রতিভাশালী লেখক ইশনাথ ঝা-এর অনুবাদ 'শকুন্তলম' ও 'মৃচ্ছকটিক' দেখতে হয়। যদিও নাটকগুলিতে মূল পাঠের প্রতি পূর্ণ বিশ্বস্ততা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়— এতে কোনো সন্দেহ নেই যে নাটক হিসেবে এগুলি খুবই সফল রচনা। এইসব অনুবাদগুলিই রূপান্তরণের মূল নিয়ম মেনে চলে— গদ্য গদ্যে ও পদ্যাংশ পদ্যেই অনূদিত হয়। তবে জীবানন্দ ঠাকুরকৃত তিন খণ্ডে (অদ্যাবধি প্রকাশিত) ভাস-এর নাটকাবলী শুধু গদ্যেই অনুবাদ করা হয়েছে। তবে দুঃখের ব্যাপার হলো জীবানন্দবাবু সৃজনশীল লেখক নন বলে অনুবাদগুলি না হয়েছে মহান সাহিত্য, না দাঁড়িয়েছে নাটকের মতো নাটক হয়ে।

নাটকের ক্ষেত্রে পশ্চিমা প্রভাব হয়েছে খুব ক্ষীণ বিভিন্ন কারণে; এর একটা মূল্যবান ব্যতিক্রম হলো অধ্যাপক দামোদর ঝা-র অনুবাদ ইবসেনের 'ঘোস্ট্স'-এর মৈথিলী রূপ 'ভূতক ছায়া'। বঙ্গদেশ বা মহারাষ্ট্রের মতো মিথিলায় কোনো কলকাতা অথবা বম্বে নেই। মিথিলার কোনো শহরে পেশাদার নাট্যমণ্ডলী না থাকা হচ্ছে আরেকটা কারণ যেজন্য পশ্চিমা ভাষা থেকে নাটকের অনুবাদ এতো কম হয়েছে। শেষ কারণ হলো, তথাকথিত 'ইংরেজি' শিক্ষা মিথিলায় এসেছে খুব দেরি করে এবং আসার পরেও এই ধরনের বিদ্যাশিক্ষা যখনই শুরু হয়েছে তাতে মাতৃভাষার প্রতি এমন বিমুখতা দেখা গেছে যে এই শিক্ষার কোনো প্রভাবই মাতৃভাষার সাহিত্যের ওপর পড়েনি। তাই মৈথিলী নাটক বিংশ শতকের প্রথমভাগে গড়ে ওঠে সংস্কৃত নাটকের এবং বিশেষ করে তার অবক্ষয়ী রূপের সর্বগ্রাসী প্রভাবের মধ্যে দিয়ে।

পঞ্চাশের দশকে কলকাতায় একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দিলো। অনেকগুলি বাংলা নাটক মৈথিলীতে হয় অনূদিত হলো অথবা মঞ্চে অভিনয়ের জন্য হলো সংশোধিত এবং এগুলির অভিনয় হলো অত্যন্ত সফল। এই ধারা অদ্যাবধি অব্যাহত আছে। বরং, এখন এরই ফলশ্রুতি রূপে দেখা যাচ্ছে অনেক নতুন নাটক লেখাও হচ্ছে এবং তার সার্থক মঞ্চায়নও সম্ভব হচ্ছে। এই পরিবর্তনের ফলে মৈথিলীর পক্ষে তিনটি সুবিধা হলো : প্রথমত, আধুনিক মঞ্চ-সজ্জা ও প্রযোজনার সঙ্গে সঙ্গে নারীপাত্রে পুরুষ অভিনেতার বদলে অভিনেত্রীরা এলেন সামনে এগিয়ে; বাঙালি অভিনেত্রীরা মৈথিল নারীর ভূমিকায় দারুণ অভিনয় করেছেন এবং ফলে কলকাতার মৈথিলী নাটক হয়েছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। দ্বিতীয়ত, অনেকগুলি বাংলা নাটকই মৈথিলীতে এমন স্বাভাবিকভাবে রূপান্তরিত হয়েছে যে সহসা মৈথিলীর নাট্যসাহিত্য হয়েছে অধিকতর ধনী ও বেশি রঙিন। তৃতীয়ত, মৈথিলী

নাটক প্রচুর পশ্চিমা ধ্যান-ধারণা ও নাট্যকৌশল— যা আধুনিক পেশাদারি নাট্যাভিনয়ের বৈশিষ্ট্য— এই সূত্রে পেয়েছে। তাই প্রত্যেক দিক থেকেই দেখা যাচ্ছে এই আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে আধুনিক মৈথিলী নাটক সব দিক থেকেই উপকৃত হয়েছে বলে দেখা যাচ্ছে। আশা করা যায় এ থেকে আরো অনেক সদর্থক পরিবর্তন আসবে এবং শয়ে শয়ে প্রতিভাবান যুবক-যুবতী মিথিলাঞ্চলে প্রতিভাশালী নাট্যকারদের প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করবে পেশাদারি অভিনয় মঞ্চের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে— যা থেকে বেকার সমস্যারও কিছুটা সমাধান হবে, কিন্তু তার থেকেও বেশি হবে অধিকতর শ্রেয় ও সুস্থ একটা ঐতিহ্যের সৃষ্টি । যদি মৈথিলী ভাষাকে বেশি জনপ্রিয় ও লোকগ্রাহ্য করতে হয় সমস্ত বর্তমান ক্ষেত্রে, তার শ্রেষ্ঠ উপায় হলো মৈথিলী নাট্য-ঐতিহ্যকে পুনর্জাগরিত করা। এদিকে আরো অনেক লাভ হবে যদি প্রাচীন কীর্তনিয়া বা নেপালী নাট্য-ঐতিহ্যের ভালো গুণগুলো ও বর্তমান মঞ্চ বিষয়ক পরীক্ষা-নিরীক্ষা যা গুজরাতে বা বাংলায় চলছে— যেমন উন্মুক্ত নাট্য প্রাঙ্গণ কিংবা ঘূর্ণমান মঞ্চ— সেসব যদি মৈথিলীর আধুনিক নাট্যমঞ্চের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা যায় তো খুবই লাভ হবে। প্রকৃতপক্ষে বম্বের সরল পারসী থিয়েটার কিংবা মারাঠী মঞ্চের মতো নাট্যাভিনয় কৌশল মৈথিলী নাটকের পক্ষে কমই লাভপ্রদ হবে। আমার মনে হয় মৈথিলী নাটকের যে সহজাত গুণ তার পক্ষে এই ধরনের মঞ্চ হবে অযোগ্য।

সফল নাটকগুলির মধ্যে উদাহরণস্বরূপ নেওয়া যেতে পারে সেইসব বাঙালি নাট্যকারদের রচনার অনুবাদকে— যেমন ছবিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের— 'সন্তো', 'শেষ নাই', 'চোর', 'বারো ঘণ্টা', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'সুখায়ল ডারি নব পল্লব', 'আগন্তুক' প্রভৃতি । বাংলা নাটকের প্রকাশিত নাট্যানুবাদ যাঁরা করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রবোধ নারায়ণ সিংহ, সীতারাম চৌধুরী এবং রাজনন্দন লাল দাস প্রমুখ যাঁদের অনুবাদের মান ছিল খুবই উঁচু। এই নাট্যপ্রয়াসের ধারায় সম্ভবত নচিকেতার 'জীবন একর নাম' (১৯৭১) এবং 'এক ছলা রাজা' (১৯৭৩) শ্রেষ্ঠ নাটক। এই নাটক দুটি অবশ্য অনুবাদ নয়— বরং মোটামুটিভাবে বাংলা অনুবাদ নাটকের ধারার প্রভাবে জাত নতুন নাটক।

ঐতিহাসিক নাটক

আধুনিক মৈথিলী নাটকের একটি অতি স্বাভাবিক ঝোঁক হলো দেশপ্রেম ও ইতিহাসের নানা ঘটনাবলী নিয়ে নাট্যরচনা করা। এর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় বিষয় হচ্ছে বিদ্যাপতির জীবন— যিনি মিথিলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও যিনি এক গৌরবময় কালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

বিদ্যাপতির জীবন ও কর্ম নিয়ে ছটি নাটক পাওয়া যায় আনন্দ ঝা, হরিনন্দন ঠাকুর, ভবনাথ ঝা, 'মণিপদ্ম', বিদ্যানাথ রায় ও 'কিরণে'র লেখা। এগুলির মধ্যে 'কিরণে'র লেখা নাটক 'বিজেতা বিদ্যাপতি'ই (১৯৭২) হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ— এই নাটকে

চিত্রণকে প্রামাণ্য করে তুলতে অসম্ভব পরিশ্রম করেছেন। তবে নাট্যকুশলতার থেকে বেশি ছিল শ্রান্তপ্রেম--- দেশাত্মবোধের ধারায় ব্রজকিশোর বর্মা 'মণিপদ্মে'র আগের নাটক 'কণ্ঠহার'-এও (১৯৬৪)— যা অভিনয়ের দিক থেকেও ভালো ছিল। কিন্তু নাট্যভঙ্গি তে না লিখে মণিপদ্মের নাটক 'বিদ্যাপতি'কে যদি জীবনীর শৈলীতে লেখা গ্রন্থ রূপে নেওয়া যায় তো তাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কৃতি বলতেই হবে।

আমার বিশ্বাস সাধারণভাবে বেশি সফল নাটক লেখা হয়েছে বিদ্যাপতির ভৃত্য উগনা বা উদনাকে নিয়ে। কথিত আছে ভগবান শিব বিদ্যাপতির হরভক্তিতে এতো সন্তুষ্ট ছিলেন এবং তাঁর শিববন্দনাতে (যাকে 'নচারী' বলা হয়) ইনি এতো তুষ্ট হন যে ভগবান স্বয়ং তাঁর ভৃত্য হয়ে আসেন। কবি প্রথমে তাঁর আসল পরিচয় জানতেন না, কিন্তু একদিন এক গভীর অরণ্যের মধ্যে দিয়ে একসঙ্গে যেতে গিয়ে উনি তাঁর আসল পরিচয় জানতে পেরে যান। ভগবানও তখন ভক্তের কাছে নিজেকে এই শর্তে প্রকাশ করেন যে উনি কাউকে একথা বলবেন না। তারপর এমনই আকস্মিকভাবে একদিন দেখা গেলো কবিপত্নী ভৃত্যটির মন্দবুদ্ধিতা এবং আলস্যের জন্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে জ্বলন্ত চেলাকাঠ নিয়ে মারতে উঠেছেন— তখন কবি বাধ্য হয়ে তাঁর পত্নীকে ভৃত্যের সত্যিকারের পরিচয় বলতে বাধ্য হলেন। তৎক্ষণাৎ বিশ্বেশ্বর সেখানে থেকে উধাও হয়ে গেলেন। তারপরের গল্প এইরকম যে কবি এতে উন্মত্তপ্রায় হয়ে শিবের কয়েকটি ভজন গেয়ে উঠলেন যা সবচেয়ে বেশি হৃদয়স্পর্শী নচারী বলে মনে করা হয়।

এই বর্ণনা থেকে একথা বোঝা যাচ্ছে যে আরো সংক্ষিপ্ত কিন্তু অধিকতর নাটকীয় ঘটনা এই গল্পে দেখানো হয়েছে— যাতে ধর্মীয় ও কাব্যিক সম্ভাবনা রয়েছে প্রচুর। এই কাহিনীর অংশটির নাট্যরূপায়ণের প্রচুর প্রয়াস হয়েছে কিন্তু মনে হয় সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়াস করেছেন অগ্রণী নাট্যকার ইশনাথ ঝা। উনি এই কাহিনীর একটা কাব্যিক ব্যাখ্যা ও শক্তিশালী দৃশ্যরূপ দিয়েছেন। চরিত্রচিত্রণ ও ভাবারোহের বর্ণনায় উনি ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ। আমি 'উগনা'কে (১৯৫৬) আধুনিক মৈথিলী নাটকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বলে মনে করি।

দেশাত্মবোধক নাটকের অন্য ভালো উদাহরণ হলো জীবনাথ ঝা-র 'বীরনরেন্দ্র', কাশীনাথ ঝা-র 'জয়-জন্মভূমি', বালগোবিন্দ ঝা-র 'ত্রিপথগা' এবং ললিতেশ্বর ঝা-এর 'সন্তপরীক্ষা'— সন্ত সাহেবরামদাসের (১৯৪৮) জীবন-বিষয়ে লেখা, সারদানন্দ ঝা-র 'ফেরার' (ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ১৯৪২-এর আন্দোলন নিয়ে লেখা) এবং একাধিব নাটক অযাচী মিশ্রকে নিয়ে। এমনকি শশিনাথ ঝা-এর সর্গ দর্শনাত্মক নাটক উদয়নাচার্যের জীবন নিয়ে এবং রাজেশ্বর ঝা-র প্রায় নির্জীব নাটক 'শাস্ত্রার্থ' (১৯৬৭) মনে হয় মিথিলার গৌরবময় অতীতকে তুলে ধরার একটা প্রয়াস।

একাংক নাটক

হাল আমলে দেখা যাচ্ছে পূর্ণাঙ্গ নাটকের থেকে একাঙ্ক নাটকই বেশি লেখা হচ্ছে। আমার

মনে হয় এই পরিবর্তন আধুনিক যুগের সূত্রপাতের সঙ্গে সম্বন্ধিত, কিন্তু প্রাচীন কালের সংস্কৃত 'ব্যায়োগ' ও 'প্রহসন' হলো একাঙ্ক নাটকের মিথিলায় এর আগের রূপ। এইগুলিকেও দেখা যাচ্ছে প্রচুর উৎসাহের সঙ্গে আবার বাঁচিয়ে তোলা হয়েছে যা বেশ সফল হয়েছে। রঘুনন্দন দাস লিখেছেন 'দূতাঙ্গদ ব্যায়োগ' যাতে রাবণের কাছে অঙ্গদের দূতরূপে যাত্রাই বর্ণিত হয়েছে। নাটকটিতে হাস্য-পরিহাস ও শ্লেষ প্রচুর আছে এবং চরিত্রগুলিকে খুব সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

একাঙ্ক নাট্যকারদের মধ্যে ড. কাঞ্চীনাথ ঝা 'কিরণ' এবং চন্দ্রনাথ মিশ্র 'অমর' -এর স্থান বিশিষ্ট। ড. কিরণ মিথিলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস থেকে বহু আকর্ষক ঘটনা বেছে নিয়ে সেগুলির মধ্যে গল্প ও নাটকীয়তার উপাদান খুঁজে বের করেছেন বহু যত্নে এবং তারপর আধুনিক কালে সেগুলিকে যেভাবে নাটকেপ রূপারোপ করার জন্য পরিবর্তন করা দরকার তা করেছেন। 'শ্রীঅমর'-এর নাটকের মধ্যে পড়েছে 'টোপী' (টুপী) , 'নিরক্ষরতা নিবারক পাঠশালা', 'আধুনিক পাঠ্য প্রণালী', 'হকিম সঞে হাকিম' (ডাক্তারের সঙ্গে প্রশাসক), 'ঘরৈয়া লুরি' (ঘরোয়া কাজের দক্ষতা) এবং 'ব্রহ্মস্থান', প্রভৃতি।

যদিও সাহিত্যিক গুণাগুণের দিক থেকে এগুলি নিকৃষ্ট তবু মঞ্চে সফল হয়েছে এমন কিছু একাঙ্ক নাটকের নাম এখানে করা যায় : 'বাণ্টী ক্লাব', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'পঢ়য়বাক খর্চা', 'আচার্য দ্রোণ' প্রভৃতি যা চন্দ্রকান্ত ঝা-এর লেখা।

বেশি জনপ্রিয় হয়েছে খুব স্বাভাবিক কারণেই 'প্রহসন' বা farce । অধ্যাপক হরিমোহন ঝা সম্ভবত মৈথিলীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রহসন লেখক : 'ঠোপ সঞে টোপ' (চন্দনের ফোঁটার সঙ্গে বিলাতি টুপী), 'রেলক ঝগড়া', 'বৌয়াক দাম' (বাচ্চার দাম)। এঁর চেয়ে বেশি ঘটনাবহুল অথচ অধিকতর কৃত্রিম হলো অধ্যাপক তন্ত্রনাথ ঝা-এর নাটক যা 'একাঙ্কী চয়নিকা' নামের একটি সংকলনে উনি প্রকাশিত করেন। ওঁর মঞ্চধারণা অনেক বেশি তা বোঝাই যায়— তবে নানান সামাজিক সমস্যা নিয়েও উনি ভাবিত। হাস্যরসের মাধ্যমে উনি নিজের শক্তিশালী বক্তব্যকে সামনে রাখতে সক্ষম হন। এটা মানতেই হবে যে এই দুজন লেখকই নাটকের মাধ্যমে মৈথিলীর হাস্য-পরিহাসের ধারাকে জিইয়ে রাখতে অত্যন্ত সক্ষম হয়েছিলেন।

অবশ্য এই দুজন প্রথিতযশা নাট্যকারই ভালো প্রহসন লিখেছেন অন্য কেউ নয়— একথাও সত্যি নয়। প্রত্যেক বছরই নতুন প্রহসন লেখা হচ্ছে উঁচু মানের এবং কিছুদিন আগেই হরিশচন্দ্র ঝা 'হরিশ' আমাদের চরম আনন্দ দিয়েছেন পরিহাস, হাস্য ও ব্যাঙ্গানুকরণের সাহায্যে রচিত একটি নাটকের মাধ্যমে, যার নাম হলো 'ছীঁক' (হাঁচি)। নাটকটি সাহসিকতার জন্য উল্লেখযোগ্য কারণ এতে সর্বপ্রথম মানক ভাষাশৈলী ব্যবহার না করে উপভাষাকে ব্যবহার করা হয়েছে মিশ্ররূপে। উনি এমন একাধিক সফল একাঙ্ক নাটক লিখেছেন যা বেশ আনন্দদায়ক ও সাহসিক। একইরকমভাবে রূপকান্ত ঠাকুরের 'বচন বৈষ্ণব' সেইসব মানুষের প্রতি উদ্দিষ্ট যারা নিজেদেরকে মিথ্যে আদর্শবাদের ধুয়ো

তুলে জনপ্রিয় করে তোলার প্রয়াস করে।

যাঁরা নিয়মিত ও গম্ভীর একাঙ্ক রচয়িতা তাঁদের মধ্যে নাম করতে হয় গোবিন্দ ঝা-র 'মিথিলাক প্রতিনিধি', শুধাংশু শেখর চৌধুরীর 'হথটুট্টা কুরসী', যোগানন্দ ঝা-র 'মুনিক মতিভ্রম' এবং কৃষ্ণকান্ত মিশ্রের 'আত্ম-মর্যাদা'। অগ্রগণ্য কল্পকাহিনীকারদের মধ্যে যোগবাবু অন্যতম এবং তাঁর নাটকের বিষয় প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীর সুকন্যার গল্প। লেখক এই কাহিনীর দ্বারা এত বেশি প্রভাবিত যে তিনি ভুলে যান যে তিনি নাটক লিখছেন, কবিতা নয়। আমার মতে যদিও 'মুনিক মতিভ্রম' এক সুন্দর সাহিত্য, কিন্তু এটি একটি ভাল নাটক নয় কারণ একে মঞ্চস্থ করা সম্ভব নয়। আমি জানি না এটি মঞ্চস্থ হয়েছে কিনা তবে আমি নিশ্চিত যে একে মঞ্চে সফল করা অত্যন্ত কঠিন। আধুনিক জীবন নিয়ে লেখা গুণানন্দ এবং ঝা-র একাঙ্ক নাটক 'মধুযামিনী' এবং গঙ্গানন্দ সিংহের 'জীবন সংঘর্ষ' আজকের শ্রেষ্ঠ একাঙ্ক নাটক।

অন্যান্য ক্ষেত্রে, প্রহসনগুলি ছাড়া, এখানে উল্লিখিত গম্ভীর একাঙ্ক নাটকগুলি সম্ভবত এ যুগের মৈথিলী নাট্যরচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন— যেখানে শক্তিশালী বিষয়ের ঐতিহাসিক গুরুত্বযুক্ত উপস্থাপনা এবং মূল্যবান নান্দনিক অভিজ্ঞতাও হাত মিলিয়েছে।

মৈথিলী নাট্যকারদের সমস্যা

মিথিলায় এ পর্যন্ত গুণী মানুষদের উপযোগী স্বাধীন কোনো মঞ্চের উদ্ভব হয়নি। মিথিলায় কীর্তনিয়া মঞ্চ ছিল; কিন্তু তার সংস্কার প্রয়োজন। অথবা বলতে পারি আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। মিথিলার মতো অনগ্রসর জায়গায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুনর্গঠন হচ্ছে পণ্ডিত, লেখক এবং শিক্ষিত মানুষের মধ্যে এই বোধ জাগিয়ে তোলা যে পেশাদার নটুয়া (অভিনেতা)-য় পরিণত হওয়া বা এদের সঙ্গে মেশায় কোনো অবনতির সম্ভাবনা নেই যা ছিল অতীতে বিশ্বাস। অভিনয় শিল্প এখনো মানুষের সম্মানের পক্ষেহানিকারক বলে মনে করা হয় এবং বিশেষ করে নারীর নাটকের অভিনয়ে অংশ নেওয়ার কোনো অধিকার নেই। তাছাড়া, গুজরাত বা বাংলার মতো এখানেও পেশাদার অভিনেতার জনপ্রিয়তা এবং সম্মান প্রয়োজন। আধুনিক মৈথিলীভাষী মানুষকে অভিনেতার কাজের সম্মানজনক এবং লাভজনক প্রকৃতির কথা বুঝতে হবে।

এ কথার বোধ হয় কিছু যাথার্থ্য আছে যে জমিদারি প্রথার অবলুপ্তি নাটকের ঐতিহ্যের উপরেও চরম আঘাত হানে। নাটক একটি ব্যয়সাপেক্ষ শিল্পমাধ্যম এবং অন্য কোনো শিল্প মাধ্যমের চেয়ে এই ধারায় বেশি পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন। মিথিলার মানুষ অত্যন্ত দরিদ্র এবং তারা সাংস্কৃতিক ব্যাপারে অর্থ ব্যয়ের সামর্থ্যের ব্যাপারে নিজেদের প্রতি দ্রুত আস্থা হারিয়ে ফেলছেন, কারণ তাঁদের ভাষা এখনো সাংবিধানিক স্বীকৃতি পায়নি এবং তাকে জনপ্রিয় নেতারা অনিচ্ছার সঙ্গে ইতস্তত করে এগিয়ে দেন।

বর্তমানে বেতারের মাধ্যমে নাটককে কিছুটা আনুকূল্য দেখানো হচ্ছে। দুঃখের বিষয়

এখানে কোনো স্বাধীন বেতার বিভাগও নেই যা মৈথিলী ভাষীদের প্রয়োজন মেটাতে পারে। আমাদের যা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে তা হল পাটনা বেতার বিভাগ থেকে প্রচারিত মৈথিলী নাটকের কিছু জঘন্য অনুষ্ঠান যা সারা বছরে কয়েক মিনিটের জন্য সম্প্রচারিত হয়। এদের কতগুলি ইন্দুর মতো লেখকদের হাতে হঠাৎ সাফল্য পেয়েছে। ১৯৭৫-এ দ্বারভাঙায় আকাশবাণীর শাখা চালু হওয়ার পর থেকেই কেবল বেতার নাটকের বাগ্‌ধারা এবং প্রকরণ শিক্ষার চেষ্টা চলছে।

অবশেষে বলতে হল চলচ্চিত্র এবং উপন্যাস নাটকের বড় শত্রু। সৌভাগ্যক্রমে, মৈথিলীতে এ পর্যন্ত কোনো চলচ্চিত্র তৈরি হয়নি, এবং যদিও কিছু দেশপ্রেমী মৈথিলী ভাষাকে জনপ্রিয় করার প্রয়োজনে চলচ্চিত্র নির্মাণের কথা বলছেন, আমার মনে হয় এতে এতো বেশি অর্থের প্রয়োজন এবং হিন্দি চলচ্চিত্রের সাফল্য এত শক্তিশালী একটি বিষয় যে মৈথিলী নাটকের কোনো ভয়ের কারণ নেই। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা সেখানেই। মানুষ মৈথিলী নাটক দেখার চেয়ে হিন্দি ছবি দেখতে চাইবেন বেশি। এ কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। পৃথিবীর অন্যান্য নাট্যসাহিত্যের মতো এ ক্ষেত্রেও পেশাদারি মঞ্চ তৈরি করতে হলে চলচ্চিত্রের কতগুলি লক্ষণ মনে রাখতে হবে। জনমাধ্যম হিসাবে নাটকের চেয়ে বেশি শক্তিশালী আর কোনো মাধ্যম নেই যা প্রভাব বিস্তার করতে পারে বিপুল জনসমাজের উপর। যেখানে একটি উপন্যাস পাঠের ক্ষেত্রে প্রয়োজন পাঠের ক্ষমতা, কিছু চেষ্টা এবং যথেষ্ট অবকাশ, একটি নাটকের জন্য কোনো পাঠক্ষমতারই প্রয়োজন নেই, প্রায় কোনো কায়িক পরিশ্রম (নাটক দেখতে যাওয়া এবং নাটক দেখা ছাড়া) প্রগোজন নেই এবং দু থেকে তিন ঘণ্টার বেশি অবকাশও দরকার নেই। তদুপরি, চলচ্চিত্রের অনুপস্থিতিতে দক্ষ অভিনেতা এবং লেখকের কাছে নাটক যথেষ্ট লাভজনক প্রতীয়মান হওয়া প্রয়োজন। যাই হোক, নান্দনিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে নাটক অনেক বেশি পরিতৃপ্তকর; অনেক বেশি মানুষকে নিযুক্ত করে এই মাধ্যম এবং গুণী অভিনেতাকে আরো বেশি খ্যাতি লাভের সুযোগ দেয় চলচ্চিত্রের তুলনায়।

মৈথিলী নাট্যকাররা গ্রাম্য নটুয়াদের আদিবাসী-নৃত্য এবং নাটক থেকে প্রেরণা পেতে পারেন যদি যারা 'জলিম সিংহ' বা 'মনচুরনি নাচ'-এর মতো শক্তিশালী কাজ করেছে যদিও তা দুর্ভাগ্যক্রমে অত্যন্ত অশ্লীল এবং কদর্য রুচির পবিচায়ক। অন্যভাবে বলতে গেলে, নাট্যকারদের অভিনেতাদের জ্ঞানে পরিমার্জনা যোগ করতে হবে এবং দেশের আদিবাসীদের প্রচলিত ধারার সংস্করণ এবং আধুনিকীকরণ করতে হবে।

আধুনিক মৈথিলী কবিতা

গদ্যের ক্ষেত্রে যেখানে নতুন শক্তি নতুন উপাদান এবং নতুন বিষয় উপস্থাপিত করে,

কবিতার ক্ষেত্রে তা কিছু পুরনো উপাদান পুনরুত্থাপনের কাজ করে, প্রাচীন বিষয়কে নতুন শক্তি প্রদান করে যা ছিল সম্পূর্ণ নতুন উপাদান এবং নতুন বিষয় সৃষ্টির চেয়ে অনেক বেশি।

(ক) প্রাচীন সাহিত্য রীতি এবং বিষয়সমূহ

মহাকাব্য

এই শতকের আগেও মৈথিলীতে মহাকাব্য লেখা হয়েছে কিন্তু মৈথিলী নয়— সংস্কৃতই মহাকাব্য রচনার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম রূপে বিবেচিত হতো। মহারাজা ছত্রসিংহের (১৮০৩-৩৯) সময় মৈথিলীতে দীর্ঘ কাব্য এবং মহাকাব্য রচনার ধারা শুরু হয়। মৈথিলী সাহিত্যে এই ধারাকে চূড়ান্ত রূপে প্রতিষ্ঠিত করে মনবোধ -এর 'কৃষ্ণজন্ম' (১৮৮০ খ্রি.)। তাছাড়া, নতুন নানান প্রভাবের পরে এই সময়ে যখন নব্যভাষাগুলি ধীরে ধীরে গুরুত্ব পেতে থাকলো, সৃষ্টিশীল মানুষজন ভাবতে শুরু করলেন যে নব্যভাষাতেও মহাকাব্য রচনা করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে চন্দা ঝা-র 'রামায়ণে'র গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

সে সময়ে সংস্কৃত মহাকাব্যগুলি— প্রামাণ্য ও সাহিত্যিক গুণসম্পন্নভাবে অনুবাদের চেষ্টা করা হয়েছিল। পরেও হয় যেমন, অচ্যুতানন্দ দত্তের 'মহাভারত' (১৯৩১) এবং 'রঘুবংশ' (১৯৩৩), জীবছ মিশ্রের 'রামায়ণে'র অংশবিশেষ (১৯৩৬), পরমানন্দ দত্তের 'হরিবংশ', লক্ষ্মীনাথ ঝা-র 'নৈষাধ' এবং যদুনন্দনদাস ও পরমানন্দের 'কুমরাসম্ভব' প্রভৃতি। এগুলির সব অবশ্য সমান সফল হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, 'রঘুবংশে'র অনুবাদে অচ্যুতানন্দ দত্ত নিজেকে তেমন কারো কাছে বোধগম্য করে তুলতে পারেন নি, যে মূল সংস্কৃত পাঠ পড়েনি।

যেগুলি অনুবাদ-কর্ম নয় এমন সব পাঠের ক্ষেত্রে বরং বেশি সফলতা দেখা গেছিল। তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকৃতি হলো চন্দা ঝা-র 'রামায়ণ' (১৮৯৮)। কথিত আছে এর প্রতিটি পঙ্‌ক্তি মহারাজাধিরাজ লক্ষ্মীশ্বর সিংহের রাজসভায় আলোচিত হয়েছিল পাঠের চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার আগে। এটি সত্যিই একটি স্মরণীয় কাজ। "এই গ্রন্থের ভাষার মাধুরী ও শৈলীর সৌন্দর্য সাধারণ মানুষকে খুব শিগ্‌গিরই আকৃষ্ট করলো এবং বিদ্বান ও অশিক্ষিত — দু ধরনের মানুষের কাছেই এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে গেলো। এর বিষয়বস্তুর প্রকৃতি এবং সংস্কৃতনিষ্ঠ শৈলী মৈথিল সংস্কৃতজ্ঞদের মুগ্ধ করে দিলো নিজস্ব চমৎকারিত্ব, ভাবপ্রকাশের গাম্ভীর্য দিয়ে ও তাঁদের মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগকে জাগিয়ে তুললো। সংস্কৃতের ছন্দেই এটি মূলত রচিত হয়েছে কিন্তু এর গানগুলি মিথিলার সাংস্কৃতিক পরম্পরা অনুসারেই রচিত হয়েছে। বাল্মীকির 'রামায়ণের' মতোই এর পঙ্‌ক্তিগুলি খুবই গীতিমধুর লাগবে গীত হলে " (ড. উমেশ মিশ্র)।

ভাষার ওপর অদ্ভুত দক্ষতা যার সঙ্গে জুটেছে ঠিক প্রবাদের ব্যবহার, লোকোক্তি ও

অলঙ্কারের প্রয়োগ, ঐতিহ্যপূর্ণ মৈথিলীর গানের ও সুরের ব্যবহার, অত্যন্ত প্রিয় ছন্দনির্বাচন এবং পঙ্ক্তি ও স্তবকগুলির গতি ও তাল, জীবন্ত চরিত্র-চিত্রণ, বিস্তারিত ব্যাপারের প্রতি প্রেম, খারাপের ওপর ভালোর জয়ের নীতিতে ঐকান্তিক বিশ্বাস— এই সব মিলিয়েই এটি এতো সফলতা পেয়েছিল।

লালদাস চন্দা ঝা-র প্রদর্শিত পথে চলতে চাইলেন 'রামেশ্বর নারায়ণ' (১৯১৪) গ্রন্থে, যা মহারাজাধিরাজ রামেশ্বর সিংহের (১৮৯৮ ১৯২৯) নামে রাখা হয়েছে। চন্দা ঝা-র কৃতির অপরূপতা আরো বেশি চোখে পড়ে এই কৃতির পাশে রাখলে। এতে ছন্দ বা সুরের বৈচিত্র্যও নেই, না আছে শব্দ, প্রবাদ, লোকোক্তির অনায়াস ব্যবহার কিংবা চন্দা ঝা-র 'রামায়ণে'র তুলনায় কাব্যিক কথনভঙ্গিমার ওপর তেমন দখল। অবশ্য এ এক সুগঠিত কাহিনীর সহজ ও সরল বর্ণনা। রামের তুলনায় অধিকতর গুরুত্ব প্রদান— একই কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আসলে কাব্যটি বৈষ্ণবের তুলনায় অনেক বেশি শাক্তভাবাপন্ন।

রঘুনন্দনদাসের 'সুভদ্রাহরণ' (১৯৩৭-৪৪), বদ্রীনাথ ঝা কবিশেখরের 'একাবলী-পরিণয়' (১৯৩৭-৪২), অচ্যুতানন্দ দত্তর 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৯৪০/৪৪), অধ্যাপক তন্ত্রনাথ ঝা-র 'কীচকবধ' (১৯৩৮/৬১) এবং গৌরীশঙ্কর ঝা-র মাইকেল মধুসূদনের অনুবাদ 'মেঘনাদবধ' (১৯৪১) প্রভৃতি বরং অনেক বেশি সফল ছিল।

রঘুনন্দন দাসের কৃতিতে কিছু বিখ্যাত সুপরিচিত ঘটনাবলী রয়েছে। যেমন দশটি অঙ্কে বর্ণিত অর্জুনের সুভদ্রাহরণের কথা। এর পারিপার্শ্বিক দৃশ্য ছিল খুবই বৃহৎ, এর শৈলী খুবই আকর্ষক এবং প্রকৃতির অনুরূপ।

দুর্ভাগ্যবশত রঘুনন্দনদাসের অন্য সব রচনার মতোই এতেও হিন্দির প্রভাব স্পষ্টতই দেখা যায়; যার অন্যতম প্রমাণ এই কাব্যের কাহিনী বিন্যাসে।

পণ্ডিত বদ্রীনাথ ঝা-র রচনার ওপর ছিল সরাসরি সংস্কৃত মহাকাব্যগুলির প্রভাব। তাঁর 'একাবলী পরিণয়' 'দেবী ভাগবত'-এর ষষ্ঠ স্কন্ধের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এটি ১৫টি সর্গে শেষ হয়েছে। একাবলী এখানে নায়িকার নাম এবং এই গল্পে তার সঙ্গে নায়ক একবীরের মিলনের কথা বর্ণিত হয়েছে। গল্প আরম্ভ হয় (শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীর ছেলে যদুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা) সন্তানহীন রাজা তুর্বসুর দীর্ঘ তপস্যা পুত্র সন্তান-লাভের জন্য যার ফল স্বরূপ ভগবান নারায়ণ তাকে একটি পুত্রের বর দিলেন এবং নিজেই তাঁর ছেলে একবীর হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। এই একবীরই কাব্যের নায়ক হয়ে যাচ্ছে। তুর্বসু একদিন ম্লান সন্ধ্যাবেলায় তাঁর নবজাত পুত্র একবীরকে নিয়ে ফেরত এলেন এবং ওঁর দেশবাসী সবাই তাকে সমাদরে গ্রহণ করলো।

পরের সর্গে দেখা যাচ্ছে একবীর বড় হয়ে উঠেছে। তার শৈশবের বর্ণনা পড়ে মনবোধের 'কৃষ্ণজন্মে'র কথা মনে পড়ে যায়। পরে এই বালকই বাবার সিংহাসনে বসে এবং তার পর থেকেই (৮ম সর্গ থেকে) প্রকৃত কাহিনী শুরু হয়। তার সঙ্গে দেখা হয়

একাবলীর সখী যশোমতীর। একাবলী ছিল এক অপূর্ব সুন্দরী রাজকন্যা যাকে একটি দানব— নাম কালকেতু— নিয়ে গিয়ে বন্দী করে। যশোমতী রাজার বিশ্বাস অর্জন করতে চাইছে দেখা যাচ্ছে নিজের বান্ধবীর রূপ বর্ণনা করে এবং তার বিপদের কথা বলে।

একবীর এই সব কথায় নরম হয়ে গিয়ে দানবটিকে আক্রমণ করে একাবলীকে রক্ষা করে এবং বাকি জীবন তাকে বিয়ে করে সুখে দিন যাপন করতে থাকে।

এই মহাকাব্য অসম পরিকল্পনা দোষে দুষ্ট (কারণ মূল পরিকল্পিত কথা শুরু হচ্ছে অর্ধেক কাব্য শেষ হয়ে যাওয়ার পর। এখানে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী, যেমন দানবের সঙ্গে যুদ্ধ, নারীর উদ্ধার, নায়িকার সঙ্গে একবীরের প্রেম প্রভৃতি খুব তাড়াতাড়ি দেখিয়ে ভীষণ আকস্মিকভাবে নাটকটিকে শেষ করে দেওয়া হয়েছে।), এবং অন্যান্য দোষের মধ্যে পড়ছে দুর্বল চরিত্রায়ণ (উদাহরণ, একবীরের প্রতি একাবলীর প্রেম-ভাবনার প্রায় হঠাৎই ঘোষণা) এবং এইস্থানে অতিরিক্ত সংস্কৃতায়ন শৈলীর নির্বাচনে।

প্রথম অংশের কিছু বর্ণনা অবশ্য পৃথকভাবে দেখলে তাদের মার্জিত উচ্চভাব এবং উন্নীত ভঙ্গির জন্য উল্লেখযোগ্য। এর গুণ হলো এই যে এটি সংস্কৃত মহাকাব্যের শৈলী বেশ ভালোভাবে নির্ভুল করে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছে।

'কীচক বধ' এবং ' মেঘনাদ বধ'— দুটিই রচিত হয়েছিল মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রত্যক্ষ প্রভাবে যিনি নিজের বলিষ্ঠ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও মুক্তক ছন্দ সর্বপ্রথম ভারতীয় ভাষায় আনার জন্য প্রখ্যাত হয়েছিলেন।

অধ্যাপক তন্ত্রনাথ ঝা-র 'কীঁচক-বধ' (১৯৩৭-৬১) নয় সর্গে কীচকের হত্যা খুবই সুশ্রাব্য রচনা, দেখা যাচ্ছে ভীমসেনের হাতে কীচক মারা যাচ্ছে পাণ্ডবদের এক বছর অজ্ঞাতবাসের মধ্যে— বিরাট নগরে। চন্দা ঝা-র পর সর্বাধিক সফল মহাকাব্য সম্ভবত এইটিই। শৈলীর সংস্কৃতায়নের ফলে এই কাব্যের গতি একটুও শ্লথ করে নি গল্প-কথনের দিক থেকে; বরং এ থেকে কৃতিটি একটি আদর্শ উচ্চতায় পৌঁছতে পেরেছে। এই দিক থেকে চতুর্থ সর্গ বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। এখানে দ্রৌপদীর মনের বর্ণনা রয়েছে যখন তাকে কীচকের ঘর থেকে সুরা আনতে বলা হচ্ছে। তক্ষুনি দ্রৌপদীর মনে পড়ে গেলো নিজের রৌদ্রজ্জ্বল গৃহ, স্বয়ম্বর, অর্জুনের সংসর্গে কাটানো জীবনের কথা, দুঃশাসনের অপমানের সহন এবং শেষে সে স্থির করে যে কীচক তাকে ছুঁতেও পারবে না। এবং মনঃস্থিতি কিংবা আবেগ নিয়ে বাড়াবাড়ি নেই গতিশীলতার, বরং প্রতিটি সম্ভাব্য পরিবর্তন রচয়িতা কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়েছে এবং প্রতিটি পরিবর্তনই খুব সুপরিকল্পিতভাবে দেখানো হয়েছে। এতে যে শৈলী আছে তা নিশ্চিত রূপেই ও যোগ্য কারণেই গম্ভীর ও হাল্কা মনের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে। এটাকে সত্যিই অসাধারণ উপলব্ধি বলে ধরে নিতে হবে।

গৌরীশঙ্কর ঝা-র 'মেঘনাদ বধ'-এর অনুবাদ অনেকাংশেই মূল কাব্যের সৌন্দর্য বজায় রাখতে পেরেছে।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য মহাকাব্যের মধ্যে উল্লেখ করতে হয় জীবনাথ ঝা-র 'রাবণবধ', বয়স্ক কবি সীতারাম ঝা-র 'অম্বচরিত'(১৯৫৬) যা থেকে ওঁর সেই কাব্যিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না যা ওঁর মুক্তক কবিতায় পাওয়া গেছে — যা এখানে পাওয়া যায় তা হলো মিথিলার প্রতি দেশপ্রেমের একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। লক্ষণ ঝা-র 'গঙ্গা' (১৯৬৬) (ভারতীয় আর্য সংস্কৃতির ও জীবনের গীতিবিশেষ) এবং 'শান্তিদূত' (আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নেহরুর কৃতিত্ব নিয়ে রচিত কবিতা); রাঘবাচার্যের ঐতিহাসিক এবং অত্যন্ত শক্তিশালী অপ্রকাশিত 'মল্লদেববিজয়' ও সর্বোপরি কাশীকান্ত মিশ্র মধুপের অপূর্ব কবিতা 'রাধাবিরহ' (১৯৬৯) ও অদ্যাবধি অপ্রকাশিত 'বিদ্যাপতি' ইত্যাদি হলো অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

এগুলির মধ্যে সতেরো সর্গে বিভক্ত 'রাধাবিরহ' তার শৈলীর বিশিষ্টতার জন্য পৃথকভাবে উল্লেখ দাবি করতে পারে। যদিও এর বিষয়বস্তু সর্বজ্ঞাত তবুও কবি এই কাব্যে একটা নতুনত্ব আনতে পেরেছেন। ইনি রাধাকে দেখিয়েছেন ভুবনেশ্বরী রূপে যিনি প্রতিজ্ঞা করছেন পৃথিবীতে সুখ-সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনবেন। কিন্তু যেখানে কবি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা হলো এর সূক্ষ্ম বাগ্মিতা ও কাব্যিক কুশলতায়। কাব্যিক সৌন্দর্যের এখানে এমন ছড়াছড়ি যে পাঠকের কখনো কখনো মনে হয় এ থেকে কিছুটা মুক্তি পেলে ভালো হয়।

এই কাব্যটি সবচেয়ে ভালো লাগে যখন এটি উচ্চস্বরে পঠিত হয়; কারণ তখনি বোঝা যায় মধুপ কতোটা দক্ষ ছিলেন ছন্দ চয়নে ও স্তবক গঠনে। কবিতাটি সংস্কৃত শৈলীতে ঢালা এবং পরম্পরাগত প্রতীক, বিস্তারিত বর্ণন এবং দক্ষ কারিগরি প্রভৃতির জন্য বিখ্যাত। তবে এতে আবার সেইসব গুণের অভাব রয়েছে যা থাকলে বলা যেত এটি আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ কাব্য রচনার উদাহরণ।

দীননাথ পাঠকের 'চাণক্য' (১৯৬৫) হলো আধুনিক মিথিলার মহাকাব্য। এটি হলো সরল, সোজাসুজি শৈলীতে লিখিত কিন্তু যার ভাষার আছে প্রচুর শক্তি, আর আছে প্রভূত প্রতীক; এর পরিকল্পনাতেই বেশ বিশালতা ও মহানতা দেখতে পাচ্ছি; রূপকের ব্যবহারে এটি আধুনিক এবং আজকের পাঠকদের কাছে এর বেশ সম্মান আছে। কবি এখানে চাণক্যকে দেখিয়েছেন মিথিলার একজন জননেতা রূপে যিনি জানেন কিভাবে কোনো জাতীয় স্বার্থে সাধারণ মানুষকে জাগ্রত করতে হয়। কবির জীবন দর্শনের বিষয়েও এই কাব্য থেকে অনেক কথা জানা যায়— বিশেষ করে একথা জানলে যে এই কাব্য ইন্দো-চীন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা হয়েছে। আর কোনো আধুনিক কাব্য এই ধরনের আকারে লেখা হয়নি যা থেকে তৎকালীন পরম্পরার সঠিক পরিচয়ও পাওয়া যায়, আবার ছন্দের ওপর এবং বাগ্‌ধারার ওপর দক্ষতার উদাহরণ পাওয়া যায় এবং শক্তিশালী ও প্রভাবোদ্দীপক শৈলীর পরিচয়ও পাওয়া যায়। এই কবিতাটির মহানতার বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। যে যুগে ছোট দৈর্ঘ্যের কবিতাই হয়ে যাচ্ছে আদর্শ— যার সঙ্গে যোগ

দিচ্ছে গীতিকবিতা বা কোনো কোনো গান, সেখানে যদি কোনো সুদীর্ঘ কবিতা পাঠকদের মাঝে মহা সমাদরে গৃহীত হয় তো তাকে একটা বিরাট কৃতিত্ব বলে মনে করতে হবে। এমন কি চন্দা ঝা, তন্ত্রনাথ ঝা ও বদ্রীনাথ ঝা-ও এমন সমকালীন সময়ে উপযোগিতা আছে এমন বক্তব্যের কাব্য রচনা করতে পারেন নি— কিন্তু এই কাব্যটিতে সচেতন ও দক্ষ গল্প-কথনের শৈলী ও কাব্যিক কুশলতার জন্য তা সম্ভব হয়েছে।

এই কবিতাটির মতো না হলেও কতকটা এমনই হলো মথুরানন্দ চৌধুরীর 'কানন কন্যা', বিধুর 'সীতায়ন' এবং জনার্দন প্রতিহস্তের 'সীতা' একইভাবে তাদের কাব্যিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আধুনিক জীবনের সঙ্গে নিজেদের কাব্যকে জুড়তে পেরেছে।

মহাকাব্য ধীরে ধীরে জনসাধারণের মধ্যে অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বর্তমান যুগে অবশ্য উপন্যাসের চেয়ে ছোট গল্প বেশি সমাদৃত, একাঙ্ক বেশি দরকার পূর্ণাঙ্গ নাটকের থেকে; অতএব আজকের যুগে 'খণ্ডকাব্য' বা যাকে 'গীতি' বা 'মুক্তিকাব্য' বলে তাই মহাকাব্যের থেকে বেশি জনপ্রিয়। অবশ্য এই বিধাটি একেবারে হারিয়ে যায় নি। এটি এখনো বেঁচে আছে একটা জীবন্ত সাহিত্য-রীতি হিসাবে 'চাণক্য'-র মতো গ্রন্থে।

খণ্ডকাব্য

মৈথিলী লেখকদের কাছে খণ্ডকাব্য বেশি জনপ্রিয়। সম্ভবত এই জন্যে যে এটির পরিকল্পনা ও রচনা সহজতর। প্রথম প্রথম দেখা যাচ্ছে পৌরাণিক গল্পগুলিকে ছন্দ ও কবিতায় ঢেলে অনেকগুলি খণ্ডকাব্য রচিত হয়েছে; যেমন লালদাসের 'শম্ভু বিনোদ গণেশ' খণ্ড (১৯০৯-১১) ও একাধিক ব্রতকথা, গুণবন্তলালদাসের 'গজগ্রাহোদ্ধার' (১৯১৪), সুদর্শনোপাখ্যান' (১৯১৪-৩১), 'গঙ্গালহরী' (১৯২১), 'সুকন্যোপাখ্যান', 'গৌরীপরিণয়-প্রবন্ধ' (ব্রহ্ম-বৈবর্ত-পুরাণ থেকে উদ্ধৃত) (১৯২১) এবং কিছু ব্রতকথা; গঙ্গাধর মিশ্রের 'নারদমোহ' (১৯১৯), 'সত্য-ব্রত্যোপাখ্যান' (১৯২১), 'সুকন্যোপাখ্যান' (১৯২১), এবং 'সুদামা চরিত' (১৯৩৫); অনূপ মিশ্রের 'নারদ-বিবাহ' এবং দামোদরলালদাসের 'শকুন্তলোপাখ্যান'।

এগুলির মধ্যে গঙ্গাধর মিশ্রেরটিই সম্ভবত শ্রেষ্ঠ। ইনি একটি কাহিনীর মর্ম ধরতে পরেন খুব সুন্দর ভাবে এবং তারপর তা বলতে পারেন খুব সুন্দর ভাষায়।

পরবর্তীকালেও বেশ কিছু লেখক এই ধরনের খণ্ডকাব্য-রচনায় আত্মনিয়োজিত করলেন; যেমন, লক্ষ্মীব্রতসিংহের 'সত্যব্রতোপাখ্যান' (১৯৩৪) এবং পুলকিতলালদাসের ('মধুর') 'রম্ভাশুকসম্বাদ' (১৯৩৬)।

যেসব অনূদিত খণ্ডকাব্য এই সমস্ত পৌরাণিক কাব্যরূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে সামনে এসেছে, তা হলো: কালিদাসের 'ঋতুসংহার'(অচ্যুতানন্দ দত্ত এবং শ্রীবল্লভ ঝা-এর দ্বারা), 'মেঘদূত' (অনুবাদ পরমানন্দদত্ত 'পরমার্থী' দ্বারা (১৯৩৭), এবং ভগীরথ ঝা দ্বারাও); ম.ম. পরমেশ্বর ঝা-এর 'যক্ষসমাগমকাব্য' (ভগীরথী ঝা দ্বারা, ১৯৩৯) এবং ভর্তৃহরিনির্বেদ

(গৌরীশঙ্কর ঝা দ্বারা, ১৯৩৯)।

এর পরের পর্যায়ে মূল রচনায় বহু খণ্ডকাব্য দেখা দিতে লাগলো মৈথিলীতে যা তিন ধরনের হতো : (১) যেগুলি কোনো না কোনো প্রাচীন গাথাকে একেবারে নতুন গল্পের ছাঁচে ঢেলে দিয়ে রচিত হতো; (২) যেগুলো সম্পূর্ণ কাল্পনিক গল্প বেছে নিতো, তবে সেগুলির সঙ্গে আধুনিক যুগের কোনো সমস্যা জুড়ে দিতো, এবং (৩) যেগুলি জীবনের একটা দিকের বিষয়ে ভাবিয়ে তোলার মতো ব্যাখ্যা নিয়ে রচিত হতো, যার প্রধান অস্ত্র ছিল ব্যঙ্গ ও হাস্য।

এইসব কৃতির মধ্যে রঘুনন্দনদাসের 'বীরবালক' (১৯২৬), যা লব-কুশকে নিয়ে লেখা, শ্যামবিহারী দাস 'নবীনে'র অপূর্ব কাব্য ' গোধূলি (১৯৪৩), সূর্যকান্ত ঝা 'কমলের' দেশপ্রেমিক-রচনা 'তপস্বী' (১৯৪৮), শরশয্যায় শায়িত ও মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষারত ভীষ্মকে নিয়ে লেখা বুদ্ধিধারী সিংহ রমাকরের 'শরশয্যা' (১৯২৬), ভুবনেশ্বর প্রসাদের ' মৈথিলী বাল-রামায়ণ' (১৯৬৩), সুরেন্দ্র ঝা 'সুমনের' 'চণ্ডীচর্যা' (১৯৬৩),— যা দুর্গার কাহিনী নিয়ে লেখা, এবং 'ঋতু-সংহার', ঋদ্ধিনাথ ঝা-র 'সতীবিভূতি', গণেশ্বর ঝা-র 'দেবগীত', ছেদী ঝা-র 'কোইলী দূতী', জনার্দন ঝা-র 'জানকী পরিণয়' এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লঘু কবিতা 'সীতা'— এইসব কটিই প্রথম শ্রেণীতে পড়বে উপরোক্ত তিনটি ভাগের। এগুলির বেশির ভাগই রচিত হয়েছে নব্যভাষার পরম্পরাগত ছন্দে এবং তাদের বিষয়ও আমাদের দেশের ইতিহাস এবং পুরাকথা। এগুলি পড়া হয় শ্রদ্ধার সঙ্গে, তবে তাতে ভালোবাসা থাকে না। দ্বিতীয় ধরনের খণ্ডকাব্যগুলি বরং নিজেদের জন্য বেশি ভালো জায়গা তৈরি করে নিতে পেরেছিলো। সেই যুগে যাঁরা বিখ্যাত লেখক-কবি ছিলেন তাঁদের মধ্যে মথুরানন্দ চৌধুরীর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কৃতি 'কৃষক' (১৯৪৬) উল্লেখযোগ্য। সম্ভবত একেবারে সবচেয়ে আধুনিক বিষয় নিয়ে খণ্ডকাব্য-রচনার সৎপ্রয়াস ইনিই করেছিলেন। তাঁর গল্পে একজন আধুনিক কৃষক আছে যার অবস্থার বর্ণনা আমাদের করুণারই উদ্রেক করতো।

তবে অধিকতর পরিপক্ক রচনা হলো উপেন্দ্রনাথ ঝা 'ব্যাস' -এর 'সন্ন্যাসী' (১৯৪৮) — যা মুক্ত ছন্দে লেখা। নায়ক ঘর ছেড়ে হিমালয়ে যাচ্ছে সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য কিন্তু শেষমেষ বাড়িতে ফিরে আসছে যখন সে বুঝতে পারছে যে একজন সুস্থ গৃহস্থের গার্হস্থ্য জীবনও কতটা পূর্ণরূপে গুরুত্বের কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। কারণ তার বিরহিণী সঙ্গিনী এই বিচ্ছেদ পরিত্যাগকে সহজভাবে নিতে পারেনি। ফলে সে যখন ফিরে এসেছে তার নিজের সংসারে, তখন তাকে পেলো মৃত্যু-শয্যায়। গল্পটি নারীর স্থানকে আরো উঁচুতে তুলে ধরছে বলিষ্ঠভাবে এবং আমাদের বিহ্বল করছে— বিশেষ করে গৃহী জীবনের মূল্য আবার সঠিক ভাবে দেখানো সম্ভব হচ্ছে। ইদানীং ব্যাস এই শৈলীরই আরেকটি উদাহরণ রেখেছেন খুব সুন্দর ভাবে শেষ হয় এমন একটা রচনায়। 'পতন'-এ উনি খুব চতুরভাবে এবং অনুভূতি দিয়ে বলছেন কিভাবে আকাশ থেকে নহুষের পতন ঘটেছে

যখন সে ইন্দ্রের পত্নীকে নিজের বলে মেনে নিতে যায়, কারণ শুধু এই যে সেও 'ইন্দ্রত্ব' পেয়েছে ও স্বর্গে গেছে। মানুষের দম্ভ ও রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং আবেগের সংঘাতের এ একটি অপূর্ব কাহিনী যা কবি দারুণ জমাটিভাবে বলতে পেরেছেন। এই কাব্যে প্রথম সর্গের মুক্তক ছন্দ থেকে তৃতীয়তে ছন্দ পরিবর্তন তিন বার হওয়াতে বোঝা যাচ্ছে এই কাব্যটির তিনটি স্বাভাবিক ভাগ রয়েছে, কথার বিকাশেরও। এর সমকক্ষ — পরিকল্পনা বা রচনার দিক থেকে — অন্য কোনো খণ্ডকাব্য নেই যেটি এতো মহান। ইন্দ্রাণীর চরিত্রের মধ্যে দিয়ে নারীর আদর্শ রূপটির পরিস্ফুটনের সঙ্গে সঙ্গে আছে দেবী সরস্বতীর কথা যিনি বর্ণনা করেছেন যে কিভাবে তিনি নিজের শীলরক্ষা করে থাকেন। যতো প্রশংসা এই কাব্যটি অদ্যাবধি পেয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি তা পাওয়ার যোগ্য। অতএব ক্ষুদ্র স্তরে 'পতন' একটি মহান রচনা।

অধ্যাপক কেদারনাথ লাভ-এর খণ্ডকাব্যগুলি উপেন্দ্রনাথ ঝা 'ব্যাসের' পাঠ থেকে কোনো অংশে কম নয় তবে সেগুলি এতো বেশি উচ্চমানের নয় এবং সর্বত্র সমানরূপে প্রশংসাযোগ্য নয়। প্রথমে অধ্যাপক লাভ অনুবাদ করলেন হিন্দি থেকে পোদ্দার রামাবতার অরুণের খণ্ডকাব্য 'অশোক-পুত্র' (১৯৫৯) বেশ সফলভাবে। এরপরে ইনি লিখলেন দুটি নিজস্ব খণ্ডকাব্য—'লখিমা রানী' (১৯৬০) এবং 'ভারতী' (১৯৬৪)। দুটিতেই ইনি মিথিলার দুজন মহীয়সী মৈথিল রমণীর চরিত্র-চিত্রণের প্রয়াস করেছেন। বিষয়ের সঠিক চয়ন, এবং মিথিলার ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে এই দুই নারীর স্থান, আর রচয়িতার নাটকীয়তার প্রয়োগ— সব মিলিয়ে এই খণ্ডকাব্যগুলির স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। এখানে 'লখিমা রানী' কাব্যটি মনে হয় 'ভারতী'র থেকে অধিকতর সফল চরিত্র চিত্রণেও এবং জটিল চরিত্রের অপূর্ব কল্পনাতেও। কবি খুব সুন্দর ভাবে লখিমাকে বিদ্যাপতির প্রেমিকা রূপে চিত্রিত করা থেকে বিরত হয়েছেন, অথচ তাও দুজনের মধ্যে সম্বন্ধের নরমভাব ও পরিপক্বতা— দুটোই খুব সুদক্ষভাবে ও খুব সুন্দর করে দেখানো হয়েছে। অধ্যাপক লাভ এই বিষয়গুলি যেভাবে কাব্যে চিত্রিত করেছেন তার থেকে বেশি ভালোভাবে এগুলি করতে পারা কঠিন। কাব্যের স্বর ও মুক্তক ছন্দের ব্যবহার মোটামুটিভাবে চরিত্রগুলির সূক্ষ্ম পরিবর্তন ও নায়িকার ব্যবহারের সূক্ষ্ম পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে সুন্দরভাবে প্রযুক্ত হয়েছে এখানে। যদিও কোথাও কোথাও বাচনশৈলী এখানে নষ্ট হয়েছে 'লখিমা রানী'-তে হাল্কা মেজাজে রচনার ফলে ও আরো কিছু দোষে দুষ্ট হয়ে, সাধারণত বাগ্‌ব্যবহার করা হয়েছে খুবই অনুভূতিপ্রবণতার সঙ্গে যার প্রশংসা অবশ্য কর্তব্য। কখনো মনে হয় একই কথা যদি 'ভারতী'র বাগ্‌ব্যবহারের বিষয়ে বলা যেতো তো খুব ভালো হতো। তা ছাড়া বর্ণনার সহজগম্যতা ও পঙক্তিগুলির পরস্পরের বুনোটগুলি খুবই উচ্চ দরের 'লখিমা রানী'কে আর এই পাঠে খুব কম পঙক্তিই আছে যার সতর্ক বিন্যাস ও আকরণের প্রশংসা না করে পারা যায় না। এটা বিশেষ ভাবে লক্ষ করা যায় যখন কবি বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যান— 'শিল্প' থেকে 'যুদ্ধে' চলে যান

কবিতার মধ্যেই। শেষত আধুনিক পরিবেশেও যে-কোনো কবিতার একটা অর্থ থেকে যাচ্ছে। সাধারণ মানব-মানবীর বিপদের সময়েও এবং কবিকে কোনো সমগ্র জাতির অনুভূতিপ্রবণতার ভাস্কর রূপে দেখলে এই কবিতার একটা বক্তব্য আছে সাধারণ মানুষের প্রতি— আছে একটা গুরুত্ব আমাদের বর্তমান সময়ে— যার তুলনা একমাত্র দেওয়া যেতে পারে দীনবন্ধু পাঠকের 'চাণক্য' থেকে। 'ভারতী'র বিষয়বস্তুতে নারী মুক্তির জন্য একটা বিরাট বক্তব্যের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে আরো বৃহত্তর ক্যানভাসে আছে এই বিষয়ের। মানব জীবনে 'ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ' প্রতিটিরই নিজস্ব স্থান রয়েছে। মিথিলার জীবন ও কালের পক্ষে একটা সঠিক স্থান দেওয়া হয়তো সম্ভব ছিল— প্রাচীনতম কালের পরিবেশকে আবার ফুটিয়ে তোলা সম্ভব ছিল। এসবেরই সব দিক থেকে খোঁজ নেওয়া সম্ভব হয়নি। কবিতাটির বাগ্‌ধারা ও ছন্দও কিছুই আলোচনা বা উল্লেখের যোগ্য নয়।

গঙ্গেশ গুঞ্জনের মুক্তক ছন্দে লেখা 'হমঃ একটা মিথ্যে পরিচয়' (= আমি, একটা মিথ্যে পরিণতি') আধুনিক মানুষের একটা জ্ঞানগর্ভ বিশ্লেষণ। কবি কিয়দংশে সফল হয়েছেন আধুনিক যুগে সাধারণ মানুষের একটা ছবি ফুটিয়ে তোলার জন্য। কিন্তু তাঁর এই মুক্তক ছন্দ না ভারী তালানুরাগী না ততো কাব্যিক— কেননা এখানে মনে হয় গাম্ভীর্য ও সুচারুতার খুবই অভাব থেকে যাচ্ছে।

তৃতীয় শ্রেণীর খণ্ডকাব্যের উদাহরণ হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নরগঙ্গা', মথুরানন্দ চৌধুরীর হাল্কা ছন্দে লেখা 'মূসক মহিমা' ও একাধিক সাহিত্যিক গাথাকাব্য রচনা— যা কোনো বিখ্যাত রচনার অনুসারী বা নকল হোক বা না হোক— তবে মিথিলার জীবনের সংস্কৃতিক দিকগুলি নিয়ে যেখানে অবশ্যই কিছু না কিছু মন্তব্য আছে। এসবগুলি ছাড়া রয়েছে নানান রচনা যা প্রথিতযশা লেখকেরা— যেমন অধ্যাপকত্রয়ী হরিমোহন ঝা, তন্ত্রনাথ ঝা ও চন্দ্রনাথ মিশ্র 'অমর'— লিখে গেছেন।

গীতি-কাব্য

কিছু কিছু সংস্কৃত বা বাংলা গীতিকবিতার সমাধুনিক মৈথিলীতে অনুবাদ আমরা পাচ্ছি; যেমন, জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-র মৈথিলী অনুবাদ— ছেদী ঝা-র করা; ভুবনেশ্বরসিংহ 'ভুবনে'র করা 'বিরহিণী ব্রজাঙ্গনা' এবং গোবিন্দ ঝা-র করা 'বীরাঙ্গনা'।

কবিদের মধ্যে যাঁরা প্রাচীন ধাঁচের গীতিকবিতা লেখায় হাত পাকিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে প্রাচীনতম হলেন হর্ষনাথ ঝা কিন্তু শ্রেষ্ঠতম হলেন চন্দা ঝা-ই। চন্দা ঝা-র গীতিকবিতা তাঁর জীবন-কালে 'গীত-সপ্তশতী' ও '(সং)গীত-সুধা' নামে দুটি ক্ষুদ্র সংকলন-গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর স্যর গঙ্গানাথ ঝা প্রকাশনার ব্যবস্থা করলেন তাঁর লেখা সব মহেশবাণীর, নাম 'মহেশবাণী-সংগ্রহ'। শেষে ১৯৩৭-এ তাঁর আরো অনেক কবিতা নিয়ে রাজপণ্ডিত বলদেব মিশ্র একটা সংকলনের সম্পাদনা করলেন যার নাম ছিল 'চন্দ্র পদাবলী' যাতেও মহেশবাণীগুলিই ছিল শ্রেষ্ঠ— সরলতা ও সপ্রাণতার দিক

থেকে। মনে হয় উনি যেন ওঁর সমস্ত ভক্তি দিয়েছেন ঢেলে এবং নিজের মনোভাব ও অনুভূতিগুলির যতটা সম্ভব প্রত্যক্ষভাবে তুলেছেন ফুটিয়ে। কথিত আছে কবি প্রত্যহ নতুন একটি মহেশবাণী গাইতেন ঈশ্বরের সামনে এবং গাইতে গাইতে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে যেতেন।

বিংশ শতকের আরো বহু কবিই এই মহেশবাণী রচনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন : জীবন ঝা, বিন্ধ্যানন্দ ঝা, 'রঘুনন্দন', 'জয়মঙ্গল', আনন্দ ঝা ('মহেশ শতক'), 'কিরণ' এবং 'যাত্রী'। পরমানন্দ দত্ত চেষ্টা করেছিলেন এক নতুন ধরনের মহেশবাণীর, যেখানে মনায়িনী বা ভক্তের বদলে মহেশ (শিব) নিজেই কথা বলবেন, এমনটা দেখানো হয়েছে।

জীবন ঝা, গঙ্গানাথ ঝা, তুলপতি সিংহ, শ্রীকৃষ্ণ ঠাকুর, ললিতেশ্বর সিংহ, একরদেশ্বরসিংহ, দুর্গাদত্তসিংহ এবং দীনবন্ধু— সবাই 'গোসাউনিক গীত' রচনা করেছিলেন। এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পঙক্তিগুলি গঙ্গানাথ ঝা-এরই লেখা। নানান উৎসবে গাওয়া যায় এমন বহু গান উনি লিখেছিলেন— যার মধ্যে কিছু গান নবরাত্রের সময়ে দুর্গাপ্রতিমার সামনে গাওয়া হয়। এগুলির মধ্যে বেশিরভাগই হলো একজন ঈশ্বর-চিত্ত সাধকের সাধারণ প্রার্থনা। এছাড়াও আরো কিছু রচনা আছে যেগুলি দার্শনিকভাবে নিবেদিত আদিশক্তির প্রতি উদ্দিষ্ট গান।

অন্য ধরনের গীতিকবিতা, তিরহুতি, চৌমাস্যা, লগনী, মলার প্রভৃতি লিখে গেছেন চন্দা ঝা, জীবন ঝা, চক্রধর ঝা, গঙ্গানাথ ঝা, বিন্ধ্যনাথ ঝা, সীতারাম ঝা, মনমোহন-দাস, বদ্রীনাথ ঝা, 'কবিশেখর', কালিকুমার দাস 'কুমার', ঋদ্ধিনাথ ঝা, মুকুন্দ ঝা, ছেদী ঝা প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে গঙ্গানাথ ঝা ও বিন্ধ্যনাথ ঝা-এর রচনা গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ তাঁদের কবিতায় প্রয়োজনীয় গাম্ভীর্য ছিল। আমের চাষের পর গাওয়া হয় এমন তাঁদের লেখা 'সমদাউনি', অথবা মেয়েকে বিদায় দেবার সমদাউনি এবং লগনীগুলি প্রাচীনকালে প্রচলিত সমদাউনি ও লগনীগুলির থেকে ছিল খুবই আলাদা। ঋদ্ধিনাথ ঝা প্রেম-গীতের থেকে ভক্তিগীতি লিখেছেন ('লক্ষ্মীবতী- গীতাঞ্জলী', ১৯২৭) অনেক বেশি। 'কুমারের' গানগুলি বেশিরভাগই কোনো না কোনো উৎসব উপলক্ষে গাওয়া যায় এমন। আর মুকুন্দ ঝা-র গুলি বেশির ভাগ বিষ্ণুপদ। মনমোহনদাসের ব্রাহ্মণ ও তিরহুতিগুলি খুবই বিখ্যাত। কিছু কিছু মহিলা কবি—যেমন কালিন্দী দেবী, শ্যামা দেবী, ও জয়ন্তী দেবী অপূর্ব গীতিকবিতা লিখেছেন প্রাচীন বিষয়সমূহ নিয়ে—লোকগীতি ও আধুনিক গীতিকাব্য ছাড়াও— যা অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য।

মুক্তক কাব্য

মুক্তক কাব্যের বহু সংস্কৃত ও হিন্দি সংকলনের মৈথিলী অনুবাদ বেরিয়েছে ছন্দোবদ্ধ

কবিতায়। উদাহরণ:, অচ্যুতানন্দ দত্ত-র 'ভামিনীবিলাস', জীবনাথ ঝা 'বিদ্যাভূষণে'র লেখা 'শৃঙ্গার-তিলক', ছেদী ঝা-র 'আর্যাসপ্তশতী', (সংস্কৃত থেকে) শ্রীবল্লভ ঝা-র করা ভর্তৃহরির রচনা 'নীতিশতক', 'চাণক্যশতক', এবং 'দৃষ্টান্ত শতক' এবং (হিন্দি থেকে) ধনুকধারী দাসের করা 'বিহারী সৎসই'।

ফারসী, উর্দু ও হিন্দি কবিদের মধ্যে প্রচলিত 'সমস্যাপূর্তি' মৈথিলীতে আপন করে নেওয়া এবং এমন রচনার অভ্যাস করা দেখা গেলো এই শতকের প্রথমার্ধে। 'অন্যোক্তি' ও 'অপহ্নুতি' (যাকে মৈথিলীতে বলা হয় 'মুকরী') শুধু হালে এসে বেশি জনপ্রিয় হয়েছে।

মুক্তক ছন্দের প্রথম পর্বের রচয়িতারা হলেন চন্দা ঝা ও জীবন ঝা। এই ক্ষেত্রে খুব শিগ্‌গিরি বিখ্যাত হয়ে গেলেন মৈথিল কবি সীতারাম ঝা। ইনি বহু সংখ্যক মুক্তক রচনা করেছিলেন যা নিজের বিভিন্ন গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন— 'শিক্ষাসুধা', 'লোকলক্ষণ' এবং 'উপদেশাক্ষমালা' প্রভৃতি। এতে সব ধরনের মুক্তক রয়েছে— অন্যোক্তি, লৌকিকোক্তি, অপহ্নুতি, বক্রোক্তি, ব্যাজোক্তি, কটূক্তি ও কাকূক্তি। সম্ভবত ওঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় গানগুলি আছে 'লোকলক্ষণে'। পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে পার্থক্য গড়ে ওঠে ও মানা হয় সেই নানান বৈশিষ্ট্যের ছবির মতো সংক্ষেপসার— যার সবগুলিই খুবই গম্ভীরতাপূর্ণ এবং রসবোধসম্পন্ন। যাগেশ্বর ঝা-র 'আর্যা'-ও মুক্তকের একটা সুন্দর উদাহরণ ছিল যাতে আর্যা ছন্দে সমস্ত আধুনিক সমস্যাবলীর বিষয়ে কিছু না কিছু মন্তব্য করা হচ্ছে।

এই সময়ের মুক্তক কবিতার অন্য উল্লেখযোগ্য হলো এইগুলি : যদুনাথ ঝা 'যদুবরের' ('অন্যোক্তি শতক'), ধনুকধারীলালদাস -এর ('মৈথিলী সপ্তশতীঃ'), উপেন্দ্র ঠাকুর 'মোহন' ('অপহ্নুতিমঞ্জরী') এবং বেদানন্দ ঝা ('রত্নবটুয়া')।

কবিতায় নানা বিষয়ক কৃতি

ছন্দ ও অলংকার নিয়ে কৃতি 'অলংকার দর্পণ' ও 'ছন্দোলংকারমঞ্জুষা'— সীতারাম ঝা-এর এবং 'অলংকৃতিবোধ'— বেদানন্দ ঝা-এর কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। কাশীনাথ ঠাকুর 'কলেশে'র 'মৈথিলী রস কানন' যাতে প্রাচীন সংস্কৃত শৈলীতে কবিতার যোগ্য নয় এমন অনেক বিষয় আছে, যেমন, জ্যোতিষ, ধর্মশাস্ত্র ও চিকিৎসা-শাস্ত্র।

চম্পূ

চম্পূ কবিতার কোনো প্রকারভেদ নয়, বরং এটি গদ্য ও পদ্যের একটি বিশিষ্ট সংমিশ্রণ। নবজাগরণে নিবিষ্ট-প্রাণ কবিরা এই বিধারও ব্যবহার করেছেন। ঋদ্ধিনাথ ঝা নিজের চম্পূ 'বিশ্বেশ্বর চম্পূ' (১৯৪৬) গ্রন্থে রাজাবাহাদুর বিশ্বেশ্বর সিংহের 'কোবর যাত্রা' অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিয়েছেন।

সিদ্ধান্ত

পরম্পরাগত কবিতার পুনরুজ্জীবন-প্রয়াসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো দীর্ঘ কবিতার রচনা। পুরনো ধরনের গীতিকবিতাগুলি খুব শিগ্‌গিরি তাদের জনপ্রিয়তা হারাচ্ছিল এবং এই শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ কবিরা সাধারণভাবে খুব ইতস্তত ভাব দেখিয়েছেন এমন সব কাব্য ধারাকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে।

(খ) নতুন কাব্য রীতি ও নতুন বিষয়সমূহ

দেশাত্মবোধক কবিতা

নতুন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তার প্রভাবে একদল নতুন কবি এমন সব কবিতা লেখা শুরু করেছেন যা মিথিলার মানুষকে স্বদেশের প্রতি প্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়ায় সাহায্য করেছে। তাঁরা একথা বুঝতে পারলেন যে কবিতা শুধুমাত্র এইজন্য লেখা হতে পারে না যে তা দিয়ে কাউকে খুশি করা যাবে— কবিতাকে শিক্ষাও হতে হবে। 'মৈথিলী গীতাঞ্জলী'র দুটি উল্লেখযোগ্য সংকলন— যা যদুনাথ ঝা 'যদুবর' সম্পাদনা করেছেন এবং শ্যামানন্দ ঝা-র 'মৈথিলী সন্দেশ'— এইসবই ছেপে বেরিয়েছে ১৯২০ নাগাদ, যাতে এই নতুন ধরনের কবিতার আত্মা জন্ম নিলো। 'মৈথিলীর গীতাঞ্জলী'র মুখবন্ধে যদুনাথ ঝা 'যদুবর' ঘোষণা করেছিলেন ঠিক এই কথাই।

এই দ্বিতীয় সংকলনের সম্পাদক এও বলেন যে দেশাত্মবোধক কবিতাগুলি হয়তো কাব্যিক সৌন্দর্যের দৃষ্টিতে দেখলে খুব উচ্চমানের হবে না, কিন্তু এগুলিকে বিচার করতে হবে জনতাকে কতটা উজ্জীবিত করতে পারলো তার নিরিখে।

অবশ্য গদ্যের মতো পদ্যের বেলাতেও এদের চিন্তা ছিল একই রকম— মিথিলার সহজতম ও সবচেয়ে নিশ্চিতরূপে প্রগতির উপায় হলো এখানকার ভাষিক উন্নতি।

দেশপ্রেম থেকে নানান ধরনের অনুভূতিগুলির জন্ম হলো— 'মিথিলা বন্দনা', 'স্বদেশপ্রেম তথা স্মৃতি', 'মৈথিলী (মাতৃভাষা) বন্দনা', 'মিথিলার লক্ষণ বৈচিত্র্য', 'মিথিলার পূর্ব গৌরব ও বর্তমান দুরাবস্থা', 'দেশোদ্ধারের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা', 'মিথিলাবাসীদের প্রতি উপালম্ভ ', 'মিথিলা-ক্রন্দন', 'উদ্বোধন, সাবধানবাণী, উপদেশ, উপরাগ', 'ধিক্কার', 'ধন্যবাদ', 'অনুতাপ', এবং 'সান্ত্বনা'। এর মধ্যে দিয়ে বোঝা যাবে যে কেমন অসামান্য উৎসাহে বিশাল সংখ্যক কবির হৃদয় হয়েছিল পরিপূরিত এই শতকেই।

একথা সত্যি যে কাব্যিক উৎকর্ষের দিক থেকে কুব কম দেশাত্মবোধক কবিতাই আলোচনার যোগ্য। এই কবিতাগুলি শুধু মাত্র এক আদর্শ মিথিলাকে ভবিষ্যতে গড়ে তোলার কথা বলে, ঠিক যেমনটা ছিল অতীতের গৌরবময় পর্যায়ে।

যে কবিরা পুরনো পত্র-পত্রিকায় এবং এইসব সংকলনে দেশাত্মবোধক কবিতা লিখে স্থান পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কিছু কিছু ভালো কবিও আছেন; যেমন, ভানুনাথ ঝা,

চন্দা ঝা, জীবন ঝা, ত্রিলোচন ঝা, গোনৌড়া ঝা, পদ্মনাভ ঝা, কেদারনাথ ঝা, মায়াপ্রসাদ মিশ্র, তারাচরণ ঝা, পুলকিতলালদাস 'মধুর', হীরালাল ঝা 'হেম', ছেদী ঝা, রামচন্দ্র মিশ্র, রঘুনন্দন দাস, কুশেশ্বর কুমার, সীতারাম ঝা এবং আরো অনেকে। তিরিশের দশকেও এই উৎসাহ সংক্রমিত হয়েছিল, বিশেষ করে আনন্দ ঝা, কাঞ্চীনাথ ঝা, কাশীকান্ত মিশ্র 'মধুপ', বৈদ্যনাথ মিশ্র 'বৈদেহ' (পরে যিনি 'যাত্রী' নামে প্রখ্যাত হন) এবং শ্যামানন্দ ঝা-র মতো কবিদের মধ্যে।

প্রকৃতপক্ষে ১৯০৬-১৯৩৫-এর মধ্যে মৈথিল কবি বা পদ্যকারদের প্রথম প্রথম ইচ্ছা অনিবার্যভাবে হতো দেশপ্রেম বিষয়ে কবিতা-রচনা করার। গদ্যেও মৈথিল মহাসভার আদর্শের ছাপ এ যুগে পাওয়া যাচ্ছে। বুদ্ধিনাথ ঝা-র 'মৈথিলোত্তেজনা-পারাবার' এবং গঙ্গাধর মিশ্রের 'মিথিলার বিলাপ', ছেদী ঝা-র 'মৈথিলী গীত কুসুমাঞ্জলী' এবং 'বন্দী জীবন' এবং আরো অনেক কবিতায় যুবশক্তিকে উত্থানের ডাক দিলো— যেমন ভুবনেশ্বর সিংহ 'ভুবনের', 'যুগবাণী', 'যুবক' ও 'উদ্বোধন' এবং ভোলালালদাসের 'যুবক-সঁ' — এবং এছাড়াও সীতারাম ঝা-র উপদেশমূলক কবিতা ('শিক্ষাসুধা'), কুশেশ্বর কুমার ('স্ত্রীকর্তব্য' ১৯২৪ এবং 'শিক্ষাসোপান' ১৯৩৬), জনার্দন ঝা 'জনসীদনের' 'নীতিনিবন্ধ' ও সীতারাম ঝা-র ব্যঙ্গাত্মক কবিতাগুলি (যেমন 'পঢুয়াচরিত' — 'পূর্বাপর ব্যবহার', ১৯২০/৩৪) — এসবই এই ভাবনার থেকে প্রত্যক্ষভাবে বেরিয়ে এসেছিল।

এই উৎসাহ আজও কাঞ্চীনাথ ঝা 'কিরণ' ও রাঘবাচার্য শাস্ত্রীর কবিতায় বজায় আছে সংঘাত, পরাজয় ও হতাশার মধ্যে দিয়েও যা উজ্জ্বল হয়ে আছে।

'কিরণ' (১৯০৭ জাত) সেইসব হতভাগ্যদের হয়ে কলম ধরেন যাঁরা নিম্নবর্গের মানুষ, সম্পদহীন অথচ নতুন মানুষ — তাঁর লেখা 'মাটির মহাদেব' সম্ভবত আধুনিক মানুষের প্রাচীন মূল্যবোধ ও প্রতীক নিয়ে অসন্তোষের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। এভাবেই রাঘবাচার্য শাস্ত্রী (১৯১৭-তে জন্ম)— যিনি সমান রূপে গম্ভীর ও চিন্তাশীল, নিজের কলমের জোরে মিথিলার প্রান্ত ও তার মানুষদের স্বীকৃতির লড়াইয়ে সঙ্গ দিলেন এবং এভাবে মিথিলার ভাষা ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের কাজে সহায়ক হলেন। তাঁর অনুপ্রেরণামূলক গানগুলিকে বলা হয় লক্ষ লক্ষ মানুষের কণ্ঠস্বর বিশেষ। তিনি মৈথিলীর জন্য সংগ্রামরত সেইসব মানুষের সঙ্গে নিজের কবিতাকে জুড়েছেন যারা মিথিলা ও মৈথিলীর শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধে রয়েছে রত। ওঁর গ্রন্থ 'ক্রান্তি গীত' (১৯৩০), 'জ্বালামুখী' (১৯৩৬) এবং সর্বোপরি 'মধুকণ' (১৯৪৯)— প্রভৃতিতে যেসব গান ছিল সেগুলিই সম্ভবত মৈথিলীর আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ব্যবহৃত হয়েছিল। তাই এগুলিকে বিস্মরণের কোনো উপায় নেই।

চীনা আক্রমণের সময়ে আবার এই দেশাত্মবোধক উৎসাহ অন্যখাতে বইলো ভারতীয়তার সপক্ষে। এই ধরনের কবিতার একটি সংকলন ছেপে বের করেছেন বেদেহী সমিতি (১৯৬৫), নাম 'বিজয় শঙ্খ'।

একইভাবে বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের (১৯৭১) মৈথিলী কবিদের সময় কবিতায়

তাঁদের দেশাত্মবোধক চেতনার পূর্ণপ্রকাশ লক্ষ করা যায়; যা মৈথিলী ভাষা-ভাষী মানুষদের প্রবলভাবে উৎসাহিত করে— তাঁদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপালে মৈথিলী আন্দোলনের শরিক হতে।

আধুনিক গীতিকবিতা

নতুন প্রভাব সবচেয়ে বেশি কার্যকর হয়েছিলো যাকে বলা যায় আধুনিক মৈথিলী গীতিকবিতা— তার ক্ষেত্রে। আদি এবং মধ্যযুগের মৈথিলী গীতিকবিতার সঙ্গে অবশ্যই সংযোগ ছিল সঙ্গীতের। সমস্ত গীতিকবিই সঙ্গীতে পারদর্শী হবেন এমন ধরে নেওয়া হত। সব গীতিকবিতাই কোনো রাগ বা রাগিণীতে নিবদ্ধ হত। আধুনিক মৈথিলী গীতিকবিতা অবশ্য ইংরেজি এবং আধুনিক হিন্দি ও বাংলা গীতিকবিতার প্রভাবে এই বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পেরেছে। একটি গীতিকবিতা বিশেষ কোনো রাগ বা রাগিণীতে নিবদ্ধ করে গাওয়ার আর কোনো প্রয়োজন নেই। এমন নয় যে নতুন এই গীতিকবিতা সাঙ্গীতিক গুণ বর্জিত; এরও নিজস্ব সঙ্গীত আছে তবে তা সঙ্গীতের রীতি-নীতি দ্বারা আবদ্ধ নয়। নতুন গীতিকবিতা শুধু গীত হওয়া এবং সেভাবে উপভোগের জন্য নয়; এগুলি পাঠযোগ্য এবং কাব্য হিসাবে আবৃত্তিরও উপযোগী।

এই নতুন ধারণা প্রথম সম্পূর্ণভাবে চিনতে পেরেছিলেন ভুবনেশ্বর সিংহ 'ভুবন' এবং তাঁর কবিতাসঙ্কলন 'আষাঢ়'-এর এবং বিখ্যাত ভূমিকায় ১৯৩৬ সালে তিনি একে লোকসমক্ষে আনেন।

যে কবি প্রথম এই সত্য অনুভব করেন এবং পরিবর্তন আনেন তিনি ১৯৩০-এ আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। কালীকুমারদাস (সঙ্কলন 'কাজ-কুসুমাঞ্জলী', ১৯৩০), জয়নারায়ণ মল্লিক, কাঞ্চীনাথ ঝা 'কিরণ', লক্ষ্মীপতিসিংহ, ভুবনেশ্বর সিংহ 'ভুবন' ('আযাঢ়' ১৯৩৬ এবং 'স্মৃতিকণা' ১৯৪৪), জীবনাথ ঝা 'বিদ্যাভূষণ' ('কল্পনা'১৯৪৯), কাশীকান্ত মিশ্র 'মধুপ' (সঙ্কলন 'অপূর্ব রসগুল্লা' ১৯৪০-৪১, 'ঝঙ্কার' ১৯৪২, 'তটকা-জিলেবী', ১৯৪২/৪৩ এবং 'শতদল' ১৯৪৫), বল্লভ ঝা, কাশীনাথ ঝা, মহাবীর ঝা 'বীর', শ্যামানন্দ ঝা, বৈদ্যনাথ মিশ্র, 'যাত্রী' ('চিত্রা' ১৯৪৭ এবং 'পত্রহীন নগ্না-গাছ'), ঈশানাথ ঝা ('মালা' ১৯৪৫), তারানাথ ঝা, সুরেন্দ্র ঝা, 'সুমন' (সঙ্কলন 'প্রতিপদা', 'সাওন ভাদব' 'অর্চনা' ১৯৫০, 'পয়স্বিনী' ১৯৬৯), উপেন্দ্র ঠাকুর 'মোহন' ('ফুলডালি', ১৯৪০), দেবানন্দ ঝা, আর্শীপ্রসাদ সিংহ ('মাটিক দীপ, ১৯৫৭), কাশীনাথ ঠাকুর 'কলেশ' রাঘবাচার্য শাস্ত্রী ('বন-কুসুম' এবং 'জ্বালামুখী') এবং অন্যান্যরা সাফল্যের সঙ্গে এই নতুন ধারায় গীতি-কাব্য রচনা করেন।

ভুবনেশ্বব সিংহ 'ভুবন' (১৯০৮-৪৪), এই নতুন ধারার প্রথম উল্লেখযোগ্য গীতিকবি। তাঁর বিষয় পুরনো (যেমন, 'অভিসার') এবং নতুন (সম্পূর্ণ কবিতাগুচ্ছ 'ভুবন-ভারতী' ১৯৫৮ দ্রষ্টব্য) দুইই। তাঁর শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতাগুলি অবশ্য সেগুলি যেখানে তাঁর ব্যক্তিগত

অনুভূতির প্রকাশ; সেগুলি নয় যেগুলি প্রচলিত রীতি অনুযায়ী 'কাব্যিক' বিষয়।

শ্রীবল্লভ ঝা-র (১৯০৫-৪০) কবিতাগুলি সংস্কৃতের রীতি দ্বারা প্রভাবিত (দ্র. তাঁর 'চন্দ্রালোক'-এর উপর কবিতা)। জীবনাথ ঝা-ও (জন্ম ১৯১০) একই প্রভাবে প্রভাবন্বিত (দ্র. তাঁর কবিতা 'উপালম্ভ' সমুদ্রের প্রতি), তবে তিনি যুগের সমস্যা বিষয়েও সচেতন (দ্র. কবিতা 'বিধি-বিধনা')। মহাবীর ঝা 'বীর'-ও (১৮৯৭-১৯৪৫) প্রচলিত বিষয় নিয়েই লেখেন; তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা অবশ্য হংস-গীত।

যে সব কবি সংস্কৃত দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন এবং সুন্দর আধুনিক গীতিকবিতা রচনা করেন, তাঁদের মধ্যে সুরেন্দ্র ঝা 'সুমন' (জন্ম ১৯১০) বিশেষ স্থানের অধিকারী। তিনি বহু কবিতা রচনা করলেও তাঁর উল্লেখযোগ্য সঙ্কলন হল 'অর্চনা', 'প্রতিপদা' এবং 'পয়স্বিনী'। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর শুদ্ধ এবং সৌষ্ঠবগুণপূর্ণ রচনাশৈলীর কারণে যার অর্থের নানা সূক্ষ্ম দিক এবং নিজস্ব বৈচিত্র্য একমাত্র শিক্ষিত কানেই ধরা পড়বে। একজন সাধারণ পাঠক হয়তো তাঁর কবিতা পড়ে আপাতভাবে আনন্দিত হবেন, বেতার কবিতার পূর্ণ রসগ্রহণ একমাত্র সুশিক্ষিত পাঠকের পক্ষেই সম্ভব। যেমন তার গঙ্গাগাথা যা সম্ভবত এমন কথা ব্যক্ত করতে সমর্থ হয়েছিল যা এপর্যন্ত পণ্ডিতজনেরাও কেউ ভাবেন নি অথবা যে অসাধারণ ভঙ্গিতে তিনি বর্ষার সমস্ত রস বর্ণনা করেন যা আবার তিনটি ভিন্ন কবিতায় একজন মহান শহীদ, একজন আবেগতাড়িত রমণী এবং একটি কবিতা এই তিনভাবে দেখানো হয়েছে। তেমনি একটি পর্বতকে এক বৃদ্ধ, যুবক ও বালক হিসেবে কল্পনা বা একটি গাছকে তপস্বী হিসেবে দেখানো তাঁর অসাধারণ কবিত্বশক্তির নজির। তাঁর সংস্কৃত শব্দবন্ধ, পরিমিত ছন্দ এবং অলঙ্কার প্রয়োগশৈলী তাঁকে কখনোই সাধারণ পাঠকের কাছে স্মরণীয় করে তুলবে না, কিন্তু যাঁরা মিথিলার ভাবনা এবং সংস্কৃতিকে ভালোবাসেন যাতে ঘটেছে তাঁর কবিতার অবগাহন স্নান এবং যাঁরা ভালো কবিতা পড়তে এবং তা নিয়ে ভাবতে ভালোবাসেন— তাঁদের কাছে তাঁর কবিতা উপভোগ্য এবং চিরন্তন আবেদনময়।

ঈশানাথ ঝা (১৯০৭-৬৫) সম্ভবত তাঁর প্রজন্মের সবচেয়ে বেশি প্রতিভাশালী লেখক, যিনি প্রচলিত এবং নতুন ধারার কাব্য রচনার মেলবন্ধন ঘটান। তাঁর পরিবারে বহু প্রজন্ম ধরে কবিতা লেখার চর্চা ছিল : সরস কবি কুলপতি এবং জিরাবন ঝা নিধি ছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষ। মিথিলার সঙ্গীতের প্রাচীন ঐতিহ্যের তিনি চর্চা করেন এবং তার আত্মীকরণ করেন (দ্র. তাঁর কবিতা 'পরিচয়')। তিনি তাঁর সমস্তরকম সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার গীতিকাব্য রচনার কাজে ব্যবহার করেন। 'মালা'র কবিতাগুচ্ছে ইংরেজি কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্যটুকুও নেই। এগুলি সৌন্দর্য এবং শ্রেয়স্করতার ধারণা নিয়ে লেখা। কামময় প্রেমের স্থান সেখানে সুলভ নয়। কবি প্রকৃতির গান গাইতে ভালোবাসেন— বসন্ত, শরৎ, কোকিল, মেঘ এবং সকালের গান; এবং 'স্বপ্ন'-তে তিনি বর্ণনা করেন কিভাবে তিনি তাঁর স্বপ্ন থেকে পাওয়া অনুপ্রেরণার অপেক্ষায় থাকেন। তাঁর কোনো

কোনো কবিতার বিষয় নিপীড়িত মানুষের শোষণ এবং সমস্যা; কিন্তু এই কবি বাস্তবধর্মী কবিতার চেয়ে কল্পনাধর্মী কবিতায় (যেমন 'গায়ক-সঁ' এবং 'পথ-ধূলি'), দেশাত্মবোধক গানে (যেমন 'হম মৈথিলী ছী') এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থীয় কবিতায় (যেমন, 'অমর শিশু', 'কোকিল', প্রকৃতির কবিতা', 'কৃষক-কন্যা') অনেক বেশি সফল। তাঁর শব্দবন্ধ সংস্কৃত ঘেঁষা কিন্তু শ্রুতিমধুর। কবিতার পঙ্‌ক্তিতে ছোটখাটো পরিবর্তন এনে তিনি তার দুর্বোধ্যতা ঘুচিয়ে তাকে পাঠকের বোধগম্য করে তোলেন। প্রথম দিকের কবিতায় এই কবির ভাবনায় অপরিণত মনের ছাপ থাকলেও তিনি তা কাটিয়ে ওঠেন।

কাশীকান্ত মিশ্র 'মধুপ' (১৯০৭—) এক সুপরিণত কবি। তাঁর প্রথম দিকের রচনায় মুখ্যত কামভাব থাকলেও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের ছাপ তাতে ছিল। 'ঝাঙ্কার'-এ তাঁর ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। কবিতাগুলি নানা ধরনের বিষয় নিয়ে লেখা। কবিদের কামময় বিষয় ছেড়ে মিলটন, মাৎসিনি, রুশো, ভলতেয়ারের মতো করে লিখতে বলা হয়েছে; বলা হয়েছে বিপ্লবের সাহিত্য রচনা করতে। এই সঙ্কলনের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি যদিও 'তারা' এবং 'ওস-কণা' (শিশির') নিয়ে লেখা যেখানে একগুচ্ছ নিজস্বতাময় তুলনা এনে কবি তাঁর বিষয়কে গৌরবান্বিত করেছেন। তাঁর প্রকৃতিপ্রেম অত্যন্ত স্পষ্ট; তিনি এর সঙ্গে নানা বিষয়, সমস্ত রকম ধারণা, তুলনা এবং অনুভূতির সম্পর্ক স্থাপন করেন।

তাঁর পরবর্তী কবিতায় তিনি প্রচলিত ধারণা এবং তুলনা ব্যবহারে অনীহা প্রকাশ করেন। নিজের অভিজ্ঞতাকেই তিনি সোজাসুজি কাজে লাগান। এই প্রবণতা পরিণতি পেয়েছে 'শতদল'-এ। 'পতিত পীক' (পানের পিক), 'ঝাখরোল গাছী' (সেই আমগাছের ঝাড় যাদের ফলগুলি ঝরে পড়েছে), 'বাসি' (বাসি), সারাপরক তুলসী (শ্মশানভূমিতে তুলসীগাছ), 'বাংগ' (না ধোনা তুলো), 'দোকা-সী' (ঝিনুকের প্রতি), 'তুমাকুসঁ' (তামাকের প্রতি), 'হিলল দঁত' (নড়বড়ে দাঁত), 'ছুতহর' (দূষিত বাসন) এবং 'ভসিয়াতি মালা' (ভাসমান মালা) প্রভৃতি বিষয় থেকে বোঝা যায় যে তিনি নিচুতলার প্রতি সহানুভূতিশীল। তবে তাঁর কবিতার প্রথম খণ্ড 'ঝাঙ্কার' এই খণ্ডের চেয়ে কল্পনা এবং অনুভূতির গভীরতায় অনেক উঁচুদরের।

সম্প্রতি 'মধুপ' দীর্ঘ দুঃখের কবিতা লিখেছেন যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল 'ঘসল অঠন্নী' (ঘষা আট আনা)। এর উদ্দেশ্য দরিদ্র এক শ্রমিক এবং তার সন্তানের জীবনান্ত বর্ণনা করা। তার মালিক তাকে একটা ঘষা আট আনা পয়সা দেন, গ্রামের দোকানদার নিতে আপত্তি জানায় এবং সেই পয়সাটি সে বদল করেও নেয় না। ঘটনাটি খুবই সামান্য এবং হয়তো কিছুটা অতিরঞ্জন দোষেও দুষ্ট; কিন্তু কবি এ থেকেই একটি চমৎকার কবিতা তৈরি করেছেন।

মধুপের দুর্বলতা হল তাঁর অত্যধিক অলঙ্করণ; কখনো কখনো সেখানে আছে বাক্যালঙ্কার, বিশেষ করে 'যমক' এবং 'বক্রোক্তি'র একঘেয়ে ব্যবহার। তাঁর নিজস্বতা তাই কখনো কখনো কৃত্রিমতা এবং মুদ্রাদোষে ম্লান। তাঁর বিস্তারিত বিবরণ এবং ছন্দ ও

শব্দের ধ্বনিনির্ভর বিন্যাস তার গম্ভীর কবিতাকে সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় হতে দেয়নি। অবশ্য তাঁর গীতিকবিতা, যেমন 'ঝাঙ্কার' ও 'শতদল'-এর কবিতাগুচ্ছ, বিশেষ করে তাঁর কামময় কবিতা তাঁর দীর্ঘ এবং মুখ্য কবিতার চেয়ে বেশি স্মরণযোগ্য এবং জনপ্রিয়।

অর্শীপ্রসাদসিংহ (১৯১১—), যিনি বর্তমানে হিন্দির একজন পরিণত কবি, মৈথিলীতে রচনা শুরু করেন অনেক পরে, তবে এখন তাঁর ক্ষমতা এতটাই পরিণতি পেয়েছে যে যা তিনি স্পর্শ করেন তাই যেন সোনা হয়ে ওঠে। তিনি মৈথিলীতে দুটি ছোট ছোট কাব্য প্রকাশ করেছেন— 'মাটিক দীপ' (১৯৫৮) এবং 'পূজাক ফূল' (১৯৬৯)। তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা সেটি যেখানে তিনি বলছেন সময় এসেছে মৈথিলীর বিরুদ্ধশক্তির সঙ্গে লড়াই-এ শঙ্খনিনাদের। অবশ্য তিনি সাধারণ মানুষের পক্ষে কৌতূহলজনক অনেক বিষয়েও সৌষ্ঠবপূর্ণ পরিণত গীতিকবিতা রচনা করেছেন।

উপেন্দ্র ঠাকুর 'মোহন' (১৯১৩—) মূলত গীতিকবিতারই রচয়িতা। উনি ভালোভাবেই জানেন যে আমাদের মধুরতম গানগুলিই আমাদের চরমতম দুঃখের কথা বলে। তবে ওঁর দুঃখবোধ খুব একটা গভীর কিছু নয়, এবং ইদানীংকালে উনি প্রায় লেখা ছেড়েই দিয়েছিলেন। ইনি নিজের গানের একটা চটি বই প্রকাশ করেছিলেন যার নাম ছিল 'ফুলডালি'। এ থেকে কবির প্রতিভার আর একটি দিকের সন্ধান পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে দেখা যাচ্ছে উনি শৃঙ্গাররসাত্মক গানের জনপ্রিয় গায়ক। কিছু কিছু গানে উনি সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। একজন রুজি রোজগেরে মানুষের জীবন উনি কবিতার মাধ্যমে নিয়ে এলেন আমাদের সামনে— আবার যারা নিজেদের সময় ও শান্তি নষ্ট করে আলস্য করে তাদের জন্যও।

নতুন ধরনের কবিতার ঐতিহ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রচয়িতা বৈদ্যনাথ মিশ্র 'যাত্রী' (১৯১০—)। প্রথম জীবনে উনি অভিজ্ঞ কবি সীতারাম ঝা-এর প্রশিক্ষণে ছিলেন। কিছুদিনের জন্য উনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং তা সত্ত্বেও মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির প্রতি ওঁর প্রেম ছিল অবিচল। প্রকৃতপক্ষে যে গীতিকাব্য ওঁকে বিখ্যাত করে তুললো তা ছিল মাতৃভাষার সংস্কৃতি মিথিলার সংস্কৃতি নিয়ে লেখা।

উনি পারদর্শী ছিলেন কবিতার পঙক্তিগুলিকে— যে পরিবেশের জন্যই হোক না কেন— যোগ্য করে তোলা। ভাষার ওপর ও স্বাভাবিক বাগ্‌ধারার ওপর তাঁর দখল এমনই ছিল যে সে বিষয়ে কিছু বলার নেই। প্রথম জীবনে উনি দুটি অপূর্ব কবিতা রচনা করেছিলেন— 'বূঢ় বর' (বুড়ো বর) যেখানে বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ বিষয়ে ছিল তীব্র ব্যঙ্গ এবং 'বিলাপ'— যা ছিল একটা নাটকীয় স্বগতোক্তি যার মধ্যে দিয়ে একটি বাল-বিধবার দুঃখবেদনা ভাষা পায়। কবি সংস্কৃতনিষ্ঠ শব্দাবলী ব্যবহার করেন না বরং চলতি ভাষাকে কাব্যের স্তরে নিয়ে যান। এই কবিতাগুলিতে যে বাগ্‌বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন আসে, তার সৌন্দর্যও অপূর্ব। উদ্ভাবক ভাবনা, শ্লেষপূর্ণ ও ব্যঞ্জনাময় শৈলী, কথ্য ভাষার প্রয়োগ,

অতুলনীয় গতি ও লয় এবং যথাযথ বিশ্লেষণী বক্তব্য— এ সবই হল তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য।

তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি তখনই লেখা হল যখন তিনি আশ্রয় নিলেন 'মুক্তক ছন্দ'-এর। সে সময়ের কোশি নদীর বন্যায় মৃত ও ঘরছাড়া মানুষদের নিয়ে লিখলেন— 'কোশিকী-ক-ধার-মে', লিখলেন জনৈক দরিদ্র নিঃস্ব ঘুঁটে কুড়ানি মেয়ের কথা ('গোঠ-বিছনী'), আবার কোনো একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের অনুভূতির চূড়ান্ত প্রকাশও ঘটল তাঁর কবিতায়— যাকে তার ঘর ছেড়ে পরিবার ছেড়ে থাকতে হয় বহু দূরে ('গামক চিট্‌ঠী'), এ ছাড়াও তাঁর কবিতায় ছিল প্রাচীন ও নতুনের সংঘাত ('দ্বন্দ্ব')।

এই কবিতাগুলিতে উনি তিক্ত, নরম সমবেদনাশীল ও ব্যঙ্গাত্মক ছিলেন। যখনই নতুন পদ্যশৈলী গড়ে তোলা হতো ওঁর কবিতার যে-কোনো পঙক্তি থেকেই মৈথিলীর পাঠকেরা বুঝতে পারতেন এই আকরণে ভালো কবিতা কিভাবে লেখা হবে। তাঁর প্রতীক, চিন্তা, অনুভূতি এবং কল্পনা— সবই তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার থেকে উঠে আসে কবিতায়। গোপনে যে ফল্গু বয়ে যায় তাঁর কবিতায় সংগীতের মূর্ছনার, তার সমান সৌন্দর্য হলো তাঁর বিষয়বস্তু ও সেগুলির বিষয়ে তাঁর বাস্তববোধ। যদিও কবিতার ভাষা খুবই সহজ কথাবার্তার থেকে নেওয়া ও তাঁর বাচন-ভঙ্গি খুবই উন্নত মানের যার রসগ্রহণ সাধারণের ওপরের স্তরের মানুষের পক্ষেই সম্ভব। উনি নিজের কবি-প্রতিভার পরিচয় জাতীয় ভাষাতেও 'নাগার্জুন' এই ছদ্মনামে রেখেছেন কিন্তু মাতৃভাষায় ওঁর অবদান নিঃসন্দেহে আরো অনেক বেশি। ওঁর প্রথম সংকলন 'চিত্রা'র (১৯৪৯) চেয়েও অনেক বেশি সফল হয়েছে ওঁর পরবর্তী গ্রন্থ 'পত্রহীন নগ্ন গাছ' (১৯৬৭)। এই সংকলনের যে শ্রেষ্ঠ কবিতা— 'আন্‌হর জিন্‌গী' (অন্ধ জীবন) সম্ভবত আধুনিক মৈথিলীর শ্রেষ্ঠতম কবিতা। কবি বারংবার নিজেকে সাম্যবাদী বলে ঘোষণা করেছেন কাব্যগ্রন্থগুলিতে কিন্তু উনি নিশ্চিতভাবে নানান মতের ও পথের মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছেন— বিশেষ করে নতুন যুগের তরুণ প্রজন্মের কবিদের ওপর। তবে ওঁর প্রথম পর্বের প্রশিক্ষণের প্রশংসায় একথা বলতে হবে যে তাঁর সহজ শব্দগুলি কখনোই চিন্তহীনভাবে চয়ন করা হয়নি— যার ফলে ওঁর অভিজাত এবং সম্ভ্রমপূর্ণ ভাষা কখনোই নষ্ট হয়ে যায় নি। তাঁর বাস্তব জীবনের কথ্যভাষার প্রভাবে; তাঁর ছন্দ কখনোই মুক্তকের চয়নে বিনষ্ট হয়ে যায় নি। এখানে দেখতে পাচ্ছি একজন কবিকে যিনি নিজের যা কিছু করণীয় সে বিষয়ে কুশলী, যাঁর ধ্যান-ধারণা প্রগতিশীল, যুগানুকূল— এবং যিনি সেসব থেকে সরে এসে সস্তা আধুনিকতার দিকে এগোন না।

তন্ত্রনাথ ঝা-র (১৯০৯—) লিরিক কবিতা তাঁর কাব্য সংকলন 'নমস্যা' (১৯৬৮) এবং 'মঙ্গল পঞ্চাশিকা'তে (১৯৭৪) প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে মাইকেল মধুসূদনের দুটি সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা— 'আশ্বিন' এবং নূতন 'বৎসর' এবং একটি হাস্যরসাত্মক সাহিত্যিক গাথাকবিতা 'মুসলী ঝা'— যা ছিল ছোট্ট একটি মজার কবিতা— সরল,

সোজাসুজি এবং রসালো। তন্ত্রনাথ ঝা-র গীতিকবিতার গুরুত্ব এখানে যে উনি অনেক নতুন পদ্যছন্দ উপহার দিয়েছেন। নিজের পরম্পরাগত কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে উনি 'মুক্তক' এই ছদ্মনাম ব্যবহার করেন।

এঁদের থেকে তরুণতর প্রজন্মের কবিদের মধ্যে বুদ্ধিধারী সিংহ 'রমাকর' (১৯১৯—) (যাঁর সংকলনগুলি হলো 'আবেশ', 'অমর বাপু' ১৯৪৯ এবং 'মধুমতি' ১৯৫৮) খুব চিন্তাশীল গম্ভীর কবি। ইতিমধ্যে বহু প্রাচীন কবিকে নিজের অভিজাত রচনা ভঙ্গি এবং বিরল সমিতির জন্য গোবিন্দ ঝা পেছনে ফেলে বহুদূর এগিয়ে গেছেন। চন্দ্রনাথ মিশ্র অমর ইতিমধ্যেই নিজেকে ব্যঙ্গ কবিতার সফল লেখক-রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যদিও সনাতনপন্থী কবিতা-রচনাতেও দক্ষ (দ্র. 'ঋতুপ্রিয়া' ১৯৬৩, 'আশা-দিশা' এবং 'উল্টা পালি'— যার আগের নাম ছিল 'যুগচক্র') ছিলেন। রূপনারায়ণ ঝা 'রাকেশ'-এর (প্রাচীন কবি সীতারাম ঝা-এর পুত্র) ক্ষমতা ছিল অসীম— বিশেষ করে রসের কোনো পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে— কিন্তু ক্ষমতার অনুরূপ রচনা উনি করতে পারেন নি। উপেন্দ্রনাথ ঝা 'ব্যাস'-এর কল্পনা অত্যন্ত উর্বর এবং উনি লেখেনও একটা সম্ভ্রান্ত শৈলীতে যেমন করেছেন 'বিদ্যাপতিক অবসান' অথবা 'মানভূমি' গ্রন্থে। ('গীতা' এবং ওমর খৈয়ামের 'রুবাইয়তে'র ওঁর অনুবাদ অবশ্য ওঁর মূল কবিতার চেয়ে বেশি সফল কবিতা হয়ে দাঁড়ায়)। কুলানন্দ ঝা 'কুলেশ' (সংকলন 'দিনমণি'), চন্দ্রভানুসিংহ এবং রাধাকৃষ্ণ ঝা 'বহেড়া' হলেন চল্লিশ পঞ্চাশের দশকের অন্য প্রমুখ কবি।

১৯৫০ থেকে ১৯৬০-এর মধ্যে মৈথিলী কবিতায় যেন একটা ক্রমাগত সংযোজন হতে থাকলো নতুন শক্তিমান কবিদের এবং দেখা গেল প্রচুর ভালো কবি কাব্য-রচনায় অভিনিবেশ করেছেন এবং গীতিকবিতা হয়ে দাঁড়িয়েছে সবচেয়ে সৃষ্টিশীল রচনা-মাধ্যম এবং এই কবিরা যেন একটা সৌরমণ্ডল তৈরি করেছেন নিজেদের প্রতিভার আলোকে। শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র (১৯১৮—) প্রকাশিত করেন কবিতার দুটি সংকলন— 'মেরুপ্রভা' ও 'অগ্রদূত' । ইনি মূলত মুক্তছন্দে কবিতা লিখেছেন এবং প্রথম সংকলনটিতে কিছু মহান কবিতার উদাহরণ রয়েছে, যেমন 'মেরুপ্রভা' (ইংরেজিতে auoroa boreolis) এবং পরের সংকলনটি তরুণ পাঠকদের জন্য। সুধাংশু শেখর চৌধুরী (১৯২২ -) এবং 'বিনু' (১৯৩৯-৫৫) এঁরই অনুসারী ছিলেন— বিশেষ করে পরবর্তী জন নিজের কবিতা 'ইত্যলম্'-এ (যার অর্থ 'এই যথেষ্ট')। রামচরিত্র পাণ্ডেয় 'অণু' (১৯১৯ -) নিজের কবিতা 'নক্ষত্র' (১৯৫৬) নামের একটি সংকলনে প্রকাশিত করেন। ওঁর গীত যেন সমস্ত রকমের অনুভূতিকে করেছিল নিজের সাম্রাজ্য এবং এই নতুন শৈলী ওঁকে তো মানাতোই— প্রাচীন কবিতাকেও মানাতো। দুর্গানাথ ঝা শ্রীশ (১৯২৯—) খুব সুন্দর করে একটা পৌরাণিক কথা বলেছেন 'মহামৎস্য ও মনু'-তে (১৯৬১)। জগদীশ নারায়ণ দীপক (১৯২৮—) নিজের সংকলন 'আরতী'-তে (১৯৫৯) নিজের নরম এবং বেদনাময় অনুভূতিকে ভাষা দিয়েছেন। ব্রজকিশোর বর্মা 'মণিপদ্ম' এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লোকশৈলী

এবং লোকছন্দকে নিজেদের সিরিয়াস কবিতার গঠনে করেছেন ব্যবহার। রবীন্দ্রের বেশ কিছু কবিতা সংকলনও প্রকাশিত হয়েছে— 'জহিনা ছী তহিনা' এবং 'চিত্র-বিচিত্র' এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক জয়মন্ত মিশ্র, প্রভাকর ঝা, মথুরানন্দ চৌধুরী, শৈলেন্দ্রমোহন ঝা, গঙ্গাধর মিশ্র 'জীবূ', আদ্যনাথ ঝা 'নিরঙ্কুশ', ভবনাথ ঝা, শ্রীমন্ত পাঠক, রামদেব ঝা, রামকিশোর ঝা, বিশ্বনাথ ঝা 'বিষপায়ী', আর সর্বোপরি রমানাথ মিশ্র 'মিহির' (সংকলন— 'মাধুরী' ১৯৬৭) অন্যান্য কবিরা যাঁরা মৈথিলীতে গীতিকবিতার বিকাশে নিজেদের অবদানে ভাষাতে সৌম্য ও সজীব শৈলী গড়ে তুলেছেন।

১৯৬০-এর পর অন্য যেসব গীতিকবি খ্যাতি পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম নিতে হয় গোপালজী ঝা 'গোপেশ'-কে (সংকলন— 'সোনদাঈক পত্র', 'গুম্‌ম ভেল ঠাঢ়ছী ১৯৬৬) যাঁর শৈলী ও হাস্যরসবোধ 'যাত্রী' ও হরিমোহন ঝা-র কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং এজন্যই উনি অত্যন্ত জনপ্রিয় কবিও ছিলেন; রাধা রমণ (সংকলন : এক আঁখি গঙ্গা ১৯৬৭) যিনি বিষাদেরই কবি; বিন্দেশ্বর মণ্ডল ('নূতন কিরণ' ১৯৬৮) যিনি বিখ্যাত হয়ে গেলেন 'ওহি ভূমিক হমহুঁ ছী, অহুঁ ছী, ওহো ছথি' ('এ ভূমির আমি, তুমি, সেও এই ভূমির')— এই একটি কবিতা থেকেই; রাধাকৃষ্ণ ঝা 'বহেড়' যিনি গ্রাম্য পরিহাসকেই নিজের কবিতার উপজীব্য করেছেন; অনন্তবিহারী-লাল দাস 'ইন্দু'; জয়ধারীসিংহ 'প্রভাকর'; সুধাকান্ত মিশ্র (যিনি আধুনিক কবিতাগুচ্ছ 'তীসটা কবিতা'র রচয়িতা); বিজয় নারায়ণ মিশ্র এবং প্রবাসী সাহিত্যলঙ্কার— যিনি 'অন্নপূর্ণা' নামের একটি সুন্দর কবিতা সংকলনের রচয়িতা ছিলেন।

কিছুদিন আগে সোমদেব কবিতার— বিশেষ করে ১৯৪০ থেকে ১৯৬০-এর গীতিকবিতার একটা বিস্তারিত ও সুদক্ষ বিশ্লেষণ করেন এবং দেখান যে প্রধানত দুটি ধারা পাওয়া যাচ্ছে কবিতার— এবং এও দেখান যে এই কাব্য-বিকাশ হয়েছে বেশ সফল : (ক) একটি ধারায় পড়েছেন সেইসব কবিরা যাঁদের জীবনের প্রতি বিশ্বাস এখনো অটুট এবং (খ) দ্বিতীয়টিতে সেইসব কবিরা আছেন যাঁরা সমস্ত বিশ্বাস ও ভরসা হারিয়ে ফেলেছেন। প্রথমোক্ত কবিদের মধ্যে এইসব বিশেষত্ব পাওয়া যায় (১) দেশপ্রেম, (২) লোকছন্দ ও লোককথাবস্তু, (৩) সাপেক্ষ কবিতা যেখানে আত্মনকে আবিষ্কার করা হচ্ছে মুক্তির জন্য, (৪) মিথিলার জীবনের বাস্তব ছবি— বন্যা, খরা, রোগ-ভোগ, অশিক্ষা এবং দারিদ্র্যের ছবি। দ্বিতীয় গোষ্ঠীতে যে কবিরা পড়েন উনি তাঁদের মধ্যে পাচ্ছেন : (১) এমন কিছু কবিকে যাঁরা সমাজে যে শোষণ ও সংঘাত হচ্ছে তাই দেখাচ্ছেন, (২) তাঁদের যাঁরা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন এবং ধনীদের তাদের স্বার্থপরতার জন্য ধিক্কার দেন, এবং (৩) তাঁরা যাঁরা অন্ধকার বর্তমানকে অবজ্ঞা করে ভবিষ্যৎকে দেখতে জানেন। সোমদেব এইসব কবিদের কাব্যকুশলতার প্রশংসাযোগ্য আলোচনা করেছেন— নতুন ছন্দ, নবীন অলংকরণ, নতুন প্রতীক ও রূপক। উনি বিশ্বাস করেন যে

'প্রগতিবাদী' কবিদের রচনায় একটা স্পষ্টবাচন এবং শৈলীগত তির্যকতা আছে যদিও যা ওঁরা বলতে চান তা নিজেদের জীবন ও অভিজ্ঞতা থেকেই জাত এবং সমাজ জীবনকে অধিকতর সুস্থ ও শ্রেয় করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে লেখা যেখানে বর্তমানের অশুভ শক্তির কোনো স্থান নেই।

নবীন কবিরা নিজেদের কবিতায় তিনটি রচনা-নীতির ব্যবহার করেন : (১) নতুন কবি নিজের পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন এবং সব সময়েই চাইছেন এই পরিবেশের প্রতি নিজের কর্তব্য পালন করতে, (২) তিনি কোনো পরম্পরার বাঁধনেই বাঁধা পড়তে চান না— বিশেষ করে বহু প্রাচীন বিদ্যাপতি মনবোধের পরম্পরাতে তো নয়ই— এমনকি সদ্যগত অতীতের চন্দা ঝা-ভুবনের ঐতিহ্যের বাঁধনেও নয়, যদিও তিনি নিজের কবিতার শিকড় রয়েছে গাঁথা 'যাত্রী'র কবিতায়— তা দেখেছেন— তাও এইজন্য যে যাত্রীকেই নবীন কবিতার জনক বলে ধরা হয়; (৩) তিনি জানবেন, বুঝবেন এবং আবিষ্কার করবেন বলে বেরিয়েছেন। কিছুকাল পূর্বে রামকৃষ্ণ ঝা 'কিসুন' নতুন কবিদের একটি সংকলন— 'মৈথিলীক নবীন কবিতা' (১৯৭১) প্রকাশিত করেছেন যাতে আছে বেশ কিছু মহান কবিতা।

এই নতুন ধরনের কবিতার বা 'নবীন সাহিত্যের' সব থেকে প্রধান মুখপাত্র ছিলেন মণীন্দ্র চৌধুরী 'রাজকমল' (১৯২৯-১৯৬৭)। এঁর প্রথম কাব্য সংকলনের নাম 'স্বরগন্ধা'। ইনি বলেছিলেন— যা আমরা কীর্তিনারায়ণ মিশ্রের একটি সুন্দর নিবন্ধে পাই, মিশ্রের নিজের কাব্যসংকলন 'সীমান্ত'র (১৯৬৭) ভূমিকায়— যে 'নবীন' কবি আধুনিক জীবনে যেসব পরিবর্তন সমানে ঘটে চলেছে সে বিষয়ে অতীব সচেতন থাকেন। ইনি কোনো বাঁধাধরা তত্ত্ব বা মতবাদে বাঁধা পড়তে চান না, যদিও সাধারণত দেখা যায় ইনি আধুনিক অস্তিত্ববাদের অভিমতকে মেনে নেন। নবীন কবি এমন রচনা প্রক্রিয়ার ব্যবহার করেন যে সমস্ত ধরনের মানবিক অভিজ্ঞতা— তাব সমস্ত রূপ ও রঙকে ফুটিয়ে তুলতে পারে সার্থক ভাবে। সর্বোপরি, রাজকমল দাবি করেন, যে এই নবীন কবি বিদ্রোহ ঘোষণা শুধুমাত্র বিদ্রোহের জন্যই করেন না— অথবা শুধুমাত্র পশ্চিমা লেখকদের শৈলী ও বিষয়বস্তুর নকল করার জন্যই করেন না। বরং একথা বলা যায় যে কবি বর্তমান জীবনের একটা প্রকৃত ও তীব্র ছবি চাইছেন আঁকতে কলমের আঁচড়ে এবং তার মধ্যে দিয়ে আধুনিক মানুষের মনের ভেতরে যে অনুভূতি ও নন্দনভাব রয়েছে তার প্রতিভাসও করতে চাইছেন। মনে করছেন এভাবে একটা নতুন বিশ্ব ও একটি নতুন সাহিত্যকে গড়ে তোলা সম্ভব।

'রাজকমলে'র এই নেতৃত্বকে মেনে নিয়ে একদল নতুন কবি এক ধরনের চিন্তা-ভাবনাকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন : এঁদের মধ্যে প্রধান হলেন— 'রামকৃষ্ণ ঝা 'কিসুন' ('আত্মনেপদ' ১৯৬৩ এঁর সংকলন), অধ্যাপক মায়ানন্দ মিশ্র (সংকলন : 'দিশান্তর' ১৯৬৫), সোমদেব ('কালধ্বনি' ১৯৬৯), কীর্তিনারায়ণ মিশ্র ('সীমান্ত' ১৯৬৭), রমানন্দ 'রেণু' ('অন্ততঃ' ১৯৬৯ যা ওঁর প্রথম সংকলন এবং তারপরের গ্রন্থ হলো 'ওকরে নাম'

১৯৭২— "ওরই নামে"), জীবকান্ত (সংকলন 'নাচুঁ হে পৃথ্বী' ১৯৭১), ভীমনাথ ঝা ('ত্রিধারা' ১৯৬৮ এবং 'বীণা' ১৯৭০)। আরো কিছু কবি আছেন যাঁরা একত্রে সংকলন বের করেছেন— মৈথিলীর কিছু সর্বাপেক্ষা অনুভূতিশীল কবিতা আছে এর মধ্যে (নাম 'ধুরি' ১৯৭২, যাতে আছে ভীমনাথ ঝা, উপেন্দ্র 'দোষী', উদয়চন্দ্র ঝা এবং যুগবোধ প্রমুখ কবি)। এই দলে আরো কিছু তরুণ কবিও আছেন যাঁদের মধ্যে পড়েছেন হংসরাজ, ধীরেন্দ্র, ধূমকেতু, মধুকর, তারাকান্ত প্রকাশ ও রামানুগ্রহ ঝা।

এই সব কবিদের মধ্যে অবশ্য সবাই সমান স্তরের কবিতা লেখেন নি— তাই একটা পার্থক্য করা সম্ভব। এঁদের মধ্যে বয়স ও গুণমান দুই দিক থেকেই সব থেকে ওপরে আসেন 'কিসুন' এবং মায়ানন্দ। এঁরা দুজনেই অবশ্য তাঁদের পূর্বসূরিদের থেকে খুব বেশি পৃথক্ নন। তাঁরা বিষয় নির্বাচনের নিরিখে 'রাজকমলে'র খুব কাছাকাছি পড়েন— রচনা-ভঙ্গির দিক থেকে দেখলেও, কিন্তু তারা অনেক বেশি আভিজাত্যপূর্ণ এবং কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে দেখলে— বলা যায়, পরম্পরাবাদীও। তবে তাঁরা দুজনেই খুবই চিন্তাশীল কবি এবং দুজনেই তাঁদের চমৎকার ভাষা-শৈলী ও রূপকতার দিক থেকে অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য। হতে পারে সব ধরনের পাঠকের পক্ষে তাঁদের কবিতার রসাস্বাদন সম্ভব নয়, যদিও তারা এমন বহু কবিতাও লিখেছেন যা সহজতর এবং সাধারণের পক্ষে সহজবোধ্যও।

এরপরে আসছেন সোমদেব, রমানন্দ রেণু এবং কীর্তিনারায়ণ মিশ্র। সোমদেবের কবিতা মনে হয় গভীর ভাবের দ্যোতক এবং তাঁর ভাষা ও প্রতীক-ব্যবহার যতটা ফুটিয়ে তুলতে পারে তার তুলনায় তাঁর ভাব অনেক বেশি রহস্যময়। ছোট ছোট সহজ কবিতায় সোমদেব মনে হয় অনেক বেশি কুশলতার পরিচয় দেন তাঁর 'ছদ্ম-দর্শনে' ভরা কিংবা আপাতদৃষ্টিতে 'নিগূঢ়' কবিতার তুলনায়। রমানন্দ 'রেণু' আজকের সমাজের বিরুদ্ধে বিরক্ত হয়ে বিদ্রোহের ডাক দিয়েছেন যদিও তাঁর বাগ্‌ধারা ও বাচনশৈলী এখনো তাঁর কবিতার লয় ও স্বরের সঙ্গে খাপ খায় না। অনেকাংশেই মনে হয় তিনি গীতিকবিতা না লিখে গদ্যে লিখেছেন, বিশেষ করে তাঁর কবিতায় গীতিকতার অভাবে একথা মনে হয়। তবে তাঁর অনুভূতির সততা ও সার্থকতার বিষয়ে অথবা তাঁর বৌদ্ধিক ব্যাখ্যা— সমাজের অসুখ নিয়ে ভীতি বিষয়ক— তা নিয়ে সন্দেহ নেই। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো— তিনি পশ্চিমা কবিতার বা পশ্চিমার দ্বারা প্রভাবিত কবিতার অত্যন্ত বিরোধী।

কীর্তিনারায়ণ একজন কুশল কাব্য-শিল্পী এবং এঁর কবিতা যত্ন করে পড়ার মতনই। কিন্তু এখনো যাত্রী, রাজকমল কিংবা কিসুন যেমনটা পেরেছেন, কীর্তিনারায়ণ ঠিক তেমন ভাবে নতুন কবিতার বাগ্‌ধারার ওপর অধিকার অর্জন করেন নি— ওঁর এই কাব্যরীতির ওপর দখলও সব কবিতায় সমানভাবে ফুটে ওঠে না।

জীবকান্ত এবং 'ধুরি'-র কবিদের বিশেষ করে ভীমনাথ ঝা-এর কাজের মধ্যে আমরা নতুন শৈলী নিয়ে শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রকাশ দেখি। এইসব কবিরা নিজেদের বিষয়বস্তুর

ব্যাপারে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল এবং বাগ্‌ধারা ও পঙক্তিগুলির ছন্দবিষয়েও তাঁদের যথেষ্ট জ্ঞান। এমনকি তাঁদের অনুচ্ছেদ গঠনের ধারাও বিশেষভাবে আলাদা। শুধু জীবনের নানা দিক ও বিষয়ে তাঁদের সুস্পষ্ট সমালোচনাই নয়, শব্দ এবং পঙ্‌ক্তি গঠনের সৌন্দর্যবোধও এই কবিদের বড় করে তুলেছে। এঁদের মধ্যে আমার মতে জীবকান্ত সবচেয়ে পরিণত এবং শ্রেষ্ঠ। যাত্রীর পরে নতুন কবিতার ধারায় তাঁর কাব্য সংগ্রহ 'নাচু হে পৃথ্বী' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সংযোজন এবং এ জাতীয় কবিদের মধ্যে আমরা 'নতুন' কাব্যধারার যাথার্থ্য অনুভব করি।

বর্তমান প্রজন্মের কবিরা যাঁরা ১৯৫০-এর কোঠায় জন্মেছেন, তাঁরা বিশেষ আলোচনা করার পক্ষে অত্যন্ত তরুণ এবং অপরিণতও তবে তারা নিজেদের কবিত্বের স্বাক্ষর রাখতে শুরু করেছেন। এঁদের মধ্যে যাঁর গীতিকবিতা আলোচনার দাবি রাখে তিনি 'নচিকেতা'। তিনি উপনিষদীয় ধারণায় ফিরে গিয়েছেন এবং কাব্যে শান্তি এবং স্বস্তির বাণী প্রকাশ করতে চেয়েছেন যা নতুন কবিরা তাঁদের আন্তরিক অনুসন্ধান সত্ত্বেও খুঁজে পান না। তাঁর প্রথম একটি কাব্যসংগ্রহ প্রকাশিত হয় ১৯৬৬-তে ('কবয়ো বদন্তি') এবং সম্প্রতি আর-একটি প্রকাশিত হয়েছে ('অমৃসত্য পুত্রাঃ' ১৯৭০)। প্রথমটিই বেশ সফল যদিও সেখানে কিছুটা অপরিণত ভাব, ভাষার বাগ্‌ধারার উপর সম্পূর্ণ দখলের অভাব এবং ছন্দের বিষয়েও কিছুটা দ্বিধার প্রকাশ পাই। সর্বোপরি মিথিলার মাটির কাছাকাছি কল্পনা ও ভাবনার অভাব আছে নচিকেতার কবিতায়।

হেতুকর ঝা-র কাব্যসংগ্রহ 'চেটিকা'ও তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে অতীতে ফিরে যাওয়া এর অতীতের মূল্যবোধের সঙ্গে সমঝোতার প্রয়াস চোখে পড়ে।

বর্ণনাত্মক কবিতা

কবিতা রচিত হয়েছে কোনো দৃশ্যের বর্ণনা-রূপে, দীর্ঘ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হিসেবে, বা কোনো উৎসব বা স্মরণীয় ঘটনার আলোচনা করে। আগে এই ধরনের প্রয়াস করেছেন লালদাস ('বিরুদাবলী') এবং রাজদেব ঝা-র 'দরভঙ্গা-বর্ণনা' ও 'বাড়ি-বর্ণন'। কাশিনাথ মিশ্র 'মধুপ' লিখেছিলেন 'কোবর-গীত' (১৯৪৬) কোবরযাত্রা উৎসবের বর্ণনা রূপে, যা মহারাজাধিরাজ দ্বারভাঙা-র পারিবারিক উৎসবের অঙ্গ। সম্ভবত বর্ণনাত্মক কবিতা চরিত্রগতভাবে হয়ে পড়ে নির্দিষ্ট সময়-নির্ভর রচনা। আজ পর্যন্ত মৈথিলীতে যা লেখা হয়েছে তা এই ধরনের কবিতার ক্ষেত্রে খুব একটা উৎসাহব্যঞ্জক নয়।

হাস্যরসাত্মক কবিতা

নতুন প্রভাবের আরেকটা ফল হলো প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ হাস্য-কবিতা ও পরিহাস ও ব্যঙ্গ কবিতার রচনা। যদিও অনেক কবিই কখনো কখনো পরিহাসকে কবিতায় আনেন একটা অতিরিক্ত শৈলীরূপে, এবং এই কবিরাই ব্যঙ্গকবিতার ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা

যোগ করেন। হরিমোহন ঝা অনেক হাস্যরসাত্মক কবিতা লিখেছেন 'টী পার্টি', 'ঢালা ঝা-ক-বিদাই' ইত্যাদি বিষয় নিয়ে। দামোদরলাল দাস হাসির কবিতার প্রতি প্রথম উৎসাহ দেখান, তাঁর লেখা 'হমর বীরতা'-য় যেখানে বক্তা সত্যিই একজন কাপুরুষ। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা হলো 'প্রেমপত্রাবলী' যার একটিই অংশ ছেপে বেরিয়েছে 'ঘোঘ বিরুদাবলী' নামে।

চন্দ্রনাথ মিশ্র 'অমর' (সংকলন 'গুদগুদি' ১৯৪৫ ও 'ত্রিফলা' ১৯৪৯) নিজেকে এই ধরনের রচনায় সফল প্রমাণিত করেছেন। ইনি নিজের উপজীব্য বিষয়ের প্রতি ব্যঙ্গবাণ প্রয়োগ করেন খুঁটিনাটির দিকে মন দিয়ে এবং পরিহাস, শব্দ বিশেষের ওপর বলপ্রয়োগ এবং সূক্ষ্ম অতিরঞ্জনের সাহায্যে। এঁর প্রথম দিকের কবিতায় কিছুটা গভীরতার অভাব ছিল। কিন্তু এখন ওঁর কবিতায় পূর্ণতা ও প্রাপ্তবয়স্কতার ছাপ যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যাচ্ছে। 'যুগচক্রে'র ওপর ওঁর লেখা কবিতায়— যা এখন 'উনাটা পাল' (= উল্টো পাল) নামে প্রকাশিত হয়েছে, উনি এমন সব ক্রূর, সচেতন ও সুরসিক মন্তব্য করেছেন যে সহজেই পাঠকের মনে পড়ে যাবে আলেক্‌জান্ডার পোপের ব্যঙ্গকবিতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতাতেও এমন সব পরিস্থিতি স্থান পায় কিন্তু 'অমরের' পরিহাসেই সম্ভবত আধুনিক মৈথিলী কবিতার সবচেয়ে পরিণত হাস্যরস পাওয়া যাচ্ছে।

সিদ্ধান্ত

আধুনিক কবিতা যে বিষয় বৈচিত্র্যের দিক থেকেই লাভবান হয়েছে তাই নয়, এখানে আধুনিক মানুষ ও তার নানা সমস্যা নিয়েও অনেক লেখা হয়েছে। প্রকৃতি ও তার বিভিন্ন সংগঠক এককগুলি যতটা প্রাচীন কবিতায় নায়কোচিত সত্যতার আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং বীরধর্ম, প্রেমজ্ঞাপন ও অভিযানের ওপর জোর দেয়, ঠিক ততোটাই এসব পাওয়া যায় আধুনিক কবিতাতেও। ফলে এ থেকে কবিতার আকরণের একটা পরম্পরা তৈরি হতে চলেছে যা বিখ্যাত হয়ে যায় পরবর্তীকালে। মুক্তক ছন্দ এবং নানান তাল ও ছন্দ-বিষয়ক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ধ্বনিমাধুরী নিয়ে প্রয়াস হয় সার্থকভাবে। দীর্ঘ কবিতাগুলি, ছোট মাপের গীতিময় রচনা, গাথাসংগীত যার সাহিত্যিক মূল্য আছে, ব্যঙ্গকবিতা ও হাস্যরসাত্মক কবিতা— এইসব কবিতার নবীন রীতি এবং মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, গীতিকাব্য ও মুক্তক প্রভৃতি প্রাচীন রীতি— এসবই মৈথিলী কবিতার ওপর ইংরেজির প্রভাব বলে ধরে নিতে হবে। কবিতায় সতেজ বাগ্‌ধারা ও ততোধিক সজীব প্রতীক খুবই সফলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে অন্য সমস্ত সাহিত্যিক বিধার তুলনায় কবিতা হলো সবচেয়ে রক্ষণশীল বিধা। আর তাই প্রাচীন কাব্যভঙ্গিই কবির সৃজনশীল মনকে করে প্রভাবিত। বিদ্যাপতির পরম্পরা তাই নানান প্রভাব এবং আন্দোলন সত্ত্বেও টিঁকে থাকে।

আমি এখানে চেষ্টা করেছি সাহিত্যিক ঝোঁকের বা গতিবিধির একটা মোটামুটি

হিসাব দিতে—কোনো বিধারই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিতে নয়। অনেকগুলি এমন রচনাভঙ্গি আছে যার বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি; যেমন ব্রতকথা যা পদ্যছন্দে বলা হয়, বেদানন্দ ঝা-র ভজন (যোগ, স্বামী শিবানন্দ, দুর্গা এবং আরো বহু ধর্মীয় বিষয় নিয়ে), চন্দ্রধারী সিংহের দার্শনিক কৃতিগুলির আলোচনা ভবপ্রীতানন্দের ভক্তিগীতি কিংবা মোদলতার ভজন অথবা বাবু রামলোচন শর্মার করা কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত হিন্দি কবি তুলসীদাসের রচনার সার্থক অনুবাদ। অবশ্য সাহিত্যের ইতিহাসে এগুলির স্থান যে খুব উঁচুতে তা নয়; কিন্তু মৈথিলীভাষী মানুষের কাছে এই নতুন বিষয়গুলি অত্যন্ত আনন্দ ও সন্তুষ্টির কারণ।

মহিলা সাহিত্যকারেরা

শুধু একটি কথাই আরো বলা দরকার। মিথিলার লেখিকারা কাব্যরচনার ক্ষেত্রেই হয়েছেন অধিকতর সফল, যদিও এর ব্যতিক্রমও কিছু আছেন; যেমন শম্ভবী দেবীর 'মিথিলাক বিদূষী মহিলা' এবং রাজলক্ষ্মীর 'ভাগবত প্রকাশ' এবং 'গয়াযাত্রা'— এসবই অপূর্ব গদ্যরচনার উদাহরণ। খ্যাতনামা মহিলা কবিদের মধ্যে নাম করতে হয় লক্ষ্মীবতী 'লীলা', শ্যামা দেবী, প্রভা দেবী, শান্তি কুমারী, সুভদ্রাকুমারী পথ্যা, কামাখ্যা দেবী এবং জয়ন্তী দেবী। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের কবিতা প্রকাশিত করেছেন পুস্তকাকারে কিন্তু প্রায় কেউই সাহিত্যের ইতিহাসের নিরিখে খ্যাতিলাভ করেন নি।

একইরকমভাবে শিশু সাহিত্যের ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিখ্যাত কবিতা-রচনা হয়েছে বলে দেখতে পাচ্ছি। এমনই একটি অমর কবিতা হলো অধ্যাপক কণ্টকের লেখা 'তরেগণ' যা খুবই প্রশংসিত হয়েছিল। তবে ইনি নিজের সফলতাকে সৃজনশীলতার পথে আর বেশি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন নি এবং এইজন্যেই এঁর কবিতাকে পৃথকভাবে কোনো গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া সম্ভব নয় এই ধরনের ইতিহাস গ্রন্থে।

প্রাচীনকালে মিথিলার ভাষার নাম ছিল অবহট্‌ঠ বা মিথিলা-অপভ্রংশ। এইচ. টি. কোলব্রুক সর্বপ্রথম এর নামকরণ করেন মৈথিলী। স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন ভাষাটির চূড়ান্ত নামকরণ করেন মৈথিলী। বাংলা ও হিন্দি ভাষার সঙ্গে কিছু কিছু মিল থাকলেও মৈথিলী একটি স্বতন্ত্র স্বাদু বর্ণময় ভাষা। এই ভাষায় রচিত নানা আঙ্গিকের সাহিত্যের আনুপূর্বিক ইতিহাস সম্ভবত এই প্রথম বাংলায় প্রকাশিত হল। ভারতীয় সাহিত্যের অন্তঃসলিল স্বরূপ জানতে এই ইতিহাস অবশ্য পাঠ্য।

জয়কান্ত মিশ্র (জন্ম ১৯২২) এখন পুরো সময়ের লেখক। এক সময় ইংরেজি সাহিত্য পড়িয়েছেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে। নিখিল ভারত মৈথিলী সমিতির অবৈতনিক সভাপতি, সাহিত্য অকাদেমির মৈথিলী উপদেশক পর্ষদের একদা আহ্বায়ক মৈথিলী ও ইংরেজিতে লিখে থাকেন। প্রকাশিত গ্রন্থের ভেতর উল্লেখযোগ্য : অ্যান ইনট্রোডাকশন টু দি ফোক লিটারেচার অফ মৈথিলী (২ খণ্ড), লেকচার্স অন টমাস হার্ডি; মৈথিলী সাহিত্যক ইতিহাস, কীর্তনিয়া নাটক ইত্যাদি।

উদয় নারায়ণ সিংহ (জন্ম ১৯৫১) বর্তমানে মহীশূরের সেন্ট্রাল ইন্‌স্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ান ল্যাংগুয়েজেস-এর অধিকর্তা। বরোদা ও গুজরাত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন ভাষাতত্ত্ব। সম্পাদনা করেছেন ভাষাতত্ত্বের পত্রিকা *ইন্ডিয়ান লিংগুইসটিকস*। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহু আলোচনাসভায় পাঠ করেছেন গবেষণাপত্র। বাংলা ও মৈথিলীতে নিয়মিত লিখে থাকেন কবিতা ও প্রবন্ধ। এ পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থ : কবয়ো বদন্তি, অমৃতস্য পুত্রাঃ, অনুত্তরণ; নায়কক নাম জীবন, এক ছল রাজা; কবিতার ভাষা, উপন্যাসের সাহিত্যতত্ত্ব ইত্যাদি।